ভক্তিরসের মর্মজ্ঞ,

সংগীতাচার্য, সুসাহিত্যিক

শ্রীদিলীপ কুমার রায়

পূজনীয়েষু।

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ :

বাংলা সাহিত্য প্রসঙ্গ

রবীন্দ্র বীক্ষা (সম্পাদিত)

আধুনিক বাংলা ছন্দ

প্রাচীন বাংলা ছন্দ (যন্ত্রস্থ)

নিবেদন

"বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয়" গ্রন্থটির সূচনা ছয় বৎসর পূর্বে। পরিশিষ্ট অংশটি ব্যতীত সমগ্র গ্রন্থটিই তখন এক বৎসরকালের মধ্যে রচিত হয়েছিল। নানা কারণে বইটি তখন ছাপানো সম্ভব হয়নি। দু'বৎসর পূর্বে যখন প্রেসে ছাপতে দেবার সুযোগ এলো ততদিনে পদাবলী বিষয়ক চিন্তাভাবনায় অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু সেই অনুসারে পুনর্লিখনের আর সময় ছিল না। সামান্য কিছু তথ্যগত সংশোধন সহ, মোটামুটি সেই ছয় বৎসরকাল পূর্বেকার গ্রন্থটিই প্রকাশ করা গেল।

গ্রন্থপরিকল্পনায় মুখ্যতঃ বৈষ্ণবসাহিত্য-জিজ্ঞাসু পাঠকদের প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়টি পদাবলীর উপকরণ বিষয়ক। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাংলা পদাবলী ধারার প্রাণপুরুষরূপী শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী এবং ভক্ত দার্শনিকগণ প্রদত্ত তাঁর আবির্ভাবের তত্ত্বব্যাখ্যা সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে বৃন্দাবন গোস্বামীগণের হাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসতত্ত্বের যে স্বরূপ নির্ধারিত হয়েছে তারই সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যাবে। এই তিনটি অধ্যায়কে বৈষ্ণব পদাবলী পাঠের ভূমিকারূপে গণ্য করা যেতে পারে। চতুর্থ অধ্যায়ে চৈতন্য-পূর্ব যুগের পদাবলী-গানের মুখ্য [illegible] কবি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলীর পরিচয় দেওয়া হল। এ-অধ্যায়টি [illegible] সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। কারণ, একাধিক সমালোচক বিদ্যাপ[illegible] কবিত্ব সম্পর্কে ইতিপূর্বেই বিশদ আলোচনা করেছেন। পঞ্চম অধ্য[illegible]বর্তী মুখ্য কবিত্রয় জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস এবং বলরাম-দাসের পরি[illegible] বিশদভাবে দেওয়া গেল। ষষ্ঠ অধ্যায়ে এযুগের আরও চারজন উ[illegible] কবি বাসুঘোষ, লোচনদাস, জগদানন্দ এবং শশিশেখরের পদাবলীর সং[illegible]প্ত পরিচয় দেওয়া হল। চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচিত নয়জন কবির ক্ষেত্রে, তাঁদের কবিত্বশক্তির পাশাপাশি গঠনশিল্পরীতি সম্পর্কেও যথাযোগ্য গুরুত্ব দিতে চেষ্টা করা হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ে পৃথকভাবেই পদাবলীর গঠনশিল্প অর্থাৎ তার ভাষা, চিত্রকল্পনা, অলঙ্কার এবং ছন্দ সম্পর্কে কিছুটা বিশদ আলোচনা করা গেল। ভাব এবং রূপ উভয়েরই সমগুরুত্ব আরোপ এ-গ্রন্থের মুখ্য লক্ষ্য রাখা হয়েছে। গ্রন্থ পরিশিষ্টে পদাবলীপাঠের পক্ষে অপরিহার্য বিবেচনায় দুটি অধ্যায়ে (ক) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এবং (খ) চৈতন্য বিষয়ক

মধ্যযুগে রচিত বাংলা জীবনীগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল। উৎসনির্দেশে (Index) পাঠকদের সুবিধার্থে (ক) পরিভাষা এবং (খ) ব্যক্তিনাম, গ্রন্থনাম, বিবিধ—এই দুই পৃথক ভাগ রাখা হল।

লেখক এবং প্রকাশকের যথেষ্ট যত্ন সত্ত্বেও গ্রন্থে কিছু মুদ্রণপ্রমাদ রয়ে গেল। শিল্পাঙ্গিক আলোচনা-সমন্বিত গ্রন্থে যে সম্পূর্ণ প্রমাদমুক্তি কতটা দুঃসাধ্য কাজ পাঠক সহৃদয়তার সঙ্গে তা বিবেচনা করবেন আশা রাখি। একটি গুরুতর প্রমাদের এখানে উল্লেখ প্রয়োজন। তৃতীয় অধ্যায়টিকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসতত্ত্ব নামে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা প্রয়োজন ছিল। সেটি ভ্রমক্রমে হয়নি। পাণ্ডুলিপি অবস্থায় গ্রন্থটি আমার সহকর্মী ডক্টর শ্রীশিশিরকুমার দাশ দেখে দিয়েছেন এবং কয়েকটি মূল্যবান পরামর্শে আমাকে বিশেষভাবে উপকৃত করেছেন। গ্রন্থের প্রুফ দেখা, উৎস-নির্দেশ প্রস্তুত করা এবং অন্যবিধ কাজে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন আমার সহধর্মিণী শ্রীমতী দীপালি সেন এবং অনুজপ্রতিম শ্রীমান তরুণ রায়। ইংরেজি **Index** শব্দের পরিভাষা বিষয়ে 'উৎসনির্দেশ' শব্দটি আমার পূজনীয় আচার্য শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের পরামর্শে গ্রহণ করেছি। গ্রন্থপ্রকাশে সতর্ক যত্ন নিয়েছেন বুকল্যাণ্ডের পক্ষ থেকে শ্রীজানকীনাথ বসু। তাঁর বিশেষ আগ্রহ না থাকলে গ্রন্থটির প্রকাশ আরও বিলম্বিত হবার আশঙ্কা ছিল।

ন সেন।

দোলপূর্ণিমা, ১৩৭৪।
আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগ।
দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়॥

বিষয় সূচী

প্রথম অধ্যায়

পদাবলীর উৎস-প্রসঙ্গ

পদাবলী নামের উৎপত্তি :

পদ কথাটি বাক্য এবং সংগীত দুই অর্থেই ভরতের নাট্যসূত্রে (খৃঃ পূঃ ২ শতক থেকে খৃঃ ২ শতক) ব্যবহৃত হয়েছে।—

পদ শব্দের প্রথম ব্যবহার

গান্ধর্বং যন্ময়া প্রোক্তং স্বরতান পদাত্মকম্।
পদং তস্য ভবেদ্বস্তু স্বরতালানুভাবকং ॥

কালিদাস মেঘদূতেও সংগীত অর্থে পদ শব্দ ব্যবহার করেছেন।—

মদ্ গোত্রাঙ্কং বিরচিত পদং গেয়মুদ্গাতুকামা (উ. মে ৮৯॥)

প্রাচীন সংগীতশাস্ত্রে সংগীত অর্থে পদশব্দের ব্যবহারের আরও দৃষ্টান্ত মেলে। নেপাল দরবার থেকে, বৌদ্ধচর্যাগানের যে পুঁথি পাওয়া গেছে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তারও নাম পেয়েছেন চর্যাপদ। সুতরাং বাংলা ভাষাতেও গান অর্থে পদ শব্দের ব্যবহার বহু প্রাচীন। পদসমুচ্চয়—এই অর্থে পদাবলীর প্রথম ব্যবহার করেছেন অষ্টম শ... র্ধের আলঙ্কারিক আচার্য দণ্ডী তাঁর কাব্যাদর্শ গ্রন্থে।—

...রবিচ্ছিন্না পদাবলী। ১।১০॥

...এই অর্থে প্রথম পদাবলী কথাটি ব্যবহার করলেন কবি জ... শ শতকের শেষভাগ) তার গীতগোবিন্দ কাব্যে। ক... তিনি লিখেছেন,—

সংগীত ... অর্থে 'পদাবলী' শব্দটির প্রথম ব্যবহার

যদি হরিস্মরণে সরসংমনো,
যদি বিলাসকলাসু কুতূহলম।
মধুর কোমলকান্তপদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেব সরস্বতীম্ ॥

জয়দেবের গীতগোবিন্দ দিয়েই বৈষ্ণব পদাবলীগানের সূচনা। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহাজনেরা পদাবলীর ভাষা ভাব ছন্দ অলঙ্কারে,—মূল বিষয়বস্তুতে যেমন জয়দেবকে অনুসরণ করেছেন পদাবলী নামটিও তেমনি আত্মসাৎ করেছেন ধরা যেতে পারে।

জয়দেবের গীতগোবিন্দের পদাবলী যেমন মধুর কোমলকান্ত রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার সংগীত, বৈষ্ণব পদকর্তাদের গৌরাঙ্গলীলা বা রাধাকৃষ্ণলীলার পদগুলিও তেমনি মধুর কোমলকান্ত ভাব ও ভাষাছন্দে রচিত প্রেমসংগীত। সম্ভবত গৌরাঙ্গের আবির্ভাবের পূর্ববর্তী বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের সময় থেকেই রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক সংগীত পদাবলী নামে পরিচিত হয়েছে।

পদাবলীর রূপ ও ভণিতা :

পদাবলীর নামের মত গঠনভঙ্গিও জয়দেবের আদর্শে পরবর্তী বাংলা পদে অনুসৃত হয়েছে। অধিকাংশ ত্রিপদীবন্ধ-পদের পংক্তি সংখ্যা হল আট, কদাচিত ছয় বা দশ। দ্বিপদীবন্ধ (পয়ার, পজ্ঝটিকা, একাবলী, দিগক্ষরা ইত্যাদি) দশ থেকে ষোল, আঠার বা বিশ পংক্তির পদও রচিত হয়েছে। চৌপদী সংখ্যায় কম। চার বা ছয়, আট পংক্তির চৌপদী রচিত হয়েছে।[1] অধিকাংশ পদে প্রথম দুই শ্লোক গাওয়ার পর ধ্রুবপদ গাওয়া হত। পদের শেষের দুই পংক্তিতে সাধারণত কবিদের নামোল্লেখ থাকে—তাকেই ভণিতা বলে। জয়দেব পদশেষে ভণতি, ভণিতম্ ইত্যাদি শব্দ দিয়ে আপন নামের উল্লেখ করেছেন। বাংলা বৈষ্ণব পদাবলীর কবিরাও ভণয়ে, ভণই, ভণে ইত্যাদি শব্দ সহযোগে আপন নাম বসিয়েছেন,—ভণিতা কথাটি এর থেকেই এসেছে ধরা যেতে [illegible] প্রাচীন যুগে অবশ্য প্রায় সমস্ত কাব্যেই ভণিতা প্রয়োজন হতো [illegible] খন কাব্যগুলি পাঁচালীগানের মতো সুর-সহযোগে পঠিত বা গ[illegible] হত শ্লোকে রচয়িতার নাম নির্দেশে শ্রোতারা কবিদের পরিচ[illegible] অনেক সময় আপন নাম না দিয়ে বিশেষণও দিতেন—যেম[illegible] কবিকণ্ঠহার, কবিশেখর ইত্যাদি ভণিতা ব্যবহার করেছে[illegible] নাম ভণিতায় ব্যবহার করেছেন,—পদাবলীতে তারও দৃষ্টান্ত [illegible] বৈষ্ণব পদাবলীর ভণিতাংশটির একটি বিশেষ মূল্য রয়েছে। শুধু কবিপরিচয় নয়, কবির বিনয়াবনত ভক্ত হৃদয়ের আত্মনিবেদনের সুরটিও অধিকাংশ ভণিতায় প্রকাশ পেয়েছে। বিদ্যাপতির একাধিক ভণিতায় তার আশ্রয়দাতা রাজা শিবসিংহ এবং তৎপত্নী লছিমাদেবীর প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে। ইতিহাস এবং ধর্মাবেগ,—উভয়দিক থেকেই বৈষ্ণব পদাবলীর বিনয়নম্র ভণিতাংশের বিশেষ মূল্য রয়েছে।

ধ্রুবপদ

ভণিতা

পদাবলীর ভাষা ও ব্রজবুলি ঃ

পদাবলীতে নানা ভাষার মিশ্রণ দেখা যায়। জয়দেব গীতগোবিন্দে সংস্কৃতভাষা ব্যবহার করেছেন সত্য, তবে সে ভাষা অত্যন্ত সরল,—বাংলা ভাষার খুব কাছে চলে এসেছে। ভাষাতত্ত্ববিদ ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এ ভাষাকে Sanskritised Vernacular অথবা Vernacularised Sanskirt বলে বিশেষিত করেছেন। সম্ভবত বাংলাদেশের বৈষ্ণব ভক্তদের কথা মনে রেখেই তিনি এভাবে পদগুলি লিখেছিলেন। ছন্দেও কবি মূল সংস্কৃতের তুলনায় প্রাকৃত রীতিকে বেশি অনুসরণ করেছেন। সনাতন গোস্বামী জয়দেবকে লক্ষ্মণসেনের সমকালীন বলে উল্লেখ করেছেন। লক্ষ্মণসেন বাংলার সিংহাসনে রাজত্ব করেছেন ১১৭৯ থেকে ১২০৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। সুতরাং এই সময়ের মধ্যে জয়দেবের গীতগোবিন্দ লিখিত হয়েছে অনুমান করা যেতে পারে।

গীতগোবিন্দের ভাষা

ব্রজবুলি নামটি প্রথম কিভাবে সাধারণ্যে পরিচিত হয়েছে বলা কঠিন। ব্রজধাম—বৃন্দাবন অঞ্চলে যে আঞ্চলিক হিন্দিভাষা ব্যবহৃত হয় তার সঙ্গে এই ভাষার একেবারেই মিল নেই। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন, "এ ভাষা মৈথিল ভাষার অনুকরণে সৃষ্ট। প্রাকৃতপৈঙ্গলে এ ভাষার প্রাথমিক নমুনা আছে। তবে বিদ্যাপতির পদ প্রচারে এই ভাষা ব্যাপক প্রসার লাভ করে। রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদে এই ভাষা ব্যবহৃত হয় এবং ব্রজ বা বৃন্দাবন রাধাকৃষ্ণের [illegible] বোধ হয় এই ভাষার নাম ব্রজবুলি হইয়াছে। [illegible] হিন্দির সংমিশ্রণে উৎপন্ন একপ্রকার ভাষা ব্যবহৃত হয়। [illegible]ত পদাবলী-প্রচলিত ব্রজবুলির সম্বন্ধ নাই। মৈথিল, হি[illegible] এবং অসমীয়া ভাষার প্রভাব পদাবলীতে যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়।" ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন, "মোরাঙ্ নেপালের রাজসভার আওতায়ই বাংলা-মৈথিল পদাবলীর মিশ্রণে অবহট্‌ঠের ঠাটে ব্রজবুলির উৎপত্তি হয়েছিল।"

বাংলা মহাজন পদাবলীতে ব্রজবুলি নামে সুপ্রচলিত ভাষা মূলতঃ মৈথিল ভাষারই ক্রমরূপান্তর। কবি বিদ্যাপতি মৈথিল ভাষায় প্রায় এক হাজার বৈষ্ণব ও

শৈব পদ লিখেছিলেন। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার নানা তথ্য প্রমাণাদির দ্বারা অনুমান করেছেন, বিদ্যাপতি ১৩৮০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে জন্মেছেন এবং অন্ততপক্ষে ১৪৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে, বহুবিচিত্র বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ভূপরিক্রমা, কীর্তিলতা, পুরুষপরীক্ষা, কীর্তিপতাকা, লিখনাবলী, ভাগবত-অনুলিপি, শৈবসর্বস্বসার, গঙ্গাবাক্যাবলী, বিভাগসার, দানবাক্যাবলী, দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী এবং সেই সঙ্গে প্রায় সহস্র সংখ্যক বৈষ্ণব ও শৈব পদ। সুতরাং ভূগোল, ইতিহাস, ন্যায়, স্মৃতি, নীতি, পত্র রচনারীতি এবং সেই সঙ্গে শৃঙ্গার ও অন্যান্য রসের পদাবলী রচনায় কবির বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। এই

ব্রজবুলিতে মৈথিল প্রভাব

গ্রন্থাদিতে ব্যবহৃত ভাষার মধ্যে সংস্কৃত, অবহট্‌ঠ এবং মৈথিল তিনেরই নিদর্শন রয়েছে। দেশীয় অবহট্‌ঠ ভাষায় কীর্তিলতা রচনার কারণ দেখিয়ে কবি লিখেছিলেন—

বিদ্যাপতির ভাষা

সক্কয় বাণী বুহঅণ ভাবই
পাউঅ রস কো মম্ম না পাবই।
দেসিল বঅনা সবজন মিট্‌ঠা
তেঁ তৈসন জম্পঞো অবহট্‌ঠা॥

'সংস্কৃত বাণী বুধগণের ভাবনার বিষয়।—প্রাকৃত ভাষা-রসের মর্ম [illegible] পায়না। দেশীয় বচন সকলের কাছেই মিষ্টি। [illegible] বলছি।' প্রাকৃতজনের রসবোধের [illegible] বিদ্যাপতি পদাবলী রচনায় সম্ভবতঃ [illegible] করেছিলেন। এবিষয়ে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের অভি[illegible] পারে,—

ডঃ বিমানবিহারীর অভিমত

"মনে হয় যে সব বিষয়ে কবিতা পড়িবার আগ্রহ কেবলমাত্র মি[illegible]বাসীদেরই হইবার কথা, এরূপ বিষয় লইয়া কবি অবহট্‌ঠ ভাষায় রচনা করিয়াছেন, পূর্বভারতের কাব্যরসিকেরা যেরূপ কবিতা শুনিতে উৎসুক হইবার সম্ভাবনা তাহা তদানীন্তন বাংলা, হিন্দি, ওড়িয়া ও অসমীয়া ভাষার সহিত বিশেষ সাদৃশ্যযুক্ত মৈথিলী ভাষায় লিখিয়াছেন; আর সমগ্র ভারতের পণ্ডিত সমাজের জন্য যখন ভূপরিক্রমা, পুরুষপরীক্ষা, বিভাগসার,

শৈবসর্বস্বহার প্রভৃতি রচনা করিতে চাহিয়াছেন, তখন সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন।"

মনে হয় ডঃ মজুমদারের এই অভিমতই যুক্তিযুক্ত। মিথিলায় প্রাপ্ত বিদ্যাপতির পদ খাঁটি মৈথিল ভাষাতেই লিখিত হয়েছে। বাংলা দেশে প্রাপ্ত পদে তৎকালীন বাংলার কিছু সংমিশ্রণ হয়েছে। এই ভাষার কোমলতা বৈষ্ণব কবিদের ভালো লেগেছিল। বিশেষ করে শ্রীচৈতন্যদেব 'চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দের' পদ-রসাস্বাদনে হেতু প্ৰ হ'লেন তাঁর দ্বারাও বিদ্যাপতির পদ বাংলা দেশে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছিল। মিথিলাতে বিদ্যাপতির সমসাময়িক আরও একাধিক কবি এই কোমল ধ্বনি-তরঙ্গিত মৈথিল ভাষায় পদ রচনা করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ কবি উমাপতির 'পারিজাত হরণ' নাটকে সত্যভামার মুখে প্রদত্ত পদটির (অরুণ পূবব দিশি বহলি সগর নিশি, গগন মগন ভেল চন্দা··) উল্লেখ করা যেতে পারে। বাংলাদেশে, উড়িষ্যায় এবং আসামে শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক কালেই বিদ্যাপতির পদাশ্রিত মৈথিল ভাষার অনুসরণে পদ রচনা শুরু হয়েছিল। অবশ্য সে সকল পদে ক্রমান্বয়ে আঞ্চলিক ভাষার প্রভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তাছাড়া গায়কদের হাতে বিদ্যাপতির মূল মৈথিল ভাষায় লিখিত পদও যে ঈষৎ পরিবর্তিত হয়েছে বিভিন্ন পুঁথি সংকলনে তার পরিচয় মেলে।

ব্রজবুলি

সু... এরূপে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে, বিদ্যাপতি পূর্ব ভারতের কাব্য-রসিকরা যেরূপ কবিতা পছন্দ করতেন, তখনকার বাংলা, হিন্দি, ওড়িয়া এবং অসমীয়া ভাষার সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত সেরূপ মৈথিল ভাষাতেই বৈষ্ণব (এবং শৈব) পদগুলি লিখে-...র সমকালে বাংলাদেশ এবং উড়িষ্যা ও আসামের মধ্যে এই পদরচনারীতি বিশেষভাবে সমাদৃত হয় এবং বৈষ্ণব ভক্ত... অনুরূপ ভাষাদর্শে পদ রচনা করতে থাকেন। পরবর্তীকালে রাধাকৃষ্ণ ব্রজলীলার পদ-ভাষা এই অর্থে এই ভাষাদর্শ বাংলা দেশে ব্রজবুলি নামে পরিচিত হয়।

বাংলাদেশে প্রথম ব্রজবুলিপদ

চৈতন্য-পূর্ব যুগে বাংলাদেশে ব্রজবুলিতে লিখিত শ্রীখণ্ডের যশোরাজ খাঁ ভনিতাযুক্ত একটি পদের (এক পয়োধর চন্দন লেপিত......) সন্ধান মিলছে। চৈতন্য সমকালীন বাঙালী কবিদের মধ্যে মুরারি গুপ্ত, বাসুদেব ঘোষ, বসু রামানন্দ, যদুনন্দন, বংশীদাস প্রভৃতি কবিরাও ব্রজবুলি পদ রচনা করেছেন। উড়িষ্যায় শ্রীচৈতন্যের

অন্তরঙ্গ পার্ষদ রায় রামানন্দ অধিকাংশ পদ জয়দেবের ভাষা ও ছন্দের আদর্শে সংস্কৃতে রচনা করলেও প্রখ্যাত 'পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল' পদটি ব্রজবুলিতেই রচনা করেছিলেন, এটি লক্ষ্য করবার বিষয়। চৈতন্যদেবের সমকালীন অসমীয়া বৈষ্ণব কবি শঙ্করদেবের বহু পদে ব্রজবুলির সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষিত হয়।

ব্রজবুলির ব্যাপক ব্যবহার হয়েছে চৈতন্য-পরবর্তী গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে। বাঙালী বিদ্যাপতি মিথিলার বিদ্যাপতির যোগ্য উত্তরসাধক। তাঁর অতি উৎকৃষ্ট কিছু সংখ্যক ব্রজবুলি-পদের নিদর্শন মেলে। সপ্তদশ শতকে কবি গোবিন্দদাস ব্রজবুলিতে বহুসংখ্যক প্রথমশ্রেণীর পদ রচনা করেছেন। জ্ঞানদাস, বলরামদাস, জগদানন্দ, রাধামোহন, রায়শেখর প্রভৃতি পদকারদের নাম এ প্রসঙ্গে স্বভাবতই মনে আসবে। বৈষ্ণব পদাবলীতে ব্রজবুলি ভাষার প্রবর্তক বিদ্যাপতি। তবে নানা কারণে মিথিলায় সে ধারা বেশি সমৃদ্ধি লাভ করেনি। শ্রীচৈতন্যকে কেন্দ্র করে রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার যে ভাববন্যা বাংলাদেশে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে নব প্রাণচেতনার সঞ্চার করেছিল,—ব্রজবলি পদ এই নব ভাবোপলব্ধির ক্ষেত্রে অনির্বচনীয় রসের সন্ধান দিয়েছিল। নিছক বাংলা ভাষায় সমগ্র বৈষ্ণব পদাবলী রচিত হলে ভাবমাধুর্যের এমন অফুরন্ত রস [illegible] হত কিনা সন্দেহ রয়েছে। আসাম ও উড়িষ্যাও ব্রজবুলির ধারা দীর্ঘ [illegible] পারেনি। বাংলাদেশই ধ্বনিতরঙ্গিত ব্রজবুলি ভাষাছন্দের [illegible] দীর্ঘ তিন শতাব্দীকালের চর্চায় এই ভাষারীতিকে পদাবলী [illegible] গৌরবময় সম্পদে রূপায়িত করেছে। স্বয়ং বিদ্যাপতিও [illegible] রসঃনিঃসরণের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন কি [illegible] ব্রজবুলি এবং পদাবলীর বাংলাভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে [illegible] স্থানে আলোচনা করা গেল।

ব্রজবুলির ব্যাপক ব্যবহার চৈতন্যোত্তর কালে

পদাবলীর বিষয়বস্তু ও উৎস :

বৃন্দাবনের কৃষ্ণলীলা এবং নবদ্বীপ-নীলাচলের গৌরাঙ্গলীলা নিয়েই বিপুলায়তন বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য গড়ে উঠেছে। কৃষ্ণলীলার আবার দুটি অংশ—বাল্যলীলা এবং রাধাকৃষ্ণপ্রেমের মধুরলীলা। বাল্যলীলার মধ্যে

কালীয়দমন, গোষ্ঠলীলা ইত্যাদির কিছু পদ রয়েছে। বৈষ্ণব পদকর্তাগণ জয়দেব বিদ্যাপতির ও চণ্ডীদাসের আদর্শে রাধাকৃষ্ণের মধুরলীলাকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। তবে শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে বৃন্দাবন গোস্বামীরা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের যে নতুন দার্শনিক প্রতিষ্ঠা দিলেন চৈতন্য-পরবর্তী পদাবলী সাহিত্যে তার সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষিত হয়। চৈতন্যদেবের তিরোভাবের পর তাঁর অবতার-লীলাকে কেন্দ্র করেও বহু পদ রচিত হয়েছে। সে পদগুলিতেও তার বাল্য, কৈশোর, সন্ন্যাস প্রভৃতি জীবনালেখ্য রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার আলোকে ব্যাখ্যাত হয়েছে।

বৃন্দাবনলীলা ও নবদ্বীপলীলা

পদাবলীর—বিশেষত রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবন প্রেমলীলার উৎসসন্ধান সহজ কাজ নয়। হালের (অন্ধ্র সাতবাহনবংশীয় রাজা) গাথা সপ্তশতীতে প্রায় দু'হাজার বছর (খ্রীঃ ১ম শতক) আগে রাই, কানু এবং গোপীদের উল্লেখ রয়েছে।—এটিই বোধ হয় সর্বপ্রাচীন রাই-কৃষ্ণ যুগলনামের উল্লেখ।[১] উপনিষদে (গোপালতাপনী উপনিষদ : অথর্ববেদ) শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে গোপ-গোপীদের উল্লেখ আছে। রাধার পৃথক নামোল্লেখ নেই। ভাগবতের কৃষ্ণ ঐশ্বর্যবান পুরুষ। সেখানে কৃষ্ণরাধার মাধুর্যলীলা স্থান পায়নি। কৃষ্ণ-লীলা-পুষ্ট একটি গোপীর উল্লেখ থাকলেও স্পষ্টভাবে রাধা নামের উল্লেখ ভাগবতে নেই। নবম শতকে আনন্দবর্ধন-কৃত ধ্বন্যালোকে সংকলিত শ্লোকগুলির মধ্যেও দুটি শ্লোকে [illegible] রাধার উল্লেখ রয়েছে। একটি শ্লোকে কৃষ্ণ বৃন্দাবনাগত কোনও [illegible] ভদ্র গোপবধূগণের বিলাসসুহৃদ, রাধার নির্জন কেলির সাক্ষী [illegible]

বৃন্দাবনলীলার উৎস

গাথাসপ্তশতী

উপনিষদ

ধ্বন্যা[illegible] কৃষ্ণরাধা[illegible] স[illegible]

১। [illegible] তং কণহ গো-রঅং রাহি আএ অবণেন্তো।
এতাণং বলবীণং অন্নাণং বি গোরঅং হরসি॥ ১।৮৯॥ পোট্টিসস্স
হে কৃষ্ণ, তুমি মুখমারুতের দ্বারা রাধিকার (মুখের) গোরজ (ধূলিকণা) অপনয়ন করে এই বল্লভীদের ও অন্যান্যদের গৌরব হরণ করছ।
আরও কয়েকটি পদে কৃষ্ণের রাধার প্রতি পক্ষপাতিত্বের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত থাকলেও সুস্পষ্ট নামোল্লেখ নেই।
দ্র ২।১৪, ২।১৭, ৫।৪৭, ৭।৫৫, ৭।৬৯ শ্লোক,

সেই যমুনাতীরের লতাকুঞ্জগুলির কুশল তো?[২] আর একটি শ্লোকে রাধাবিরহের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।—'মধুরিপু কৃষ্ণ দ্বারবতী চলে গেল তাঁরই বস্ত্র দেহে জড়িয়ে এবং কালিন্দী তটকুঞ্জের বঞ্জুল লতাগুলি জড়িয়ে ধরে সোৎকণ্ঠা রাধা এমন গুরুবাষ্প-গদগদ কণ্ঠে বিগলিত তারস্বরে গান গেয়েছিল যে তাতে যমুনা-বক্ষে জলচরগণও উৎকণ্ঠিত হয়ে কূজন আরম্ভ করেছিল।[৩]

কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়

অজ্ঞাতনামা সংকলয়িতার সংস্কৃত কবিতা-সংগ্রহ 'কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয়' (দশম শতক) গ্রন্থেও রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক চারটি শ্লোক পাওয়া যায় (২১, ৩৪, ৪১, ৪২ সংখ্যক শ্লোক)।

দশাবতারচরিত

ক্ষেমেন্দ্রের 'দশাবতার চরিত' জয়দেবের গীতগোবিন্দের পূর্ববর্তী রচনা। সেখানে রাধাকৃষ্ণ লীলাবর্ণনায় গীতগোবিন্দের ভাষা ভাব ও ছন্দের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।—

ললিত-বিলাস-কলা-সুখ খেলন-ললনা-লোভন-শোভন-যৌবন
মানিত নবমদনে।
অলিকুল-কোকিল কুবলয়-কজ্জল কাল-কালিন্দসুতামিব উজ্জ্বল
কালিয়কুল দমনে।

শ্রীধরদাসের 'সদুক্তিকর্ণামৃত' পদসংগ্রহটি জয়দেবের সমকালে সংকলিত হওয়াই সম্ভব। এখানেও রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদ রয়েছে। হেমচন্দ্রের

অন্যান্য গ্রন্থ

কাব্যানুশাসন (একাদশ শতক?) 'রামচন্দ্রের [illegible] নাট্যদর্পণ কবিকর্ণপূরের অলঙ্কার কৌস্তুভ, পিঙ্গলাচা[illegible] প্রাকৃতপিঙ্গল প্রভৃতি জয়দেবের সমসাময়িক অনেকগুলি গ্রন্থেই রাধাকৃষ্ণলীল[illegible] পাওয়া যায়। লীলাশুক বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের 'কৃষ্ণকর্ণামৃত'ও সম্ভবত এই স[illegible] হয়েছে। এই গ্রন্থটি চৈতন্যদেব মহাবস্তু জ্ঞানে দাক্ষিণাত্য থেকে স[illegible]ন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ গ্রন্থের মধুর রসাশ্রিত ব্রজলীলার [illegible] টিকাসহ ব্যাখ্যা করেছেন।

২। তেষাং গোপবধূবিলাসসুহৃদাং রাধারহঃ সাক্ষিণাং
ক্ষেমং ভদ্র কলিন্দরাজতনয়াতীরে লতাবেশ্মনাম্।...

৩। যাতে দ্বারবতীং পুরং মধুরিপৌ তদ্বস্ত্রসংব্যানয়া
কালিন্দীতটকুঞ্জ বঞ্জুল লতামালম্ব্য সোৎকণ্ঠয়া।
উদ্গীতং গুরুবাষ্পগদ্গদ গলত্তারস্বরং রাধয়া
যেনান্তর্জলচারিভি র্জলচরৈরুৎকণ্ঠমাকূজিতম্॥

এখানে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। এতক্ষণ আমরা সুস্পষ্ট রাধাকৃষ্ণ ব্রজলীলার উল্লেখ যে সকল প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায় তারই পরিচয় দিয়েছি। কিন্তু তথ্য উপকরণের দিক থেকে বিচারে লক্ষ্য করা যায় বহু খ্যাত অখ্যাত প্রাচীন ভারতীয় শৃঙ্গাররসের কাব্যধারা-কেই বৈষ্ণব কবিরা আধ্যাত্মিকতার আলোকে নতুনভাবে পদাবলীগানে পরিবেশন করেছেন। চৈতন্য-পূর্ববর্তী

শৃঙ্গাররসাত্মক প্রাচীন কাব্য থেকে তথ্য আহরিত হয়েছে

কবি জয়দেব এবং বিদ্যাপতির পদগুলিতে প্রাকৃত শৃঙ্গাররসের চিত্র-সৌন্দর্যই প্রাধান্য পেয়েছে। রাধাকৃষ্ণ প্রেমের ক্রমপর্যায়টি অনুসরণ করলে দেখা যায় হালের 'গাথা সপ্তশতী' থেকে শুরু করে অমরুশতক, কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয়, সদুক্তি কর্ণামৃত, সুভাষিতাবলী, সূক্তিমুক্তাবলী প্রভৃতি সংগ্রহ গ্রন্থগুলিতে বর্ণিত নারী-প্রেমচিত্রাবলম্বনেই পদাবলীর ভক্তকবিরা শৃঙ্গার মধুর রসের নায়িকাকে অঙ্কিত করেছেন। বাৎস্যায়নের কামসূত্র এবং কালিদাসের বিভিন্ন কাব্যের শৃঙ্গার রসচিত্রকেও বৈষ্ণব কবিরা প্রয়োজনমতো কাজে লাগিয়েছেন। এক শ্রীধরদাসের সদুক্তিকর্ণামৃতেই বয়ঃসন্ধি, নবোঢা, মুগ্ধা, মধ্যা, প্রগল্‌ভা, স্বকীয়া, পরকীয়া, অভিসারিকা (দিবাভিসার, তিমিরাভিসার, জ্যোৎস্নাভিসার, দুর্দিনাভিসার), বাসকসজ্জিকা, খণ্ডিতা, মানিনী, কলহান্তরিতা, বিরহিণী, বিপ্রলব্ধা, প্রোষিতভর্তৃকা, দূতীবচন, সখিভর্ৎসনা প্রভৃতির নায়িকা চিত্ররূপের চমৎকার সব শ্লোক পাওয়া যায়। এই চিত্রসাদৃশ্য শুধু রাধাকৃষ্ণ লীলার পদেই নয়, গৌরাঙ্গ[illegible] পদেও যথেষ্ট রয়েছে। জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দ[illegible] বলরামদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি কবির বহুপদ সুখ্যাত এইসব প্রাচীন [illegible] থেকে সংস্কৃত প্রেমকবিতার আলেখ্যেই রচিত হয়েছে। তবে পার্থক্য [illegible] হল, সংস্কৃত কবিরা প্রাকৃত প্রেমচিত্রণে নায়িকার যে সব অনুভাবের বর্ণনা দিয়েছেন ভক্ত বৈষ্ণব কবিরা (বিশেষ করে চৈতন্য-পরবর্তী কবিরা) মধুর প্রেমভক্তির দ্বারা তাকে শোধন করে অলৌকিকতা দান করেছেন। প্রাচীন সংস্কৃত শৃঙ্গাররসের কবিদের সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তকবিদের পরিচয় সাধনের সংযোগ রক্ষা করেছেন একদিকে জয়দেব ও বিদ্যাপতি,—অপরদিকে রূপগোস্বামী, জীবগোস্বামী প্রভৃতি বৃন্দাবনের বৈষ্ণব গোস্বামীগণ।

রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার বৃন্দাবন কাহিনীর উৎস সম্পর্কে পাঠকমনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। এ বিষয়ে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের সুচিন্তিত অভিমত উদ্ধৃত করা যেতে পারে।—

ডঃ শশিভূষণের অভিমত

...মনে হয়, ব্রজের রাখাল কৃষ্ণের গোপীগণের সহিত যে প্রেমলীলা তাহা প্রথমে আভীর জাতির মধ্যে কতকগুলি রাখালিয়া গানরূপে ছড়াইয়াছিল। চপল আভীর বধূগণ এবং নব যৌবনে অনিন্দ্যসুন্দর গোপযুবক কৃষ্ণের বিচিত্র প্রেমলীলার উপাখ্যান গোপজাতির মধ্যে অনেক গানের প্রেরণা যোগাইয়াছিল। গান ছড়ার মাধ্যমেই হয়ত এগুলি ভারতবর্ষের বিভিন্নাঞ্চলে প্রচার লাভ করিতেছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্নাঞ্চলে যথেষ্ট সমৃদ্ধি লাভ করার পরে বৃন্দাবনের কৃষ্ণলীলা আস্তে আস্তে পুরাণগুলিতে স্থান পাইয়া কবি কল্পনায় আরও পল্লবিত হইয়া উঠিতে লাগিল। কৃষ্ণের এই বিচিত্র গোপীলীলার কাহিনীর ভিতরে একটি বিশেষ গোপী রাধার সহিত কৃষ্ণের বিশেষ প্রেমলীলার কিছু কিছু কাহিনী একটি ফল্গুধারার ন্যায় ভারতবর্ষের প্রাচীন প্রেমসাহিত্যের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইতেছিল মনে হয়। বিষ্ণুপুরাণ এবং ভাগবতের রাসবর্ণনার[১] ভিতরে তাহারই সাক্ষ্য পাওয়া যাইতেছে।

কৃষ্ণ-প্রিয়তমা এক প্রধানা গোপীর প্রেমলীলার গান দাক্ষিণাত্যে[illegible] সুপ্রাচীন আলবার সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ছিল বলে ডঃ দাশগুপ্ত জানি[illegible]ন। তবে সেখানে প্রধানা গোপীর নাম রাধার পরি[illegible]'[illegible]' ছিল। রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার শ্লোক বা পদ [illegible] কবিরা ধর্মপ্রেরণার জন্যেই যে শুধু লিখতেন এমন মনে [illegible] কোনও কারণ নেই। শৃঙ্গার রসাশ্রিত প্রেমলীলা আস্বাদনের জন্যেও রাধা[illegible] বহু কবিই কাব্যের বিষয়বস্তুরূপে গ্রহণ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে জয়দেবের পূর্বোদ্ধৃত

আলবার-কাহিনী প্রভাব

১। ভাগবতের দশমস্কন্ধে রাসলীলার বর্ণনায় পাওয়া যায়, কৃষ্ণ রাসমণ্ডল থেকে একজন প্রিয়তম গোপীকে নিয়ে অন্তর্হিত হন এবং অন্য গোপীদের আড়ালে তার সঙ্গে বিবিধ কেলী করেন। বিরহাতুর গোপীরা খুঁজতে খুঁজতে বৃন্দাবনের এক বনপ্রান্তে ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ পদচিহ্ন দেখে শ্রীকৃষ্ণের গমনপথ চিনতে পারল এবং সেই সঙ্গে একটি ব্রজবধূর পদচিহ্ন দেখে সেই পরম সৌভাগ্যবতী কৃষ্ণপ্রিয়ার উদ্দেশে বলল,—

'যদি হরিস্মরণে' শ্লোকটি স্মর্তব্য—'যদি হরিস্মরণে মনকে সরস করতে চাও, আর যদি বিলাসকলার কৌতূহল থাকে তবে জয়দেব ভারতীর মধুর কোমল এবং কান্ত পদাবলী শোন।' বিদ্যাপতিরও অসংখ্য পদে রাধার শৃঙ্গার-চিত্রণে বিলাসকলা কৌতূহল চরিতার্থ করবার প্রয়াসই প্রাধান্য পেয়েছে বলা যেতে পারে।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি বৈষ্ণব পদাবলী একটি সুস্পষ্ট দার্শনিক ধর্মমতের দ্বারা চালিত হয়েছে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর থেকে। একটু উদার প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে জৈন, বৌদ্ধ এবং মরমিয়া সুফীদের গানের সঙ্গে অনেক বৈষ্ণব পদের ভাবসাদৃশ্য আবিষ্কার করা যায়। জৈন বৌদ্ধরা বাংলাদেশে প্রায় দু হাজার বছর পূর্ব থেকে রয়েছেন। সুফী ভাবধারার প্রসারও সপ্তম শতক থেকে হয়েছে। উত্তর, দক্ষিণ এবং পশ্চিম ভারতের সঙ্গে বাংলার সংস্কৃতির যোগাযোগও দীর্ঘদিন ধরে চলেছে। সুতরাং বিভিন্ন সময়ে যে সব ধর্ম সংস্কৃতি ভারতে উদ্ভূত হয়েছে তাদের সঙ্গেও অল্পবিস্তর পদাবলীর ভাব সাদৃশ্য আবিষ্কার করা কঠিন নয়।

জৈন, বৌদ্ধ, সুফী ভাবের সঙ্গে বৈষ্ণব ভাবের মিল

চৈতন্য-পূর্ববর্তী পদাবলী গানে বিদ্যাপতি রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার বহুপদ রচনা করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের ভগবত সত্তার কাছে আত্মনিবেদন এবং প্রার্থনা বিষয়ক অল্প

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ।। ১০।৩০।২৪

এই [illegible] ক ভগবান ঈশ্বর হরি নিশ্চয়ই আরাধিত হয়েছেন। যে জন্যে গোবিন্দ আমাদের ছেড়ে প্রীতিবশে একে এই নিভৃত স্থানে নিয়ে এসেছেন।

ভগবতে রাধা নামের উল্লেখ নেই। অনয়ারাধিতো কথাটিকে 'অনয়া রাধিতঃ' এইভাবে ব্যাখ্যা করে বৈষ্ণব আচার্যেরা এখানে রাধা নাম আবিষ্কার করেছেন। সনাতন গোস্বামী, জীবগোস্বামী এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণে কৃষ্ণদাস কবিরাজ পরিচরণে বা সেবন অর্থে রাধ ধাতু প্রয়োগব্যাখ্যা করেছেন।—

কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্তিরূপ করে আরাধনে।
অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে।।

কয়েকটি পদও তাঁর রয়েছে। বহুপদে রাধাকৃষ্ণের নামোল্লেখ নেই কিন্তু নায়িকার প্রেমলীলার চিত্র দিয়েছেন। তাঁর কিছু সংখ্যক শৈবপদও পাওয়া যায়। ধর্ম প্রেরণার তুলনায় প্রেমচিত্রণ ও কবিত্ব প্রকাশের দিকেই তাঁর বেশি প্রবণতা লক্ষিত হয়।

চৈতন্যপূর্ববর্তী বৈষ্ণব গান

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে (পুঁথিটি খণ্ডিত অবস্থায় প্রাপ্ত) এগারোটি পালাখণ্ডে রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার নানা আখ্যায়িকা বর্ণিত হয়েছে। এ কাব্যে বর্ণিত দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড ইত্যাদি কাহিনী ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে পাওয়া যায়। সনাতন গোস্বামীর ভাগবত টিকাতেও উল্লেখ রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পালাগুলিতে রাধা-কৃষ্ণ লীলার অনেকাংশে স্থূল প্রাকৃত রুচির চিত্রই ফুটে উঠেছে। বাশুলী সেবক দ্বিজচণ্ডীদাসকে চৈতন্যপূর্ববর্তী কবি বলা হয়েছে। তাঁর পদগুলিতে সহজ মধুর প্রেমলীলার বিরহিণী রাধার চিত্রই স্ফূর্তি পেয়েছে। দ্বিজ ও দীন এবং অন্যান্য চণ্ডীদাসের পার্থক্য এখনও পণ্ডিতদের গবেষণার বিষয় রয়েছে। তবে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের অভিমত মেনে নিয়ে একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে, সুদীর্ঘ কয়েক শতাব্দীকাল ধরে রসপিপাসু বাঙালী সমাজ চণ্ডীদাস পদাবলীর মাধ্যমে প্রেমভক্তিপ্লুত যে সংগীত মাধুর্যের স্বাদ লাভ করেছেন কোথাও তার তুলনা মিলবে না।

চৈতন্য পরবর্তী বৈষ্ণব ভাবধারা

চৈতন্য পরবর্তীকালে বৃন্দাবনের ষট্‌গোস্বামী গৌড়ীয় বৈষ্ণব [illegible]শাস্ত্রের পূর্ণাঙ্গ ধর্মীয় দার্শনিক রূপ দিলেন। রূপগোস্বামী[illegible]জ্জ্বলনীলমণি এবং জীব গোস্বামীর ষট্‌সন্দর্ভে সেই দর্শনে[illegible]ত বিশ্লেষণ রয়েছে। পরবর্তীকালে দেশী ভাষার এই [illegible] বৈষ্ণব দর্শন কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁর অমরগ্রন্থ 'চৈতন্যচরিতামৃতে' প[illegible] করেছেন। বাংলা দেশে খেতরী মহোৎসবের (১৫৮১) প্রবর্তক নরোত্তম ঠা[illegible]র্তনগানের

পালাকীর্তন

একটি বিশিষ্ট ধারার (গড়ানহাটি) মাধ্য[illegible] পালাকীর্তনের (পূর্বরাগ, রূপানুরাগ, মান, অভিসার, প্রেমবৈচিত্ত্য, আক্ষেপানুরাগ, রাস, নিবেদন, মাথুর ইত্যাদি) রূপ দিয়েছেন। শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব থেকেই নৃত্য-গীত সংযোগে রাধাকৃষ্ণের লীলাভিনয় করতেন,—সেই অভিনয়ে চৈতন্যদেব ও তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদেরা কৃষ্ণ, রাধা এবং বৃন্দাবনের অন্যান্য গোপ গোপীদের চরিত্রকে রূপায়িত করতেন। সাধারণ অভিনয় থেকে লীলাভিনয়ে পার্থক্য ছিল এই যে, বৃন্দাবন-মাথুর ধর্মীয় লীলাভিনয়ে ভক্তবৃন্দ সেই ভাবে

একেবারে তন্ময় হয়ে আত্মলীন হয়ে পড়তেন। মহাপ্রভুর এই লীলাকীর্তনকে পূর্ণাঙ্গ পালারূপ দিলেন নরোত্তম ঠাকুর।

গৌরচন্দ্রিকা :

গৌরচন্দ্রিকা

এই প্রসঙ্গে গৌরচন্দ্রিকার উল্লেখ করা যেতে পারে। সম্ভবত এই সময় থেকেই পালাকীর্তনের সূচনায় গৌরচন্দ্রিকা গীতিরও প্রবর্তন হল। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের জীবন আখ্যায়িকাকে বৃন্দাবন ও বঙ্গদেশের চৈতন্যসমকালীন ও পরবর্তী গোস্বামীরা এক বিশেষ অলৌকিক তত্ত্বদৃষ্টির আলোকে ব্যাখ্যা করলেন। গৌরাঙ্গদেব যে অন্তরঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ ও বহিরঙ্গের শ্রীরাধার যুগল ভাব চেতনার অবতার-স্বরূপ বৃন্দাবন দাস, লোচন দাস, জয়ানন্দ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রমুখ জীবনীকারেরাও সেই ভাবে শ্রীচৈতন্যের অলৌকিক জীবনচরিত রচনা করলেন। মহাজনদের পদাবলী গৌরাঙ্গ-লীলার অসংখ্যপদে পূর্ণ হয়ে উঠল। রাধাকৃষ্ণের লীলা-আলেখ্যেই গৌরাঙ্গের জীবনচিত্র পদাবলীর মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠল। রাধাকৃষ্ণ লীলার সকল প্রকার ভাবই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের জীবনে ভক্ত কবিরা প্রতিবিম্বিত করে দেখতে চাইলেন। সুতরাং এখন থেকে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার পালাকীর্তনের সূচনায় চৈতন্যদেবের জীবন লীলার অনুরূপ ঘটনাবিধৃত একটি পদ সর্বপ্রথম গাইবার রীতি প্রবর্তিত হল। ভক্তেরা গৌ[illegible] বিষয়ক প্রথম গান শুনেই বুঝতে পারেন সভায় কোন্ পালা সেদিন গাওয়া হবে [illegible] হল গৌরচন্দ্রিকা।

আমাদে[illegible]

এবারে [illegible]প তাহলে সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে, পদাবলীর কাহিনী, তথা উপ[illegible]বং ভক্তিভাবাশ্রিত সৌন্দর্যচিত্রায়ণে বৈষ্ণব কবিরা উপনিষদ, হালের গা[illegible], আভীর ও অন্যান্য জাতির লৌকিক প্রেম গাথা, ভাগবতসহ [illegible] বিবিধ পুরাণ, বাৎস্যায়নের কামসূত্র, অমরুশতক, আনন্দবর্ধনের ধ্বন্যালোক, কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়, সদুক্তিকর্ণামৃত, সুভাষিতাবলী, সূক্তিমুক্তাবলী প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্র, পুরাণ, লোকধর্ম ও প্রেমগীতিকেই আশ্রয় করে ভারতের পূর্বাচার্যদের অনুসৃত পথেই অগ্রসর হয়েছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই বৃহত্তর বাংলাদেশে জয়দেব, বিদ্যাপতি, দ্বিজ-চণ্ডীদাস, বড়ুচণ্ডীদাস প্রভৃতি সাধক ও সৌন্দর্য প্রেমের কবি রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার মাধুর্য পদাবলীগানে প্রচার করেছেন। কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়, প্রাকৃতপৈঙ্গল প্রভৃতি

প্রাচীন পদসংকলন গ্রন্থে রাধাকৃষ্ণের মধুর লীলারসাত্মক বাঙালী কবির পদের সন্ধান মিলেছে। শ্রীচৈতন্যদেব এই সকল কবির মধুর কোমলকান্ত পদাবলীর রসাস্বাদনে আনন্দ লাভ করেছিলেন। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে শ্রীচৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে বৃন্দাবনের ষট্‌গোস্বামীর দর্শনাশ্রয়ে বাংলাদেশে নব্য মানবীয় প্রেমভক্তি ধারার বিকাশ ঘটল। গৌড়ীয় এই প্রেমভক্তি রসাশ্রয়ী বিপুল ঐশ্বর্যময় পদাবলী সাহিত্যের ধারা গড়ে উঠল। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে শতশত ভক্তকবি পদাবলীর এই পুণ্যধারায় বারিসংযোগ করেছেন। চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ পার্ষদ নরোত্তম ঠাকুর খেতরী মহোৎসবে খোল মাদল করতাল সহ পদাবলীকীর্তনের পূর্ণাঙ্গ আঙ্গিকরূপ দিলেন। গৌরাঙ্গলীলা, শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা, মধুরলীলার পূর্বরাগ-রূপানুরাগ, মান অভিসার, প্রেমবৈচিত্ত্য-আক্ষেপানুরাগ, মাথুর, ভাবসম্মিলন, আত্মনিবেদন প্রভৃতি পালাগানে কীর্তনগানের রীতি এখন থেকে প্রবর্তিত হল। পালাগানে গৌরচন্দ্রিকার সূচনাও এই সময় থেকে হয়েছে। এরপর ধীরে ধীরে আঞ্চলিক সুরবৈষম্য অনুসারে বৈষ্ণব পালাকীর্তনের কয়েকটি বিশিষ্ট রীতিও গড়ে উঠেছে। গড়ানহাটী কীর্তনরীতির প্রবর্তক হলেন নরোত্তম ঠাকুর। জ্ঞানদাস, মনোহর, নৃসিংহ প্রবর্তিত বাঢ়ের প্রাচীন রীতির নাম মনোহরসাহী। পদকর্তা বিপ্রদাস ঘোষ রেনেটী বা রাণীহাটি ধারার প্রবর্তক। ঝাড়খণ্ডী মন্দারিণী প্রভৃতি কীর্তন রীতিও উল্লেখযোগ্য।

অন্যান্য আলোচনায় প্রবেশ করবার পূর্বে পরবর্তী অধ্যায়ে শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনকাহিনীটি একনজরে দেখে নেওয়া যেতে পারে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রীচৈতন্যের জীবনী

নিমাইয়ের জন্মের পূর্বে একবার যবনরাজ গৌড়েশ্বর ফতেসাহ (১৪৮৩-১৪৯১) সম্ভবত ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপ উচ্ছন্ন করেছিলেন। ফতেসাহ এর কাছে সংবাদ পৌঁছেছিল গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হবে। তাতেই গৌড়রাজের এই আক্রোশ। জয়ানন্দ সে সম্পর্কে লিখেছেন—

তৎকালীন দেশের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পরিবেশ

পিরল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন
উচ্ছন্ন করিলা নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ।
বিষম পিরল্যা গ্রাম নবদ্বীপের কাছে
ব্রাহ্মণে যবনে বাদ যুগে যুগে আছে।
গৌড়েশ্বর বিদ্যমানে দিল মিথ্যাবাদ
নবদ্বীপ বিপ্র তোমার করিব প্রমাদ।
 ... ...
এই মিথ্যা কথা রাজার মনেতে লাগিল
নদীয়া উচ্ছন্ন কর রাজা আজ্ঞা দিল। [চৈ.ম. নদীয়া খণ্ড]

এই [illegible] বাসুদেব সার্বভৌম নবদ্বীপ ত্যাগ করে উড়িষ্যায় পালিয়ে যান। সেখানে [illegible] প্রতাপ রুদ্র (১৪৯৭-১৫৪০) সার্বভৌমকে বিশেষ সম্মান দিয়েছি[illegible] শ্রীচৈতন্য নীলাচলে গিয়ে সার্বভৌমের সঙ্গে শাস্ত্রবিচার করে তাঁকে স্বীয় ম[illegible]ছিলেন। সে কাহিনী বহু পরবর্তীকালের ঘটনা।

এক[illegible] সময়ে গৌড়রাজের অত্যাচারে 'প্রাণভয়ে স্থির নহে নবদ্বীপবাসী,' —সেই সময়ই শাস্ত্রচর্চার দিক থেকে নবদ্বীপ যে বড়ো কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল (এবং সম্ভবত তাতেই গৌড়রাজের ঈর্ষার কারণ ঘটেছিল) তার চিত্র এঁকেছেন বৃন্দাবন দাস—

নবদ্বীপ শাস্ত্রচর্চার কেন্দ্র

নবদ্বীপ সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে।
একো গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে॥
ত্রিবিধ বৈসে এক জাতি লক্ষ লক্ষ।

সরস্বতী দৃষ্টিপাতে সভে মহা দক্ষ ॥
সভে মহা অধ্যাপক করি গর্ব ধরে।
বালকেও ভট্টাচার্য সনে কক্ষা করে ॥
নানাদেশ হৈতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়ি লোক বিদ্যারস পায় ॥
অতএব পড়ুয়ার নাহি সমুচ্চয়।
লক্ষ কোটি অধ্যাপক নাহিক নির্ণয় ॥

[চৈ. ভা. আদিখণ্ড. ২অ.]

এ বর্ণনায় সামান্য অতিরঞ্জন থাকলেও এসময়ে নবদ্বীপ শাস্ত্রচর্চায় যে নতুন মনীষার পরিচয় দিয়েছিল ইতিহাসে তার সাক্ষ্য রয়েছে। নব্যন্যায়, নব্যস্মৃতি, নব্যতন্ত্র—সবই একালের ইতিহাস। নব্য নৈয়ায়িক রঘুমণি, স্মার্ত রঘুনন্দন, বৃহৎতন্ত্রসারের লেখক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ—এঁরা এ-যুগেই সম্ভবত শ্রীচৈতন্যের কিছু পূর্বেই আবির্ভূত হয়েছিলেন। তবে কৃষ্ণভক্তির দিক থেকে নবদ্বীপ তখন উন্নত হতে পারেনি। মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরির পূজাগীত প্রচলিত ছিল,—মদ্যমাংস দিয়ে যক্ষের পূজা করত কেউ, কেউ বাসুলীর সেবক ছিল, কিন্তু—

বলিলেও কেহ নাহি লয় কৃষ্ণ নাম।…
কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণভক্তি কারো নাহি বাসে ॥….
না শুনে কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গলে।…

[চৈ. ভা. [illegible] ২ অ.]

অদ্বৈত আচার্য, শ্রীবাস প্রভৃতি দু'চারজন কৃষ্ণভক্ত রাতে ভয়ে ভয়ে [illegible]নাম গান করতেন। সব দিক থেকে। পাষণ্ডীরা এবং যবনেরা কেউ [illegible] ভক্তদের সুনজরে দেখতেন না।

এই পরিবেশে ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে ১৯ ফেব্রুয়ারী (?) ফাল্গুনী পূ[illegible] চন্দ্রগ্রহণের সময় শচীদেবীর গর্ভে নিমাই-এর জন্ম হয়। পিতা জগন্নাথ মিশ্র শ্রীহট্ট থেকে নবদ্বীপে এসে বসতি করেছিলেন। জয়ানন্দ আমাদের আরও সংবাদ দিয়েছেন, জগন্নাথ মিশ্রের পূর্বপুরুষরা উড়িষ্যার যাজপুরে বাস করতেন। সেখান থেকে রাজা ভ্রমরের অত্যাচারে শ্রীহট্টে গিয়েছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যের জন্ম-সময়াদির বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে লিখেছেন—

নিমাই-এর জন্ম

চৌদ্দশত সাত শকে মাস ফাল্গুন।
পৌর্ণমাসী সন্ধ্যাকালে হৈল শুভক্ষণ ॥
সিংহরাশি সিংহলগ্ন উচ্চ গ্রহগণ।
ষড়্‌বর্গ অষ্টবর্গ সর্ব শুভক্ষণ ॥
অকলঙ্ক গৌড়চন্দ্র দিলা দরশন।
সকলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন প্রয়োজন ॥
এত জানি চন্দ্রে রাহু করিলা গ্রহণ।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি' নামে ভাসে ত্রিভুবন ॥

[চৈ. চ. আদি. ১৩প.]

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবকে প্রত্যেক পদকর্তাই কৃষ্ণাবতারের আবির্ভাবরূপে উল্লেখ করেছেন। লোচন চৈতন্যকে দিয়ে বলিয়েছেন,—

চৈতন্য আবির্ভাবের অলৌকিক বর্ণনা

বৃন্দাবনধন প্রকাশিব কলিযুগে।
ভুঞ্জিব প্রেমার সুখ ভুঞ্জাইব লোকে ॥
নিজ প্রেম বিলাসিব হেন লয় চিতে।
নিজ প্রেমা বিলাসিব প্রতিজ্ঞা করিল ॥

[চৈ. ম. সূত্রখণ্ড]

কবিরাজ গোস্বামী রায় রামানন্দকে দিয়ে শ্রীচৈতন্যকে বলিয়েছেন,—

রাধিকার ভাবকান্তি করি অঙ্গীকার ॥
নিজরস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার।
নিজ গূঢ় কার্য তোমার প্রেম আস্বাদন।
আনুষঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন ॥

[চৈ. চ. মধ্য. ৮ম প.]

লোচন অবতার তত্ত্ব ব্যাখ্যায় বলেছেন—

রাধার বরনে অঙ্গ গৌরাঙ্গ হইয়া।
রাধিকার ভাবরস অন্তরে করিয়া ॥

[চৈ. ম. আদিখণ্ড]

কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন—

রাধিকার ভাবমূর্তি প্রভুর অন্তর।

[চৈ. চ. আদি: ৪প.]

লোচন বলেছেন—

রাধাকৃষ্ণ অবতার করিতে বিহার।
আপনে স্বতন্ত্র রাধা প্রকৃতি আকার॥
প্রকৃতি পুরুষ যেন দোঁহে আত্মতনু।
দোঁহে একতনু, কার্য বুঝি হৈল ভিন্ন॥

[চৈ. ম. আদিখণ্ড]

কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন—

রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ॥
প্রেমভক্তি শিখাইতে আপনে অবতরি।
রাধাভাব কান্তি দুই অঙ্গীকার করি॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যরূপ কৈল অবতার।

[চৈ. চ. আদি-৪প.]

শ্রীচৈতন্যের এই অবতার-লীলা সম্পর্কে,—বৈষ্ণব রসতত্ত্বের ব্যাখ্যা সম্পর্কে পরে পৃথক ভাবে বিশদ আলোচনা করা যাবে।

বালক নিমাই বেশ দুরন্ত ছিলেন বিভিন্ন চরিতকারের বর্ণনা থেকে তার পরিচয় মেলে। ভাগবতকার এই দুরন্ত বালককে বালগোপালের [illegible] মাহাত্ম্যের আলোকে চিত্রিত করেছেন। জয়ান[illegible] লোচন এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজও (অতি সংক্ষিপ্ত [illegible]) বালকের বাল্যলীলায় বালগোপালকে প্রত্যক্ষ করেছেন। গঙ্গাস্নানে নি[illegible] দৌরাত্ম্য করতেন বৃন্দাবনদাস তার চমৎকার জীবন্ত বর্ণনা দিয়েছেন। জগ[illegible] কাছে গিয়ে তারা নালিশ করছেন।—

বাল্যকাল

কেহ বলে সন্ধ্যা করি জলেতে নামিয়া।
ডুব দেই লৈয়া যায় চরণে ধরিয়া॥
কেহ বলে আমার না রহে সাজি ধুতি।
কেহ বলে আমার চোরায় গীতাপুঁথি॥
কেহ বলে পুত্র অতি বালক আমার।
কর্ণে জল দিয়া তারে কান্দায় অপার॥

কেহ বলে মোর পৃষ্ঠ দিয়া কান্ধে চড়ে।
মুঞিরে মহেশ বুলি ঝাপ দিয়া পড়ে ॥
কেহ বলে বৈসে মোর পূজার আসনে।
নৈবেদ্য খাইযা বিষ্ণু পূজয়ে আপনে ॥
স্নান করি উঠিলে বালুকা দেই অঙ্গে।
যতেক চপল শিশু সেই তার সঙ্গে ॥
স্ত্রীবাসে পুরুষ বাসে করয়ে বদল।
পরিবার বেলে সভে লজ্জায় বিকল ॥

স্নানার্থিনী বালিকারাও এসে শচীদেবীর কাছে অভিযোগ জানায়—

শুন ঠাকুরাণী নিজ পুত্রের করণ।
বসন করয়ে চুরি, বলে বড় মন্দ ॥
ব্রত করিবারে যত আনি ফুল ফল।
ছড়াইয়া ফেলে বল করিয়া সকল ॥
স্নান করি উঠিলে বালুকা দেই অঙ্গে।
যতেক চপল শিশু সেই তার সঙ্গে ॥
অলক্ষিতে আসি কর্ণে বোলে বড় বোল।
কেহ বলে মোর মুখে দিলেক কুল্লোল ॥
ওকরার ফল দেয় কেশের ভিতরে।
কেহ বলে 'মোরে চাহে বিভা করিবারে' ॥

[চৈ. ভা আদি. ৫ অ.]

শেষোক্ত [illegible]টিই কি লক্ষ্মীদেবী? বাল্যকালের পূর্বরাগের আভাস কবি এখানে দিয়েছেন কি? গঙ্গাস্নান চিত্রে এই দুরন্তপনার ছবিটি যেমন জীবন্ত, তৎকালীন সমাজচিত্র হিসেবেও এর মূল্য বড় কম নয়।

বিশ্বরূপের গৃহত্যাগ

নিমাই-এর বড়ো ভাই (দশ বছরের বড়ো) বিশ্বরূপ ষোল বছর বয়সে (১৪৯১ খৃঃ) সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করেন। বৃন্দাবন দাস জানিয়েছেন তিনি অদ্বৈত আচার্যের সভায় গীতা ব্যাখ্যা করতেন, কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। তাঁকে সংসারী করবার জন্যে পিতা বিয়ের উদ্যোগ করলে তিনি গৃহত্যাগ করেন। তিনি কাটোয়ার কেশব ভারতীর কাছে

দীক্ষা নিয়েছিলেন এবং সন্ন্যাস জীবনে তাঁর নাম হয় শ্রীশঙ্করারণ্য। লোচন এ-তথ্য পরিবেশন করেছেন। বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হওয়াতে জগন্নাথ নিমাইকে আর শাস্ত্র পড়াতে রাজী নন।—

এই মত বিশ্বরূপ পড়ি সবশাস্ত্র।
জানিল সংসার সত্য নহে তিল মাত্র॥
অতএব ইহার পড়িয়া কার্য নাঞি।
মূর্খ হই ঘরে মোর রহুক নিমাঞি॥

[চৈ. ভা. আদি. ৮অ.]

অশিক্ষায় বালক নিমাই আরও উদ্ধত হয়ে উঠলেন। ঘরে বাইরে দৌরাত্ম্য আরম্ভ করলেন। একদিন আস্তাকুড়ে ফেলা বিষ্ণু নৈবেদ্যের এটো হাঁড়ির ওপর গিয়ে বসেছেন তিনি। শচীমাতা তিরস্কার করে বলছেন,—

নিমাই-এর বিদ্যাভ্যাস

বর্জ্যহাঁড়ী ইহা সব পরশিলে স্নান।
এতদিন তোমার এ না জন্মিল জ্ঞান॥

নিমাই জবাবে বললেন,—

তোরা মোরে না দিস পড়িতে।
ভদ্রাভদ্র মূর্খ বিপ্রে জানিব কেমতে॥

নানা তর্কের পর জগন্নাথ নিমাইকে পড়বার অনুমতি দিলেন। তখন তিনি সেই আস্তাকুড় থেকে উঠে এলেন। এর পর থেকে তাঁর প্রচণ্ড মনোযোগে পাঠচর্চা আরম্ভ হল। গঙ্গাদাস পণ্ডিতের কাছে তিনি ব্যাকরণ পড়েন। [illegible] বছর বয়সে নিমাই-এর উপনয়ন হল, আর এগার বছর বয়সে তিনি পিতাকে হা[illegible]লেন। নিমাই কৈশোর জীবনে বেশ উদ্ধত, একগুঁয়ে রাগী প্রকৃতির ছিলেন। [illegible] সময়কার নানা ঘটনা থেকে সেকথা অনুমান করা যায়।

ষোল বছর বয়সে প্রথম যৌবনে (১৫০১) নিমাই লক্ষ্মীদেবীকে বিয়ে করেন। কৈশোরে অন্যান্য বালিকাদের মধ্যে এই বালিকার সঙ্গে তার বিশেষ পরিচয় ঘটেছিল। কবিরাজ গোস্বামী তার বর্ণনা দিয়েছেন।—

প্রথম বিবাহ

একদিন বল্লভাচার্য কন্যা লক্ষ্মী নাম।
দেবতা পূজিতে এলা করি গঙ্গাস্নান॥
তারে দেখি প্রভু হৈলা অভিলাষ মন।

লক্ষ্মী চিত্তে সুখ পায় প্রভুর দর্শন ॥
সাহজিক প্রীতি দুঁহা করিল উদয়।
বাল্যভাবে ছন্নতন্থ করিল নিশ্চয় ॥
দুঁহা দেখি দুঁহা চিত্তে হইল উল্লাস।
দেব পূজা ছলে দোঁহে কৈলে পরকাশ ॥
প্রভু করে আমা পূজ আমি মহেশ্বর।
আমাকে পূজিলে পাবে অভীপ্সিত বর ॥
লক্ষ্মী তার অঙ্গে দিল পুষ্পচন্দন।
মল্লিকার মালা দিয়া করিল বন্দন ॥

[চৈ. চ. আদি. ১৪ প.]

এই প্রথমবারের সাক্ষাৎকার। তখনও পিতা জগন্নাথ বেঁচে ছিলেন। জগন্নাথের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার।—

দৈবে একদিন প্রভু পড়িয়া আসিতে।
বল্লভাচার্যের কন্যা দেখে গঙ্গাপথে ॥

[ঐ. আদি, ১৫ প.]

এর পর বিপ্র বনমালী শচীদেবীর কাছে গিয়ে লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে নিমাই-এর বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। চৈতন্যভাগবত-কার এই ঘটকালির চিত্রটি সুন্দর দিয়েছেন। জননী শচীদেবী বনমালীকে বললেন,—

পিতৃহীন বালক আমার।
জীউক পড়ুক আগে তবে কার্য আর ॥

[চৈ. ভা. আদি. ৯]

বিপ্র বনমালী দুঃখিত অন্তরে ফিরে যাচ্ছিলেন। পথে নিমাই-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ। নিমাইকে বনমালী জানালেন যে, নিমাই-জননী বিবাহ প্রস্তাবে আমল দেননি। নিমাই ঘরে এসে মাকে জিজ্ঞাসা করলেন 'আচার্যেরে সম্ভাষা না কৈলে ভাল কেনে?' শচীদেবী এবারে পুত্রের মনোগত ইচ্ছা বুঝে আবার আচার্যকে ডেকে বললেন,—

বিপ্র কালি যে কহিলা তুমি।
শীঘ্র তাহা করাহ, বলিল এই আমি ॥

[চৈ ভা. আদি. ৯.]

সুতরাং নিমাই লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে পূর্বরাগে আকৃষ্ট হন এবং নিজের চেষ্টায় বিবাহ সম্পন্ন করেন চরিতকার স্পষ্টই সে ইঙ্গিত দিয়েছেন।

তরুণ অধ্যাপক নিমাই

তরুণ অধ্যাপক নিমাই টোল খুলে ছাত্র পড়ান। বৈষ্ণব ভক্তদের দেখা পেলেই নানা শাস্ত্রীয় কূটতর্ক তুলে তাদের অপ্রস্তুত করেন। এসময়ে নবদ্বীপের একটা ঘটনার কথা বৃন্দাবনদাস বলেছেন। অদ্বৈতের গৃহে তার গুরুভাই মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য ঈশ্বরপুরী কিছুদিনের জন্যে এলেন। মাধবেন্দ্রপুরী শঙ্করাচার্যের সম্প্রদায়ভুক্ত হলেও ভক্তিরসের প্রথম প্রবর্তক। অনেকেই ঈশ্বরপুরীকে দেখতে যেতেন, নিমাইও যেতেন তাঁর কাছে। ঈশ্বরপুরী তাঁকে কৃষ্ণচরিত পুঁথি লিখে দেখতে দিয়েছিলেন যদি কোনও দোষ থাকে। নিমাই পুঁথি দেখে বলেছিলেন, ভক্তের বর্ণনায় কোনও দোষ থাকে না। প্রতিদিনই কিছু সময় উভয়ের মধ্যে নানা আলোচনা হত। সম্ভবত এই প্রথম নিমাই একজন বৈষ্ণবের সঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে দীর্ঘ দিনধরে আলোচনা করলেন। এ ঘটনাকে তাঁর জীবনে বৈষ্ণব চেতনার প্রথম অঙ্কুর বলা যেতে পারে। এই সময়ে আর একটি ঘটনা হল এক দিগ্বিজয়ীপণ্ডিত গৌড়, তিরহুত, কাশী, গুজরাট, বিজয়নগর, কাঞ্চী, পুরী, হেলঙ্গ, তৈলঙ্গ, উড্র দেশের পণ্ডিতদের পরাজিত করে নবদ্বীপে এসেছেন। গঙ্গার তীরে নিমাই-এর সঙ্গে তাঁর শাস্ত্রবিচার হল। তিনি অতি দ্রুত গঙ্গার একটি স্তব তৈরী করে আবৃত্তি করলেন। শ্রুতিধর নিমাই সে স্তবের আদি মধ্য ও অন্ত তিনস্থানের অলঙ্কার-দোষ দেখিয়ে দি[illegible] পণ্ডিত পরাভব মানলেন।

পূর্ববঙ্গ পর্যটন

এরপর নিমাই পূর্ববঙ্গ পর্যটনে বেরিয়ে পড়লেন, সঙ্গে শিষ্যবর্গ র[illegible]। মাকে বললেন, কিছুদিন বিদেশ ঘুরে আসি। [illegible]দেবীকে বললেন, 'মায়ের সেবন তুমি কর নিরন্তর।' নি[illegible] পদ্মাতীরে এলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। তাঁরা নিমাইকে নমস্কার জানিয়ে বলছেন,—

আমা সভাকার মহাভাগ্যোদয় হইতে।
তোমার বিজয় আসি হৈল এদেশেতে॥
মূর্তিমন্ত তুমি বৃহস্পতি অবতার।
তোমার সদৃশ অধ্যাপক নাহি আর॥

সভে এক নিবেদন করিয়ে তোমারে।
বিদ্যাদান কর কিছু আমা সভাকারে ॥

[চৈ. ভা. আদি. ১২ অ.]

বৃন্দাবন দাস আরও জানিয়েছেন, ইতিপূর্বেই নিমাইয়ের ব্যাকরণ-টিকা পূর্ববঙ্গের অধ্যাপকরা নিজেরা পড়েছেন এবং ছাত্রদের পড়াচ্ছেন।—

উদ্দেশে আমরা সভে তোমার টিপ্পনী
লই পড়ি, পড়াই শুনহ দ্বিজমণি। [ঐ]

নিমাই দুইমাস পদ্মাতীরের বিদ্যাকেন্দ্রে থেকে ছাত্রদের পড়িয়ে উপাধি দিয়ে এসেছিলেন। এখানেও তাঁর অধ্যাপক জীবনের একটি চরম সাফল্যের পরিচয় পাওয়া যায়। জয়ানন্দ এবং লোচন নিমাইয়ের পূর্ববঙ্গ যাবার অর্থনৈতিক কারণটিও বলেছেন।—

অর্থ উপার্জন বিনু সংসার না চলে
বঙ্গদেশে যাব আমি অর্থের ছলে।

[চৈ. ম. নদীয়া খণ্ড]

বঙ্গে গিয়ে তিনি বহুজনকে 'পঢ়াঞা পণ্ডিত' করলেন এবং 'বহুধন লঞা' ঘরে ফিরলেন একথা কবিরাজ গোস্বামীও বলেছেন।

নিমাই পূর্ববঙ্গে থাকতেই তাঁর গৃহে যে চরম দুর্ঘটনা ঘটে গেল,—অনুমান হয় তারই ফলে তাঁর জীবনের ধারার এত পরিবর্তন ঘটেছিল।

লক্ষ্মীদেবীর [illegible]

লক্ষ্মীদেবী আকস্মিক সর্পাঘাতে মারা গেলেন (১৫০৩)। জয়ানন্দ এই সর্পাঘাত মৃত্যুর বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। বৃন্দাবনদাস লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যুর সঠিক কারণের উল্লেখ করেননি। আর কবিরাজ গোস্বামী ও লোচন বলেছেন প্রভুর বিরহই সর্পের আকার নিয়ে লক্ষ্মীকে দংশন করেছিল।—

প্রভুর বিরহ সর্প লক্ষ্মীরে দংশিল।

[চৈ. চ. আদি. ১৬ প.]

অনুমিত হয়, সর্প দংশনেই বিরহিণী কিশোরী বধূর মৃত্যু হয়েছিল। তাঁর মৃত্যু সময়ে গদাধর সেখানে উপস্থিত ছিলেন। জয়ানন্দ গদাধরের কাছে শুনে লিখেছেন। কবিরাজ গোস্বামী বা লোচন বৈষ্ণবভক্তির আতিশয্যে সর্পদংশনকে বিরহদংশন রূপে কল্পনা করেছেন।

নিমাই ঘরে ফিরে পূর্ববঙ্গের গল্প করছেন। বঙ্গদেশী বাক্য অনুকরণ করে পরিহাস করছেন, কিন্তু শচীমাতা সামনে না এসে ঘরে রয়েছেন। নিমাই ঘরে গিয়ে মাকে জিজ্ঞাসা করলেন 'দুঃখিত তোমারে মাতা দেখি কি কারণ?' এবারে নিমাই সব জানলেন। তখন থেকেই তাঁর মনে বৈরাগ্য বোধ, সংসারের অনিত্যতার বোধ এসেছে। ক্ষণকাল নিজেকে সামলে নিয়ে মাকে বলছেন,—

নিমাই-এর ভাবান্তর

ভবিতব্য যা আছে তা খণ্ডিবে কেমনে॥
এই মত কাল গতি কেহ কার নহে।
অতএব সংসার অনিত্য বেদে কহে॥

[চৈ. ভা. আদি. ১২ অ]

'সংসার অনিত্য বেদে কহে'—এ তো শঙ্করাচার্যের অদ্বৈত বেদান্তের মায়াবাদী ভাষ্য। নিমাই-এর মনে এবারে সন্ন্যাস-বৈরাগ্যের বীজ উপ্ত হল মনে হয়। নইলে যে বয়সে তাঁর দাদা বিবাহ সম্বন্ধ হচ্ছে দেখে গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হন, সে বয়সে নিমাই তো মায়ের প্রাথমিক অমত সত্ত্বেও নিজে উদ্যোগী হয়ে প্রেমিকা লক্ষ্মীদেবীকে বিবাহ করেছিলেন। সেই প্রাণপ্রিয়ার তিরোভাব আজ তরুণ অধ্যাপকের মনে সংসারের অনিত্যতার বোধ এনে দিয়েছে। লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যু নিমাইয়ের ভাবী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-রূপী সন্ন্যাস-জীবনের সূচনা করে দিয়েছে, আমাদের এই অনুমান অসঙ্গত নয়।

ইতিপূর্বেই নিমাইয়ের বায়ুরোগের কথা একাধিক জীবনী[illegible]লেখক উল্লেখ করেছেন। এবারে সেই রোগের প্রকোপ বাড়ল। তিনি আবার অ[illegible]পনা করছেন। চাকরে শিরঃপীড়ার জন্য মাথায় বিষ্ণু[illegible]খিয়ে দিচ্ছে। ১৫০১-১৫০৩ এই দু'বছর নিমাই লক্ষ্মী[illegible] নিয়ে ঘর করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। ১৫০৫-এ বুদ্ধিমন্তখান, মুকুন্দ, সঞ্জয় প্রভৃতির চেষ্টায় রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে দ্বিতীয়বার তাঁর বিয়ে হল।

দ্বিতীয়বার বিবাহ

১৫০৮-এ (অক্টোবর) নিমাই গয়ায় চললেন পিতৃপিণ্ড দিতে। পিতার মৃত্যুর তের বছর পরে যাচ্ছেন তিনি। এখানে ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে তাঁর ছয় বছর পরে দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হল। উভয়ে তখন কি কথাবার্তা হয়েছিল ভক্ত জীবনীকারেরা আপন আপন ভক্তিমিশ্রিত কল্পনার সাহায্যে তার বর্ণনা দিয়েছেন।

গয়ায় গমন; পথে ঈশ্বরপুরীর কাছে দীক্ষা

অনুমিত হয়, ঈশ্বরপুরীর ভক্তিসাধনা নিমাইকে আকৃষ্ট করেছিল। এবারে তাঁর কাছে মন্ত্রদীক্ষা নিলেন।[১] ১৫০৯-তে (জানুয়ারী) নবদ্বীপে যেন এক নতুন মানুষ ফিরে এলেন। কবিরাজ গোস্বামী এ-বিবরণ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সংযত ভাষায় লিখেছেন—

তবেত করিল প্রভু গয়াতে গমন।
ঈশ্বরপুরীর সহিত তথায় মিলন॥
দীক্ষা অনন্তরে কৈল প্রেম প্রকাশ।
দেশে আগমন পুনঃ প্রেমের বিলাস॥

[চৈ. চ. আদি. ১৭ প]

এখন থেকে সেই উদ্ধত অহংকারী নিমাই একেবারেই নিরহংকার বিনয়ী হয়ে উঠলেন। যিনি কৃষ্ণভক্তদের সুযোগ পেলেই বিদ্রূপ করতেন এবারে তিনিই কৃষ্ণভক্ত হয়ে উঠলেন। এই সঙ্গে তৃতীয় আর একটি পরিবর্তন, তাঁর বায়ুরোগের প্রকোপ বেশ বৃদ্ধি পেল। কৃষ্ণভক্তিজনিত বিরহ-ভাবাবেশ এবং বায়ুরোগজনিত মূর্চ্ছা রোগের প্রকোপ,—দুয়েরই প্রকাশ নিমাইয়ের মধ্যে দেখা দিল। নিমাইয়ের আরও একটি পরিবর্তন দেখা দিল, গার্হস্থ্য ধর্মে অনীহা। যে নিমাই বিশ্বরূপ সন্ন্যাস নেবার পর ইচ্ছা জানিয়েছিলেন গৃহী হয়ে পিতামাতার সেবা করবেন, যিনি নিজে উদ্যোগী হয়ে লক্ষ্মীদেবীকে বিয়ে করেছিলেন, এখন কিন্তু পতিপ্রাণা উদ্ভিন্নযৌবনা বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতি তাঁর আর কোনও আকর্ষণ নেই।—

নিমাই-এর পরিবর্তন

লক্ষ্মীরে[২] আনিয়া পুত্রসমীপে বসায়।
দৃষ্টিপাত করিয়াও প্রভু নাহি চায়॥

[চৈ, ভা, মধ্য-১অ]

প্রথম প্রেমিকা-পত্নী লক্ষ্মীদেবীর বিরহ ধীরে ধীরে নিমাইয়ের মধ্যে কৃষ্ণবিরহের চেতনা এনে দিয়েছে।

ছোট হলেও একটি বৈষ্ণব সমাজ নবদ্বীপে দীর্ঘদিন ধরে ছিল। পাষণ্ডী এবং

১। জয়ানন্দ বলেছেন, গয়ার পথে রাজগৃহে ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে নিমাই-এর সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং সেখানেই মন্ত্রদীক্ষা নিয়েছিলেন। এ মত অন্য জীবনীকারগণ সমর্থন করেন নি।

২। বিষ্ণুপ্রিয়া

যবনরাজার ভয়ে তাঁরা সন্ত্রস্ত থাকতেন। শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে ভয়ে ভয়ে তাঁরা মিলিত হতেন। নিমাই কৃষ্ণভক্ত হলেও বায়ুরোগে কাতর। তিনি সুস্থ হয়ে দলে থাকলে পাষণ্ডী এবং যবনরাজকে উপযুক্ত শাস্তি তাঁরা দিতে পারবেন আশা রাখেন। বৈষ্ণব সমাজ তখনও অহিংস প্রেমপথের পথিক ছিলেন না, এটি লক্ষ্য করবার বিষয়।

নবদ্বীপে ফিরে নিমাই গুরু গঙ্গাদাস পণ্ডিতের পরামর্শে আবার অধ্যাপনা শুরু করলেন। ন্যায়, স্মৃতি, কাব্য, অলঙ্কার এবং ব্যাকরণের পণ্ডিত তিনি, ব্যাকরণের স্বাধীন টিকাভাষ্য লিখে সমগ্র বাংলাদেশের বৈয়াকরণদের প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। এবারে কিন্তু ছাত্রদের পড়াতে বসে সর্বশাস্ত্রে কৃষ্ণতত্ত্বই ব্যাখ্যা করলেন। এক বিশেষ ভাবাবেশে বাহ্যচেতনা হারিয়ে তিনি এই কৃষ্ণতত্ত্ব ব্যাখ্যা করতেন। ছাত্রেরা কিন্তু সে তত্ত্বব্যাখ্যা প্রসন্নভাবে গ্রহণ করেনি। তারা উপাধির জন্য এসেছে, বিশ্বের চরমতত্ত্ব জানতে আসেনি। নিমাই বুঝলেন শেষে—'আমার এসব কথা অন্যত্র অকথ্য।' পড়ুয়াদের বিদায় দিলেন। এবার তিনি 'দিলেন পুঁথিতে ডোর অশ্রুযুক্ত হৈয়া।' গয়া থেকে ফিরে চার মাস ছাত্রদের পড়াতে চেষ্টা করেছিলেন,—ব্যর্থ হয়ে পুঁথি বন্ধ করলেন। কৃষ্ণভক্তি, সেই সঙ্গে বায়ুরোগের প্রকোপ দিনে দিনে বেড়ে চলল নিমাইয়ের, মাতা শচীদেবী পুত্রের অসুখে (হয়তো এত অস্বাভাবিক কৃষ্ণ-ভক্তিতেও) চিন্তিত হলেন। নিমাই এবার বৎসরকাল ধরে বৈষ্ণব ভক্তদের নিয়ে সংকীর্তন করতে লাগলেন। শ্রীবাস, অদ্বৈত, নিত্যানন্দ (নিত্যানন্দ দেশ পর্যটনান্তে এসময়ে নবদ্বীপে এসে নিমাইয়ের সঙ্গে মিলিত হলেন) প্রভৃতি নবদ্বীপের বৈষ্ণব সমাজের প্রধানেরা আড়ম্বরপূর্ণ অভিষেকের দ্বারা নিমাইকে বৈষ্ণব সমাজের নেতা পদে অভিষিক্ত করলেন।

বৈষ্ণব ভক্ত নিমাই

ঠিক কোন সময়ে হরিদাস বৈষ্ণব হয়েছিলেন এবং সেই অপরাধে প্রকাশ্যে বাইশ বাজারে তাঁকে যবনরাজের অনুচরেরা চাবুক মেরেছিল (হুসেনশাহী আমলে ১৫০৬-৮এর মধ্যে) বলা কঠিন। নিমাই নেতৃত্ব নিয়ে তাঁকে বলেছিলেন—

হরিদাসকে উদ্ধার

এই মোর দেহ হেতে তুমি মোর বড়।
তোমার যে জাতি সেই জাতি মোর দড়॥

... ...

পাপিষ্ঠ যবনে যবে তোমা দিল দুখ।
তাহা সঙরিতে মোর বিদরয়ে বুক ॥

. .   . .

তোমার মারণ নিজে অঙ্গে করিলঙ।
এই তার সাক্ষী আছে মিছা নাহি কঙ ॥

[চৈ, ভা, মধ্য. ১০ অ.]

এবারে নিমাই নিত্যানন্দ এবং হরিদাসকে নির্দেশ দিলেন,—

প্রতি ঘবে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
কৃষ্ণ ভজ, কৃষ্ণ বোল, কর কৃষ্ণ শিক্ষা ॥

[চৈ, ভা, মধ্য. ১৩ অ]

নবদ্বীপেব ব্রাহ্মণ পাষণ্ডীদেব দু'জন জগাই মাধাই। বৃন্দাবন দাস এই দুই মাতাল দস্যুব চিত্র এঁকেছেন,—

জগাই-মাধাই উদ্ধার

দুইজনে পথে পড়ি গড়াগড়ি যায়।
যাহাবেই পায় সেই তাহাবে কিলায় ॥
ক্ষণে দুইজনে প্রীত, ক্ষণে ধরে চুলে।
চকার বকার শব্দ উচ্চ করি বলে ॥

[চৈ, ভা, মধ্য. ১৩ অ.]

সমস্ত নদীয়া এদের ভয়ে সন্ত্রস্ত। হেন পাপ নেই যা এরা করে না। নিত্যানন্দ আব হরিদাস তাদের কাছে কৃষ্ণনাম প্রচার করতে গিয়ে কোনও মতে পালিয়ে প্রাণে বাঁচলেন। নিমাইকে একদিন গঙ্গার ঘাটে ধরে জগাই মাধাই মঙ্গলচণ্ডীর গীত করতে বলল। তারা শাক্ত, চণ্ডীসাধনায় উৎসাহী। নিত্যানন্দকে একদিন পথে ধরে তাঁর নাম জিজ্ঞাসা করল। নিতাই নিজেকে অবধূত বলে পরিচয় দেওয়াতে মাধাই রেগে 'মারিল প্রভুব শিরে মুটকি তুলিয়া।' জগাই এই অকারণ রক্তপাত দেখে মাধাইকে নিবৃত্ত করল। তখন নিমাই এর কাছে খবর গেল। তিনি ছুটে এলেন। নিত্যানন্দের কিন্তু দুঃখ নেই। অন্ততঃ একজনেব মনে কৃষ্ণভক্তির সাড়া জাগাতে পেরেছেন। কারণ, 'মাধাই মারিতে প্রভু রাখিল জগাই।' প্রথম নিমাই খুব ক্রুদ্ধ হলেও নিত্যানন্দের এই কথায় আনন্দে জগাইকে কোলে টেনে নিলেন। জগাই প্রেমানন্দে মূর্ছিত হল,—এতক্ষণে মাধাই-এরও মন ভালো হয়েছে।

প্রভু বলে তোরা আর না করিস পাপ
জগাই মাধাই বলে আর নারে বাপ।

[চৈ, ভা, মধ্য. ১৩ প.]

সেই থেকে জগাই মাধাই কৃষ্ণভক্ত হল। মাধাইকে নিমাই গঙ্গাঘাটে সকলকে বিনয়নম্র নমস্কার করতে নির্দেশ দিলেন। মাধাই এখন থেকে তাই করতেন আর কঠোর কৃষ্ণ সাধন করতেন। আজও নবদ্বীপে মাধাইয়ের ঘাট রয়েছে, মাধাই ব্রহ্মচারীরূপে পুজিত হয়েছেন।

চন্দ্রশেখরের ভবনে একদিন রুক্মিনীহরণ পালার অভিনয় হল। প্রভু নিজে রুক্মিণী বেশে নৃত্য করলেন। হরিদাস বৈকুণ্ঠের কোটাল সাজলেন। শ্রীবাস নারদের ভূমিকা নিলেন, নিত্যানন্দ বড়াই বুড়ী হলেন। এ অভিনয় দেখতে নাকি বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিয়ে শচীদেবী উপস্থিত হয়েছিলেন। বৃন্দাবনদাসের এই অভিনয় বর্ণনা লোচন সংক্ষেপে সেরেছেন। কবিরাজ গোস্বামীও সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় চন্দ্রশেখর ভবনের পরিবর্তে শ্রীবাস আচার্যের ভবনের নাম করেছেন। এই কীর্তনে মৃদঙ্গ মন্দিরা এবং শঙ্খ বাজানো হয়েছিল। ভাগবতকার এখানে কীর্তনের বাদ্য সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন সেটি লক্ষণীয়।

নৃত্যাভিনয়

নিমাইয়ের বৈষ্ণবমন্ত্র দীক্ষা নেবার পূর্বে নবদ্বীপে অদ্বৈত আচার্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব করেছেন। নিমাই নেতৃত্ব নেবার পর তিনি শান্তিপুরে চলে গিয়েছিলেন। অভিনয় উপলক্ষে নবদ্বীপে এলেও পুনর্বার শান্তিপুর ফিরে যান এবং সেখানে ভক্তিমার্গের পরিবর্তে জ্ঞানমার্গের সাধনার কথা প্রচার করেন [দ্র. চৈ. ভা. মধ্য ১৯ প.]। নিমাই তাঁকে গিয়ে শাস্তি দেন এবং ভক্তিমার্গে ফিরিয়ে আনেন, নবদ্বীপেও ফিরিয়ে আনেন। ভক্ত জীবনী লেখকেরা এ ঘটনাকে উভয়ের পরস্পরকে পরীক্ষারূপে ব্যাখ্যা করলেও আমাদের অনুমান, উভয়ের নেতৃত্বের হয়তো কিছুটা সাময়িক বিরোধ ঘটেছিল।

অদ্বৈতাচার্যকে জ্ঞানমার্গ থেকে ভক্তিমার্গে আনয়ন

নিমাইয়ের জীবনে এরপর উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, চাঁদকাজির গৃহ আক্রমণ ও লুণ্ঠন। বৃন্দাবনদাস হুসেন সাহ্-এর (১৪৯৩-১৫২০) রাজত্বের যে ছোটখাট চিত্র দিয়েছেন তাতে তাঁকে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতি সদাশয় কোনও মতেই বলা চলে না। এক জায়গায় লিখেছেন, —

চাঁদকাজির শাস্তি

হুসেন সাহ সর্ব উড়িয়ার দেশে।
দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিলেক দেউল বিশেষ॥
[চৈ. ভা. অন্ত্য. ৪ প.]

হুসেন সাহ কর্মচারীদের বৈষ্ণব-দমনে বিশেষ নির্দেশ দিয়েছিলেন অনুমিত হয়। চাঁদকাজি নবদ্বীপে কৃষ্ণনাম-কীর্তন শুনে যেরূপ নিষ্ঠুর ভাবে তা দমন করেছেন বৃন্দাবনদাস তার চিত্র সুস্পষ্টভাবে এঁকেছেন,—

হরিনাম কোলাহল চতুর্দিকে মাত্র।
শুনিয়া সঙরে কাজী আপনার শাস্ত্র॥
কাজী বলে ধর ধর আজি করোঁ কার্য।
আজি বা কি করে তোর নিমাই আচার্য॥
আথে ব্যাথে পলাইলা নগরীয়াগণ।
মহাত্রাসে কেশ কেহ না করে বন্ধন॥
যাহারে পাইল কাজী মারিল তাহারে।
মৃদঙ্গ ভাঙ্গিল অনাচার কৈল দ্বারে॥
কাজী বলে হিন্দুয়ানি হইল নদীয়া।
করিব ইহার শাস্তি নাগালি পাইয়া॥
. ...
এই মত প্রতিদিন দুষ্টগণ লৈয়া।
নগর ভ্রময়ে কাজী কীর্তন চাহিয়া॥ [চৈ. ভা. মধ্য. ২৩ অ.]

নিমাই বৈষ্ণব সমাজের নেতৃত্ব নিয়ে স্থির করলেন, সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে কাজির নির্দেশ অমান্য করবেন। সন্ধ্যায় মশালসহ কীর্তনদল বার করলেন এবং কাজির ঘর ভেঙে তার দরজায় কীর্তন করবেন স্থির করলেন। অসংখ্য নগরবাসী সংকীর্তন করতে করতে কাজির বাড়িতে এল —

আসিয়া কাজীর দ্বারে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রোধাবেশে হুঙ্কার করয়ে বহুতর॥
ক্রোধে বলে প্রভু আরে কাজীবেটা কোথা।
ঝাট আন ধরিয়া কাটিয়া ফেল মাথা॥
প্রাণলঞা কোথা কাজী গেল দিয়া দ্বার।
'ঘর ভাঙ্গ ভাঙ্গ' প্রভু বলে বার বার॥
[চৈ. ভা. মধ্য. ২৩ অ]

তখুনি সকলে কাজির ঘর দুয়ার ভেঙে বাগান নষ্ট করে ফেলল। কাজি পিছন দিক দিয়ে পালিয়ে বাঁচলেন। নিমাই ক্রোধবশে অন্দরমহলেও আগুন দিতে চেয়েছিলেন। নিত্যানন্দ তাকে বুঝিয়ে নিবৃত্ত করলেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, চাঁদকাজি গৌড়েশ্বর হুসেন সাহ্-এর দৌহিত্র ছিলেন।

একাধিক ঘটনায় দেখা যায় নিমাই কৃষ্ণভক্ত হলেও এখন পর্যন্ত প্রয়োজনে হিংসাধর্ম ছাড়েননি। চাঁদ কাজির অত্যাচার দমনের এ কাহিনীতে তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ মিলছে। চৈতন্যচরিতামৃত-কার এরপর কাজির হৃদয় পরিবর্তনের কিছু অলৌকিক কথা বলেছেন, তার বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য স্বীকার করা যায় না। এটুকু বুঝা যায় এরপর থেকে নবদ্বীপে কাজির অত্যাচার বন্ধ হল। নিমাইয়ের এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা বাড়ল।

সন্ন্যাসগ্রহণ এবং গৃহত্যাগ

এরপর নিমায়ের জীবনে উল্লেখযোগ্য ঘটনা সন্ন্যাসগ্রহণ। নিমাই লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যুর পর থেকেই আর সংসারে তেমন আসক্ত থাকতে পারেননি। সংসার অনিত্য, এখানে কেউ কারও নয়,—সকলকেই কালের গতিতে চলে যেতে হবে,—শঙ্করের এই মায়াবাদী বেদান্তসত্য তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। এবারে (২৪ বৎসর বয়সে ১৫১০) খৃ. [১] নিত্যানন্দকে তিনি বললেন,—

> শুন নিত্যানন্দ মহাশয়।
> গারিহস্থ বাস আমি ছাড়িব নিশ্চয়॥

নিত্যানন্দ জানালেন, কিসে ভালো হবে তুমিই জানবে। জগৎ উদ্ধার কি ভাবে হবে তুমি ছাড়া কে জানবে।

> তথাপিহ কহ সর্ব সেবকের স্থানে।
> কেবা কি বলছে তাহা শুনহে আপনে॥
>
> [চৈ. ভা. মধ্য. ২৫ অ.]

একে একে নিমাই, মুকুন্দ, গদাধর প্রভৃতি নেতৃস্থানীয় বৈষ্ণবদের কাছে সংকল্পের কথা বললেন। গদাধর শাস্ত্রীয় যুক্তি দিয়ে নানাভাবে নিবৃত্ত করতে চাইলেন। শেষে বললেন, প্রথমেই জননী-বধের ভাগী হবে। নিমাই সেই এক যুক্তি দেন।

১। ১৫২০ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারীর দ্বিতীয় সপ্তাহে সম্ভবত ২৬ শে মাঘ কাটোয়া যাত্রা করছিলেন এবং ২৯শে মাঘ সংক্রান্তির দিন প্রান্ত সন্ন্যাস নিয়েছিলেন।

লোকশিক্ষা, জগৎ উদ্ধার যদি আমাদ্বারা চাও তবে সন্ন্যাসে বাধা দিওনা। **কৃষ্ণবিরহ অর্থাৎ বৈরাগ্য এবং লোক উদ্ধার** এই দুই কারণেই নিমাই সন্ন্যাস নিয়েছিলেন মনে হয়। শচী, বিষ্ণুপ্রিয়া একে একে সকলকেই নিমাই ধৈর্যের সঙ্গে তাঁর সন্ন্যাসের সংকল্প ও উদ্দেশ্য বুঝিয়েছিলেন। প্রত্যুষে নদী পেরিয়ে নিমাই কণ্টকনগরে (কাটোয়া) এলেন। কেশবভারতী সেখানে অবস্থিতি করছিলেন, নিমাই তাঁর কাছে দীক্ষা নিলেন। কেশব শঙ্কর-পন্থী ভারতী-সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন। এখন থেকে, নিমাইয়ের নাম হল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। জগতকে

কেশবভারতীর কাছে দীক্ষানিয়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম গ্রহণ

কৃষ্ণনাম বলিয়েছেন, কৃষ্ণের কীর্তন প্রকাশ করেছেন, তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।— এটা বৃন্দাবনদাসের ব্যাখ্যা। জয়ানন্দ বলেছেন, কৃষ্ণই চৈতন্যসন্ন্যাসী হয়ে জগতকে চৈতন্য দান করেন—তাই তার নাম হল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য [দ্র. চৈ ম. সন্ন্যাস খণ্ড]। নিমাই-বিরহে নবদ্বীপের কি করুণ অবস্থা হল বৃন্দাবনদাস, জয়ানন্দ, লোচন তার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। শ্রীচৈতন্য নবদ্বীপ ত্যাগ করবার পর হরিদাস ফুলিয়ায় এবং অদ্বৈত শান্তিপুরে চলে যান। শ্রীচৈতন্য রাঢ় দেশে প্রবেশ করে প্রথম ফুলিয়ায় হরিদাসের ঘরে যান, সেখান থেকে শান্তিপুরে অদ্বৈতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। তিনি নিত্যানন্দকে নবদ্বীপ পাঠালেন শচীমাতা এবং ভক্তদের শান্তিপুরে নিয়ে আসতে। অদ্বৈতের গৃহে জননীর সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ হল। তিনি কাতর মাকে সান্ত্বনা দিলেন,

> নীলাচলে বাস আমি করিব সর্বথা।
> সর্বদা আসিবে যাবে দেখা পাবে তথা ॥ [চৈ. ম. মধ্যখণ্ড]

চৈতন্যচরিতামৃত-কার শচীমাতাকে দিয়েই বলিয়েছেন,--

> নীলাচলে নবদ্বীপে যেন দুই ঘর।
> লোক গতাগতি বার্তা পাব নিরন্তর ॥
> তুমি সব করিতে পার গমনাগমন।
> গঙ্গাস্নানে কভু তাঁর হবে আগমন ॥ [চৈ. চ. মধ্য. ৩ প.]

এবারে নবদ্বীপের ভক্তদের শ্রীচৈতন্য বললেন,

> যদ্যপি সহসা আমি করিয়াছি সন্ন্যাস।
> তথাপি তোমা সবা হৈতে নহিব উদাস ॥
> তোমা সব না ছাড়িব যাবৎ আমি জীব। [ঐ.]

শান্তিপুরে সম্ভবত শ্রীচৈতন্য তিনদিন ছিলেন। তারপর নীলাচলের পথে চললেন।

প্রভুর সঙ্গে রয়েছেন,—

নীলাচলের পথে

নিত্যানন্দ গদাধর মুকুন্দ গোবিন্দ।
সংহতি জগদানন্দ আর ব্রহ্মানন্দ ॥

[চৈ. ভা. অন্ত্য. ২ অ.]

তাঁরা ছত্রভোগ[১] হয়ে নৌকা করে উড্রদেশে (উড়িষ্যায়) এসে প্রবেশ করলেন। সুবর্ণরেখায় এসে প্রভু স্নান করলেন। একে একে জলেশ্বর, জাজপুর, কটক, সাক্ষীগোপাল, ভুবনেশ্বর পেরিয়ে কমলপুরে এসে ভার্গী নদীতে স্নান করলেন। এখান থেকে জগন্নাথমন্দিরে ধ্বজা দেখতে পেলেন। এবারে নীলাচলে প্রবেশ করে প্রভু ত্বরিতগতিতে মন্দিরে এলেন এবং জগন্নাথমূর্তি দেখে আনন্দে অধীর হয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়েন। বাসুদেব সার্বভৌম তখন মন্দিরে এসেছিলেন। তিনি প্রভুকে আপন ঘরে নিয়ে রাখলেন। নিত্যানন্দ ইত্যাদি সকলে ইতিমধ্যে এসে পড়লেন। সার্বভৌম তাদের জগন্নাথ দেখতে পাঠালেন এবং বহুবিধ মহাপ্রসাদ এনে রাখলেন। তারা স্নান করে ফিরতে ফিরতে প্রভুর চেতনা ফিরল। সকলে মহাপ্রসাদ খেয়ে তৃপ্ত হলেন।

বাসুদেব সার্বভৌমের সঙ্গে বিচার

সার্বভৌমকে শ্রীচৈতন্য সম্ভবত আগে থেকেই চিনতেন। বৃন্দাবনদাস উল্লেখ করেছেন,—

জগন্নাথ দেখিতে যে আইলাম আমি।
উদ্দেশ্য আমার মূল এথা আছ তুমি ॥

[চৈ. ভা. অন্ত্য. ৩ অ]

সার্বভৌম নিমাইয়ের সন্ন্যাস পছন্দ করেননি। শঙ্করাচার্যের ভক্তিবাদে সন্ন্যাসের প্রয়োজন নেই, তাছাড়া যৌবনে সন্ন্যাস মোটেই যুক্তিযুক্ত হয়নি। উত্তরে মহাপ্রভু কৈফিয়ৎ দিচ্ছেন,—

১। বর্তমান ডায়মণ্ডহারবারের অন্তর্গত।

কৃষ্ণের বিরহে মুঞি বিক্ষিপ্ত হইয়া।
বাহির হইমু শিখা সূত্র মুড়াইয়া॥
সন্ন্যাসী করিয়া জ্ঞান ছাড় মোর প্রতি।
কৃপার যেন মোর কৃষ্ণে হয় মতি॥ [চৈ. ভা. অন্ত্য. ৩ অ]

এবপব প্রভু সার্বভৌমকে ভাগবতেব আত্মাবাম শ্লোকেব[২] ব্যাখ্যা শুনতে চাইলেন। সার্বভৌম আপন শক্তি অনুসাবে ত্রয়োদশ প্রকারেব[৩] ব্যাখ্যা কবলেন। এবপব মহাপ্রভু নিজে আরও নতুনতর ব্যাখ্যা কবলেন।—

ভগবান তাঁব শক্তি তাঁব গুণগণ।
অচিন্ত্যপ্রভাব তিনেব না যায় কথন॥
অন্য যত মধ্যে সাধন কবি আচ্ছাদন।
এই তিন হবে সিদ্ধ সাধকেব মন॥ [চৈ. চ. মধ্য. ৬ প]

সার্বভৌম এবারে চমৎকৃত হলেন, প্রভুর অবতাবত্ব উপলব্ধি কবলেন। কৃষ্ণদাস কবিবাজেব বর্ণনায় দেখা যায়, সার্বভৌম শঙ্কবেব বেদান্ত মতবাদে—বিশ্বাসী ছিলেন,—এবারে প্রেমভক্তি মার্গেব পথিক হলেন প্রভুব কৃপায়।

শ্রীচৈতন্য ১৫১০ খৃঃ মাঘমাসে (২৯শে মাঘ) কাটোয়াতে সন্ন্যাস নিয়েছেন। ফাল্গুনে নীলাচলে এসেছেন। সার্বভৌমের সঙ্গে শাস্ত্র বিচার হল চৈত্র মাসে। বৈশাখে দাক্ষিণাত্য ভ্রমনে বেরিয়ে পড়লেন। এবারে কাউকে সঙ্গী নিলেন না। একমাত্র গোবিন্দ (কড়চালেখক) সঙ্গে ছিলেন। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণেব বিশদ বর্ণনা একমাত্র গোবিন্দদাসের কড়চাতে (১৫১২-তে লিখিত) বয়েছে। সার্বভৌম প্রভুকে গোদাবরী তীবে বিদ্যানগবের বায় বামানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ কবতে বললেন। জাতিতে শূদ্র বলে যেন উপেক্ষা না করেন।

দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ

২। আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥ আত্মারাম মুনিগণ বিধি ও নিষেধের অতীত হয়ে সেই প্রচুর পরাক্রমশালী শ্রীহরিতে অহৈতুকী (ফলকামনাশূন্য) ভক্তি করে থাকেন। শ্রীহরির গুণই এই প্রকার।

৩। কবিবাজ গোস্বামীর মতে নয় প্রকার ব্যাখ্যা সার্বভৌম করেছিলেন। মহাপ্রভু নতুন অষ্টাদশ প্রকার ব্যাখ্যা করলেন।

শ্রীচৈতন্য গোদাবরী তীরে নাম সংকীর্তন করছিলেন—রামানন্দ নিজেই এসে পরিচয় করলেন। প্রভু তাঁর কাছে কৃষ্ণকথা শুনতে চাইলেন। প্রভুর অনুরোধে রামানন্দ সাধ্যভক্তির স্বরূপ ব্যাখ্যা করলেন। একে একে স্তরভেদে তিনি স্বধর্মাচরণ, কৃষ্ণকর্মার্পণ, স্বধর্মত্যাগ, জ্ঞানমিশ্রাভক্তি, জ্ঞানশূন্য ভক্তি, প্রেমভক্তির কথা বললেন। প্রভু প্রতিবারই বলেন, 'এহো বাহ্য আগে কহ আর।' এবারে—

রায় রামানন্দের সঙ্গে বিচার

প্রভু কহে এহো, হয় আগে কহ আর।
রায় কহে দাস্য প্রেম সর্ব সাধ্য সার॥
প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে কান্তভাব সর্বসাধ্যসার॥ [চৈ. চ. মধ্য : ৮প.]

এরপর রসতত্ত্বের সাধনবিষয়ে বিচার মীমাংসা হল দুজনে। রায় আরও বলেলেন,—কৃষ্ণপ্রাপ্তির বহুবিধ পথ আছে, যার যে রসে অধিকার সেটিই তার কাছে সর্বোত্তম। রসবিচারে তিনি বলছেন,—

রসতত্ত্ব

পূর্ব পূর্ব রসের গুণ পরে পরে হয়।
এক দুই গণনে পঞ্চ পর্যন্ত বাড়য়॥
গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে সর্বরসে।
শান্ত, দাস, সখ্য, বাৎসল্য গুণ মধুরেতে বৈসে॥
... ...
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্বকালে আছে।
যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে॥

... ...
যদ্যপি কৃষ্ণসৌন্দর্য মাধুর্যের ধুর্য।
ব্রজদেবী সঙ্গে তার বাড়য়ে মাধুর্য॥ [চৈ. চ. মধ্য : ৮ প]

রসের ভজনে রায় অধিকারী ভেদের কথা বললেন। সকলে মধুররসে ভজনের অধিকারী নন। প্রভু এরপরও জানতে চাইলে রামানন্দ বিস্মিত হলেন।—

রায় কহে ইহার আগে পুছে হেন জনে।
এতদিনে নাহি জানি আছয়ে ভুবনে॥

ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্যশিরোমণি।
যাহার মহিমা সর্ব শাস্ত্রেতে বাখানি॥ [চৈ. চ. মধ্য : ৮ প]

ত্রিজগতে এই রাধা-প্রেমের দ্বিতীয় উপমা নেই। এবারে প্রভু সন্তুষ্ট হয়ে কৃষ্ণ এবং রাধার স্বরূপ জানতে চাইলেন। রায় এবারে যা বললেন শ্রীরূপের ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জলনীলমণিতে এবং শ্রীজীবের ষট্‌সন্দর্ভে তার বর্ণনাই দেওয়া হয়েছে। বৃন্দাবন গোস্বামীদের পরিমার্জিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসতত্ত্বের কথাই রায় রামানন্দ এবারে শ্রীচৈতন্যকে শোনালেন, স্থির হল ফিরবার সময় প্রভু রামানন্দকে নীলাচলে নিয়ে যাবেন।

কৃষ্ণ রাধার স্বরূপ

এরপর ত্রিমন্দ নগরে বৌদ্ধদের তিনি যুক্তিবিচারে পরাস্ত করলেন,—তারা বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করল। সেতুবন্ধ যাবার পথে প্রভু—

তার্কিক মীমাংসক যত মায়াবাদীগণ।
সাংখ্য পাতঞ্জল স্মৃতি পুরাণ আগম॥
[চৈ. চ, মধ্য. ৯ প]

—সকলের মনের পরিবর্তন করতে করতে অগ্রসর হন। তাঁর সমাজ-সংস্কারের কথাও কড়চা-লেখক গোবিন্দ উল্লেখ করেছেন। জিজুরীতে দরিদ্র পিতারা কন্যাদের বিবাহ দিতে অপারগ হলে খাণ্ডবা নামে দেবতার সঙ্গে বিয়ে দিতেন, তাদের বেশ্যাবৃত্তি করে বাঁচতে হত। প্রভু দুঃখ করলেন—

কেমন নিঠুর পিতা বলিতে না পারি।
কেমনে মুরারী করে আপন কুমারী॥

... ...

মুরারী পল্লীর মধ্যে মোর প্রভু গিয়া।
পবিত্র করিল সবে হরিনাম দিয়া। [গো. ক. ৫৫ পৃ.]

দুর্দান্ত দস্যুদলপতিদেরও তিনি কৃষ্ণভক্তির পথে নিয়ে এলেন। ইতিপূর্বেই পথে বলিপ্রথা বন্ধ করে তিনি নিজে অষ্টভুজা কালীর পূজা করেছেন—এবারে রামেশ্বরে এসে শিব পূজা করলেন। রামেশ্বর থেকে ফিরবার পথে গোদবরী পেরিয়ে প্রভু বোম্বাইয়ের আমেদাবাদে এলেন। কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের একটি কারণ বলেছেন জ্যেষ্ঠভ্রাতার অন্বেষণ।—

বিশ্বরূপ প্রসঙ্গ

সন্ন্যাস করি বিশ্বরূপ গিয়াছে দক্ষিণে।
অবশ্য করিব আমি তাঁর অন্বেষণে ॥

[চৈ. চ : মধ্য : ৭ প]

বিশ্বরূপ সন্ন্যাসের পর শঙ্করারণ্য নাম নিয়ে দাক্ষিণাত্যে গিয়েছিলেন। বোম্বাইয়ের পাণ্ডুপুর তীর্থে বিট্‌ঠলদেবের মন্দিরে ছিলেন তিনি। হয় তো সে সংবাদ জেনে শ্রীচৈতন্য এদিকে এসেছিলেন। কিন্তু তাঁর ভ্রমণে বেরোবার কিছুদিন আগেই শঙ্করারণ্য দেহরক্ষা করেছেন। শ্রীচৈতন্য সোমনাথ গেলেন, গুজরাট হয়ে বরোদা গেলেন, নর্মদায় স্নান করে প্রভাস, দ্বারকা এবং বৈবতক পাহাড়ে গেলেন, বিন্ধ্যাগিরিতে গেলেন। আবার বিদ্যানগরে ফিরে রামানন্দের সঙ্গে মিলিত হলেন। দাক্ষিণাত্যে গিয়ে মহাপ্রভু তামিলভাষা শিখেছিলেন, কড়চা লেখক গোবিন্দ সে কথার উল্লেখ করেছেন। চরিত-লেখকদের বর্ণনায় দেখা যায় মহাপ্রভু গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করতে গিয়ে হিন্দুধর্মের অন্যান্য শাখাগুলির প্রতি,—শাক্ত, শৈব, রামানুজপন্থী বৈষ্ণব ধর্মের (লক্ষ্মীনারায়ণ পূজা) প্রতি সহিষ্ণুতা দেখিয়েছেন। তাঁদের স্তবস্তুতি করেছেন। তবে লক্ষ্মীর তুলনায় শ্রীরাধা যে অনেক বড়ো তারও উল্লেখ করেছেন। লক্ষ্মী ঐশ্বর্যজ্ঞানে কৃষ্ণসঙ্গম চেয়েছিলেন বলে বাধা জন্মেছে, রাসলীলায় তাঁর স্থান হয়নি। গোপীগণ এবং গোপীশিরোমণি শ্রীরাধা মাধুর্যের ভিতর দিয়ে কৃষ্ণকে চেয়েছিলেন বলেই সফল হয়েছেন। মাধ্বী সম্প্রদায়ভুক্ত (মধ্বাচার্য প্রতিষ্ঠিত) বৈষ্ণবদের ভক্তির তিনি প্রশংসা করেছেন তবে তাঁদের জ্ঞান ও কর্মের প্রাধান্যকে নিন্দা করেছেন। জ্ঞান-শূন্য ভক্তিই গৌড়ীয় মহাপ্রভু প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন।

উচ্চ নীচ জাতিগত ভেদ লোপ

আর একটি বিষয় লক্ষণীয়। সন্ন্যাস-পূর্ব জীবনে বৈষ্ণব-সমাজের নেতৃত্ব নিয়ে তিনি নবদ্বীপে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের ভার দিয়েছিলেন ব্রাহ্মণ নিত্যানন্দ এবং যবন হরিদাসের মাধ্যমে। বোধহয় পাষণ্ডী ও যবনদের অত্যাচারের সমুচিত জবাব এই ভাবে তিনি দিতে চেয়েছেন। কৃষ্ণবেত্তা শূদ্র রায় রামানন্দকে পুরীতে এনে তাঁর ওপর ধর্মপ্রচারের দায়িত্ব দিলেন। সেখানেও তিনি বোধহয়,

সন্ন্যাসী পণ্ডিতের করিতে সর্বনাশ।
নীচশূদ্র দ্বারা করে ধর্মের প্রকাশ ॥

[চৈ. চ. মধ্য : ৫ প

পরবর্তী জীবনেও দেখা যাবে বৃন্দাবনে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের দার্শনিক রসতত্ত্বের রূপ দেবার দায়িত্ব দিয়েছেন প্রধানত সনাতন ও রূপগোস্বামীর ওপর। জাতিতে তারা কর্ণাটি ব্রাহ্মণ হলেও দীর্ঘকাল মুসলিম সংযোগ ঘটেছিল।[১] হোসেন সাহের রাজ্য পরিচালনায় দু'জন মন্ত্রী রূপে এই দুই ভাই তার দক্ষিণ ও বাম হস্তস্বরূপ ছিলেন। প্রেমভক্তির আকর্ষণে শ্রীচৈতন্য যবন রাজের কাছ থেকে তাদের ছিনিয়ে নিয়ে বৃন্দাবনে নতুন কাজে লাগিয়ে দিলেন।

নীলাচলে ফিরে শ্রীচৈতন্য দু'বছর অবস্থিতি করলেন। এবারে গৌড়দেশ হয়ে জননী ও জাহ্নবী দর্শন করে বৃন্দাবন যাবেন স্থির করলেন। সন্ন্যাস নিয়েই শান্তিপুর থেকে একবার তিনি বৃন্দাবন যাবার ইচ্ছা জানিয়েছিলেন,—কিন্তু জননীর অনিচ্ছায়, পার্ষদদের প্রতিবন্ধকতায় তখন যেতে পারেননি। এবারে তাঁর আজন্মের স্বপ্নতীর্থ কৃষ্ণরাধার মধুর প্রেমলীলা-নিকেতন দেখবার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে চাইলেন। কিন্তু এবারেও ইচ্ছা সফল হল না।

রূপ-সনাতনের দীক্ষা

ইতিপূর্বেই গৌড়রাজ হুসেন সাহ-এর দুই মন্ত্রী সাকর মল্লিক এবং দবীরখাস বারবার মহাপ্রভুকে গোপনে পত্র লিখে পাঠিয়েছেন। এদের দু'জনকে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা দেবার ইচ্ছা নিয়েই তিনি গৌড়ের পথে চলেছেন। পূর্বেও কয়েকবার যেতে চেয়েছেন কিন্তু রামানন্দ যেতে দেননি। ১৫১৫ খৃঃ শেষভাগে (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) তিনি নীলাচল ত্যাগ করলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র শ্রীচৈতন্যের পরমভক্ত, রাজনৈতিক বিষয়েও তাঁর পরামর্শ নিয়ে চলেন। এবার প্রভুর যাত্রাপথে যাতে কোনও কষ্ট না হয় তার রাজসিক ব্যবস্থা করলেন। স্বর্ণরেখার মুখ দিয়ে সাগর মোহানা পেরিয়ে গঙ্গা দিয়ে কুমারহট্ট, ফুলিয়া, শান্তিপুরের পথে মহাপ্রভু রামকেলিতে এলেন। রামকেলি মালদহে গৌড়ের কাছেই একটি গ্রাম। তখন যবনরাজের বেশ অত্যাচার চলেছে। হুসেন প্রভুর ক্ষতি করতে পারেন ভক্ত রাজকর্মচারীরা নানাসূত্রে তাঁকে সে সংবাদ জানিয়েছিলেন। যদিও কৃষ্ণদাস কবিরাজ এবং বৃন্দাবনদাস হুসেন সাহ্‌কে চৈতন্যভক্তরূপে কল্পনা করেছেন,[২] তবু রূপ সনাতনকে গভীর নিশীথে লুকিয়ে প্রভুর

১। দীর্ঘদিন মুসলিম রাজ সংসর্গে জাতিচ্যুত হয়েছেন জ্ঞানে তাঁরা ই নীচজাতি বলে আত্মপরিচয় দিয়েছেন।

২। হিন্দু যারে বলে কৃষ্ণ খোদায় যবনে।
সেই তিঁহ নিশ্চয় জানিছ সর্বজনে। [চৈ. ভা. অন্ত্যঃ ৪র্থ]

—এই উক্তি বৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে হুসেন সাহ-এর মুখে বসিয়েছেন।

সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হয়েছিল। তিনি গৌড়ে কেন এসেছেন এবারে আসল কথাটি বললেন।—

শুনি মহাপ্রভু কহে শুন দবিরখাস।
তোমা দুই ভাই মোর পুরাতন দাস॥
আজি হৈতে দোঁহা নাম রূপ সনাতন।
দৈন্য ছাড় তোমা দৈন্যে ফাটে মোর মন॥
দৈন্যপত্রী লিখি মোরে পাঠালে বারবার।
সেই পত্রী দ্বারা জানি তোমার ব্যাভার॥
গৌড় নিকটে আসিতে মোর নাহি প্রয়োজন।
তোমা দোঁহা মিলিবারে ইহ আগমন॥

[চৈ. চ. মধ্য : ১ প]

রূপ সনাতন এবার নতুন প্রভাতে নবপথের যাত্রী হলেন। তারাই মহাপ্রভুকে গৌড়ের ভিতর দিয়ে বৃন্দাবন যাত্রা করতে বারণ করলেন। গৌড়রাজ তাঁকে ভক্তি করলেও,

তথাপি যবন জাতি না করিহ প্রতীতি।
তীর্থযাত্রায় এত সংঘট্ট, ভাল নহে রীতি॥

[চৈ. চ. মধ্য : ১ প]

ফিরবার পথে শান্তিপুরে আচার্য অদ্বৈতের গৃহে এবারেও শচীমাতার সঙ্গে শ্রীচৈতন্য সাক্ষাৎ করে যান। জয়ানন্দ অবশ্য বলেছেন প্রভু নবদ্বীপে এসেছিলেন এবং বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিয়ে শচীদেবী তাঁকে দেখতে বেরিয়েছিলেন, প্রভু তাদের বুঝিয়ে ঘরে ফিরে পাঠান। —এ উক্তির সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ আছে।

নীলাচল থেকে এর একবছর পরে (১৫১৫ সেপ্টেম্বর/অক্টোবর) প্রভু ঝাড়খণ্ডের পথেমথুরা বৃন্দাবন যাত্রা করেন। সে সময় আগ্রার সিংহাসনে ছিলেন পাঠানরাজ সেকেন্দার লোদী (১৪৮৯-১৫১০)। যতদূর জানা যায় হিন্দুদের ধর্মাচরণ সম্পর্কে তাঁরও মন অনুদার ছিল। গৌড়ে যেমন শ্রীচৈতন্য হুসেন সাহ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নি,—আগ্রায় সম্রাট সেকেন্দারের সঙ্গেও তাঁর সাক্ষাৎকার ঘটে নি। হয় তো এ সাক্ষাৎকার নিরাপদ মনে করেননি তিনি।

বৃন্দাবন যাত্রা

ঝাড়খণ্ড থেকে ছোটনাগপুরের জঙ্গলে এসে ভীলদের কৃষ্ণনাম ও প্রেম বিতরণ করে তাদের বৈষ্ণব করলেন। কাশী এলেন। সেখানে তখন

অদ্বৈত-বৈদান্তিক প্রকাশানন্দ সরস্বতী ছিলেন। তিনি প্রভুর ধর্মমতকে উপহাস করতেন। ফিরবার পথে তাঁর সঙ্গে শাস্ত্রালোচনায় শঙ্কর-মতকে খণ্ডন করে শ্রীচৈতন্য ভাগবত-পুরাণের মতকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এবারে তাঁর সঙ্গে দেখা না করে প্রয়াগ হয়ে মথুরায় এলেন। বৃন্দাবনে এসে কৃষ্ণপ্রেমে তিনি অধীর হয়েছিলেন। ভক্তেরা তাঁকে কৃষ্ণ বলে সম্বোধন করলে তিনি তাদের নিষেধ করে বললেন—

প্রভু কহে বিষ্ণু বিষ্ণু ইহা না কহিও।
জীবাধমে কৃষ্ণজ্ঞান কভু না করিহ॥ [চৈ. চ. মধ্য : ১৮ প]

এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, বৃন্দাবনদাস (এবং অন্যান্য চরিত লেখকেরা) শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপ লীলাতে তাঁকে দিয়ে কৃষ্ণাবতার রূপে ঘোষণা করিয়েছিলেন।[১] এখানে কিন্তু মহাপ্রভু নিজেই নিজেকে কৃষ্ণজ্ঞান না করতে বলছেন। নীলাচল-লীলার সময় থেকেই শ্রীচৈতন্যের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন জীবনীকারেরা দেখিয়েছেন। নবদ্বীপে তিনি নিজেকে কৃষ্ণাবতার ভাবলেও এ-সময় থেকে শ্রীরাধার ভাবে ভাবিত হয়েছেন। দিব্যোন্মাদ অবস্থায় নীলাচলের শেষ ছয় বৎসরেব লীলায় এই ভাব সর্বাপেক্ষা প্রকট হয়েছিল।

বৃন্দাবন থেকে ফিরবার পথে কয়েকজন পাঠান অশ্বারোহীকে মহাপ্রভু বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত করলেন। 'পাঠান বৈষ্ণব' নামে তাঁরা পরিচিত হয়েছিলেন। ফেরার পথে আবার প্রয়াগে এলেন। এখানে রূপ গোস্বামী এবং তার ভাই বল্লভ এসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। রামানন্দের সঙ্গে কৃষ্ণ প্রেমতত্ত্বের যে আলোচনা হয়েছিল—এবারে 'সেই কৃষ্ণতত্ত্ব ভক্তিতত্ত্ব রসতত্ত্ব প্রান্ত। সব শিখাইল প্রভু ভাগবত সিদ্ধান্ত॥' [চৈ. চ. মধ্য : ১৯প]। প্রয়াগে দশদিন ধরে রূপগোস্বামীকে সব শিখিয়ে তাঁকে বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দিলেন।

১। (ক) দেখিয়া গর্জয়ে প্রভু করয়ে হুঙ্কার
"মুঞি সেই মুঞি সেই" বোলে বার বার।
[চৈ. ভা. মধ্য : ২ অ]

(খ) কাহারে বা পুজিস করিস কার ধ্যান
যাহারে পূজিস—তাঁরে দেখ বিদ্যমান। [ঐ]

(গ) আমি সে করিমু পূর্বে পৃথিবী উদ্ধার
ভক্তজন রাখি দুষ্ট করিমু সংহার। [চৈ. ভা. মধ্য: ৩ অ]

রূপ-সনাতনের হুসেন সাহী মন্ত্রিত্ব ত্যাগ ও গৌড় থেকে পলায়নের কাহিনী এখানে বলে নেওয়া যেতে পারে। দবীর খাস (সনাতন) ছিলেন প্রধানমন্ত্রী আর সাকর মল্লিক (রূপ) ছিলেন রাজস্ব মন্ত্রী। মহাপ্রভু রূপ-সনাতন নামকরণ করেন। ইতিপূর্বেই দেখেছি শ্রীচৈতন্য গৌড়ে রামকেলিতে এসে গোপনে এই দুজনকে দীক্ষা দিয়ে যান। এরপর মন্ত্রিত্ব ছেড়ে রূপ গৌড় ত্যাগ করে পালিয়ে গেলেন। সনাতনও পালাতে পারেন এই আশঙ্কায় হুসেন সাহ তাঁকে কারাগারে বন্দী করলেন। রূপ সনাতন দু'জনকে ছেড়ে রাজ্য চালনা দুঃসাধ্য তার পক্ষে। সনাতন কারারক্ষককে দশসহস্র মুদ্রা ঘুষ দিয়ে পালিয়ে কাশী এসে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে দেখা করলেন। প্রভু প্রেমাবেশে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। সনাতন তাতে সংকোচবোধ করলে প্রভু বললেন—

রূপ সনাতন কাহিনী

> প্রভু কহে তোমা স্পর্শি আত্মপবিত্রিতে।
> ভক্তিবলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে॥
>
> [চৈ. চ. মধ্য : ২০ প]

দু'মাস কাশীতে থেকে মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে বৈষ্ণব সিদ্ধান্তসকল শিক্ষা দিলেন। রূপ গোস্বামী তাঁর ভক্তিরসামৃতসিন্ধু এবং উজ্জ্বলনীলমণিতে প্রভুদত্ত শিক্ষাকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসদর্শনে রূপ দিয়েছেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, মহাপ্রভু সনাতনকে নানাদিক থেকে কৃষ্ণ রাধা প্রেমলীলার যে ব্যাখ্যা করেছিলেন তার মধ্যে নরলীলাকেই সর্বোত্তম বলেছেন।—

সনাতনকে প্রভুর উপদেশ

> কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা
> নরবপু তাহার স্বরূপ।
> গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর
> নরলীলা হয় অনুরূপ॥ [চৈ. চ. মধ্য : ২১ প]

এখানেই মহাপ্রভু নিজেকে বোধ হয় প্রথম বাউল বলে পরিচয় দিয়েছেন। বাউলদের মধ্যে যে সহজ মানবীয় প্রেমসাধনার পরিচয় মেলে, চৈতন্য অনেকাংশে জাতিপংক্তি বিহীন, ঐশ্বর্যবিহীন, শাস্ত্রজ্ঞানবিহীন সেই সহজ মানব-প্রেমতত্ত্বকেই প্রকাশ করতে চেয়েছেন। তিনি বলছেন—

আমি তো বাউল আন কহিতে আন কহি।
কৃষ্ণের মাধুর্যস্রোতে আমি যাই বহি॥
[চৈ. চ. মধ্য : ২১প]

তিনি বাউলদের মতোই মধুর-প্রেমে পাগল হয়েছিলেন। কৃষ্ণের সর্বোত্তম নরলীলার প্রেমসাধনায় যে মনের মানুষের ছবি ফুটে উঠেছিল তারই সন্ধানে গৃহত্যাগী হয়েছিলেন। সনাতনকে প্রভু—

যুক্ত বৈরাগ্যস্থিতি সব শিখাইল।
শুষ্ক বৈরাগ্যজ্ঞান সব নিষেধিল॥ [চৈ. চ. মধ্য : ২৩ প]

সনাতনকেও প্রভু কাশী থেকে বৃন্দাবন গিয়ে রূপের সঙ্গে মিলিত হয়ে বৈষ্ণবধর্ম ও ভক্তি-স্মৃতি শাস্ত্র প্রচার করতে আদেশ দিলেন।—

পূর্বে প্রয়াগে আমি রসের বিচারে।
তোমার ভাই রূপে কৈল শক্তি সঞ্চারে॥
.. ..
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা বৈষ্ণব আচার।
ভক্তিস্মৃতি শাস্ত্র করি করিহ প্রচার॥
[চৈ. চ. মধ্য : ২৩ প]

সনাতনকে তিনি যে নীতি উপদেশ দিয়েছিলেন বৈষ্ণবধর্মে তা 'শিক্ষাষ্টক'[১] নামে প্রসিদ্ধি পেয়েছে। যে নীতিগুলি পালন করতে বলেছিলেন সে হল,—

'শিক্ষাষ্টক'

অবৈষ্ণব সঙ্গ ত্যাগ, বহু শিষ্য না করিবে।
বহু গ্রন্থ কলাভ্যাস ব্যাখ্যান বর্জিবে॥
হানি লাভ সম শোকাদি বশ না হইবে।
অন্যদেব অন্যশাস্ত্র নিন্দা না করিবে॥
বিষ্ণু বৈষ্ণব নিন্দা গ্রাম্য বার্তা না শুনিবে।
প্রাণী মাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে॥
[চৈ. চ. মধ্য : ২২]

এই অহিংস নীতিবাদ মহাপ্রভু বৌদ্ধধর্ম প্রভাবে পরবর্তী জীবনে গ্রহণ করেছিলেন, মনে হয়—। সন্ন্যাস-পূর্ব নবদ্বীপলীলায় তিনি প্রয়োজনে হিংসার আশ্রয় নিয়েছেন।

১। মূল 'শিক্ষাষ্টক' বঙ্গানুবাদ-সহ পরিশিষ্টে দেওয়া গেল।

কিন্তু সন্ন্যাস পরবর্তী নীলাচল লীলার সময় থেকে তিনি সম্পূর্ণ অহিংস প্রেমধর্মের পথিক। মহাপ্রভু সনাতনকে আত্মারাম শ্লোকেরও নতুন একষট্টি প্রকারের ব্যাখ্যা করে শোনালেন। সার্বভৌমকে যে আঠার প্রকারের ব্যাখ্যা শুনিয়েছিলেন এগুলি তার থেকে সম্পূর্ণ নতুন।

কাশীতে ফেরার পথে তিনি বৈদান্তিক পণ্ডিত প্রকাশানন্দের সঙ্গে বেদান্ত বিচার করে, শঙ্কর-মত খণ্ডন করে ভাগবত পুরাণই যে প্রকৃত বেদান্তভাষ্য, এই মত প্রতিষ্ঠিত করলেন।

নীলাচলে প্রত্যাবর্তন

১৫১৬ খৃঃ জুলাই মাসে আবার তিনি বৃন্দাবন ভ্রমণ শেষ করে নীলাচলে ফিরে এলেন। এর পর দিব্যোন্মাদের পূর্ববর্তী ছয়বৎসর কাল তিনি একই সঙ্গে গৌড়ে নিত্যানন্দকে ধর্মপ্রচারের এবং বৃন্দাবনে রূপসনাতনকে ধর্মতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, নাটক, কাব্য, দর্শনশাস্ত্র প্রভৃতি রচনার প্রেরণা যুগিয়েছেন। কদিকে গৌড়ে পতিত উদ্ধার, যবনরাজ ও পাষণ্ডী হিন্দুদের হাত থেকে মানবসমাজের মুক্তির ব্যবস্থা করেছেন নিত্যানন্দের মাধ্যমে। অপরদিকে, বৃন্দাবনে রূপ-সনাতন গোস্বামীর মাধ্যমে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মীয় রসতত্ত্ব ও দর্শনকে একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়েছেন। নীলাচলে এসেই তিনি নিত্যানন্দকে গৌড় দেশে পাঠালেন। তাঁকে বললেন, নীলাচলে বসে মুনিধর্ম করলে, গৌড়ে গিয়ে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে পতিতদের উদ্ধার না করলে আমাকে অবতার বলে প্রচার করে কি ফল হবে? নিত্যানন্দ ১৫১৫।১৬ তে গৌড়ে ফিরে এলেন। তিনি গৌড ও রাঢ়ের বৈষ্ণব সমাজে গৌরাঙ্গমূর্তির পূজা প্রচলন করলেন। নিত্যানন্দ কঠোর জীবনযাপন ও মাধুকরীবৃত্তির পথ ধরেননি। এ বিষয়ে মহাপ্রভুর কাছে অভিযোগ উঠলে প্রভু প্রশ্ন করেন —

নিত্যানন্দের সঙ্গে প্রভুর আলোচনা

কর্তাল মৃদঙ্গ যন্ত্র মাল্যচন্দনে।
শিঙ্গা বেত্র গুঞ্জাহার নূপুর আভরণে॥
মহোৎসব মাগিয়া নাচেন সংকীর্তনে।
হেন যুক্তি তোমারে দিলেক কোনজনে॥

[চৈ. ম. উত্তর খণ্ড]

নিত্যানন্দ জবাবে হেসে বললেন,—'কাঠিন্য কীর্তন কলিযুগ ধর্ম নহে।' তিনি আপন সংকীর্তন রীতিই বহাল রাখলেন। নিত্যানন্দ এ-সময়ে পাণিহাটিতে এক চিড়া-মহোৎসব করেছিলেন। জাতিভেদহীন পংক্তিভোজের এই প্রবর্তনা উত্তর

কালে নিত্যানন্দের স্ত্রী জাহ্নবী দেবীর নেতৃত্বে পুত্র বীরচন্দ্র এবং শিষ্য নরোত্তম প্রভৃতিকে খেতরী মহোৎসব রূপ মহা-বৈষ্ণব সম্মেলনে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

হরিদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যের সঙ্গেই নীলাচল এসেছিলেন। মহাপ্রভুর দ্বাদশ বৎসর পূর্বেই ১৫২১ খৃষ্টাব্দে তিনি দেহ রাখলেন। হরিদাস চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ পার্শ্বদদের অন্যতম ছিলেন এবং যবনরাজের অত্যাচার থেকে তাকে উদ্ধারের জন্যেই মহাপ্রভু মর্তে শীঘ্র অবতীর্ণ হয়েছেন বৃন্দাবনদাস এমন কথা তাকে দিয়ে বলিয়েছেন।—

হরিদাসের দেহরক্ষা

যেবা গৌণ ছিল মোর প্রকাশ করিতে
শীঘ্র আইনু তোর দুঃখ না পারোঁ সহিতে॥

[চৈ. ভা.: মধ্য ১০ অ]

হরিদাসের নির্বাণের পর তাঁর দেহ কোলে নিয়ে প্রেমাবিষ্টভাবে চৈতন্য নৃত্যকীর্তন করলেন। বিমানে (দোলা বিশেষ) চড়িয়ে কীর্তন সহকারে সমুদ্রে নিয়ে এলেন। সমুদ্রজলে তাঁকে স্নান করিয়ে ভক্তগণকে হরিদাসের পদোদক পান করালেন। বালুকায় গর্ত করে নিজে তাঁকে সযত্নে শুইয়ে বালিচাপা দিলেন। হরিদাসঠাকুরের মহোৎসবের ভিক্ষাতেও নিজে বেরোলেন। মহোৎসব ভোজনে নিজে হাতে পরিবেশন করলেন।—কবিরাজ গোস্বামী হরিদাসের নির্বাণ ছবি জীবন্তভাবে এঁকেছেন। শ্রীচৈতন্য হরিদাসের মৃত্যুতে বিশেষ বিচলিত হয়েছিলেন সন্দেহ নেই।

১৫২২ থেকে ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দ—এই দ্বাদশ বৎসর মহাপ্রভুর নীলাচল লীলাকে দিব্যোন্মাদ বলা হয়। শ্রীরূপ গোস্বামী উজ্জ্বলনীলমণিতে বলেছেন,—

শ্রীচৈতন্যের দিব্যোন্মাদ

এতস্য মোহনাখ্যস্য গতিং কামপ্যুপেযুষঃ
ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীর্যতে।
উদ্‌ঘূর্ণা চিত্রজল্পাদ্যাস্তদ্ভেদা বহবো মতাঃ॥

[উজ্জ্বলনীলমণি. ১৩৭ শ্লোক]

মোহনে পরম গতি কথনীয় নয়।
তাথে চিত্তভ্রম আভা দিব্যোন্মাদ হয়॥
উদ্‌ঘূর্ণা চিত্র জল্পাদি তার ভেদ হয়।
অনেক আছয়ে ভেদ কবিগণ কয়॥

স্বতঃস্ফূর্ত অনুরাগের প্রকাশ হল ভাব—ব্রজগোপীদের ক্ষেত্রে এই ভাবই মহাভাব। ভাব রূঢ় ও অধিরূঢ় ভেদে দুই প্রকার। অধিরূঢ়ভাবে দিব্যোন্মাদ প্রলাপ হয়। অধিরূঢ় ভাবের দুই ভেদ মোদন এবং মাদন। মোদন বিরহ অবস্থায় মোহন হয়। কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় 'ব্রহ্মাণ্ড ক্ষোভ করে সেই ত মোহন।' দিব্যোন্মাদ মোহনের অন্তর্গত।

এখন একটা প্রশ্ন আসে। রূপগোস্বামী উজ্জ্বলনীলমণি লিখেছেন মহাপ্রভুর মৃত্যুর পর। কবিরাজ গোস্বামী আবার উজ্জ্বলনীলমণির বর্ণনানুযায়ী মহাপ্রভু-লীলার চিত্র এঁকেছেন। রূপগোস্বামী প্রকৃতভাবে মহাপ্রভুর শেষ দ্বাদশবৎসরের নীলাচল-লীলার ঘটনাবলী জেনে সেই অনুযায়ী দিব্যোন্মাদ রসতত্ত্বের বিশ্লেষণ করেছেন কি?—না কবিরাজ গোস্বামী উজ্জ্বলনীলমণির অলৌকিক দিব্যোন্মাদ-তত্ত্বের আলোকে কাল্পনিক ঘটনাবলী শ্রীচৈতন্যের শেষ দ্বাদশবৎসরের নীলাচল জীবনে আরোপ করেছেন। এ-প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়া কঠিন। অনুমিত হয় উভয় পদ্ধতির মিশ্রন ঘটেছিল। এই সময়কার চিত্রাঙ্কনে কবিরাজ গোস্বামী দেখিয়েছেন, কখনও প্রভুর বাহ্যজ্ঞান স্বাভাবিক রয়েছে, কখনও অর্ধজ্ঞান রয়েছে, কখনও সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞান হারিয়েছেন। এই সময়ও মহাপ্রভু জগদানন্দকে নবদ্বীপে মায়ের কাছে পাঠিয়ে খোঁজ নিয়েছেন। তাঁকে পৃথকভাবে প্রসাদ পাঠিয়েছেন। মায়ের আজ্ঞাতেই তিনি দূরদেশ বৃন্দাবনে না গিয়ে নীলাচলে সন্ন্যাসজীবন কাটিয়েছিলেন। মায়ের কষ্ট বেদনার কথা তিনি কখনও ভুলতে পারেননি। দুঃখকরে বলেছেন—

তোমার সেবা ছাড়ি আমি করিল সন্ন্যাস।
বাউল হইয়া আমি কৈল ধর্মনাশ॥

[চৈ. চ. অন্ত্য : ১৯ প]

দিব্যোন্মাদ অবস্থায় বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে তিনি কখনও গভীররাতে একা জগন্নাথ মন্দির দ্বারে কৃষ্ণ-মিলনাশায় অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছেন, কখনও ভাবাবিষ্ট হয়ে চটকপর্বতকে বৃন্দাবনের গোবর্ধন পর্বত ভেবে সেদিকে ছুটে গেছেন, কখনও বা যমুনায় কৃষ্ণ-জলকেলি ভ্রমে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছেন। রাধিকার বিরহের যে দশ দশার বর্ণনা রূপগোস্বামী দিয়েছেন,—অনুরূপ অবস্থার চিত্র শ্রীচৈতন্যের জীবনেও আরোপিত হয়েছে।

মহাপ্রভুর অন্তর্ধান-লীলা বৃন্দাবনদাস বা কবিরাজ গোস্বামী বর্ণনা করেননি। লোচন এবং জয়ানন্দ কিছু ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা দিয়েছেন। জয়ানন্দ লিখেছেন—

শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধানলীলা

আষাঢ় বঞ্চিত রথ বিজয়া নাচিতে।।
ইটাল বাজিল বাম পায়ে আচম্বিতে।
চরণ বেদনা বড় ষষ্ঠীর দিবসে।
সেই লক্ষ্য টোটায় শয়ন অবশেষে।।

ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার এবং স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় জয়ানন্দের এই বর্ণনাই মেনে নিয়েছেন। ডাঃ মজুমদার লিখেছেন, 'আমার নিজের ধারণা যে, জয়ানন্দ প্রদত্ত বিবরণই সত্য। প্রভু ইটে আহত হইয়া জ্বর ও দূষিত ক্ষতে আক্রান্ত হন এবং তাঁহার প্রিয়বন্ধু গদাধর পণ্ডিতের আশ্রমে দেহরক্ষা করেন।' লোচন আবার জানিয়েছেন, আষাঢ়ের সপ্তমী তিথিতে, রবিবার বেলা তিন ঘটিকায় গুঞ্জাবাড়ীতে "জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে।" পাণ্ডা ব্রাহ্মণ এসে দেখেন, 'গুঞ্জাবাড়ীর মধ্যে প্রভুর হইল অদর্শন।।' [চৈ. ম. শেষখণ্ড] ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন সিদ্ধান্ত করেছেন, গুণ্ডিচা মন্দিরে মহাপ্রভুর দেহ সমাধি দেওয়া হয়েছিল। অপর একটি সন্দেহ করা হয়, শ্রীচৈতন্যকে গুপ্তহত্যা করা হয়েছিল গুণ্ডিচা বাড়ীতে। সে জন্যেই তিনি জগন্নাথে লীন হলেন, গুঞ্জাবাড়ীতে অদর্শন হলেন প্রভৃতি প্রচার প্রয়োজন হয়েছিল। এই গুপ্ত হত্যার কি কারণ অনুমান করা যায়?—(১) প্রতাপরুদ্র যুদ্ধবিগ্রহ ছেড়ে প্রভুর কৃপাপ্রার্থী হয়ে রাজকার্যে দুর্বলতার পরিচয় দিচ্ছিলেন, যাতে রাজ অমাত্যেরা পাণ্ডাদের সহায়তায় গুপ্তহত্যা করেন। (২) প্রতাপরুদ্র জগন্নাথের তুলনায় মহাপ্রভুকেই যেন বেশী সম্মান দিচ্ছিলেন তাতেও পাণ্ডাদের ঈর্ষ্যান্বিত হবার কারণ ঘটে। এই একই সময়ে মহাপ্রভুর তিরোধানের বছরেই (১৫৩৩ খৃঃ) গৌড়েশ্বর নশরৎ সাহ্‌কে তাঁর এক খোজা ভৃত্য গুপ্তভাবে হত্যা করেছিল। সেটিও এই অনুমানের অন্যতম কারণ। তবে এই অনুমান ভ্রান্ত বলেই সন্দেহ জাগে। রাজ অনুগ্রহ-ভাজন, নীলাচলের ধর্মীয় সমাজের সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান শ্রীচৈতন্য গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হলে অল্পদিনের মধ্যেই সে-বিষয়ক কিছু তথ্য প্রমাণ বাইরে প্রকাশ হয়ে পড়ত। কিন্তু এ-বিষয়ে কোনও তথ্য প্রমাণই সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়নি। তবে প্রশ্ন জাগে, বৃন্দাবনদাস ও কবিরাজ গোস্বামী কি কারণে এ-বিষয়ে একেবারে নীরব ছিলেন?

চৈতন্য আবির্ভাবের সামাজিক প্রভাব

একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবে তিনটি দিক থেকে বাংলার সাংস্কৃতিক উন্নয়নে সাহায্য করেছিল। প্রথমত ঐতিহাসিক ও সামাজিক দিক থেকে বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তির একটি পথ খুঁজে পেয়েছিল। দ্বিতীয়ত, মানব-প্রেমাদর্শে সমৃদ্ধ এক বিরাট বৈষ্ণবদর্শন ও ধর্মসম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল। তৃতীয়ত, পঞ্চদশ-ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে অধ্যাত্ম ভাব, চিত্রসৌন্দর্য ও মধুর প্রেমরসের এক অতি উচ্চ পর্যায়ের বিপুলায়তন বৈষ্ণব সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল। প্রাচীন যুগের বাংলার সংস্কৃতি আলোচনায় এই তিনটি দিকের গুরুত্ব কম নয়।

ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রভাব

নিমাইএর জন্মের সময় গৌড়েশ্বর ছিলেন ফতেশাহ (১৪৮৩-১৪৯৩)। তিনি নিমাইএর জন্মের পূর্বেই নবদ্বীপের হিন্দুদের উপর অত্যাচার করে নবদ্বীপকে যে উচ্ছন্নে দিয়েছিলেন এবং বাসুদেব সার্বভৌম সেই অত্যাচারে উৎখাত হয়ে যে উড়িষ্যায় চলে গিয়েছিলেন চৈতন্য জীবনী লেখকেরা তার বর্ণনা দিয়েছেন। চৈতন্য জীবনী সূচনায় তার কিছু অংশ উদ্ধৃত করেছি। কবির বর্ণনায় আরও পাওয়া যায়,—

আচম্বিতে নবদ্বীপে হইল রাজভয়
ব্রাহ্মণ ধরিয়া রাজা জাতি প্রাণ লয়।
নবদ্বীপে শঙ্খধ্বনি শুনে যার ঘরে
ধন প্রাণ লয় তার জাতি নাশ করে।
কপালে তিলক দেখে যজ্ঞসূত্র কাঁধে
ঘর দ্বার লোটে তার লৌহপাশে বাঁধে।
দেউল দেহরা ভাঙ্গে উপাড়ে তুলসী
প্রাণভয়ে-স্থির নহে নবদ্বীপবাসী। [চৈ. ম. নদীয়া খণ্ড]

হিন্দুসমাজ-চিত্র

মুসলিমরাজের হাতে বাংলার সংস্কৃতিকেন্দ্রের এই চরম দুর্দশায় ব্রাহ্মণেরাও বহুলাংশে দায়ী ছিলেন। ব্রাহ্মণদের মধ্যে অনাচার, ভেদবৈষম্য দেখা দিয়েছিল। তারাও পাষণ্ডী হয়ে উঠেছিলেন।

কবি তৎকালীন হিন্দু সমাজের চিত্র দিতে গিয়ে দুঃখ করে লিখেছেন,—

ধর্মকর্ম লোক সবে এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে ॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহু ধন ॥
বাসুলী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে।
মদ্যমাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে ॥
নিরবধি নৃত্যগীত বাদ্য কোলাহল।
না শুনে কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল ॥

[চৈ. ভা. আদি : ২ অ]

লৌকিক দেবদেবীর তখন প্রাধান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। বৈষ্ণব সমাজের দুর্দশা চরমে উঠেছে। নবদ্বীপে তখন হরিনাম কীর্তনেরও উপায় ছিলনা। পাষণ্ডী ব্রাহ্মণরাও যবন অত্যাচারভয়ে কীর্তনীয়াদের ওপর ক্ষেপে উঠতেন,—

শুনিয়া পাষণ্ডী বলে হইল প্রমাদ।
এ ব্রাহ্মণ করিবেক গ্রামের উৎসাদ ॥
মহাতীব্র নরপতি যবন ইহার।
এ আখ্যান শুনিলে প্রমাদ নদীয়ার ॥
কেহ বলে এ ব্রাহ্মণে এই গ্রাম হইতে।
ঘর ভাঙ্গি ঘুচাইয়া ফেলাইমু স্রোতে ॥
এ বামুনে ঘুচাইলে গ্রামের মঙ্গল।
অন্যথা যবনে গ্রাম করিবেক বল ॥

[চৈ. ভা. আদি : ২ অ]

অদ্বৈত আচার্য প্রমুখ ভক্তেরা তখন ভক্তিবিশ্বাসের আশ্রয়ে এই সামাজিক পরম দুর্দিনের হাত থেকে নিষ্কৃতি চেয়েছিলেন। চৈতন্যদেব অবতার হয়ে উঠেছিলেন এই ভক্তদেরই আত্যন্তিক ইচ্ছার মাধ্যমে। হোসেন শাহ্ গৌড়েশ্বর ছিলেন ১৪৯৩ খৃঃ থেকে ১৫২০ খৃঃ পর্যন্ত।[1] সুতরাং নবদ্বীপে এবং নীলাচলে

১। ভিনসেণ্ট স্মিথের মতানুসারে। ষ্টুয়ার্টের মতে হোসেনশাহ ১৪৯৯ থেকে ১৫২০ খৃঃ পর্যন্ত গৌড়বঙ্গে রাজত্ব করেছেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রধানতম কর্মজীবনকালে গৌড়বাংলায় হোসেনশাহী রাজত্ব চলছিল। সে সময়ে কিছুটা আর্থিক স্থায়িত্ব দেশে ফিরে এলেও সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনযাত্রায় যে হিন্দুদের যবন অত্যাচার ভয়ে যথেষ্ট শঙ্কিত থাকতে হত,—তাছাড়া পাষণ্ডী হিন্দুদেরও যে যথেষ্ট নৈতিক অধঃপতন ঘটেছিল চৈতন্য জীবনী লেখকেরা তার পরিচয় দিয়েছেন। জগাই মাধাইএর সঙ্গে হরিদাস নিত্যানন্দের সংঘর্ষ, চাঁদকাজীর[২] দমনে নিমাই-এর নেতৃত্ব, ভক্ত হরিদাসের উপর যবন রাজকর্মচারীদের অমানুষিক অত্যাচার প্রভৃতি ছোট ছোট ঘটনার মাধ্যমে সে যুগের সমাজ পরিচয় অনেকটা পরিস্ফুট হয়েছে। চৈতন্যভাগবতে চাঁদকাজীর দমন-চিত্র বিস্তৃতভাবেই দেওয়া হয়েছে। হুসেন শাহ্ যে হিন্দুধর্ম বিদ্বেষী ছিলেন তার উড়িষ্যা অত্যাচার কাহিনীতেও সে সাক্ষ্য রয়েছে।

হোসেন শাহী আমল

হুসেন শাহ্ সর্ব উড়িষ্যার দেশে ;
দেবমূর্তি ভাঙ্গিলেক দেউল বিশেষে।

[চৈ. ভা, অন্ত্যঃ ৪. অ]

রাজা প্রতাপরুদ্র রাজনৈতিক বিষয়েও মহাপ্রভুর পরামর্শ নিয়ে চলতেন। বৃন্দাবন ভ্রমণান্তে মহাপ্রভু নীলাচলে এলে প্রতাপরুদ্র তার কাছে গৌড় আক্রমণ করবেন কিনা পরামর্শ চেয়েছিলেন। মহাপ্রভু তাকে কাঞ্চিদেশ (বিজয়নগর) আক্রমণে পরামর্শ দেন এবং গৌড় আক্রমণে নিষেধ করেন, কারণ—

উড্রদেশ উচ্ছন্ন করিবেক যবনে।
জগন্নাথ নীলাচল ছাড়িব এতদিনে ॥ [চৈ. ম.]

আরও লক্ষ্য করবার বিষয় হ'ল, রূপ-সনাতনকে দীক্ষা দিতে এসে মহাপ্রভু গোপনে হোসেনশাহী গৌড়রাজ্য থেকে আবার ফিরে গিয়েছিলেন। এমনকি গৌড়ের পথে তাকে বৃন্দাবন যেতেও রূপ সনাতন নিষেধ করেছিলেন—

তথাপি যবন জাতি না করিহ প্রতীতি।

সুতরাং হোসেন শাহের সময়ও বাংলাদেশে যে হিন্দুধর্মীদের অবস্থা ভালো ছিল না সে বিষয়ে মতানৈক্যের কারণ নেই। স্বয়ং হোসেনশাহ্ সুবুদ্ধি-রায়ের জাত মারবার জন্যে 'করোয়ার পানী তার মুখে দেওয়াইলা' বৃন্দাবন দাস তার উল্লেখ করেছেন। উচ্চ রাজকর্মলাভের আশাতে এবং যবন অত্যাচার

২। চাঁদকাজী হুসেন শাহের দৌহিত্র ছিলেন।

এড়াবার জন্যে একদল হিন্দু তখন মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ সমাজ অপরদিকে আত্মগোপন করে ধর্ম রক্ষার ক্ষীণ চেষ্টা করছিলেন। বাংলার সমাজজীবনের সঙ্গে সে ধর্মের যোগ ছিল না বললেই চলে। এই সামাজিক চরম বিভ্রান্তি ও নৈরাশ্যকর পরিবেশ থেকে বাঙালী সমাজকে উদ্ধারের পথ দেখালেন শ্রীচৈতন্যদেব। তাঁর উদার মানব-প্রেমধর্মের ছায়াতলে চণ্ডাল-শূদ্র ব্রাহ্মণ বা যবন—সকলকেই আশ্রয় দিলেন। প্রেমমুক্তির উদার স্পর্শে তিনি জাতির নবমুক্তির পথ দেখিয়েছেন।—সম্ভবত এই অসম সাহসিক নব আন্দোলনের অগ্রদূতরূপে দেখতে গিয়েই বৈষ্ণব ভক্তেরা অলৌকিক অবতারলীলায় তাঁকে 'রাধা ভাবদ্যুতি সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম'-রূপে গ্রহণ করেছেন।

চৈতন্য আবির্ভাবের দার্শনিক তত্ত্বব্যাখ্যা

বৈষ্ণব ভক্ত মহাজনদের কাছে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের অলৌকিক সুন্দর তত্ত্বব্যাখ্যা রয়েছে। আচার্যেরা নাকি আমাদের তিনটি ঋণের উল্লেখ করেছেন,

দার্শনিক ধর্মোদ্ভব

—ঋষি-ঋণ, পিতৃ ঋণ, দেব-ঋণ। শিক্ষা-বিস্তারের দ্বারা ঋষি-ঋণ শোধ করতে হয়। বিবাহাদি করে গার্হস্থ্যধর্ম পালনে বংশরক্ষার দ্বারা পিতৃ-ঋণের শোধ হয়। দেব-ঋণ যজ্ঞের দ্বারা অর্থাৎ জনকল্যাণে অর্থাদি ব্যয়ের দ্বারা পরিশোধ করতে হয়। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য এই তিনভাবে কর্মফল দানের দ্বারা ঋণ পরিশোধ ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ ঋণ-মুক্তি বলে মানেননি। আনন্দ থেকে সর্বভূতের জন্ম, আনন্দের মধ্যেই ভূতচরাচর বেঁচে থাকে, শেষে আনন্দের মধ্যেই সব লয় পায়। "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দেন প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।—উপনিষদের এই আপ্তবাক্য মেনে নিয়ে মহাপ্রভু সচ্চিদানন্দময় ভগবান কৃষ্ণের প্রতি ঋণের উল্লেখ করেছেন। যতদিন আনন্দ ঋণ পরিশোধ না হবে ততদিন সব কিছুই বৃথা। পূর্বোক্ত তিনটি ঋণও আনন্দের সঙ্গেই পরিশোধ করতে হবে। কর্ম

আনন্দ-ঋণ

শুধু নিষ্কাম হলে চলবেনা।—আনন্দযুক্ত হওয়া চাই। রসো হ্যেবায়ং লব্ধানন্দীভবতি।—নিজে আনন্দ-রসাস্বাদন করে অপরকে সেই আনন্দ দান করতে হবে।—এই হল আনন্দ-ঋণ পরিশোধের উপায়। ব্রজগোপীরা এই ভাবেই আনন্দ রসাস্বাদন করেছেন। তাঁদেরই সর্বাগ্রগণ্যা হলেন মহাভাব-স্বরূপিনী শ্রীরাধা। তাই তাঁরই ভাবকান্তি অঙ্গীকারপূর্বক রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত তনু শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব।

বৈষ্ণব মহাজনেরা বলেছেন, শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণী সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে আনন্দময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ভাল বেসেছিলেন। তাঁর এই অপূর্ব ভালবাসায় ঋণী হয়ে স্বয়ং আনন্দময় সে ঋণ স্বীকার করেন। এই ঋণ পরিশোধের জন্যেই সচ্চিদানন্দময় শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব। ভগবান এখানে ভক্তের আনন্দের ঋণ স্বীকার করে নিয়েছেন। সুতরাং মর্তবাসীকেও এই আনন্দঋণ স্বীকার করতে হবে। শ্রীগৌরাঙ্গ সেই আনন্দ-জগতের সঠিক নিশানা আমাদের জানিয়ে গেছেন। আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছায় আনন্দ নেই, কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছাতেই আনন্দ।

গৌরাঙ্গ আবির্ভাবের দার্শনিক তত্ত্বব্যাখ্যা

ভক্তশ্রেষ্ঠ মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধা কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছায় যে অসীম আনন্দ উপভোগ করতেন সেই আনন্দ-স্বাদ লাভের আকাঙ্ক্ষায় রাধাভাবদ্যুতি নিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে গৌরাঙ্গরূপে নব অবতার লীলায় আবির্ভূত হতে হয়েছিল। শ্রীপাদ স্বরূপ দামোদর তাঁর কড়চায় লিখেছেন,[১]—

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।

১। গৌরাঙ্গ আবির্ভাব তত্ত্ব বিষয়ক এই প্রখ্যাত শ্লোক দুটিই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মূল ভিত্তিস্বরূপ। তবে স্বরূপ দামোদর তার কড়চায় এই শ্লোকদ্বয় লিখেছিলেন কিনা নিশ্চিত ভাবে জানা যায়নি। কড়চাটির উল্লেখ কবিরাজগোস্বামী এবং কবিকর্ণপুর (গৌর গণোদ্দেশ দীপিকা) করেছেন, কিন্তু গ্রন্থটি পাওয়া যায়নি। চরিতামৃতের কোনও কোনও পুথিতে 'তথাহি শ্রী স্বরূপগোস্বামিকড়চায়াম্' উল্লেখের সঙ্গে শ্লোকদুটি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ পুঁথিতেই শ্লোকের সূচনায় কেবলমাত্র 'তথাহি' কথাটি লেখা আছে। এ-কারণে ডঃ মজুমদার মনে করেন, শ্লোকগুলি কবিরাজ গোস্বামীই লিখেছেন তবে এই শ্লোকদ্বয়ের অন্তর্নিহিত তত্ত্বটি স্বরূপ দামোদরের কাছ থেকেই পেয়েছেন,—নইলে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকগুলি লিখতেন না।—

(ক) অতি গূঢ় হেতু সেই ত্রিবিধ প্রকার।
দামোদর-স্বরূপ হৈতে যাহার প্রচার॥
স্বরূপ গোসাঞি প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ।
তাহাতে জানেন প্রভুর এসব প্রসঙ্গ॥ [চৈ. চ আদি ৪]

(খ) অত্যন্ত নিগূঢ় এই রসের সিদ্ধান্ত।
স্বরূপ গোসাঞি মাত্র জানেন একান্ত॥
যেবা কহো অন্য জানে সেহো তাঁহা হৈতে।
চৈতন্য গোসাঞির তেঁহো অত্যন্ত মর্ম যাতে॥ [ঐ. ঐ]

সৌখ্যাঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতিলোভাৎ-
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥ [চৈ, চ. আদি ১]

'যে প্রেমের দ্বারা শ্রীরাধা আমার অদ্ভুত মধুরিমা আস্বাদন করে সেই প্রণয়মহিমাই বা কিরকম, আর রাধাপ্রেম-দ্বারা আস্বাদ্য আমার অদ্ভুত মধুরিমাই বা কি রকম?—আমাকে অনুভব করে রাধার যে সুখ হয় সেও বা কি রকম,—এর (আস্বাদন) লোভেই রাধাভাবযুক্ত হয়ে শচীগর্ভ-সিন্ধুতে হরি-রূপ ইন্দু (অর্থাৎ গৌরচন্দ্র) জন্ম নিয়েছেন।' বৃন্দাবনের কৃষ্ণলীলায় গোপীপ্রেমাস্বাদনের পর ভগবানের আরও কিছু লোভ ছিল। তিনি (ক) রাধাপ্রেমের মহিমা কেমন, (খ) রাধা আস্বাদিত কৃষ্ণের মাধুর্য মহিমা কেমন, এবং (গ) কৃষ্ণ প্রেমাস্বাদনে রাধার সুখ কেমন—এই তিন রসাস্বাদ কৌতূহলেই গৌরাঙ্গরূপে আবার অবতীর্ণ হয়েছিলেন। গৌরাঙ্গলীলা ব্যাখ্যায় স্বরূপ গোস্বামী আরও বলেছেন, [১]—

রাধাকৃষ্ণ প্রণয়বিকৃতি হ্লাদিনীশক্তিরস্মা-
দেকাত্মনাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥ [চৈ. চ. আদি ১]

'রাধা কৃষ্ণেরই প্রণয়-বিকৃতি হ্লাদিনীশক্তি, এজন্যেই তাঁরা একাত্ম হয়েও পৃথিবীতে (বৃন্দাবনলীলায়) দেহভেদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন।—এখন আবার সেই দুই ঐক্য পেয়েছে, রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত চৈতন্যাখ্য সেই প্রকটমধুর কৃষ্ণস্বরূপকে প্রণাম করি।' কবিরাজ গোস্বামীও বলেছেন,—

গোবিন্দানন্দিনী রাধা—গোবিন্দমোহিনী।
গোবিন্দ সর্বস্ব—সর্বকান্তা শিরোমণি ॥
.. ..
রাধা পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ ॥
মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে কভু নহে ভেদ ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ ॥

[চৈ. চ. আদি ৪র্থ]

১। এই শ্লোকটি সম্পর্কেও ৫০ পৃষ্ঠার পাদটিকার একই বক্তব্য প্রযোজ্য।

যে তিনটি লোভ চরিতার্থতার কামনায় শ্রীকৃষ্ণকে রাধাভাবদ্যুতি অঙ্গীকার করে গৌরাঙ্গরূপে আবির্ভূত হতে হয়েছিল কবিরাজ গোস্বামী অননুকরণীয় ভাষায় তারও চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। প্রথম লোভের বর্ণনায় শ্রীকৃষ্ণ বলছেন,—

কৃষ্ণের গৌরাঙ্গরূপ গ্রহণের প্রথম কারণ

পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব।
রাধিকার প্রেমে আমা করায় উন্মত্ত ॥

... ...

নিজ প্রেমাস্বাদে মোর হয় যে আহ্লাদ।
তাহা হতে কোটিগুণ রাধা প্রেমাস্বাদ ॥

... .

সেই প্রেমার শ্রীরাধিকা পরম আশ্রয়।
সেই প্রেমার আমি হই কেবল বিষয় ॥
বিষয় জাতীয় সুখ আমার আস্বাদ।
আমা হৈতে কোটিগুণ আশ্রয়ের আহ্লাদ ॥
আশ্রয় জাতীয় সুখ পাইতে মন ধায়।
যত্নে আস্বাদিতে নারি কি করি উপায় ॥
কভু যদি এই প্রেমার হইয়ে আশ্রয়।
তবে এই প্রেমানন্দের অনুভব হয় ॥

[চৈ. চ. আদি ৪র্থ]

বৃন্দাবনলীলায় গোপীদের কাছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন প্রেমের বিষয়। শ্রীরাধা ছিলেন প্রেমের আশ্রয়।—এই প্রেমের আশ্রয়ত্বের মহিমা উপলব্ধির লোভে গৌরাঙ্গ অবতারে ভগবান একাধারে প্রেমবিষয় ও প্রেমাশ্রয়ের আনন্দলীলাস্বাদ গ্রহণ করলেন।

দ্বিতীয় কারণ

দ্বিতীয় লোভ সম্পর্কে চরিতামৃতকার বলেছেন,—

এই এক শুন আর লোভের প্রকার।
স্বমাধুর্য দেখি কৃষ্ণ করেন বিচার ॥
অদ্ভুত অনন্ত পূর্ণ মোর মধুরিমা।
ত্রিজগতে ইহার কেহো নাহি পায় সীমা ॥

এই প্রেমদ্বারে নিত্য রাধিকা একলি।
আমার মাধুর্যামৃত আস্বাদে সকাল ॥
যদ্যপি নির্মল রাধার সৎপ্রেম দর্পণ।
তথাপি স্বচ্ছতা তার বাঢ়ে ক্ষণে ক্ষণ ॥[১]
আমার মাধুর্যের নাহি বাঢ়িতে অবকাশে।
এ দর্পণের আগে নব নবরূপে ভাসে ॥
মন্মাধুর্য রাধাপ্রেম—দোঁহে হোড় করি।
ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়ে দোঁহে কেহো নাহি হারি ॥
আমার মাধুর্য নিত্য নব নব হয়।
স্ব স্ব প্রেম অনুরূপ ভক্তে আস্বাদয় ॥
দর্পণাদ্যে দেখিয়াছি আপন মাধুরী।
আস্বাদিতে লোভ হয় আস্বাদিতে নারি ॥
বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ উপায়।
রাধিকা স্বরূপ হৈতে তবে মন ধায় ॥ [চৈ. চ. আদি ৪]

ঠিক একই কথা কবিরাজ গোস্বামী অন্যত্রও বলেছেন—

রূপ দেখি আপনার কৃষ্ণের হয় চমৎকার
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম। [চৈ. চ. মধ্য ২১]

জীবনীকারেরা এবং পদাবলীর মহাজন কবিরা গৌরাঙ্গের রাধাভাব-বিভোরতার অসংখ্য চিত্র অঙ্কিত করেছেন।

তৃতীয় কারণ

তৃতীয় লোভটিরও বিশদ ব্যাখ্যা চরিতামৃতকার দিয়েছেন। কৃষ্ণমিলনে শ্রীরাধার নিজস্ব সুখ কামনা ছিল না, কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছাতেই তিনি কৃষ্ণের কাছে আত্মনিবেদন করতেন। তবু কৃষ্ণমিলনে তাঁর সর্বাতিশায়ী সুখবোধ হত।—এ হল 'কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য' সুখবোধ। কৃষ্ণ যে তাঁর সঙ্গে মিলনে সুখী হয়েছেন সেই বোধ থেকে উদ্ভূত এক অপূর্ব সুখ চেতনা। কৃষ্ণ সেই সুখের স্বাদ পেতে চান।—

১। তুলনীয় : সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সেই পিরিতি অনু রাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয় ॥
[বিদ্যাপতি]

.ধ ধবে
দুতব.দী

আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ।
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ॥
নানা যত্ন করি আমি নারি আস্বাদিতে।
সে সুখ মাধুর্য ঘ্রাণে লোভ বাড়ে চিতে॥
রস আস্বাদিতে আমি কৈল অবতার
প্রেমরস আস্বাদিল বিবিধ প্রকার॥ [চৈ. চ. আদি ৪]

গৌরাঙ্গ অবতার লীলার এই তত্ত্বব্যাখ্যাব আলোকে বৈষ্ণব মহাজনেরা গৌরাঙ্গ ও শ্রীরাধা চিত্রে বহু ক্ষেত্রেই একই ভাব অনুভাবের প্রকাশ দেখিয়েছেন। নরহরি সরকার লিখেছেন—

নরহরি সরকারের পদ

গৌরাঙ্গ নহিত কি মেনে হইত
কেমনে ধরিত দে।
রাধার মহিমা প্রেমরসসীমা
জগতে জানাত কে॥
মধুর বৃন্দা বিপিন মাধুরি
প্রবেশ চাতুরি সাব।
বরজ যুবতী, ভাবের ভকতি
শকতি হইত কার॥ [নরহরি]

[বস্তুত গৌরাঙ্গ-প্রেমলীলার এই নব ব্যাখ্যাব আলোকেই বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে প্রেম-সৌন্দর্যের রসাস্বাদন দিব্য প্রেমানুভূতির মিশ্রণে ভক্তি ভাবান্বিত পরিশুদ্ধ হয়ে উঠেছে।]

অন্যান্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ঃ গৌড়ীয় তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মাশ্রিত রসতত্ত্বের পরিচয় নেবার পূর্বে ভারতীয় অন্যান্য বৈষ্ণবধর্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে চৈতন্যদেব প্রবর্তিত এই প্রেমধর্মের পার্থক্য সংক্ষেপে একবার দেখে নেওয়া যেতে পারে।

ভারতীয় বৈষ্ণবধর্মমতের প্রধান চারটি শাখাইরবেদান্ত ধর্মাশ্রিত। ব্রহ্মসূত্রের পাঁচজন ভাষ্যকার হলেন শঙ্কর, রামানুজ, নিম্বার্ক, মধ্ব এবং বল্লভ। শঙ্কর

কেবলাদ্বৈতবাদ প্রচারে করেছিলেন ;—তার মূল বক্তব্য হল : 'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা, জগৎ ব্রহ্মৈবকেবলম্,' ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জীব ও জগৎ মিথ্যা, মায়া মাত্র) মায়াবাদী শঙ্করাচার্য ছাড়া বেদান্তের প্রখ্যাত অন্য চারজন ভাষ্যকারই বৈষ্ণবধর্ম প্রবক্তা। রামানুজ 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ' প্রচার করে শ্রী-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করলেন। নিম্বার্ক (নিয়মাদিত্য বা নিম্বাদিত্য) দ্বৈতাদ্বৈতবাদ প্রচার করে 'হংসসম্প্রদায়' বা সনকাদি-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করলেন। মধ্ব (পূর্ণপ্রজ্ঞ বা আনন্দতীর্থ) 'দ্বৈতবাদ' প্রচার করে 'ব্রহ্মসম্প্রদায়ে'র জন্ম দিলেন। বল্লভ 'শুদ্ধাদ্বৈতবাদ' প্রচার করে (বিষ্ণুস্বামীর আদর্শে) 'রুদ্রসম্প্রদায়' গড়ে তুললেন।

ভারতীয় বৈষ্ণব ধর্মমতের প্রধান চারটি শাখা

শঙ্করের সঙ্গে রামানুজ, নিম্বার্ক, মধ্ব ও বল্লভের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। শঙ্করের মতে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। বৈষ্ণব বৈদান্তিক চারজনের মতে ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ সমভাবে সত্য। রামানুজ এবং মধ্ব 'বিষ্ণু' নামে ব্রহ্মকে বুঝিয়েছেন, নিম্বার্ক এবং বল্লভ ব্রহ্মকে কৃষ্ণনামে অভিহিত করছেন। শঙ্কর ব্রহ্ম ও জীবজগৎকে অংশী-অংশ বা কারণ-কার্য সম্পর্কান্বিত করে দেখতে বলেছেন। এই কারণ-কার্য বোধ কেমন হবে তাই নিয়ে চারজনের মতপার্থক্যে চারটি প্রধান বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। রামানুজ বলেছেন, কারণ ও কার্য ধর্মত পৃথক হলেও আসলে এক।—যেমন মাটির ঘট আর মাটির তাল। (নিম্বার্ক বলেছেন, মাটির পিণ্ড আর মাটির ঘট এরা ধর্ম এবং স্বরূপে ভিন্নও বটে,—অভিন্নও বটে। অর্থাৎ কার্য আর কারণ এদের ধর্ম আর স্বরূপ ভিন্নাভিন্ন বা দ্বৈতাদ্বৈত) মধ্ব এই মত অস্বীকার করে বলেছেন, কার্য ও কারণ সম্পূর্ণ-ই ভিন্ন।—মৃন্ময় ঘট আর কুম্ভকারের যে সম্পর্ক এ যেন তাই ;—দুই সম্পূর্ণ ভিন্নতর। বল্লভ বললেন, কার্য আর কারণ অভিন্ন,—যেমন অভিন্ন অংশী আর অংশ। সুতরাং জীবজগৎ ব্রহ্মথেকে স্বরূপত এবং ধর্মত একেবারেই অভিন্ন।—এ মত মধ্বের মতের ঠিক বিপরীত। তবে বৈদান্তিক শঙ্কর যাকে ব্যবহারিক, অনিত্য এবং মায়া বলে ঘোষণা করেছেন, বৈষ্ণব বৈদান্তিকেরা সকলেই (নিজেদের মধ্যে মতপার্থক্য সত্ত্বেও) তাকে পারমার্থিক, নিত্য এবং সত্য বলে প্রচার করেছেন।

শঙ্কর, রামানুজ, নিম্বার্ক, মধ্ব, বল্লভ

একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায়, শঙ্কর বিশুদ্ধ দার্শনিক বিচারের পথ ধরে এগিয়েছিলেন।—ভাবাবেগকে তিনি একেবারেই প্রশ্রয় দেননি। বিশিষ্টদ্বৈতবাদী

রামানুজ বিষ্ণু-ভক্তিকথা প্রচার করলেও ভাবাবেগবিহীন দার্শনবিচারের ধারাই অনুসরণ করেছেন। রামানুজের ভক্তিকে জ্ঞানমার্গীয় ভক্তি বলা চলে। নিম্বার্ক জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করলেও তার মধ্যে মাধুর্যের সঞ্চার ঘটেছে। মধ্ব আবার ধর্মকে বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গচারাই রেখেছেন।—ভক্তিমাধুর্যের সেখানে স্থান নেই। বল্লভ অবশ্য জ্ঞানমার্গ ত্যাগ করে মাধুর্য এবং অনুরাগের পথই গ্রহণ করেছেন। —বল্লভের ধর্মমত আবেগোচ্ছ্বসিত।

নরহরি সরকার ভক্তিরত্নাকরে শ্রীচৈতন্যদেবকে মধ্ব সম্প্রদায়ভুক্ত বলেছেন।

উক্ত ধর্মমতের সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের পার্থক্য

শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে উপরোক্ত চারটি সম্প্রদায়ের মতামতের আংশিক প্রভাব পড়লেও বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম অনেক বেশী মানবীয়ত্ব লাভ করেছে বলা যেতে পারে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন,—

কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর
নরলীলা হয় অনুরূপ।। [চৈ. চ. মধ্য. ২১ প]

মানব রূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলার যে চিত্ররূপ চৈতন্যদেবের জীবনলীলার এবং রসশাস্ত্রানুমোদিত পদাবলীগানে প্রকাশ পেয়েছে ভারতীয় অপরাপর বৈষ্ণব ধর্ম থেকে তার আবেদন পৃথক। শ্রীচৈতন্যদেবের অচিন্ত্য ভেদাভেদ এবং নিত্য বৃন্দাবনলীলার শুদ্ধাভক্তিপ্রেম-চেতনা একান্তই তাঁর নিজস্ব বস্তু। মধ্বের ব্রহ্ম সম্প্রদায় একমাত্র ব্রাহ্মণেরই সাধনায় অধিকার দিয়েছেন। আর শ্রীচৈতন্যদেবের উক্তি হল,—

যাহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণ নাম।
তাহারে জানিও তুমি বৈষ্ণব প্রধান॥ [চৈ. চ. মধ্য. ১৬প]

সে ব্যক্তি—

কিবা শূদ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেন নয় [ঐ. মধ্য ৮ প]

অদ্বৈত আচার্য শ্রীচৈতন্যকে বলেছিলেন—

যদি ভক্তি বিলাইবা
স্ত্রী-শূদ্র আদি যত মূর্খেরে সে দিবা।
... ...
আচণ্ডাল নাচুক তোর নামগুণ গ্যায়া। [ঐ. মধ্য. ৬ প]

প্রভু জবাব দিয়েছিলেন, তোমার এই ইচ্ছা যে সত্য হয়েছে সমস্ত সংসার তার সাক্ষী।

চণ্ডালাদি নাচয়ে প্রভুর গুণগানে।
ভট্ট মিশ্র চক্রবর্ত্তী সবে নিন্দা জানে॥ [ঐ. ঐ. ঐ.]

শ্রীচৈতন্যের সবচেয়ে অন্তরঙ্গ পার্শ্বদদের অন্যতম ছিলেন যবন হরিদাস। তাঁর মৃত্যুতে মহাপ্রভু বিশেষ বিচলিত হয়েছিলেন।—

হরিদাসের তনু প্রভু কোলে উঠাইয়া।
অঙ্গনে নাচেন প্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়া॥
হরিদাসে সমুদ্রজলে স্নান করাইলা।
প্রভু কহে সমুদ্র এই মহাতীর্থ হইলা॥
হরিদাস পাদোদক পিয়ে ভক্তগণ।
হরিদাসের অঙ্গে দিল প্রসাদ চন্দন॥ চৈ. চ. অন্ত্য ১১প]

মহাপ্রভুর জীবনের অসংখ্য ঘটনায় দেখা যায় তিনি হরিভক্তিপরায়ণ সর্বশ্রেণীর মানুষকেই ভক্তিভরে প্রেমদীক্ষা দিয়েছেন। তাছাড়া, কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্য-চরিতামৃত মধ্যলীলায় (৯ম পরিচ্ছেদ) উল্লেখ করেছেন মহাপ্রভু মধ্বতীর্থ উডুপীতে গেলে মাধ্বী সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁকে গ্রহণ করেনি, তিনিও মাধ্ব মতকে পরমত জ্ঞানে তাদের গর্ব চূর্ণ করে অর্থাৎ মাধ্ব মতকে যুক্তিবলে পরাজিত করে ফল্গুতীর্থের পথে চলে গেলেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম বাংলাদেশের হৃদয়ের বস্তু। বাংলাদেশ বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত—সবধর্মেই মানবতার এক বিশিষ্ট ছাপ এনে দিয়েছে। বৈষ্ণবধর্মের বীজ বাংলাদেশে বহু প্রাচীন কাল থেকেই রয়েছে। পাহাড়পুরে অন্ততঃ দেড় হাজার বছর পূর্বেকার বাংলাদেশে প্রচলিত কৃষ্ণলীলার চিত্রাবলী পাওয়া গেছে। প্রাচীনতম সংস্কৃতকাব্য-সংগ্রহ কবীন্দ্রবচন-সমুচ্চয় বাংলাদেশেই সংকলিত হয়েছে। এ গ্রন্থে এবং শ্রীধরদাসের সদুক্তি-কর্ণামৃত গ্রন্থে অনেক বাঙালী কবির রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পদ মিলছে। মাধ্ব মতের প্রবর্তক আনন্দতীর্থ এই গ্রন্থ প্রকাশের সময় সাত আট বছরের বালক মাত্র।

মানব প্রেমের প্রাধান্য

শ্রীচৈতন্য পূর্ববর্তী যে কবিদের পদাবলীর প্রেমরসাস্বাদনে আনন্দলাভ করতেন সেখানে মুখ্যত মানব প্রেমই প্রাধান্য পেয়েছে। জয়দেব কোমল-কান্ত পদাবলীতে যে কৃষ্ণরাধার প্রেমচিত্র এঁকেছেন সেখানে তাঁরা দেবভাব ত্যাগ করে লৌকিক প্রেমাবেশেই ধরা দিয়েছেন। প্রেমভক্তির সঙ্গে

'বিলাস কলাকুতূহলী'দের রসেরও আনন্দ দিতে শ্রীগীতগোবিন্দ লিখেছিলেন ভক্ত কবি। কবি বিদ্যাপতিও রাধার যে বিচিত্র বর্ণবহুল যৌবনলীলা-চিত্র তাঁর অসংখ্য পদে ফুটিয়ে তুলেছেন সেখানে মানবীয় প্রেম-আবেদনের প্রভাব কম নয়।[১]

ধর্মাচরণে মানবীয় সহজ ভাবের সাধন বাংলাদেশের বৈশিষ্ট্য। পথে পথে আউল বাউলের গীত শোনা যায়,—

আমার মনের মানুষ যেরে,
আমি কোথায় পাব তারে ?

এই সহজ ভাবের মানবীয় প্রেম-সাধনা বৈষ্ণবেরাও করেছেন। শ্রীচৈতন্য সহজভাবের মানুষ হতে চেয়েছিলেন। তাই বৃদ্ধা মাতাকে ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়েও কেঁদেছেন,—

সহজ সাধনা

তোমার সেবা ছাড়ি আমি করিল সন্ন্যাস।
বাতুল হইয়া আমি কৈল সর্বনাশ॥

[চৈ. চ. অন্ত্য. ১৯প.]

ব্রজের রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা-কল্পনায় বাংলার বৈষ্ণবেরা ভেদাভেদ দ্বৈতাদ্বৈত বিরোধ মিটিয়ে নিয়েছেন। মানবীয় প্রেমের দাস্য-সখ্য বাৎসল্যরূপে দৈবীভক্তি ও দিব্য প্রেমকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। ব্রজলীলায় তাই কৃষ্ণরাধার চিত্রে ভক্ত কবিদের হাতে সহজ প্রেমের রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছে।

সহজ ভাবের বাউলধারা চৈতন্যকে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর শিষ্যদেরও প্রভাবিত করেছিল। তিনি রামানন্দকে বলেছিলেন—

আমি এক বাতুল, তুমি দ্বিতীয় বাতুল।

বাউলরা যেমন জাতি-পংক্তি মানেননি। শ্রীচৈতন্যও—

বরণ আশ্রম কিঞ্চন-অকিঞ্চন
কার কোন দোষ নাহি মানে।
কমলা-শিব-বিহি দুলহ প্রেমধন
দান করয়ে জগজনে॥ [গোবিন্দ দাস]

১। আদি ও অকৃত্রিম চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব বিষয়ে গবেষক মহলে তীব্র মতবিরোধ রয়েছে বলে সে প্রসঙ্গ আর এখানে তোলা হল না।

অদ্বৈত-গৃহে শ্রীচৈতন্য মুকুন্দ এবং হরিদাসকে খেতে ডেকেছিলেন একসঙ্গে হরিদাসের মৃত্যুর পরও চৈতন্যদেবের নির্দেশে—

হরিদাস পাদোদক পিয়ে ভক্তগণ।

অদ্বৈত আচার্য নীলাচলে মহাপ্রভুকে তর্জা-লিখিত যে বার্তা পাঠিয়েছিলেন সেখানে শ্রীচৈতন্যদেবকে এবং নিজেকে বাউল বলে বিশেষিত করেছেন। শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত ধর্ম যে কত সহজ মানবিক চেতনালব্ধ ছিল সনাতনকে প্রদত্ত প্রসিদ্ধ শিক্ষাষ্টকের (দ্র. পরিশিষ্ট :) উপাদেশাবলীতে তার পরিচয় রয়েছে। অহিংস মানবধর্মের সহজতম উপদেশ তিনি দিয়েছেন সেখানে।

শ্রীচৈতন্য যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন সেটিও লক্ষ্য করবার। সেখানেও কৃত্রিম অলৌকিকত্ব প্রচার না করে তাঁর সহজ মানুষরূপে পরিচিত হবার আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পেয়েছে।—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্ নিখিল পরমানন্দ পূর্ণামৃতাব্ধে
র্গোপীভর্তুঃ পাদকমলোর্দাসানুদাসঃ ॥

[পদ্যাবলী : রূপগোস্বামী : ৭২ অঙ্ক].

আমি তো ব্রাহ্মণ নই, ক্ষত্রিয়ও নই, বৈশ্যও নই, শূদ্রও নই। আমি ব্রহ্মচারী নই, বর্ণাশ্রমী, বানপ্রস্থী বা সন্ন্যাসীও নই। যিনি নিখিল পরমানন্দ পরিপূর্ণ অমৃতসাগর স্বরূপ আমি সেই শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলের দাসানুদাস মাত্র।

তিনি যে নিজেকে অবতার-জ্ঞানে ভক্তদের ছোট বলে মনে করতেন না তাঁরও পরিচয় দিয়েছেন।—

আমারে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন॥ [চৈ. চ. আদি. ৪ প.]

রবীন্দ্রনাথ মানবীয় প্রেমের কল্যাণী ও কামনাদুষ্ট—দুটি শ্রেণী ভাগ করেছেন। মহাপ্রভু মানবীয় কল্যাণী-প্রেমকেই জনকল্যাণে ঈশ্বর-মহিমান্বিত করে বিলিয়ে গেছেন।

কবিরাজ গোস্বামী এই দুই শ্রেণী ভাগকেই প্রেম ও কাম নামে ব্যাখ্যা করেছেন।—

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।। [চৈ. চ. আদি. ৪ প.]

এই প্রেমে ভক্তের সঙ্গে ভগবান সমভূমিতে, সমলীলায় নেমে আসেন। প্রভুত্বের ঐশ্বর্যবোধ প্রেমকে শিথিল করে দেয়। তেমন প্রেমে শ্রীচৈতন্যের আকাঙ্খা ছিল না।—

ঐশ্বর্য শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত। [ঐ. ঐ. ঐ.]

এই সহজ মানবীয় প্রেম সাধনায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে যে নবপ্রাণ সঞ্চার করেছিলেন তারই সুদূরপ্রসারী ফল হিসাবে নবদ্বীপ, শান্তিপুর, নদীয়া প্রেমের বন্যায় ভেসে যাবার উপক্রম হয়েছিল। তারই ফলে একাধারে যবনরাজের অত্যাচার থেকে এবং পাষণ্ডী অধঃপতিত হিন্দুদের অত্যাচার থেকে গৌড়বাসী রক্ষা পেয়েছিল।—তারই ফলে নীলাচল ভূমি নবপ্রেম-চেতনায় উল্লসিত হয়েছিল।—বৃন্দাবনে ষট্‌গোস্বামীর প্রচেষ্টায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব-প্রেমধর্মের এক নব দার্শনিকবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সর্বোপরি সেই মধ্যযুগের ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের বাংলা সাহিত্যে এমন এক সার্বজনীন প্রেমকীর্তন-গীতির অপূর্ব সমৃদ্ধি ঘটেছিল বিশ্বসাহিত্যে যার তুলনা মেলে না। বাংলাদেশে দীর্ঘদিনের ক্ষীণপ্রবাহিত বৈষ্ণবচেতনা জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের মাধ্যমে যে উৎকর্ষ লাভ করেছিল তারই রসমূর্তিরূপে সহজ প্রেমের জীবন্ত বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব ঘটল।—আর শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন-লীলার প্রেমরূপ অবলম্বনে গড়ে উঠল এক বিপুল সমৃদ্ধ বৈষ্ণব ধর্মসম্প্রদায়।—তাঁদেরই ভক্তমনের অর্ঘ্য নিবেদিত হল শতসহস্র পদাবলী কীর্তন গীতির মাধ্যমে।

বৈষ্ণব রসতত্ত্বের পরিচয়

বৈষ্ণব রসতত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে বৃন্দাবনের ষট্ গোস্বামীর কথা মনে আসে শ্রী চৈতন্যের নির্দেশে এই ষট্‌গোস্বামী অর্থাৎ রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ দাস, গোপাল ভট্ট, সনাতন, রূপ এবং জীব গোস্বামী,[১] বৃন্দাবনে মিলিত হয়ে বৈষ্ণব তত্ত্বালোচনার ভিত্তি গড়ে তুললেন। রূপগোস্বামীর উজ্জ্বলনীলমণি এবং ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে এবং জীবগোস্বামীর ষট্‌সন্দর্ভে সেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন

১। ষট্ গোস্বামীর বিশদ পরিচয়-প্রসঙ্গে বিমানবিহারী মজুমদারের 'শ্রী চৈতন্য-চরিতের উপাদান' গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

ও রসতত্ত্বের মূল আলোচনা বিধৃত হয়েছে। এখানে মুখ্যতঃ রূপগোস্বামী কৃত ব্যাখ্যাবলম্বনে বৈষ্ণব রসের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল।

স্থায়ী নবভাব ও নবরস

প্রাচীন সংস্কৃত রসশাস্ত্রে নয়টি স্থায়ী ভাব ও রসের উল্লেখ করা হয়েছে।—

রতির্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা।
জুগুপ্সা বিস্ময়শ্চেত্থমষ্টৌ প্রোক্তাঃ শমোঽপিচ॥

রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা, বিস্ময় এবং শম— এই নয়টি মূল ভাব।—রূপান্তরিত নয়টি মূল রস হল :

শৃঙ্গারহাস্যকরুণরৌদ্রবীরভয়ানকাঃ।
বীভৎসোঽদ্ভুত ইত্যষ্টৌ রসাঃ শান্তস্তথা মতঃ॥

শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত এবং শান্ত।

বৈষ্ণব আচার্যেরা এই নয়টি ভাব-রসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রতি ভাব ও শৃঙ্গার রসকে গ্রহণ করেছেন। বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে রতি বলতে কৃষ্ণরতি এবং তার রসরূপ বলতে ভক্তিরসাত্মক কৃষ্ণ-শৃঙ্গার বোঝানো হয়েছে। বৈষ্ণবকাব্যের কৃষ্ণরাধালীলা-চিত্রই বিভাব, রাধাকৃষ্ণের পারস্পরিক অনুরাগ বোঝাতে যে সকল বাচিক বা আঙ্গিক লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে সেগুলি অনুভাব এবং মূলরসের পরিপুষ্টির জন্য যে সকল অঙ্গীরস অঙ্গীভাবের আশ্রয়ে প্রকাশ পেয়েছে সেগুলি সঞ্চারী বা ব্যভিচারি ভাব বলা যেতে পারে। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক,—

রতিভাব ও শৃঙ্গার রস

রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়ান-তারা।
বিরতি আহারে রাঙ্গাবাস পরে
যেমত যোগিনী-পারা॥
আউলাইয়া বেণী ফুলেতে গাঁথনি
দেখয়ে খসাইয়া চুলি।

হসিত বয়ানে চাহি মেঘপানে
কি কহে দুহাত তুলি ॥
একদিঠ করি ময়ুর-ময়ূরী
কণ্ঠকরে নিরীখণে।
চণ্ডীদাসে কয় নব পরিচয়
কালিয়া বঁধুর সনে ॥

[চণ্ডীদাসের পদাবলী. মজুমদার. ৬প]

—এখানে মূল আলম্বন বিভাব, নায়িকা শ্রীরাধা। তাঁহার আহারে বিরতি, রাঙাবাস পরিধান, বেণী এলাইয়া কালো চুল দেখা, মেঘসনে প্রলাপকথন, একদৃষ্টে ময়ুর-ময়ূরীর কণ্ঠের দিকে তাকানো—এগুলি অনুভাব। তাঁহাব চিন্তা, আবেগ, উন্মাদ ভাব, হাসি, নির্বেদ—এগুলি সঞ্চারীভাব। মূলস্থায়ী ভাব হল, কৃষ্ণরতি।—রস, বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গার।

বৈষ্ণব রস-প্রবক্তারা রতিভাব এবং শৃঙ্গাররসের অর্থ সম্প্রসারিত করেছেন। সাহিত্যদর্পণ-কার বিশ্বনাথ কবিরাজের ভাষায়, 'প্রিয়বস্তুর প্রতি মানব মনের অনুরাগই রতি।' বৈষ্ণব ভক্তের কাছে সর্বপ্রিয় বস্তু হল, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।—সুতরাং তাঁদের রতি হল, কৃষ্ণরতি; তার রসরূপ হল, প্রেমভক্তিরস। রূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে উল্লেখ করেছেন, 'শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণ ইত্যাদির দ্বারা জাত স্থায়িভাব কৃষ্ণরতি বিভাব অনুভাব সাত্ত্বিকভাবেব দ্বারা ভক্তহৃদয়ে আস্বাদ্য অবস্থায় আনীত হলে, তা ভক্তিরসে রূপান্তরিত হয়।' রতিভাব ও ভক্তিরসেব মূল পাঁচটি ভাগ আছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজেব ভাষায়,—

কৃষ্ণরতি

রতিভাবেব পাঁচ ভাগ

ভক্তিভেদে রতিভেদ পঞ্চপরকার।
শান্তরতি দাস্যরতি সখ্যরতি আর ॥
বাৎসল্যরতি মধুররতি পঞ্চবিভেদ।
রতিভেদে কৃষ্ণভক্তি রসপঞ্চভেদ ॥
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর রস নাম।
কৃষ্ণভক্তিরসমধ্যে এ পঞ্চ প্রধান ॥ [চৈ. চ মধ্য. ২০৯

—এ ছাড়া কবিরাজ গোস্বামী রূপগোস্বামীর অনুসরণে সাতটি সঞ্চারীরসের কথাও বলেছেন।—

হাস্যোদ্ভুত বীর করুণ রৌদ্র বীভৎস ভয়।
পঞ্চবিধ ভক্তে গৌণ সপ্তরস হয় ॥
পঞ্চরস স্থায়ী ব্যাপী রহে ভক্তমনে।
সপ্ত গৌণ আগন্তুক পাইয়ে কারণে ॥ [চৈ. চ. মধ্য. ২০প]

গৌণ সঞ্চারী রসগুলিকে আর আলোচনায় না টেনে এনে মূল পাঁচটি ভাবরসের এবারে পরিচয় দিচ্ছি।

(১) শমরতির রসরূপ শান্তরস। ভগবান কৃষ্ণকে এখানে সর্ব ঐশ্বর্যময় শ্রেষ্ঠ পুরুষরূপে গণ্য করে ভক্ত তাঁর চরণে আত্মসমর্পণ করেন

শমরতি

(২) সেবারতির রসরূপ দাস্যরূপ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে প্রভু, ভক্ত দীন ভৃত্য। ভগবানের সেবা করে ভক্ত কৃতার্থ হতে চান। এখানে শান্তরসের কৃষ্ণনিষ্ঠার সঙ্গে সেবাধর্মের সংযোজন হয়েছে।

সেবারতি

(৩) বিশ্রম্ভ (পারস্পরিক বিশ্বাস) রতির রসরূপ সখ্যরস। কৃষ্ণনিষ্ঠা এবং দাস্যের সেবার সঙ্গে এখানে বন্ধুত্বের সমপ্রাণতা সংযুক্ত হয়েছে

সখ্যরতি

(৪) বৎসলতা রতির রসরূপ বাৎসল্যরস। ভগবান কৃষ্ণের সঙ্গে ভক্তের এখানে পাল্য-পালক সম্পর্ক ভগবান এখানে সন্তান, ভক্ত মাতা। শান্তের নিষ্ঠা, দাস্যের সেবা, সখ্যের বিশ্রম্ভ—এই সঙ্গে এখানে মায়ের লালন-বৎসলতা বর্তমান।

বৎসলতা রতি

(৫) মধুরারতির রসরূপ মধুর রস। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে কান্ত,—ভক্ত শ্রীরাধা কান্তা। পূর্ববর্ণিত চারটি ভাবের সঙ্গে এখানে মধুরের কান্তাকান্তভাবও মিলেছে। কবিরাজ গোস্বামীর ...লা যেতে পারে,

মধুরারতি

পূর্ব পূর্ব রসের গুণ পরে পরে হয়।
দুই তিন গণনে পঞ্চ পর্যন্ত বাড়য় ॥
গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতিরসে।
শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য গুণ মধুরেতে বৈসে ॥[১]
[চৈ., চ. মধ্য ৮প.]

[১] ...রিতামৃতের মধ্যলীলা ১৯ পরিচ্ছেদে এ বিষয়ে কবিরাজ গোস্বামী আরও ...য়েছে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, শান্তরসে ভালবাসা নেই, ভয় ও বি
মিশ্রিত ভক্তিই সেখানে রয়েছে।[২] ভালবাসার সূচনা দাস্যে,—সখ্য ও বাৎসল্যে
ভেতর দিয়ে পরিণতি হল মধুরে। মধুর রসকে উজ্জ্বল বা শৃঙ্গার রসও বলা হ
থাকে।

এখন মধুরারতির তিনটি স্তরভেদ আছে, সাধারণী, সমঞ্জসা এবং সমর্থা

মধুরারতির স্তরভেদ : সাধারণী, সমঞ্জসা, সমর্থা

কৃষ্ণের রূপলাবণ্য দর্শনে ইন্দ্রিয় চরিতার্থের ইচ্ছাকে সাধারণ
বলে। মথুরার কুব্জা-রতি সাধারণী।

কৃষ্ণের রূপগুণাদির বর্ণনা শ্রবণে শাস্ত্রানুমোদিত পরিণয় বন্ধনের দ্বারা সঙ্গসুখ
লাভের বাসনোদ্ভূত রতির নাম সমঞ্জসা। রুক্মিণী এবং সত্যভামা সমর্থা রতির
নায়িকা ছিলেন। তাঁরা সামাজিক পরিণয় বন্ধনের মাধ্যমে কৃষ্ণকে লাভ করতে
চেয়েছিলেন।

একমাত্র ভগবানের তৃপ্তিসাধনই যে রতির লক্ষ্য তাকে সমর্থা রতি বলে।
ব্রজলীলায় শ্রীরাধা, চন্দ্রাবলী, ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি গোপীগণ সমর্থারতির
প্রেমিকা। এরা কৃষ্ণের তৃপ্তিসাধনের জন্য সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে কৃষ্ণের নিত্যপ্রিয়া
হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যেও শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলীর স্থান উচ্চে;
তুলনায় শ্রীরাধার আসন আবার উচ্চতর। বৈষ্ণব রসতত্ত্বে বর্ণিত শৃং
স্থায়ীভাব হল, সমর্থা নামক মধুরারতি। বিভাব বৃন্দাবনলীলা কাহিনি বৎ
শ্রীকৃষ্ণ, নায়িকা শ্রীরাধা,—প্রতিনায়িকা চন্দ্রাবলী, অন্যান্য ব্র চনের
লীলাবিস্তারিকা সখী।

শ্রীরাধাকে মহাভাব-স্বরূপিনী বলা হয়। সমর্থারতিই ক্রমে ক্রমে ' তি
মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব এবং মহাভা
লাভ করেছে।

মহাভাবরূপিনী শ্রীরাধা

প্রেম ক্রমে বাড়ি হয় স্নেহ মান প্রণয়।
রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয়॥

[চৈ. চ. মধ্য ।.]

২। কবিরাজ গোস্বামী অবশ্য বলেছেন : 'শান্তরসে শান্তিরতি প্রেম পর্যন্ত। দাস্যরতি
রাগপর্যন্ত ক্রমেতে বাড়য়॥' ভালবাসার ক্রমবিকাশ স্তর হল : প্রেম, স্নেহ, প্রণয়, রাগ
অনুরাগ, ভাব, মহাভাব। প্রেমের অঙ্কুর শান্তরসে, রাগের সূচনা দাস্যে।

ভাবের তিনটি সুখলাভের কথা বলা হয়েছে: (১) কৃষ্ণানুভব-রূপ প্রথম সুখ, (২) অনুরাগোৎকর্ষ দ্বারা কৃষ্ণানুভব দ্বিতীয় সুখ, (৩) কৃষ্ণানুভব-রূপ অনুরাগোৎকর্ষের অনুভূতি তৃতীয় সুখ। এই অনুভূতি শ্রীরাধার হৃদয়াশ্রিত হয়ে শ্রীরাধাকে যেমন প্রেমানন্দময়ী করে তোলে তেমনি সাধক ভক্ত ও সিদ্ধ ভক্তদের চিত্তও শ্রীরাধার প্রেমানন্দে আলোড়িত করে তোলে। এই ভাবের মধ্যে আবার যে ভাব ব্রজলীলার কৃষ্ণবল্লভাদের মধ্যে সম্ভব তাকে মহাভাব বলে। মহাভাবের আবার রূঢ়-অধিরূঢ় দ্বিবিধ ভাগ। যে মহাভাবে সাত্ত্বিক ভাব (স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু, পুলক) উদ্দীপ্ত হয় তাকে রূঢ় বলা হয়। আর যখন অনুভাব সকল রূঢ়ভাবের অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য লাভ করে তাকে অধিরূঢ় বলে। অধিরূঢ় মহাভাবের লক্ষণে বলা হয়েছে, কৃষ্ণ-বিরহে কোটি ব্রহ্মাণ্ডসুখও তুচ্ছ হয়ে যায়, কৃষ্ণমিলনে বৃশ্চিকসর্পাদির দংশনেও দুঃখের লেশমাত্র থাকে না।

মহাভাবের দুইভাগ: মোদন ও মাদন

অধিরূঢ় মহাভাবের মোদন ও মাদন দুইভাগ করা হয়েছে। মোদন হর্ষবাচক,—মোদনাখ্য মহাভাবে হর্ষানুভূতিতে পর্যাপ্তি। মাদন হল, 'দিব্য মধুবিশেষবৎ মত্ততাকর'। দিব্যমধুবিশেষে যে মত্ততা আনে মাদনেও তেমন মত্ততা আনে। রূপগোস্বামী বলেন, যাতে সকান্ত-কৃষ্ণেরও চিত্তবিক্ষোভ জন্মে এবং বিপুল প্রেমধনের অধিকারিণী কৃষ্ণকান্তাদের প্রেম অপেক্ষাও প্রেমাধিক্য প্রকাশ পায়,—সেই হল মোদনাখ্য মহাভাব। মোদনাখ্য মহাভাব কৃষ্ণকান্তাদের মধ্যে একমাত্র রাধাযূথেই সম্ভব।—এখানে হ্লাদিনীশক্তির শ্রেষ্ঠ সুবিলাস। মোদন বিরহ দশাতে মোহন নাম ধারণ করে।—মোহনভাবে কান্তালিঙ্গিত কৃষ্ণের মূর্চ্ছা, অসহ দুঃখবরণেও কৃষ্ণপ্রিয়ার কৃষ্ণসুখ কামনা, মৃত্যুবরণ করে দেহস্থ পঞ্চভূতে কৃষ্ণসঙ্গ-তৃষ্ণা মেটানোর ইচ্ছা, দিব্যোন্মাদ প্রভৃতি প্রকাশ পায়। মাদন হ্লাদিনীর সার,—রতি থেকে মহাভাব পর্যন্ত সকল প্রেমবৈচিত্র্যের উপলব্ধি এখানে রয়েছে। একমাত্র শ্রীরাধা ছাড়া অন্য কেউই মাদনাখ্য মহাভাবের অধিকারী নন।

কৃষ্ণরতির দুইভাগ: স্বকীয়া-পরকীয়া

কৃষ্ণরতির স্বকীয়া-পরকীয়া ভেদের কথা রসশাস্ত্রে বলা হয়েছে। সমঞ্জসা-রতির নায়িকারা স্বকীয়া। সমর্থারতির গোপী প্রেমিকারা পরকীয়া। পরকীয়ার আবার দুইভাগ -কন্যকা ও পরোঢ়া। যাদের পাণিগ্রহণ হয়নি, সেই লজ্জাশীলা, পিতৃগৃহস্থিতা, সখীগণের সঙ্গে নর্মক্রীড়ায়

উৎসুকা গোপীগণই কন্যা। এঁরা প্রায়ই মুগ্ধাগুণান্বিতা। গোপগণের সঙ্গে বিবাহিত হয়েও যারা কৃষ্ণ-সম্ভোগ চেয়েছিলেন তাঁরাই পরকীয়া—এদের মধ্যেও সাধনপরা, দেবী এবং নিত্যপ্রিয়া তিন শ্রেণীভেদ দেখানো হয়েছে। নিত্য-প্রিয়াদের শ্রেষ্ঠা হলেন শ্রীরাধা এবং চন্দ্রাবলী।—সর্বশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধা। বৈষ্ণব রসতত্ত্বের পরকীয়াবাদ সম্পর্কে অন্যান্য আলোচনা পরে করা যাবে।

ভক্তিরস এবং রতিভাবকে গুণবিচারে অন্যদিক থেকে দ্বিবিধভাগে দেখানো হয়েছে,—সাধ্যভক্তি, সাধনভক্তি: রাগাত্মিকা রতি, রাগানুগা রতি। স্বভাবসিদ্ধ রাধা, চন্দ্রাবলী, ললিতা, বিশাখা ইত্যাদির কৃষ্ণভক্তি সাধ্যভক্তিস্বরূপ,—আর জীবের কৃষ্ণভক্তি সাধনাসাপেক্ষ, সুতরাং সাধনভক্তিস্বরূপ। রাধা, চন্দ্রাবলী প্রভৃতি বৃন্দাবন গোপীদের রতির নাম রাগাত্মিকা রতি, জন্মসিদ্ধ কৃষ্ণরতি নিয়ে তাঁরা ব্রজলীলায় আবির্ভূত হয়েছিলেন। জীবের কৃষ্ণরতির নাম রাগানুগা রতি। জীবনের পথে নাম-গান-কীর্তন-ভজনের দ্বারা ধীরে ধীরে সাধন পথে এই রতি জন্মায়। ভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে বলা হয়েছে—

ভক্তির দুইভাগ: সাধ্য-ভক্তি, সাধন ভক্তি

রাগাত্মিকা ও রাগানুগা রতি

> ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পারমাবিষ্টতা ভবেৎ।
> তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা॥

'বাঞ্ছিত পদার্থে যে স্বাভাবিকী পরমাবিষ্টতা, তাকে রাগ বলে। রাগময়ী ভক্তিই রাগাত্মিকা।'

> বিরাজন্তীমভিব্যক্তং ব্রজবাসিজনাদিষু।
> রাগাত্মিকামনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে॥

'ব্রজবাসী জনে রাগাত্মিকা ভক্তি স্পষ্টই প্রকাশিত। রাগাত্মিকার অনুসারিণী ভক্তি রাগানুগা নামে কথিত।' মধুর রসের দুই ভাগ: বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ। বৈষ্ণব মধুর রস লীলাভেদে দুই পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে: বিপ্রলম্ভ এবং সম্ভোগ। অনুরক্ত নায়ক-নায়িকার প্রগাঢ় রতি মিলনাভাবে উৎকর্ষ লাভ করেছে,—কিন্তু ইপ্সিত মিলন সিদ্ধ হতে পারেনি—এই পর্যায়ের নাম বিপ্রলম্ভ। আর নায়ক-নায়িকা অনুরূপ অবস্থায় মিলিত হতে পারলে মনে যে উল্লাস বোধ হয় তাকে সম্ভোগ বলে। 'Our sweetest songs are those that tell of our saddest thought'—একথা বোধ হয় সর্বদেশের সর্বকালের কবিদের মনের কথা। বৈষ্ণব মহাজনেরাও বিরহমূলক বিপ্রলম্ভেরই প্রাধান্য দিয়েছেন।

সম্ভোগ বৈষ্ণব রস ও কাব্যের চরম কথা নয়। চৈতন্যচরিতামৃত-কার অবশ্য লিখেছেন,—

সম্ভোগ বিপ্রলম্ভ বিবিধ শৃঙ্গার।
সম্ভোগ অনন্ত অঙ্গ নাহি অন্ত তার॥
বিপ্রলম্ভ চতুর্বিধ পূর্বরাগ মান।
প্রবাসাখ্য আর প্রেমবৈচিত্ত্য আখ্যান॥[১] [চৈ. চ. মধ্য ২৩ প]

বিপ্রলম্ভের চারিটি ভাগ হল: পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য এবং প্রবাস। সম্ভোগ অনন্ত অঙ্গ হলেও উজ্জ্বলনীলমণি-কার তারও চারিটি ভাগ করেছেন: সংক্ষিপ্ত, সঙ্কীর্ণ, সম্পন্ন এবং সমৃদ্ধিমান। রূপগোস্বামী এই আটটি রসকে আবার আট ভাগ করে চৌষট্টি রসের পরিচয় দিয়েছেন। বৈষ্ণব কীর্তন পদাবলীর প্রতি লক্ষ্যরেখে এখানে বিপ্রলম্ভের মুখ্য চারটি ভাগের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল।

বিপ্রলম্ভ

'ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে'। উ, নী. শৃঙ্গারভেদ ৪॥

বিপ্রলম্ভ ছাড়া সম্ভোগের পুষ্টি সম্ভব হয় না। একথা বৈষ্ণব ধর্মসাধনার রসবিচারের ক্ষেত্রে শুধু সত্য নয়,—মানবীয় প্রেমরস বিচারেরও মর্মকথা।

যূনোরযুক্তয়োর্ভাবো যুক্তয়োর্বাথ যো মিথঃ।
অভীষ্টালিঙ্গনাদীনাম ন বাপ্তৌ প্রকৃষ্যতে।
স বিপ্রলম্ভোবিজ্ঞেয়ঃ সম্ভোগোন্নতি কারকঃ॥

উ. নী, শৃঙ্গারভেদ। ৩॥

'মিলনের পূর্বে বা পরে পরস্পর অনুরক্ত নায়ক-নায়িকার চুম্বন আলিঙ্গনাদির অপ্রাপ্তিতে যে ভাব জাগে তাকেই বিপ্রলম্ভ বলে। এই বিপ্রলম্ভ হল সম্ভোগের উন্নতিকারক।'

পূর্বরাগ

রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্বং দর্শনশ্রবণাদিজা।
তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্বরাগঃ স উচ্যতে॥

উ. নী, শৃঙ্গাভেদ ৫॥

১। পূর্বরাগস্তথা মানঃ প্রেমবৈচিত্র্যমিত্যপি
প্রবাসশ্চেতি কথিতো বিপ্রলম্ভশ্চতুর্বিধঃ। উ. নী. শৃঙ্গারভেদ ৪॥

'মিলনের পূর্বে দর্শনাদির দ্বারা নায়ক-নায়িকার চিত্তে উদ্বুদ্ধ রতি যখন বিভাবাদি সংযোগে আস্বাদনীয় হয়, তাকে পূর্বরাগ বলে।'

শাস্ত্রবিধি মানতে হলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই পূর্বরাগ বর্ণনা প্রথম দেওয়া উচিত। তবু চারুতার খাতিরে মৃগাক্ষীদের বর্ণনাই প্রাধান্য পেয়ে থাকে। আধুনিক সভ্যতায়ও Ladies First নীতির সমাদর দেখতে পাওয়া যায়। পূর্বারাগের নায়িকা মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগল্‌ভা—তিন রকম হতে পারে। নায়িকার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে নায়িকা বাচিক, আঙ্গিক বা চাক্ষুস যে ভঙ্গিপ্রকাশ করেন তাকে আলঙ্কারিক ভাষায় অভিযোগ বলা হয়। পূর্বরাগের অপ্রাপ্তিতে ব্যাধি, শঙ্কা, অসূয়া, শ্রম, ক্লম (ক্লান্তি), নির্বেদ, ঔৎসুক্য, দৈন্য, চিন্তা, নিদ্রা, প্রবোধ, বৈয়াগ্র্য, জড়তা, উন্মাদ, মোহ, মৃত্যু পর্যন্ত সঞ্চারীভাব সকল প্রকাশ পেতে পারে।

সাধারণী পূর্বারাগের (অর্থাৎ ভূশক্তির প্রতীক অসুরাক্রান্তা পৃথিবীরূপিণী) নায়িকা কুব্জা মথুরার সাধারণ রমণী।—কংসের মাল্যোপজীবিণীরূপে বন্দিনী। রাজপথে কৃষ্ণকে দেখে কংসের ভয় উপেক্ষা করে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

সাধারণী পূর্বরাগ

সমঞ্জসা পূর্বরাগের (অর্থাৎ মঙ্গলরূপিণী শ্রীশক্তি) নায়িকা রুক্মিণী সত্যভামা ও অন্যান্য মহিষীবর্গ কুলধর্ম রক্ষা করে দয়িতরূপে বিবাহবন্ধনে শ্রীকৃষ্ণকে পাবার জন্যে ইচ্ছুক হয়েছিলেন। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, সমঞ্জসা নায়িকার অভিসার নেই,—থাকা সম্ভবও নয়।

সমঞ্জসা পূর্বরাগ

সমর্থা বা প্রৌঢ়া পূর্বরাগের (অর্থাৎ সাধনরূপিণী লীলাশক্তির) নায়িকা শ্রীরাধা জেনেছিলেন কৃষ্ণ একমাত্র তাঁর।—সুতরাং কৃষ্ণকে দান করবার অন্য কারও শক্তি নেই। নারীধর্ম, কুলধর্ম, গৃহধর্ম, দেহধর্ম—সর্বধর্ম ত্যাগ করে তিনি কৃষ্ণেরই জন্যে কৃষ্ণকে ভালবেসেছিলেন।—এই রতিই রাগাত্মিকারতি। অন্যান্য গোপীরাও শ্রীরাধার অংশরূপে কৃষ্ণকে ভালবেসেছেন। এই ভালবাসায় মিলনের অপ্রাপ্তিতে দশ দশার কথা বলা হয়েছে। যথা,—লালসা, উদ্বেগ, জাগর্য্যা, তানব (শরীরের কৃশতা), জড়িমা (ইষ্টানিষ্ট জ্ঞানলুপ্তি), বৈয়গ্র্য, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ (চিত্তের বৈপরীত্য) এবং মৃত্যু। বৈষ্ণব মহাজনেরা সমর্থারতির নায়িকার পূর্বরাগেরই সবিশেষ বর্ণনা দিয়েছেন —এবং এই দশ দশারই কমবেশী চিত্রে এঁকেছেন।

সমর্থা পূর্বরাগ

মান

স্নেহস্তূৎকৃষ্টতাব্যাপ্ত্যা মাধুর্য্যং মানয়ন্নবম্।
যো ধারয়ত্যদাক্ষিণ্যং স মান ইতি কীর্ত্ত্যতে ॥

মান

উ. নী. স্থায়ি ৭১ ॥

স্নেহের উৎকর্ষে হয় মাধুর্য নূতন।
তাথে অদাক্ষিণ্যে মান কহে বুধগণ ॥

পরস্পর অনুরক্ত এবং একত্রে অবস্থিত নায়ক-নায়িকার দর্শন-আলিঙ্গনাদির নিরোধক মান।[১] যেখানে প্রণয় আছে, সেখানে মানও আছে। মানের কারণ ঈর্ষা।—কারণ থাকলে সহেতু মান। আর কারণবিহীন মানও হতে পারে।—তাকে নির্হেতু মান বলে। নির্বেদ, শঙ্কা, ক্রোধ, চাপল্য, গর্ব, অসূয়া, ভাব-গোপন, গ্লানি এবং চিন্তা মানের পরিচায়ক। চরিতামৃতকার শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে বলিয়েছেন,—

প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভৎসন।
বেদস্তুতি হৈতে তাহা হরে মোর মন ॥

মানের প্রসঙ্গে অভিসার প্রসঙ্গ,—এবং সেইসঙ্গে বিভিন্ন পর্যায়ের নায়িকা প্রসঙ্গ এসে পড়ে। বৈষ্ণব রসতত্ত্বে এবং কীর্তন পদাবলীতে অভিসার বর্ণনা বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে। অভিসার হ'ল, পূর্বনির্দিষ্ট সংকেতকুঞ্জে, লোক-চক্ষুর আড়ালে নায়ক-নায়িকার মিলন। ভক্ত শ্রীরাধা ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ মিলনের আধ্যাত্মিক অর্থ হ'ল, প্রাকৃত লোকদৃষ্টির আড়ালে অলৌকিক ভাবমিলন-কুঞ্জে পরস্পরের মানসবিহার। এই অভিসারে ভগবান ও ভক্ত উভয়েরই পরম আগ্রহ। প্রথম ভক্তকে ভগবানই ঘরের বার করেন,—প্রাকৃত জীবন-গণ্ডীর বাইরে ভগবৎ প্রেম-মিলনের পথে টেনে আনেন। যদি প্রাকৃত জীবন সংস্কারের মোহ কাটিয়ে ভক্ত সময় মত ভগবানের সঙ্গে মিলনের জন্যে না বেরোতে পারে—ভগবান নিজেই এসে আহ্বান বা সংকেত করেন। অনিত্যের বন্ধন কাটিয়ে ভক্তকে আপন প্রেমের ক্ষেত্রে টেনে আনাই অভিসারের অধ্যাত্ম অর্থ।

অভিসার

বৈষ্ণবকাব্যে অষ্টনায়িকার উল্লেখ আছে। তার মধ্যে ছয়টি নায়িকাবর্ণনা মানের পর্যায়ভুক্ত। বাকী একটি হ'ল প্রবাস নায়িকা, অপরটি সম্ভোগের

১। দম্পত্যোর্ভাব একত্র সতোরপ্যনুরক্তয়োঃ।
স্বাভীষ্টাশ্লেষবীক্ষাদিনিরোধী মান উচ্যতে ॥ উ. নী. মান। ৩১ ॥

নায়িকা। নায়িকা নিজে অভিসার করলে, বা নায়ককে অভিসার করালে, তাঁকে 'অভিসারিকা' বলে। নায়কের সংকেতমতো নায়িকা অভিসার করলেন, বাসক সজ্জায়[২] কুঞ্জসাজিয়ে নিজে প্রসাধন করে অপেক্ষা করলেন—এই নায়িকার নাম 'বাসকসজ্জিকা'। প্রিয়তমের আগমনে বিলম্ব হলে নায়িকার মনের যে অবস্থা হয় তাকে 'উৎকণ্ঠিতা' বলে। সংকেত করেও প্রিয়তম কেন এলেন না,—এই খেদকারিণী হলেন 'বিপ্রলব্ধা'। বৃথা প্রতীক্ষায় রাত্রি প্রভাত হল; প্রভাতে নায়ক এসে কুঞ্জে দেখা দিলেন, অঙ্গে তাঁর প্রতিনায়িকার কুঞ্জে নিশিযাপনের বিলাসচিহ্ন। নায়িকার তখন যে মানসিক অবস্থা তাকে 'খণ্ডিতা' বলে।

অষ্টনায়িকা

কলহ করে নায়িকা নায়ককে তখন তাড়িয়ে দিলেন, পরক্ষণেই মনে অনুতাপ এলো। সেই নায়িকার নাম 'কলহান্তরিতা'। এই হল মানের ছয় নায়িকা। নায়ককে নায়িকা যদি সম্পূর্ণ আয়ত্বে নিজের কাছে রাখতে পারেন, তাঁকে 'স্বাধীনভর্তৃকা' বলে। ইনি সম্ভোগের মিলনের নায়িকা। নায়ক যখন দূর বিদেশে চলে যান, বিরহিনী প্রতীক্ষারতা নায়িকাকে 'প্রোষিতভর্তৃকা' বলে। ইনি মাথুরের,—প্রবাসের নায়িকা।

প্রেমবৈচিত্ত্য

প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবতঃ।
যা বিশ্লেষধিয়ার্তিঃ স্যাৎ প্রেমবৈচিত্ত্যমিষ্যতে॥
উ. নী: প্রেমবৈচিত্ত্য ৫৭॥

প্রিয়ের নিকটে রহে প্রেমের স্বভাবে।
প্রেমবৈচিত্ত্যহেতু বিরহ করি ভাবে॥

প্রেমের নিবিড়তায়,—প্রেমের অসীমতায় প্রিয় নিকটে থাকলেও প্রেমিকার সন্দেহ জাগে বুঝি প্রিয়তমকে হারিয়ে ফেলেছেন। এই হল প্রেমবৈচিত্ত্যের অনুভূতি।

'আক্ষেপানুরাগ' প্রেমবৈচিত্ত্যেরই অংশবিশেষ। রাধিকার আক্ষেপ সব কিছুর জন্য। কৃষ্ণের প্রতি, মুরলীর প্রতি, আপনার প্রতি, সখীদের প্রতি, দূতীর প্রতি, বিধাতার প্রতি, কন্দর্পের প্রতি, গুরুজনের প্রতি, যৌবনের প্রতি—কার প্রতি আক্ষেপ নেই শ্রীরাধার!—কেহ যে

আক্ষেপানুরাগ

২। প্রিয়তমের সহিত মিলন প্রত্যাশায় দেহ ও গেহ সজ্জিত করে নায়িকার প্রতীক্ষাকে বাসকসজ্জা বলে।

আপনার হয় না।—এমনি নিজের পোড়া মনও রাধার বশে নেই।—ইন্দ্রিয়গুলি পর্যন্ত বিদ্রোহ করেছে। এই আত্ম আক্ষেপের সুমিষ্ট গঞ্জনার আড়ালে কৃষ্ণের প্রতি যে গভীর অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে, তাতেই কাব্যমাধুর্য ফুটে উঠেছে

প্রবাস

পূর্বসঙ্গতয়োর্যূনোর্ভবেদ্দেশান্তরাদিভিঃ।
ব্যবধানন্তু যৎ প্রাজ্ঞৈঃ স প্রবাস ইতীর্য্যতে॥

উ. নী. প্রবাস ৬০॥

পূর্ব সম্মিলিত নায়ক-নায়িকার যে দেশ গ্রাম বন ইত্যাদির ব্যবধান, পণ্ডিতেরা তাকে প্রবাস বলেছেন। পদাবলীগানে নায়কেরই প্রবাস বর্ণিত হয়েছে।

প্রবাস অদূর এবং সুদূর দু-রকমের হতে পারে। কালীয়দমন, গোচারণ, নন্দ-মোক্ষণ এবং রাসে অন্তর্ধান অদূর প্রবাসের নিদর্শন। বৃন্দাবন ছেড়ে শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমন সুদূর প্রবাসের নিদর্শন।—এই অংশকে 'মাথুর' বলা হয়। পদাবলীতে মাথুর পর্যায়ে উৎকৃষ্ট বহুপদ লিখিত হয়েছে।

অদূর ও সুদূর প্রবাস

সম্ভোগ আগেই বলেছি বৈষ্ণব কবিরা সম্ভোগ বা মিলনের প্রতি বেশী গুরুত্ব দেননি। উজ্জ্বলনীলমণিতে সম্ভোগের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে,—

দর্শনালিঙ্গনাদীনামানুকূল্যান্নিষে [illegible]।
যুনোরুল্লাসমারোহন্ ভাবঃ সম্ভো[illegible] ইর্য্যতে॥ উ. নী. সম্ভোগ ৪॥

দর্শন ও আলিঙ্গনাদির আনুকূল্যহেতু নায়ক-নায়িকার যে ভাবোল্লাস তাকে সম্ভোগ বলে।

মুখ্য ও গৌণ ভেদে সম্ভোগ দুরকমের। জাগ্রত অবস্থায় মিলনজনিত যে ভাবোল্লাস তাকে মুখ্য সম্ভোগ বলে। স্বপ্নাবস্থায় কল্প-মিলনকে গৌণ সম্ভোগ বলে।

মুখ্য ও গৌণ সম্ভোগ

মুখ্যসম্ভোগের আবার চারটি ভাগ সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ, সম্পন্ন এবং সমৃদ্ধিমান। সংক্ষিপ্ত সম্ভোগে পূর্বরাগের পর স্বল্পকালীন মিলন ঘটে। সংকীর্ণ সম্ভোগে মানের পর মিলন ঘটে। সম্পন্ন সম্ভোগে স্বল্পকালীন প্রবাসের পর মিলন ঘটে। আর সমৃদ্ধিমান সম্ভোগে দূরপ্রবাসের পর মিলনচিত্র পাওয়া যায়। ক্রমপর্যায়ে সংক্ষিপ্ত অপেক্ষা সংকীর্ণ, তদপেক্ষা সম্পন্ন এবং সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধি[illegible]ান সম্ভোগের উল্লাস অধিকতর।

সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ

পদাবলীতে ভাবমিলনের পদ পাওয়া যায়। উন্মাদিনী রাই মাথুর বিরহে বাহ্যসম্বিত হারিয়ে কল্পনায় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের আনন্দে বিভোর হয়েছিলেন।

ভাবসম্মিলন

—এই হল ভাবসম্মিলন। তত্ত্বব্যাখ্যায় বলা যায়, নরলীলায় বৃন্দাবন থেকে শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় চলে গেলেন। ভাববৃন্দাবনে শ্রীরাধার সঙ্গে তিনি অচ্ছেদ্যমিলনে আবদ্ধ ছিলেন,—সেই কল্পনা থেকে ভাবসম্মিলন চিত্রের উদ্ভব

বৈষ্ণব রসতত্ত্বের আলোচনা শেষ করবার পূর্বে পদাবলীর পরকীয়া নায়িকারূপ কল্পনা সম্পর্কে দু-একটি কথা বলা যেতে পারে। পরকীয়া নায়িকারূপের দার্শনিক ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, পার্থিব জীবনপ-রিবেশের মোহ কাটিয়ে ভগবানের

পরকীয়া তত্ত্ব

প্রেমাকর্ষণে ভক্তকে তাঁর উদ্দেশে ছুটতে হয়। ঘর-সংসার, প্রাকৃত জীবনের বিকৃত সকল প্রেমমোহ কাটিয়ে, তাকে লৌকিক চেতনার সর্বস্বই ত্যাগ করে কৃষ্ণের অভিসারে যাত্রা করতে হয়।—সেজন্যেই বৃন্দাবন রাসলীলার গোপীরা পরকীয়া। একদিকে মোহময় বাস্তব সংসার-চেতনার টান,—অপরদিকে ভগবানের প্রেমাকর্ষণ।—এ দুয়ের দ্বন্দ্ব ধীরে ধীরে কেটে গিয়ে রাধা সর্বাংশে কৃষ্ণপ্রেমিকা হয়ে ওঠেন,—সেই তত্ত্বই নাকি পরকীয়া নায়িকার তত্ত্ব।

রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পরকীয়ার মধ্যে মানবমনের আর এক নিগূঢ় চেতনাকে

রবীন্দ্র অভিমত

আবিষ্কার করেছেন। তাঁর মতে, মানুষের সমাজ-শৃঙ্খলার খাতিরে যে স্বাধীন প্রেমকে স্বীকার করতে পারেনি, ধর্মীয় সাহিত্যের পরকীয়া প্রেমগীতিতে তারই স্ফূর্তি দেওয়া হয়েছে। বাস্তব জীবনের অপূর্ণ প্রেমতৃষ্ণাকে মানসবিলাসের মধ্যে রূপায়িত করা হয়েছে।

উপরোক্ত দুটি ব্যাখ্যাই তাদের স্বকীয় ক্ষেত্রে সত্য। তবু পাঠকমনে প্রশ্নের অবকাশ থেকে যায়,—এই পরকীয়া রূপক,—গোপন দুরূহ অভিসারের রূপকছবি বৈষ্ণব মহাজনেরা পেলেন কোথায়? যা জীবনের অভিজ্ঞতায় মেলেনা কবিকল্পনায় তা রূপ নেবে কি ভাবে? এই পরকীয়া অভিসার-কল্পনায় প্রাচীন ভারতীয় পরকীয়া প্রেম সম্পর্কেরই ইঙ্গিত দিচ্ছে। এখানে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের একটি তথ্যনির্ভর অভিমত আমাদের অনুমানের সমর্থনে উদ্ধৃত করছি,—

ডঃ শশিভূষণ দাশ-গুপ্তের অভিমত

'ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই, আভীর জাতির মধ্যে যখন গোপাল-কৃষ্ণের প্রেমলীলা প্রচলিত ছিল তখন কন্যা গোপীগণ এবং পরোঢ়া গোপীগণের সহিত

তাঁহার প্রেমলীলায় কাহিনীই প্রচলিত থাকা স্বাভাবিক ; কারণ পৃথিবীতে যত প্রেমগীতি রচিত হইয়াছে, বিশুদ্ধ দাম্পত্য লীলা লইয়া তাহার কোথাও স্ফূর্তি নাই। বিশেষতঃ রাধালিয়া সঙ্গীত দাম্পত্য প্রেম লইয়া না হইবারই সম্ভাবনা। এই কারণেই কৃষ্ণপ্রণয়িনী গোপীগণ অন্য গোপের কন্যা বা স্ত্রীরূপেই বর্ণিতা। প্রধানা গোপিনী রাধিকার আমরা সাহিত্যে যখন হইতে আবির্ভাব দেখিতে পাইলাম, তখন হইতে তাহাকে পরোঢ়া গোপীরূপেই দেখিতে পাই। ..'কবীন্দ্র-বচন সমুচ্চয়ে' রাধা প্রেমের কবিতাকে অসতীব্রজ্যার ভিতরেই গ্রহণ করা হইয়াছে। পরবর্তীকালের সংগ্রহেও কুলটা প্রেমের দৃষ্টান্তরূপে রাধা-প্রেমের কবিতার উল্লেখ পাই'।

[শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ : দশম অধ্যায় পৃ ২৪৯-৫০। ১৩৭০ ॥]

পরকীয়া প্রেমাভিসার চিত্র কালিদাসের কাব্যেও রয়েছে।—প্রাচীন অন্যান্য সংগ্রহগ্রন্থেও (বিশেষ করে অমরুসতেক, কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয়, সদুক্তিকর্ণামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে) রয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষ লৌকিক প্রেম নির্ভর আখ্যায়িকা থেকেই পরকীয়া নায়িকা কল্পনা বৈষ্ণব ধর্ম-সাহিত্যের ব্রজলীলা আখ্যায়িকায় প্রবেশ করেছে।—একদিক থেকে দেখতে গেলে সমগ্র বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যই মানবীয় প্রেমরোমান্সের অলৌকিক ভাবনির্যাস। সুতরাং কবিরাজগোস্বামী যখন বলেন,—

পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজবিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস ॥
ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি।
তার মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি ॥ [চৈ. চ. আদি.৪ প]

এই ব্রজলীলায় পরকীয়া 'রসোল্লাস' মানবীয় প্রেমরসোল্লাসেরই ভাববৃন্দাবন-লীলায় এক বিশিষ্ট রূপক সামগ্রী হয়ে ওঠে।

পদাবলীর নায়ক : শ্রীকৃষ্ণ

পদাবলীর নায়ক অনন্তশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর প্রধান তিনশক্তি চিৎশক্তি, মায়াশক্তি এবং জীবশক্তি। এই তিন শক্তিকে অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা এবং তটস্থা হয়।—অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। স্বরূপশক্তির তিনরূপে হ্লাদিনী চিদানন্দময়ী।

আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সংবিৎ যারে জ্ঞান করি মানি ॥ [চৈ, চ, মধ্যঃ ৮ প]

'আহ্লাদিনী' শক্তিদ্বারে শ্রীকৃষ্ণ রাধারূপের মাধ্যমে আনন্দ চিন্ময় প্রেম রসাস্বাদ গ্রহণ করেন।

নায়ক: অনন্ত শক্তিমান শ্রীকৃষ্ণ

ভাগবতপুরাণের দশম স্কন্ধে রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণের নায়করূপের বর্ণনা রয়েছে।—'মস্তকে ময়ূরপুচ্ছ শোভিত চূড়া, কর্ণদ্বয়ে কর্ণিকার, পরিধানে স্বর্ণবরণ পীত বসন, গলায় বৈজয়ন্তীমালা, ব্রজবালকেরা তাঁকে ঘিরে কীর্তিগান করছে। নটবর শ্রীকৃষ্ণ অধর-সুধায় মুরলীরন্ধ্র ধ্বনিত করে আপন পদচিহ্ন শোভিত বৃন্দারণ্যে প্রবেশ করেছেন।'

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিসং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ-
র্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্ গীতকীর্তিঃ ॥

নায়কের গুণ-পরিচয়

পদাবলীর নায়ক শ্রীকৃষ্ণ চির কিশোর।—তিনি সুরম্য, মধুর, প্রিয়ভাষী, বুদ্ধিমান, বিদগ্ধ, প্রেমবশ্য, রমণী-মনোহারী, নিত্যনব, ধীর, গম্ভীর, বলীয়ান, কীর্তিমান, কেলিসৌন্দর্যময়, শ্রেষ্ঠ বংশীবাদক।—তাঁর আরও অসংখ্য গুণাবলীর পরিচয় দেওয়া হয়েছে। পৃথিবীতে রূপে গুণে তার সমকক্ষ কেউ নয়। চতুর্বিধ নায়ক লক্ষণ হল: ধীর ললিত, ধীর শান্ত, ধীরোদ্ধত, ধীরোদাত্ত। শ্রীকৃষ্ণ প্রধানতঃ ধীরললিত নায়ক[1],—তবে তিনি সর্বনায়কের চূড়ামণি। চতুর্বিধ নায়কের সব গুণই তার মধ্যে রয়েছে। নায়কের পতি উপপতি ভেদ রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের দুই রূপই পাওয়া যায়। ঔপপত্যে তাঁর শ্রীরাধার প্রতি অনুকূলতা দেখানো হয়েছে। নায়ক প্রকরণে আরও সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম বিভাগ রয়েছে। সে জটিলতায় প্রবেশের আর আবশ্যকতা নেই।

শ্রীকৃষ্ণ আপন প্রেমরসাস্বাদনের জন্যেই ব্রজলীলায় আপন শক্তি অংশে গোপীদের এবং গোপীশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধার আবির্ভাব ঘটিয়েছিলেন। দ্বাপরে

১। বিদগ্ধো নবতারুণ্যঃ পরিহাস বিশারদঃ। নিশ্চিন্তো ধীরললিতঃ স্যাৎ প্রায়ঃ প্রেয়সীবশঃ॥ [ভক্তিরসামৃত সিন্ধু. বিভাবলহরী] যে পুরুষ বিদগ্ধ (চতুর), নবযুবা, পরিহাসদক্ষ, নিশ্চিন্ত (চিন্তারহিত) ও প্রেয়সীবশ, তাহারই নাম ধীর ললিত।

মর্তলীলায় সেই লীলারসাস্বাদ ও কৌতুহলের পূর্ণ নিবৃত্তি না ঘটায় আবার বহিরঙ্গে রাধার রূপলাবণ্য নিয়ে এইযুগে নবদ্বীপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপে এসেছিলেন সে কাহিনী পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে।

পদাবলীর নায়িকা: শ্রীরাধা

পদাবলীর নায়িকা কৃষ্ণপ্রিয়াদের অগ্রগণ্যা শ্রীরাধা। রূপগোস্বামী কৃষ্ণবল্লভাদের স্বকীয়া এবং পরকীয়া দুই শ্রেণীভাগে ভাগ করেছেন। যাঁরা রূপে-গুণে কৃষ্ণতুল্যা, যাঁরা অপরিসীম প্রেম ও মাধুর্য সম্পদে সর্বদেশে ও সর্বকালে দেব-মানবের অগ্রবর্তিনী, তাঁরাই কৃষ্ণবল্লভা। 'কৃষ্ণের বিবাহিতা, পতি-আদেশ-তৎপরা, পাতিব্রত্যে অবিচলা স্ত্রীগণ হলেন স্বকীয়া।'—এঁদের মধ্যে রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী, কালিন্দী, শৈব্যা, কৌশল্যা ও মাদ্রী হলেন প্রধানা।—এঁদের মধ্যেও ঐশ্বর্যে রুক্মিণী, সৌভাগ্যে সত্যভামা অগ্রগণ্যা।

শ্রীরাধা: অগ্রগণ্যা কৃষ্ণপ্রিয়া

অত্যধিক কৃষ্ণাসক্তি বশতঃ যে রমণীরা ইহ-পরলোক চিন্তা না করে কৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করেন তারাই পরকীয়া। ব্রজগোপীরা ছিলেন পরকীয়া। পরকীয়াদেরও কন্যা ও পরোঢ়া—দুই ভাগ করা হয়েছে। মুগ্ধাগুণান্বিত, পিতৃ-গৃহস্থিতা অবিবাহিতা কৃষ্ণাসক্ত ব্রজকুমারীরা হলেন কন্যা। গোপ-বিবাহিতা কৃষ্ণাসক্তা ব্রজগোপীরা হলেন পরোঢ়া। পরোঢ়াদের সাধনপরা, দেবী এবং নিত্যপ্রিয়া—তিন শ্রেণীভাগ আছে। শ্রীরাধা, চন্দ্রাবলী, বিশাখা, ললিতা প্রভৃতি কয়েকজন হলেন নিত্যপ্রিয়া। শ্রীরাধা সহ অষ্টগোপীকে যূথেশ্বরী বলা হয়।—তাঁদের মধ্যেও রাধা ও চন্দ্রাবলীর প্রাধান্য।—এই দুয়ের মধ্যেও শ্রীরাধার উৎকর্ষ। রাধার প্রেমে আত্মসুখেচ্ছার লেশমাত্র ছিল না, কৃষ্ণসুখৈক তাৎপর্য। চন্দ্রাবলীর কৃষ্ণপ্রীতির মধ্যে আত্মপ্রীতির লেশমাত্র আভাস ছিল।

পরকীয়া: কন্যা ও পরোঢ়া

শ্রীরাধাকে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই প্রেমসুধাস্বাদনের জন্য হ্লাদিনী শক্তি অংশে সৃষ্টি করেছেন। কবিরাজ গোস্বামী রায় রামানন্দের মুখে মহাভাবরূপা রাধাঠাকুরাণীর যে স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন এখানে সেই অংশটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে।—

রাধাঠাকুরাণীর স্বরূপ ব্যাখ্যা

কবিরাজ গোস্বামী

কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম আহ্লাদিনী।
সেই শক্তিদ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি ॥

সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥
হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম।
আনন্দ চিন্ময় বস প্রেমের আখ্যান॥
প্রেমেব পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাব-রূপা রাধা-ঠাকুরাণী॥
প্রেমেব স্বরূপ দেহ প্রেম বিভাবিত।
কৃষ্ণের প্রেয়সীশ্রেষ্ঠা জগতে বিদিত॥
সেই মহাভাব হয় চিন্তামণিসার।
কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য যার॥
মহাভাব-চিন্তামণি বাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখী যাঁর কায়ব্যূহরূপ॥[১]
বাধাপ্রতি কৃষ্ণস্নেহ সুগন্ধি উদ্বর্তন।[২]
তাতে অতি সুগন্ধি দেহ উজ্জ্বলবরণ॥
কারুণ্যামৃত ধাবাব[৩] স্নান প্রথম।
তারুণ্যামৃত ধাবায়[৪] স্নান মধ্যম॥
লাবণ্যামৃত ধারায়[৫] তদুপরি স্নান।
নিজলজ্জা শ্যাম পট্টশাড়ী পরিধান॥
কৃষ্ণ অনুবাগে বক্ত দ্বিতীয় বসন।
প্রণয়মান কঞ্চুলিকায় বক্ষ-আচ্ছাদন॥
সৌন্দর্য কুঙ্কুম সখী প্রণয় চন্দন।
স্মিতকান্তি কর্পূর তিন অঙ্গে বিলেপন॥
কৃষ্ণের উজ্জ্বলরস মৃগমদ ভর।
সেই মৃগমদে বিচিত্রিত কলেবর॥

১। কায়ব্যূহরূপ—একসময় বহু কাজ করার জন্য নিজেকে বহুসংখ্যায় প্রকাশরূপ।

২। উদ্বর্তন—স্নানপূর্ব অঙ্গানুলেপন।

৩। কারুণ্যামৃতধারা—নদীধাবায় প্রাতঃস্নান। শ্রীবাধার পাদস্পর্শে করুণাধারা প্রবাহিত।

৪। তারুণ্যামৃতধারা—মধ্যাহ্নস্নান। নবতারুণ্যে শ্রীরাধার দেহ মণ্ডিত।

৫। লাবণ্যামৃতধাবা—সায়ং স্নান।—উজ্জ্বল লাবণ্যের তরঙ্গে দেহ পরিপূর্ণ।

প্রচ্ছন্ন মান বাম্য ধম্মিল্ল বিন্যাস।[৬]
ধীরাধীরাত্মক গুণ[৭] অঙ্গে পট্টবাস ॥
রাগ তাম্বুলরাগে অধর উজ্জ্বল।
প্রেম কৌটিল্য নেত্রযুগলে কজ্জল ॥
সুদীপ্ত সাত্ত্বিক ভাব[৮] হর্ষাদি সঞ্চারী।[৯]
এই সব ভাবভূষণ প্রতি অঙ্গে ভরি ॥
কিলকিঞ্চিতাদি ভাব বিংশতি ভূষিত।[১০]
গুণশ্রেণী পুষ্পমালা সর্বাঙ্গে পূরিত ॥
সৌভাগ্য তিলক চারু ললাটে উজ্জ্বল।
প্রেম-বৈচিত্র্য-রত্ন হৃদয়ে তরল ॥
মধ্যবয়স্থিতা সখী-স্কন্ধে কর ন্যাস।
কৃষ্ণলীলা মনোবৃত্তি সখী আশ পাশ ॥
নিজাঙ্গ সৌরভালয়ে গর্ব-পর্যঙ্ক।
তাতে বসিয়াছে সদা চিন্তে কৃষ্ণসঙ্গ ॥
কৃষ্ণনাম-গুণযশ অবতংশ কানে।
কৃষ্ণনাম গুণযশ প্রবাহ বচনে ॥
কৃষ্ণকে করায় সোমরস মধুপান।
নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্বকাম ॥

৬। প্রচ্ছন্নমান বাম্য ধম্মিল বিন্যাস—প্রচ্ছন্ন মানরূপ বক্রতা শ্রীরাধার কুটিল কবরী বিন্যাস স্বরূপ।

৭। মধ্যা ও প্রগল্‌ভার তিন প্রকারভেদ: ধীরা, অধীরা, ধীরাধীরা। শ্রীরাধা যে গন্ধচূর্ণ ব্যবহার করেন তার ধীরাধীরাত্মক গুণ।

৮। সুদীপ্ত সাত্ত্বিক ভাব—কৃষ্ণভাবাক্রান্ত চিত্তকে সত্ত্ব বলে।—তার থেকে জাত ভাব সাত্ত্বিক। স্তম্ভ, স্বেদ ইত্যাদি সাত্ত্বিকভাব।

৯। হর্ষাদি সঞ্চারী—মূলভাবের পরিপুষ্টির জন্যে সঞ্চারীভাবের যাওয়া-আসা। ত্রিশটি সঞ্চারী ভাবের উল্লেখ আছে বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে।

১০। কিলকিঞ্চিতাদি ভাব বিংশতি ভূষিত—বিংশতি অনুভাবের অন্যতম। গর্ব, অভিলাষ, রোদন, হাস্য, অসূয়া, ভয়, ক্রোধ, হর্ষের একত্র সমাবেশে কিলকিঞ্চিত ভাবের উদয় হয়। সখীদের সম্মুখে কৃষ্ণ রাধার অঙ্গস্পর্শ করলে,—অথবা দানঘাটে পথরোধ করলে শ্রীরাধার মনে হর্ষাতিশয্যেগর্বাদি অপর সপ্তভাবেরও সমাবেশ ঘটে।

কৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেম রত্নের আকর।
অনুপম গুণগণে পূর্ণকলেবর ॥

[চৈ. চ. মধ্য : ৮ প.]

রূপগোস্বামী শ্রীরাধার রূপগুণ বর্ণনায় বলেছেন এই বৃষভানুনন্দিনী সুষ্ঠুকান্তস্ব-রূপা, ধৃতষোড়শ-শৃঙ্গারা এবং দ্বাদশাভরনাশ্রিতা। সুষ্ঠুকান্ত-স্বরূপার লক্ষণে বলা হয়েছে, যে রাধার রূপোৎসবে ত্রিভুবন বিধূনিত হয় সেই রাধার কেশদাম সুকুঞ্চিত, দীর্ঘ নয়নযুক্ত মুখখানি চঞ্চল, কঠোর কুচদ্বয়ে বক্ষঃস্থল সুদৃশ্য, মধ্যদেশ ক্ষীণ, স্কন্ধদেশ অবনমিত, হস্তযুগল নখরত্নশোভিত!

শ্রীরাধার রূপগুণ বর্ণনা

ষোড়শ শৃঙ্গার বর্ণনায় বলা হয়েছে, শ্রীরাধা সায়ংস্নাতা, তাঁর পরিধানে নীলবসন, কটিতটে নীবী, মস্তকে বদ্ধবেণী, চিকুরে কুসুমস্তবক, কর্ণে উত্তংশ, নাসাগ্রে মণিরাজ, কণ্ঠে মাল্য, বদনকমলে তাম্বূল, নয়নযুগলে কজ্জল, চিবুকে কস্তূরীবিন্দু, গণ্ডে মকরীপত্রভঙ্গাদি, ললাটে তিলক, অঙ্গে চন্দন, করকমলে লীলাকমল এবং চরণে অলক্তকরাগ। তাঁর দ্বাদশ আভরণ বর্ণনায় বলা হয়েছে, চূড়ায় মণীন্দ্র, কর্ণে স্বর্ণকুণ্ডল, নিতম্বে কাঞ্চী, কণ্ঠে কণ্ঠাভরণ, গলদেশে নক্ষত্রনিন্দি হার, ভুজে অঙ্গদ, করে বলয়, অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয়ক, চরণে রত্নময় নূপুর, পদাঙ্গুলিতে তুঙ্গ অঙ্গুরীয়ক।

শ্রীরাধার অনন্তগুণরাশির মধ্যে রূপগোস্বামী প্রধান কয়েকটির উল্লেখ করেছেন। মধুরা নবয়বা (মধ্য কৈশোরস্থিতা), চপলাপাঙ্গী (চঞ্চল কটাক্ষময়ী), উজ্জ্বলস্মিতা (ঈষৎ হাস্যময়ী), চারুসৌভাগ্য রেখাঢ্যা (হস্তপদে সৌভাগ্যরেখাযুক্তা), গন্ধোন্মাদিতমাধবা (যার অঙ্গপরিমলে মাধব উন্মত্ত), সঙ্গীতপ্রসরাভিজ্ঞা (যার গানে স্থাবরজঙ্গম মুগ্ধ), রম্যবাক, নর্মপণ্ডিতা (বচনে ও আচরণে সুদক্ষা), বিনীতা, করুণাপূর্ণা, বিদগ্ধা (সুরসিকা), পটবান্বিতা (চাতুর্যশালিনী), লজ্জাশীলা, সুমর্যাদা, ধৈর্যগাম্ভীর্যশালিনী, সুবিলাসা, মহাভাবপরমোৎকর্ষ তোষিনী, গোকুল-প্রেমবসতি (গোকুলবাসীদের প্রীতিপাত্রী), জগচ্ছ্রেণীলসদ্‌যশা (যার যশে জগৎ ব্যাপ্ত), গুর্বর্পিতগুরুস্নেহা (গুরুজনের স্নেহপাত্রী), সখিপ্রণয়িতাবশা, কৃষ্ণপ্রিয়াবলী মুখ্যা, সন্ততাশ্রবকেশবা (সর্বদা কেশব যার আজ্ঞাধীন) প্রভৃতি।

শ্রীরাধার এই রূপসৌন্দর্য, ষোড়শশৃঙ্গার, দ্বাদশ আভরণ ও প্রেমগুণাবলীর যে বর্ণনা দিয়েছেন সেখানে প্রাচীনভারতীয় প্রেমিকারূপেরই কৃষ্ণাসক্ত নূতন চিত্ররূপ দেখতে পাওয়া যায়। বাৎসায়ন কামসূত্রে যে শৃঙ্গারচিত্রাবলীর নায়িকা বর্ণনা

দিয়েছেন,—যার ধারানুসরণে অমরুশতকের প্রেমচিত্রাবলী অঙ্কিত হয়েছে, কবীন্দ্র বচন সমুচ্চয়, সদুক্তিকর্ণামৃতে প্রেমরসভাগের যে সকল বর্ণনা পাওয়া যায় বৈষ্ণব আচার্যেরা তারই আলেখ্যে কৃষ্ণ-প্রিয়ার নায়িকারূপের বর্ণনা দিয়েছেন। সুতরাং নায়িকা শ্রীরাধা অলৌকিক হয়েও লৌকিক, মানবীয় প্রেমসৌন্দর্যের তিলোত্তমারূপেই তাঁকে অঙ্কিত করা হয়েছে। 'নব নৌতুনা' হয়েও চিরপুরাতন,—ভারতীয় শৃঙ্গার রস-চিত্রণেরই ধারাপথে পদাবলীকীর্তনের রসভাষ্যে রূপান্তরিত হয়েছেন।

বৃন্দাবন লীলায় সখীদের স্থান

সখীগণ মাধুর্যবিস্তার কারিনী

বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণলীলায় সখীদের একটি প্রধান স্থান রয়েছে। প্রেমের একমাত্র বিষয়-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমাশ্রয় হলেন শ্রীরাধা। তাঁদের সেই নিত্য প্রেমলীলার অনন্ত বৈচিত্র্য ও মাধুর্য বিস্তার করছেন সখীগণ।

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের ব্যাখ্যা

সখী কথার সংজ্ঞা নির্দেশে বলা হয়েছে, যারা ছল পরিত্যাগ করে পরস্পরকে ভালবেসেছে পরস্পরকে বিশ্বাস করেছে,—যাদের বয়স ও বেশাদি একরূপ, তারাই পরস্পরের সখী। বৃন্দাবন যুথেশ্বরীদের মধ্যে রাধা প্রধানা।—অন্যসখীরাও সর্ব সদ্‌গুণমণ্ডিতা, বিলাস-বিভ্রমে সর্বদা কৃষ্ণকে আকর্ষণকারী। সখীলীলা সম্পর্কে এখানে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের একটি ব্যাখ্যাংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

"..তাহারা প্রেমকে গড়িয়া ভাঙিয়াছে—আবার ভাঙিয়া গড়িয়াছে; আর এই ভাঙাগড়ার চাতুর্য চপলতার দ্বারা প্রেমলীলাকে সূক্ষ্ম সুকুমার রম্যত্ব দানে কেবলই বিস্তার করিয়াছে। ইহারা কখনও কৃষ্ণ-পক্ষাবলম্বী—কখনও রাধার পক্ষে। যেমন খণ্ডিতার অবস্থায় ইহাদের রাধার প্রতি সহানুভূতি ও অনুরাগ, কৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেষ, আবার মানের অবস্থায় ইহারা কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগিনী—রাধার প্রতি যেন বিরাগিনী। আসলে এই সখীগণের রাধিকা ব্যতীত যেন পৃথক অস্তিত্বই নাই, ইহারা যেন রাধিকারই ক্রমবিস্তার; প্রেমস্বরূপিনীরই চারিদিকে হাস্যে লাস্যে ছলাকলায় বিলাস চাতুর্যে একটি প্রেমজ্যোতির পরিমণ্ডল। এই জন্যই সখীরূপা গোপীগণকে বলা হয় রাধিকারই কায়ব্যূহরূপ।...ইহারা যেন মূল রাধিকাস্বরূপ প্রেমকল্পলতারই পল্লবসদৃশা। এই সখীগণের কখনও কৃষ্ণসঙ্গসুখস্পৃহা ছিল না; রাধিকার সহিত কৃষ্ণের যে মিলন তাহাতেই তাহারা পরমানন্দ অনুভব করত; এই

জন্য রাধিকার সহিত কৃষ্ণের মিলনেই ছিল সখীদের সব চেষ্টা। একটি লতার পল্লবাদিতে জলসিঞ্চন না করিয়া লতার মূলে জলসিঞ্চন করিলে সেই মূলের রসেই যেমন পল্লবাদির রসপুষ্টি ; রাধিকারূপ প্রেমকল্পলতার পল্লবসদৃশা সখীগণেরও সেইভাবে রস পরিপুষ্টি। [শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ : দশম অধ্যায় দ্র]

উজ্জ্বলনীলমণি, গোবিন্দলীলামৃত এবং চৈতন্যচরিতামৃতের সখীতত্ত্ব অবলম্বনেই ডঃ দাশগুপ্ত উপরোক্ত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। চৈতন্যচরিতামৃত থেকেও এখানে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করা গেল।—

কবিরাজ গোস্বামী

রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর।
দাস্য বাৎসল্যাদি ভাবের না হয় গোচর॥
সবে এক সখীগণের ইহা অধিকার।
সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার॥
সখী বিনু এই লীলা পুষ্টি নাহি হয়।
সখীলীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়॥
সখীবিনা এই লীলায় নাহি অন্যের গতি।
সখীভাবে তাহা যেই করে অনুগতি॥
রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জসেবাসাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়॥
সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন।
কৃষ্ণসহ নিজলীলায় নাহি সখীর মন॥
কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায়।
নিজকেলি হৈতে তাতে কোটি সুখ পায়॥
রাধার স্বরূপ কৃষ্ণপ্রেমকল্পলতা।
সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্প পাতা॥
কৃষ্ণলীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয়।
নিজ সুখ হইতে পল্লবাদ্যের কোটি সুখ হয়॥
যদ্যপি সখীর কৃষ্ণসঙ্গমে নাহি মন।
তথাপি রাধিকা যত্নে করায় সঙ্গম॥
নানাছলে কৃষ্ণপ্রেরি সঙ্গম করায়।
আত্মসুখ সঙ্গ হইতে কোটি সুখ পায়॥

অন্যান্য বিশুদ্ধ প্রেমে করে রসপুষ্ট।
তা সবার প্রেম দেখি কৃষ্ণ হয় তুষ্ট ॥
সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম।
কামক্রীড়া-সাম্যে তারে কহে কামনাম ॥ [চৈ. চ. মধ্য : ৮ প]

বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে সখীদের গুণভেদে পাঁচভাগে ভাগ করা হয়েছে,—সখী, নিত্যসখী, প্রাণসখী, প্রিয়সখী, পরমপ্রেষ্ঠ-সখী। পরম প্রেষ্ঠ-সখীগণের মধ্যে ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুলেখা, রঙ্গদেবী এবং সুদেবী এই আটজন সর্বগণাগ্রিমা। সখীদের সপ্তদশ প্রকারের কাযেরও উল্লেখ করা হয়েছে।—(ক) নায়ক-নায়িকা পরস্পরের প্রেমগুণাদির কীর্তন, (খ) পরস্পরের আসক্তিকরণ, (গ) পরস্পরকে অভিসারে প্রেরণ, (ঘ) কৃষ্ণকরে সখী (রাধা)-সমর্পণ, (ঙ) পরিহাস (চ) আশ্বাস প্রদান, (ছ) নায়ক-নায়িকার কেশবিন্যাস, (জ) মনোগত ভাব প্রকাশে দক্ষতা, (ঝ) নায়ক-নায়িকার দোষ গোপন, (ঞ) নায়িকার পত্যাদি বঞ্চনা, (ট) অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষাদান, (ঠ) যথাকালে মিলনসাধন, (ড) চামরাদিদ্বারা সেবা, (ঢ) নায়ককে তিরস্কার, (ণ) নায়িকাকে তিরস্কার, (ত) সংবাদ প্রেরণ, (থ) নায়িকার প্রাণরক্ষার যত্ন। সখীদের প্রখরা, লঘু ইত্যাদি আরও দ্বাদশ শ্রেণীভাগ করা হয়েছে।—এখানে আর উল্লেখ বাহুল্যমাত্র।

সখীদের গুণভেদে পাঁচ ভাগ

ব্রজলীলার দূতী

পদাবলীতে দূতীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময় সখীরাও নায়ক-নায়িকার মিলনের জন্যে দূতীর কাজ করতেন। যে দূতী প্রাণান্তেও বিশ্বাসভঙ্গ করতেন না তাকে আপ্তদূতি বলা হত। দূতীরা নায়ক বা নায়িকা কারও কাছ থেকে ইঙ্গিত পেলে উভয়ের মিলনোপায় উদ্ভাবন করতেন উভয়ের কারও কাছ থেকে দায়িত্ব পেয়ে উভয়ের মিলনের ব্যবস্থা করতেন, নায়ক বা নায়িকার বার্তা বহন করে নিয়ে যেতেন। আপ্তদূতীরা শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গম প্রার্থনা করলেও আত্মসমর্পণ করতেন না। গোবিন্দদাস আপ্তদূতীর একটি সুন্দর চিত্র এঁকেছেন।—

দূতীর ভূমিকা

ঋতুপতি রাতি বিরহজরে জাগরি দূতি উপেখলি রামা।
প্রিয় সহচরী বলি মোহে পাঠাওলি অতএ আয়লু তুয়া ঠামা ॥

শুন মাধব কর জোড়ি কহলম তোয়।
মনমথ রঙ্গ তরঙ্গিত লোচনে তুহু নাহি হেরব মোয়॥

দূরকর আলস আনহি লালস চাতুরি বচন বিভঙ্গ।
বরু হাম জীবন তোহে নিরমঞ্ছব তবহুঁ না সোঁপব অঙ্গ।।

যাহে শির সোঁপি কোড়পর সুতিরে সো যদি করু বিপরীতে।
পিরিতিক রীত ঐছে তব মীটব গোবিন্দদাস চিতে ভীতে॥

[গো. প. মজুমদার সং : ৪২৩ প.]

'ঋতুপতি রাত্রি, অর্থাৎ চৈত্র পৌর্ণমাসী রজনী। বিরহজ্বরে জেগে রামা (শ্রীরাধা) দূতীকে উপেক্ষা করে প্রিয় সহচরী বলে আমাকেই পাঠিয়েছে। সেজন্যে তোমার কাছে এলাম। মাধব শোন, করজোড়ে তোমায় বলছি—মন্মথ-তরঙ্গরঙ্গিত লোচনে তুমি আমার দিকে চেও না। আলস্য দূর কর, অন্য লালসা ত্যাগ কর, চাতুর্যময় বচনভঙ্গি ছাড়। বরং আমি তোমাকে জীবন দান করব, তবু দেহ সমর্পণ করব না। যার কোলে মাথা রেখে নিশ্চিন্তে শয়ন করি সে যদি বিপরীত আচরণ করে, তাহলে পিরীতির রীতি যে এখানেই শেষ হবে!—একথা ভেবে গোবিন্দদাসও ভীত হয়েছেন।

——

॥ চতুর্থ অধ্যায় ॥

চৈতন্য-পূর্ব যুগের পদাবলী

চৈতন্য-পূর্ব ও চৈতন্য-পরবর্তী পদাবলীগানের পার্থক্য

পদাবলী গানের দুইধারা

বাংলা দেশে প্রচলিত পদাবলী গানের ধারাকে সুস্পষ্ট দুটি ভাগে ভাগ করে দেখানো যেতে পারে।—জয়দেব, বিদ্যাপতি, দ্বিজচণ্ডীদাস এবং বড়ু চণ্ডীদাস—এঁরা চৈতন্য-পূর্ববর্তী কবি গোষ্ঠী রচনা করেছেন, আর চৈতন্যদেবকে অবলম্বনে ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে যে শত শত বৈষ্ণব মহাজন কবির আবির্ভাব হয়েছে তাঁরা গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের এক পৃথক ধারায় অনুপ্রেরণা পেয়ে পদাবলী সঙ্গীত রচনা করেছেন।

জয়দেব দ্বাদশ শতকের শেষভাগের বা ত্রয়োদশ শতকের সূচনা কালের কবি। লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় যে পঞ্চকবির সম্মেলন ঘটেছিল তার মধ্যে জয়দেব ছিলেন। গীতগোবিন্দে তিনি রাধা-কৃষ্ণ প্রেমলীলার যে মধুর কোমল কান্ত পদাবলী রচনা করেছেন সেখানে 'হরিস্মরণে সরসং মনো' যতটা প্রকাশ পেয়েছে সে তুলনায় 'বিলাসকলাসু কুতূহলং' বেশী প্রাধান্য পেয়েছে বললে অন্যায় হবেনা। জয়দেবের নামাঙ্কিত রতিমঞ্জরী বলে যে গ্রন্থ রয়েছে সেখানে প্রাকৃত শৃঙ্গার রসলীলারই বিশ্লেষণ রয়েছে। জয়দেব শৈব কি বৈষ্ণব ছিলেন তা' নিয়েও পণ্ডিত সমাজে দ্বিমত রয়েছে। জয়দেব সাধনার লোকশ্রুতি বিজড়িত কেঁদুলির মন্দিরটি আসলে শিব মন্দির। জয়দেব পঞ্চোপাসক হিন্দুই হউন বা রাধা-কৃষ্ণ প্রেমলীলার বৈষ্ণব ভক্ত সাধকই হউন,—বিশিষ্ট কোনও বৈষ্ণব ধর্ম-সম্প্রদায়ের গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন না সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। তাঁর গীতগোবিন্দ কাব্যের ভাবধারায় ভারতীয় প্রাকৃত প্রেমরসেরই অনুসরণ করেছেন। রাধার চিত্রাঙ্কনে বিদ্যাপতির মতো তিনিও বাৎসায়নের কামসূত্র, অমরুশতক বা কালিদাসের কাব্যাবলীর দ্বারস্থ হয়েছেন। লৌকিক রাধা-কৃষ্ণ প্রেমগানকেই ধর্মীয় ভক্তিমিশ্রণে পরিশুদ্ধ করে নেবার প্রয়াসী হয়েছেন। গীতগোবিন্দের কাহিনী-পরিসর অবশ্য অল্প। মানিনী শ্রীরাধাকে যত্ন সাধ্য-সাধনায় সখিগণ কেলিকুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত করে দিচ্ছেন—মাত্র এই অংশটুকুর প্রাকৃত

শৃঙ্গাররসাত্মক বর্ণনা দিয়েছেন জয়দেব।—অনুমিত হয় ভাব, ভাষা ছন্দ ও বাচন-ভঙ্গিতে কবি জয়দেব সে যুগে একটি সুপ্রচলিত লৌকিক প্রেমাবেগকেই ধর্মশুদ্ধির আবরণে একান্তভাবে বাংলা প্রভাবিত সংস্কৃত ভাষা-মাধ্যমে পরিবেশন করেছেন।—এই গীতগোবিন্দ কাব্য অবলম্বনে পরবর্তী বাংলা বৈষ্ণব ধর্ম-সাহিত্যধারার পথটি উন্মুক্ত হয়েছিল।

বিদ্যাপতি

মৈথিল কবি বিদ্যাপতি সম্ভবত ১৩৮০ খৃঃ থেকে ১৪৬০ খৃঃ পর্যন্ত মিথিলার বিভিন্ন রাজাদের তত্ত্বাবধানে থেকে বহুবিধ শাস্ত্রচর্চার সঙ্গে সাহিত্যচর্চাও করেছেন। মিত্র-মজুমদার সংস্করণে (১৩৫৯) তাঁর যে পদসংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে সেখানে ৯৩৩টি পদ রয়েছে।—এর সবগুলিই রাধা-কৃষ্ণ নামাঙ্কিত নয়। ধর্মমতের দিক থেকেও বিদ্যাপতি বৈষ্ণব ছিলেন এমন কোনও তথ্যনির্ভর প্রমাণ মেলে না। তাছাড়া তার পদগুলিতে রাধা-কৃষ্ণ প্রেমবর্ণনা থাকলেও সে রাধাচিত্র লৌকিক প্রেমসৌন্দর্য বিকাশের পথেই অগ্রসর হয়েছে। একটি বালিকা ধীরে ধীরে কিশোরী, নবযৌবনা হয়ে উঠেছে, কামকলায় অনভিজ্ঞা কৃষ্ণের আগ্রহাতিশয্যে কি করে শৃঙ্গাররসের পূর্ণাঙ্গ নায়িকা হয়ে উঠেছে, আবার প্রগাঢ় প্রেমানুভূতি ধীরে ধীরে দেহমনকে আচ্ছন্ন করে নায়িকার অপূর্ব ভাবান্তর কি ভাবে এনে দিয়েছে,—বিরহের তন্ময়তার প্রেমার্তি কি ভাবে বিশ্বভুবন বেদনার রঙে রাঙিয়ে তুলেছে বিদ্যাপতি তার অপূর্ব সুর-বিন্যাসে রাধাচিত্র অঙ্কিত করেছেন। বিদ্যাপতির পদাবলীকে স্বচ্ছন্দে দেব-লীলার আবরণে লৌকিক প্রেম-সৌন্দর্যের কথা-চিত্র বলা যেতে পারে। সেখানে মানবীয় প্রেমলীলাই দেব প্রেমলীলার আলেখ্যে ধরা দিয়েছে। বিদ্যাপতি জয়দেবের মতোই।—কিংবা সঠিকভাবে বলতে গেলে, জয়দেব থেকেও অনেক বেশী পরিমাণে প্রাচীন ভারতীয় শৃঙ্গার রস-বিশ্লেষণ রীতিকে সার্থকভাবে অনুসরণ করেই রাধার শৃঙ্গার-লীলা বর্ণনা করেছেন। আলঙ্কারিক উপমাতেও তিনি ভারতীয় নাগরিক-বৈদগ্ধপূর্ণ রসবর্ণনা-রীতির পূজারী ছিলেন।—সুতরাং গৌড়ীয় বৈষ্ণব প্রেমধর্মের দার্শনিকতার সঙ্গে বিদ্যাপতি চিত্রিত রাধা-কৃষ্ণ প্রেমলীলার পার্থক্য সহজেই অনুভূত হয়। তবে জয়দেবের মতো বিদ্যাপতির পদাবলীও শ্রীচৈতন্যদেবের রসাস্বাদনের পরশমণি স্পর্শে পরবর্তীযুগে অলৌকিক রাগে রঞ্জিত হয়েছে। জয়দেবের মতো বিদ্যাপতিও গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসধারার প্রধান উৎস হয়েছিলেন একথা ভুললে চলবে না।

জয়দেব বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের পদ এবং রায়ের নাটকগীতির রসামৃত মহাপ্রভু রাত্রিদিন পান করতেন।—এই চণ্ডীদাস কি বাঁকুড়ার বড়ুচণ্ডীদাস,—না নান্নুরের দ্বিজচণ্ডীদাস ?, যতদূর অনুমান

চণ্ডীদাস

করা যায় বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সাধারণ্যে বিশেষ প্রচারিত হয়নি। দু'চারটি পদ (প্রধানত বংশী বিরহখণ্ডের অন্তর্গত) পদাবলীগানের মধ্যে মিশে গেলেও আসল আখ্যায়িকাটি সম্ভবতঃ অপরিবর্তিত আকারেই রক্ষিত ছিল। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের রসাস্বাদন হলে বৈষ্ণব মহাজনেরা এ-পুঁথির পদাবলীর দ্বারা প্রভাবিত হতেন—পদগুলিও জনপ্রিয়তার মাধ্যমে ভাষার দিক থেকে ষোড়শ সপ্তদশ অষ্টাদশ শতকে অনেক পরিবর্তিত হত। মহাপ্রভু সম্ভবতঃ বাশুলী-সেবক নান্নুরের চণ্ডীদাসের পদাবলীই আস্বাদন করেছিলেন। যাইহোক বড়ু-চণ্ডীদাসও চৈতন্য-পূর্ব কবি, ভাষাতাত্ত্বিকেরা ভাষাবিচারে সেই অভিমত দিয়েছেন।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাহিনী পরিকল্পনা এবং দেহরতির স্থূল প্রকাশনা চৈতন্যোত্তর পদাবলীধারার পরিপন্থী। এখানে অনভিজ্ঞা বালিকা রাধার ওপর কামুক কৃষ্ণের অত্যাচার ও একান্ত অনিচ্ছুক বালিকার দেহোপভোগ এবং ধীরে ধীরে রাধার মনে প্রেমসঞ্চার প্রাকৃত চিত্ররূপের মাধ্যমেই বর্ণিত হয়েছে। বৈষ্ণব তত্ত্বদর্শনের আভাষ তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। কৃষ্ণকীর্তনের কবি নাগরিক প্রেমলীলায় বিদগ্ধ নন। তার নায়ক-নায়িকা নাগর-নাগরী হয়ে উঠতে পারেনি। গ্রাম্য 'গমার' গোপ কিশোর-কিশোরী রয়ে গেছে। এই কিশোরীই ধীরে ধীরে দেহশৃঙ্গারের মাধ্যমে পরকীয়া প্রেমকে উপলব্ধি করেছে এবং বংশী ও বিরহ খণ্ডে এসে কৃষ্ণবিরহে আকুল হয়ে উঠেছে,। সুতরাং কৃষ্ণকীর্তনের পদগুলিতে রাধা-কৃষ্ণ-প্রেমের যে রস পরিবেশিত হয়েছে—চৈতন্যোত্তর গৌড়ীয় বৈষ্ণব প্রেমদর্শনের সঙ্গে তার মিলের তুলনায় অমিলই বেশী।—মহাপ্রভু এর রসাস্বাদন করেছেন এমনও মনে করবার কোনও কারণ দেখা যায় না।

চণ্ডীদাসের রামী-প্রেম-আখ্যায়িকা সম্ভবতঃ সপ্তদশ অষ্টদশ শতকের সহজিয়া বৈষ্ণবদের উদ্ভাবিত কাহিনী। নান্নুরের বাশুলী সেবক চণ্ডীদাসের পদ-ধৃত

১। চণ্ডীদাস সমস্যায় খুঁটিনাটি বিতর্কে প্রবেশ না করে ধরে নেওয়া যেতে পারে অন্ততঃ পক্ষে তিন জন চণ্ডীদাস ছিলেন। (ক) বড়ু চণ্ডীদাস : শ্রীকৃষ্ণকীর্তন লেখক, (খ) দ্বিজচণ্ডীদাস : নান্নুরের বাশুলী সেবক : মহাপ্রভু যার পদ-রসাস্বাদন করতেন, (গ) দীন চণ্ডীদাস : চৈতন্যোত্তর কবি : মণীন্দ্রমোহন বসু যার পদাবলী সম্পাদনা করেছেন।

রাধার পবিত্র প্রেম-সৌরভ হয়তো সহজিয়াদের কামগন্ধ বিহীন রজকিনী-প্রেম-কাহিনী রচনায় প্রেরণা যুগিয়েছিল। এই চণ্ডীদাসের রাধা যেমন বিশুদ্ধভাবে উজ্জ্বলনীলমণি বর্ণিত বৈষ্ণব রসতত্ত্বের নায়িকা নন, তেমনি বিদ্যাপতির রাধার নাগর-বৈদগ্ধপূর্ণ প্রাকৃত প্রেমরুচিও তার মধ্যে নেই। বড়ু চণ্ডীদাসের 'গমার' অর্থাৎ গ্রাম্য স্থূল রুচিবোধও তার কল্পনার বাইরে ছিল। চৈতন্যদেবের বিশুদ্ধ রাধা-প্রেমানুভূতির পিছনে এই চণ্ডীদাস-পদাবলীর যথেষ্ট প্রভাব ছিল অনুমিত হয়। বৃন্দাবন গোস্বামীরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসবিচারে কাম এবং প্রেমের যে পার্থক্য করেছেন চণ্ডীদাস পদাবলীর অনুপ্রেরণা তাঁর পিছনে থাকা খুবই স্বাভাবিক।

আমাদের সিদ্ধান্ত

পূর্ব সিদ্ধান্তে এবারে ফিরে আসা যেতে পারে। আমাদের বক্তব্য হল, চৈতন্য পূর্ববর্তী রাধা-কৃষ্ণ প্রেম-আখ্যায়িকার কবিদের রচিত পদাবলী বিশেষ কোনও ধর্মদর্শনের দ্বারা প্রভাবিত নয়।—এবং সে কারণেই, প্রত্যেক কবির পদে স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্য অনেক বেশী। সেখানে প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেমবর্ণনাও অনেক প্রাকৃত মানবীয় এবং বাস্তব জীবন-রসায়নে জারিত। চৈতন্য পরবর্তী কবিদের মধ্যে এতটা ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের প্রভাব সুস্পষ্ট নয়। জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরামদাস প্রভৃতি পদকর্তার রচনারীতির যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্য রয়েছে সত্য,—তবু গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্বদর্শনের আলোকে রাধারূপ দর্শন করতে গিয়ে তাঁরা অনেকাংশে ব্যক্তিক প্রতিভা স্ফুরণের সুযোগ হারিয়েছেন। চৈতন্য পূর্ববর্তী কবিদের এমন কোনও নির্দিষ্ট বাঁধা পথে চলতে হয়নি ;—সে জন্যেই কবি-প্রতিভার স্ফুরণে তাঁরা অনেক বেশী সুযোগ পেয়েছেন। ইচ্ছানুযায়ী প্রাকৃত কাম ও প্রেমের গণ্ডী তাঁরা অতিক্রম করেছেন। রাধা-কৃষ্ণ বহুলাংশে আমাদের কাছাকাছি এসে পড়েছেন। চৈতন্যে-পূর্ব যুগের এই রাধা-কৃষ্ণ প্রেমাখ্যায়িকাকে শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর ভক্তিরসাশ্রিত আস্বাদনের মাধ্যমে পরবর্তী ভক্ত কবিদের মধ্যে এক নব প্রেরণা এনে দিলেন। বিশিষ্ট প্রেমদর্শনাশ্রিত ধর্মবোধের ভেতর দিয়ে চৈতন্যোত্তর এক বিপুল গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মসাহিত্যের ধারা প্রবাহিত হল। সেই ধারায় মিশে চৈতন্য-পূর্ব রাধা-কৃষ্ণ প্রেমবিষয়ক পদাবলীও নতুন ভাবব্যাখ্যা লাভ করল। বৈষ্ণব পদকার ও জীবনীকারেরা শুধু জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের পদ নয়—সংস্কৃত পুরাণ এবং প্রেমলীলার পদকেও গৌড়ীয় অলৌকিক প্রেমরসে জারিত করে নিয়েছেন দেখা যায়।

এবারে চৈতন্য-পূর্ববর্তী এবং চৈতন্য-পরবর্তী প্রধান কবিদের আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যেতে পারে।

কবি বিদ্যাপতি

কবি বিদ্যাপতির জীবনী আলোচনায় ড. বিমানবিহারী মজুমদার জানিয়েছেন সম্ভবতঃ ১৩৮০ থেকে ১৪৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। তাঁর জীবনের প্রধানতম ঘটনাগুলি পর্যালোচনায় জানা যায় 'তিনি একাধারে কবি, শিক্ষক, কাহিনীকার, ঐতিহাসিক, ভূবৃত্তান্তলেখক ও স্মার্ত্ত নিবন্ধকার হিসাবে ধর্ম্মকর্মের ব্যবস্থাদাতা ও আইনের প্রামাণ্য গ্রন্থের লেখক" ছিলেন।

জীবনী

১৪।১৫ বছর বয়সে তিনি গিয়াসউদ্দিন ও নসরৎ শাহকে উৎসর্গ করে পদ লিখেছেন। ১৪০০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে নৈমিষ্যারণ্যের দেবসিংহের আদেশে মিথিলা থেকে নৈমিষ্যারণ্য পর্যন্ত ভূখণ্ডের সমস্ত তীর্থের বিবরণী দিয়ে ভূপরিক্রমা লিখেছেন। ১৪০২-০৪ খৃ-এর মধ্যে কীর্তিসিংহের পিতৃরাজ্য মিথিলা উদ্ধার বিষয়ে 'কীর্তিলতা' ঐতিহাসিক কাব্য লিখেছেন। ১৴১০-এব কাছাকাছি সময়ে অলঙ্কার শাস্ত্রের অধ্যাপনা করেছেন, বিষ্ণুশর্মার মত গল্পে নীতিকথা বলার আদর্শে 'পুরুষ পরীক্ষা' লিখেছেন, অবহট্‌ঠ ভাষায় কীর্তিসিংহের রণ-নৈপুণ্য ও প্রেম-নৈপুণ্য সম্পর্কে 'কীর্তিপতাকা' কাব্য লিখেছেন, শিবসিংহের রাজত্বকাল (১৪১০-১৪) তাঁর কাব্যরচনার সুবর্ণযুগ বলা যেতে পারে।—এই সময়ই দুই শতাধিক পদ রচনা করেছেন,—তারমধ্যে অধিকাংশ রাধাকৃষ্ণ-প্রেমবিষয়ক গীতি। ১৪৩০-৪০ এর মধ্যে কবি 'শৈবসর্বস্বহার' এবং 'গঙ্গাবাক্যাবলী' রচনা করেন। ১৪৪০-৬০ এর মধ্যে 'বিভাগসার', 'দানবাক্যাবলী' এবং 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী' রচনা করেছেন। 'বিভাগসার' গ্রন্থে উত্তরাধিকার সম্পর্কে বিদগ্ধ আলোচনা করেছেন। বাকী তিনটি গ্রন্থকে স্মৃতির প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে পরবর্তী স্মার্তপণ্ডিতরা সশ্রদ্ধভাবে উল্লেখ করেছেন। বিদ্যাপতি উক্ত গ্রন্থাদি রচনায় একাধারে সংস্কৃত (গদ্য ও পদ্য), অবহট্‌ঠ এবং মৈথিল ভাষা ব্যবহার করেছেন। তাঁর মৈথিল পদাবলীর সমাদর বাংলা, আসাম, উড়িষ্যা এবং পূর্ব বিহারাঞ্চলে অত্যধিক পরিমাণে দেখা যায়।

নানাপুঁথি বিচারে ড. মজুমদার বিদ্যাপতির অকৃত্রিম পদরূপে ৭৯৬টি পদের উল্লেখ করেছেন। কবিকণ্ঠহার, সরসকবি, নবজয়দেব বা অভিনব জয়দেব,

ভূপতিসিংহ, নবকবিশেখর উপাধি-ভনিতায় বিদ্যাপতির পদ পাওয়া যায়।

পদসংগ্রহ পরিচয়

বিদ্যাপতি দীর্ঘ ৬২।৬৪ বৎসর ধরে কবিতা লিখেছেন। অন্ততঃ ১০।১২ রাজার উত্থান পতন তাঁকে দেখতে হয়েছে। সুতরাং ঠিকমত কালানুযায়ী তাঁর পদগুলি সাজাতে পারলে মানসিক ক্রমবিকাশের পরিচয় পাওয়া যেত। সে চেষ্টা অধ্যাপক মিত্র এবং ড. মজুমদার তাঁদের সর্বাধুনিক বিদ্যাপতি পদ সংগ্রহ গ্রন্থে করেছেন। অনুমিত হয় রাজা শিবসিংহের রাজত্বকালে (আনুমানিক ১৪১০-১৪ খৃঃ), অর্থাৎ কবির ত্রিশ চৌত্রিশ বৎসর বয়ক্রমকালে লেখা পদগুলিতেই কবির প্রতিভার সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ পরিচয় মেলে।—"এই যুগের পদে রূপ রস ও বর্ণের ইন্দ্রধনুচ্ছটা ক্ষণে ক্ষণে পাঠককে বিভ্রান্ত করিয়া[illegible]। কল্পলোকের সমস্ত সৌন্দর্য যেন নায়িকার (রাধা চিত্রের) মধ্যে মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে।" পরবর্তীপদে এই বর্ণঔজ্জ্বল্য যেন বিষাদের বৈরাগ্যরঙে কিছুটা ভাব-গভীর হয়ে উঠেছে। অবশ্য সব পদের রচনাকাল সম্পর্কে নিশংশয় না হয়ে এ বিষয়ে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত করা ঠিক নয়।

বিদ্যাপতির ধর্মমত কি ছিল সে সম্পর্কেও গবেষকদের মতানৈক্য রয়েছে তাঁর পূর্বপুরুষেরা শৈব ছিলেন। তিনি নিজেও অন্ততঃ প্রথম জীবনে শৈব ছিলেন। এমনকি শিবসিংহের মনোরঞ্জনের জন্যে যখন রাধা-কৃষ্ণের শৃঙ্গার রসের পদ

কবির ধর্মমত প্রসঙ্গ

রচনা করেন তখনও তিনি শৈব। রূপের পূজারী হয়ে রাধাকৃষ্ণ প্রেমের পদ লিখতে শুরু করেন। কিন্তু যখন দারিদ্র্যের জীবনে রাজাবনৌলিতে বসে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের অনুলিপি করেন (১৪২৮) তখন কি তার মনে বৈষ্ণব ভক্তিভাবের উদয় হয়েছে? ডঃ মজুমদার মনে করেন, এ সময় থেকে ধীরে ধীরে বিদ্যাপতি বৈষ্ণব ধর্মে অনুরাগী হয়েছিলেন। প্রার্থনামূলক পদগুলিতে সেই অনুরাগ সম্পূর্ণ আত্মসমর্পনের রূপ নিয়েছে। এ পদ তিনটির (৭৬৩, ৭৬৪, ৭৬৫ দ্রঃ) আন্তরিকতা স্বীকার করেও প্রশ্ন থাকে হরি আর হর তার কাছে খুব পৃথক ভক্তি আবেদন এনেছে কি? তাহলে বলবেন কেন—

এক শরীর লেল দুই বাস।
খনে বৈকুণ্ঠ খনহি কৈলাস। [৭৬৭ প.]

একাধিক পদে তিনি একই সঙ্গে মাধব ও শিব, হরি ও হরের কাছে আশ্রয় নিতে সংকল্প জানিয়েছেন। বিদ্যাপতি সৌন্দর্যের কবি, প্রেমের কবি। হরি হর

তাঁর কাছে বেশী কিছু পৃথক নন—একই আত্মার দুই দেহলীলা-বিলাস মাত্র। বৈষ্ণব পদাবলীতেও মুখ্যত তিনি প্রেম সৌন্দর্যের কবি। ভগবান কৃষ্ণের মর্তলীলায় প্রেমসৌন্দর্য বর্ণনায় তিনি ভক্তির আতিশয্যে সৌন্দর্যবর্ণনায় কার্পণ্য করেন নি। আবার ভক্তিপ্রার্থনায় তিল-তুলসী দিয়ে মাধবের পদতলে দেহ সমর্পণ করে তার দয়া ভিক্ষা করছেন। তাঁর পদবিচারে এই মুক্ত মনের কবি চেতনাকে যেন আমরা চিনতে ভুল না করি। শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু বিদ্যাপতি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, 'বিদ্যাপতি তীব্র ইন্দ্রিয়রাগের কবি, তথাপি ভোগ সম্বন্ধে তাঁহার মনে বিতৃষ্ণা গভীর হইয়া উঠিয়াছিল, অন্ততঃ শেষ জীবনে, এবং তিনি প্রেমের কল্যাণময় গার্হস্থ্যরূপকেও মানিতেন। একদিকে ছিল বিদ্যাপতির ইন্দ্রিয়বিলাস, নাগরিক ক্ষুধার তৃপ্তিখাদ্য সরবরাহ,—সেখানে, এমনকি রাধাকৃষ্ণ পর্যন্ত রূপজীবি, অন্যদিকে আছে বিদ্যাপতির শিব-পার্বতীর মঙ্গল সুন্দর প্রেমাদর্শ, এবং রাধাকৃষ্ণ প্রেমের উন্নত উদাত্তরূপ। বিদ্যাপতি আধ্যাত্মিকতা বর্জিত নন, কিন্তু তাঁহার আধ্যাত্মিকতা লৌকিকপ্রেমের উন্নয়নের সৃষ্টি'

শঙ্করীপ্রসাদ বসুর অভিমত

শ্রীযুক্ত বসুর এই দৃষ্টিভঙ্গিতে বিদ্যাপতির পরিচয় বহুলাংশে সুস্পষ্ট হয়েছে মনে হয়।

প্রেম কবিতা রচনায় বিদ্যাপতি পূর্বসূরী সংস্কৃত ও প্রাকৃত কবিদের অনুসরণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে কালিদাস, ভর্তৃহরি, অমরু, জয়দেবের নাম সর্বাগ্রে মনে আসে। বাৎসায়নের কামকলার চিত্ররূপও তাঁর কাব্যে সুস্পষ্ট। ভাগবতের পুঁথি নকল করেছিলেন বিদ্যাপতি, ভক্তিবাদী প্রেম সেখান থেকেই গ্রহণ করেছেন অনুমিত হয়। তিনি নিজে স্মৃতি ও অলঙ্কারের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর কাব্যের অলঙ্কার ও ছন্দোবৈচিত্র্য (মূলতঃ সংস্কৃতানুগ) পরবর্তী বৈষ্ণব কবিদের প্রেরণা যুগিয়েছে। সুতরাং অলঙ্কার ও বর্ণনারীতিতে ভারতীয় প্রাচীন রীতিই নবভাবে বিদ্যাপতি আবার সঞ্জীবিত করলেন। ভারতীয় প্রেমাদর্শে কালিদাস ভোগ ও [illegible]র যে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন, ভোগের তুলনায় ত্যাগের মধ্যে প্রে[illegible]ণীরূপকে যেভাবে পরিস্ফুট করেছেন, ভর্তৃহরি, অমরু, জয়দেব বা বিদ্যাপতি কেউই প্রেমের সেই মহৎ কল্যাণশ্রীকে যৌবন-চাঞ্চল্যের পাশে রেখে এত গভীরভাবে মঙ্গলদৃষ্টিতে দেখতে পারেন নি। কালিদাসের কাব্যের প্রেমচিত্রে সেই ফুল ও ফলের সুনিপুণ

পূর্বসূরীদের প্রভাব

বিশ্লেষণ প্রাচীন সাহিত্যের অন্তর্গত রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি প্রবন্ধে পাওয়া যাবে (দ্রঃ মেঘদূত, শকুন্তলা, কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা)। বিদ্যাপতি কালিদাসের দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত হলেও এই কল্যাণী প্রেমচিত্রকে ত্যাগের মধ্যে এতটা উপলব্ধি করবার অবকাশ পেয়েছিলেন মনে হয় না। শৃঙ্গারশতক এবং বৈরাগ্যশতকের কবি ভর্তৃহরি প্রথমদিকে যতটা শৃঙ্গারভোগের চিত্র এঁকেছেন,—পরবর্তী জীবনে বৈরাগ্য শতকে ঠিক তেমনি চরমবিতৃষ্ণার সঙ্গে শৃঙ্গারভোগের নিন্দা করেছেন,—উভয়দিকেই তিনি চরমবাদী কবি।—মানসিক অস্থিরতার পরিচয় তার শ্লোকগুলিতে সুস্পষ্ট। অমরুশতকের কবি অমরু শৃঙ্গারভোগের নানা উল্লাসই তার শ্লোকগুলিতে প্রকাশ করেছেন।—বিদ্যাপতি উভয়ের বাৎস্যায়নী চিত্রকলা গ্রহণ করলেও ভোগবাদ বা বৈরাগ্যকে চরমভাবে গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন না। একাধারে ভোগ ও ভোগবৈরাগ্য তাঁর কাব্যে সামঞ্জস্য লাভ করেছে। ভর্তৃহরি বা অমরুর তুলনায় বিদ্যাপতি কবিত্ব ও ভাববিচারে উচ্চশ্রেণীর কবিরূপেই বিবেচিত হবেন। বিদ্যাপতিকে 'অভিনব জয়দেব' বা 'নব জয়দেব' নাম দেওয়া হয়েছিল, তবু একথা স্বীকার করতে হয় কোমলকান্ত দেহ-প্রেমসর্বস্ব কবি জয়দেবের তুলনায় বিদ্যাপতি অনেক উচ্চ শ্রেণীর কবি। বিদ্যাপতি দেহমুখী হয়েও প্রেম-মনঃস্তত্ত্বকে মর্যাদা দিয়েছেন,—প্রেমকে বিরহতন্ময়তায় ভাবসম্মিলনের পবিত্রতায় উন্নীত করেছেন। রূপ-রীতি, ভাষা ও ছন্দে বিদ্যাপতি জয়দেবকে অনুসরণ করলেও তাকে বহুগুণে অতিক্রম করেছেন। ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্যে বিদ্যাপতির কাব্যলোক জয়দেবের তুলনায় অনেক উন্নত ও বিস্তৃত।

বাল্য ও প্রথম যৌবন—এই দুয়ের সন্ধি অর্থাৎ কৈশোর চেতনাকে বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে বয়ঃসন্ধি বলা হয়েছে। বিদ্যাপতি নিঃসংশয়ে (শ্রীরাধার) বয়ঃসন্ধির শ্রেষ্ঠ কবি। দেহ ও মন উভয়েরই পরিবর্তন বিকাশ অপূর্বকৌশলে কয়েকটি পদে তিনি চিত্রিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতির আঁকা সেই বয়ঃসন্ধির রাধা সম্পর্কে লিখেছিলেন, "বিদ্যাপতির রাধা নবীনা নবস্ফুটা। আপনাকে এবং পরকে ভালো করিয়া জানে না। দূরে সহাস্য সতৃষ্ণ লীলাময়ী, নিকটে কম্পিত শঙ্কিত বিহ্বল। কেবল একবার কৌতূহলে চম্পক অঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়া অতি সাবধানে অপরিচিত প্রেমকে একটুমাত্র স্পর্শ করিয়া অমনি পলায়নপর হইতেছে। যেমন একটি ভীরু বালিকা

বয়ঃসন্ধির পদ

স্বাভাবিক পশুস্নেহে আকৃষ্ট হইয়া অজ্ঞাতস্বভাব মৃগকে একবার সচকিতে স্পর্শ করে, একবার পালায়, ক্রমে ক্রমে ভয় ভাঙে, সেইরূপ। যৌবন, সে-ও সবে আরম্ভ হইতেছে, তখন সকলই রহস্য পরিপূর্ণ। সদ্যবিকচ হৃদয় সহসা আপনার সৌরভ আপনি অনুভব করিতেছে; আপনার সম্বন্ধে আপনি সবেমাত্র সচেতন হইয়া উঠিতেছে; তাই লজ্জায় ভয়ে আনন্দে সংশয়ে আপনাকে গোপন করিবে কি প্রকাশ করিবে ভাবিয়া পাইতেছেনা—

কবহুঁ বান্ধয়ে কচ কবহুঁ বিথারি।
কবহুঁ ঝাঁপয়ে অঙ্গ কবহুঁ উঘারি।।[১]

হৃদয়ের নবীন বাসনা সকল পাখা মেলিয়া উড়িতে চায় কিন্তু এখনও পথ জানে নাই। কৌতূহল ও অনভিজ্ঞতায় সে একবার ঈষৎ অগ্রসর হয় আবার জড়সড় অঞ্চলটির অন্তরালে আপনার নিভৃত কোমল কুলায়ের মধ্যে ফিরিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে।"

বয়ঃসন্ধির রাধা যে প্রেমকলায় অনভিজ্ঞা এবং কৃষ্ণমিলনাশঙ্কায় সন্ত্রস্তা বড়ু চণ্ডীদাসের মত বিদ্যাপতিও বহুসংখ্যক পদে তেমন চিত্র অঙ্কিত রচনা করেছেন। সে সকল পদে অজ্ঞাতযৌবনার মুগ্ধা-মপন চিত্রে স্থূলতার ছাপ কিছু প্রকট হয়ে পড়েছে। ধীরে ধীরে সখীদের যত্নে শ্রীকৃষ্ণের চেষ্টায় রাধা পূর্বরাগের নায়িকা হয়ে উঠেছেন। এখন তার মিশ্র মনোভাব। মিলনভীতির মধ্যেও কামনার লজ্জা ও সুখস্বপ্নের বিকাশ। একটি পদ থেকে উদ্ধৃত করছি।—

অবনত আনন কএ হম রহলিহু
বারল লোচন-চোর।
পিয়া মুখরুচি পিবএ ধাওল
জনি সে চাঁদ চকোর।
ততহু সঞো হঠে হটি মোঞে আনল
ধএল চরণ রাখি।
মধুপ মাতল উডএ ন পারএ
তই অও পসারএ পাখি।।

(১) মূলপদটি বাংলা অনুবাদ সহ এখানে দেওয়া যেতে পারে—

সৈসব জৌবন দরসন ভেল।
দুহু দলবলে ধনি দন্দ পড়ি গেল।।

কবহুঁ বান্ধয়ে কচ কবহুঁ বিথারি।
কবহুঁ ঝাঁপয়ে অঙ্গ কবহুঁ উঘারি।।

মাধবে বোললি মধুর বাণী
সে শুনি মুদু মোঞে কান।
তাহি অবসর ঠাম বাম ভেল
ধরি ধনু পচবান॥
তনু পসেবে পহাসনি ভাসনি
পুলক তইসন জাগু।
চুনি চুনি ভএ কাঁচুঅ ফাটলি
বাহু বলয়া ভাগু॥[২] [বিদ্যাপতি. মি-ম. ৩৪ প.]

(মাধবকে দেখে) মুখ নামিয়ে, নয়ন-চোরকে নিবারণ করলাম। কিন্তু সে চাঁদের দিকে চকোর যেমন ছুটে—তেমনি প্রিয়ের মুখরুচি পান করতে ছুটল। সেখান থেকে জোর করে তাকে হটিয়ে এনে চরণে ধরে রাখলাম। মধুপানমত্ত মৌমাছি যেমন ফুল ছেড়ে উড়তে পারে না, আমার নয়নও তেমনি চরণ ছেড়ে সরতে

থির নয়ন অথির কছু ভেল।
উরজ-উদয়-থল লালিম দেল॥

চঞ্চল চরণ, চিত্ত চঞ্চল ভান।
জাগল মনসিজ মুদিত নয়ান॥

বিদ্যাপতি কহে শুন বরকান।
ধৈরজ ধরহ মিলাযব আন॥

[বিদ্যাপতি, মিত্র-মজুমদার.সং: ৬১২প.]

শৈশব যৌবনে দেখাদেখি হল। দুই দলের প্রভাবে ধনী দ্বন্দ্বে (সমস্যায়) পড়ল (অর্থাৎ কোন দলে যোগ দেবে স্থির করতে পারল না)। কখনো কেশ বাঁধে, কখনো এলিয়ে দেয়। কখনো অঙ্গ ঢেকে রাখে, কখনো অনাবৃত করে। স্থির নয়ন কিছু অস্থির হল। উরোজের (পয়োধরের) উদয়স্থলে লালিমা (রক্তিমা) দেখা দিল। চরন ছিল চঞ্চল, এখন চিত্ত চঞ্চল হল। মুদিত নয়নে মদন জাগল (অথবা মদন জেগে চোখবুজে রইল)। বিদ্যাপতি বলছেন, বর (শ্রেষ্ঠ) কানাই ধৈর্য ধর, তাকে এনে মিলিয়ে দেব।

এ-প্রসঙ্গে মিত্রমজুমদারের বিদ্যাপতি গ্রন্থের ৬১০, ৬১১, ৬১২, ৬১৩, ৬১৪, ৬১৫, ৬১৬ সংখ্যক পদগুলি পঠিতব্য।

২। এপদটি অমরুশতকের একটি শ্লোকের ভাবানুবাদ—

তদ্বক্ত্রাভিমুখং বিলসিতং দৃষ্টিঃ কৃতা পাদয়োঃ
তস্যাবাপকুতূহলাকুলতরে শ্রোত্রে নিরুদ্ধে ময়া।
পাণিভ্যাঞ্চ তিরস্কৃতঃ সপুলকঃ স্বেদোদ্গমো গণ্ডয়োঃ
সখ্যঃ কিং করবাণি যান্তি শতধা যৎকঞ্চুকে সন্ধয়॥

না পারলেও বারবার অপাঙ্গে মাধবকে দেখতে চেষ্টা করছিল। মাধব মধুর স্বরে কথা বললেন,—তা'শুনে আমার কান বন্ধ করলাম। সেই ফাঁকে পঞ্চবাণ হাতে মদন বৈরী হল (অর্থাৎ মদনবাণে পরাভূত হলাম)। ঘর্মে তনু প্রসাধন নষ্ট হল, পুলকরোমাঞ্চে কাঁচুলি চুন চুন করে ফেটে গেল, বাহুর বলয় ভেঙ্গে গেল।

—এ পদে রাধার আত্মসংবরণের চেষ্টা এবং মদনের হাতে পরাজয়ের সুখময় রসাবেশ সুন্দর চিত্রিত হয়েছে। শ্রীরাধা আরও লীলাকুশলী হয়ে উঠছেন। বহুপদে তারও নয়নাভিরাম চঞ্চল চিত্র পাওয়া যায়। রসিক কৃষ্ণ প্রেমাভিলাষে কাছে এলে রাধা কি করবেন বলছেন,—

অঙ্গনে আওব যব রসিয়া
পালটি চলব হাম ইষত হসিয়া। [৭৫৩ প.]

ঈষৎ হেসে তিনি লীলায়িত দেহলতাটি ফিরিয়ে অন্যদিকে যাবেন। প্রভু তাকে নিবারণের চেষ্টা করবেন। লীলা বিলাস চাইবেন। কুটিল কটাক্ষ হেনে, মুচকি হেসে তিনি অসম্মতি জানাবেন। তারপর জোর করে মুখকমল মধু পান করলে সম্বিত হারাবেন। রসকেলির সুখানুভূতি বহু পদেই বাস্তব অভিজ্ঞতার রঙে গাঢ় হয়ে উঠেছে। নায়কের সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা, নায়িকার গতলজ্জা অভিজ্ঞারূপ, লজ্জা ও প্রেমমিলনের দ্বন্দ্ব, ভোগবৈচিত্র্য ও তার সৌন্দর্য পরিবেশ চিত্র, নব অনুভূতি এবং পূর্ণ মিলনচিত্র—বহু পদেই বিদ্যাপতি বাৎসায়নের রতি বিশ্লেষণের আলোকে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত ক[illegible]

মুগ্ধা ও প্রগল্ভা এই নায়িকার মানের বিচিত্র লী[illegible] জয়দেবের আদর্শে এবং স্বকীয় প্রতিভার মৌলিকতায় চমৎকার চিত্রিত করেছেন। কিন্তু সেই মানিনী রাধার লীলাবিলাস চিত্রণের পূর্বে তার অভিসারিকা-রূপের বর্ণনা দেওয়া প্রয়োজন। সংস্কৃত কাব্যে অভিসার-চিত্র বহু প্রাচীন।

অভিসারিকা

কালিদাস কুমারসম্ভবে অভিসারিণী উমাকে শিবের ধ্যান ভাঙাতে যখন উপস্থিত করলেন 'পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব' সেই মদন সজ্জায় সজ্জিতা রূপ সংস্কৃত সাহিত্যে অমর হয়ে আছে। মেঘদূতেও উজ্জয়িনীর নির্জন পথে অভিসারিকার চিত্র স্মরণ করেছেন কবি। ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর গমনের চিত্রও অভিসারিকার সাজ। তবু অবৈধ পরকীয়া প্রেমের নায়িকাচিত্র

সঠিকভাবে কালিদাস আঁকেন নি। অমরুশতকে সে চিত্র পাওয়া যায়। অভিসারে তীব্র অবৈধ কামনার সঞ্চরণ অমরুশতকে লক্ষ্য করা যায়। জয়দেব যে অভিসারিকা রাধার ছবি দিয়েছেন সেখানে তারও 'রতিসুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহর বেশম্'। বনমালী যমুনাতীরে ধীর সমীরে কুঞ্জসাজিয়ে বসে আছেন। এক বর্ণোজ্জ্বল ইন্দ্রিয়াবেগে শ্রীরাধা কুঞ্জর গতিতে অপূর্ব সৌন্দর্য সম্ভারে দেহ সজ্জিত করে সেখানে অভিসারে চলেছেন—কিন্তু পরকীয়া প্রেমের দুর্লঙ্ঘ্য বিঘ্ন অতিক্রমকারী রাধার দৃঢ় চিত্ততা, সংকল্পের স্থিরতা সে চরিত্রে কবি অপ্রয়োজনীয় মনে করেছেন।

পরকীয়া অভিসার প্রসঙ্গ

বিদ্যাপতি অভিসারে কালিদাস, অমরু এবং জয়দেব—তিনজনের কাছেই ঋণী,—তবে তিনজনের চিত্র থেকে তাঁর স্বকীয়তাও লক্ষণীয়। অভিসারিকার মানসিক স্তর পরপর তিনি সুন্দরভাবে এঁকেছেন। সর্বপ্রথম রাধা ভীরুবালিকা। সখীরা কৃষ্ণকে বলছেন, 'প্রথম প্রেম, ভীরু রাধা। যত্নকরে তাকে আনিব কি করে। যে সুরত অসার জ্ঞান করে তাকে যমুনা পার করিয়ে অভিসারে আনি কি করে?' (৮৫ প)। এরপর রাধা সাহসী হয়েছেন। তবে তখনও তিনি দুইকুল রাখতে আগ্রহী 'গোচর এক মোর প এ রাখব রাখবি দুঅওঁ লাজ'—আমার এক নিবেদন, দু'দিকের লজ্জা রেখ। পুনর্বার মিলনে তাতে আরও বেশী সুখপাবে। কৃষ্ণকে বুঝিয়ে রাধা নিশাবসানের পূর্বেই অভিসার কুঞ্জ থেকে ফিরে এলেন (৯১ প)। এই রাধাই আরও পরিণত অভিজ্ঞ হবার পর দুর্বার কাম ও প্রেমের তাড়নায় কিভাবে কৃষ্ণাভিসারে ছুটেছেন কয়েকটি পদে কবি তারও সুন্দর চিত্র দিয়েছেন। সখী কৃষ্ণকে বলছেন, 'মেঘ বারি বর্ষণ করছে, ধরণী জলে পূর্ণ হয়েছে, রজনী অন্ধকারি তবু রাধা তোমার গুণ স্মরণে অভিসারে এসেছেন। ঘরের দেওয়ালে আঁকা সাপ দেখে যে ভীত হয় 'সে সুবদনি করে ঝপইত ফণিমণি বিহুসি আইলি তুঅ পাসে।' নিজের স্বামীকে ছেড়ে সিন্ধু নদী পেরিয়ে কুলকলঙ্ক তুচ্ছকরে মধুর প্রেমে মেতেছেন তিনি (৩৩২ প)।

বিদ্যাপতি অভিসারিকা রাধাকে মেঘরুচি বসন পরিয়ে, হাতে লীলাকমল ও তাম্বুল দিয়ে অভিসারে পাঠিয়েছেন (৩২৫ প), 'কুঙ্কুম পঙ্ক পসাহহ দেহ। নয়নযুগল তুঅ কাজর রেহ।।—কুঙ্কুমচন্দনে দেহপ্রসাধন করে, কাজলে দুই নয়ন সাজিয়ে পাঠিয়েছেন। কখনো আবার পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাভিসারে শুভ্রবস্ত্র পরিয়ে গজমতির হার গলায় দুলিয়ে দিয়েছেন। অভিসারিকার অঙ্গসজ্জার অলঙ্করণ-

ঐশ্বর্যে আমাদের যেন চোখ ঝলসে যায়।—অপরদিকে তেমনি আবার এই রাধাকেই পরামর্শ দিয়েছেন,—

অলক তিলক না কর রাধে।
অঙ্গে বিলেপন করহি বাধে॥
তুয়ঁ অনুরাগিনি ও অনুরাগী।
দূষণ লাগত ভূষণ লাগি॥ [৩২০ প.]

তুমি অলক সাজিও না, তিলক নিও না। অঙ্গে কুঙ্কুম মৃগমদ লেপনে বাধা সৃষ্টি কোরোনা। তুমি অনুরাগিণী, শ্যাম অনুরাগী, ভূষণসজ্জা দোষের হবে। নিরাভরণ সুন্দর স্বভাব-সৌন্দর্য সাজিয়ে কবি এখানে রাধাকে অভিসারে পাঠিয়েছেন [১] বহুপদে প্রসাধন-সৌন্দর্যের তুলনায় রাধার দেহকান্তিকে বেশী মর্যাদা দিয়েছেন।

সখী ও দূতীর ভূমিকা প্র[illegible]

বৈষ্ণবপদে সখী এবং দূতীরা যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন পূর্বে তার আলোচনা করেছি। বিদ্যাপতির অভিসার পদে এই দূতীদের [illegible]সম্মিত কয়েকটি চিত্র লক্ষ্য করবার বিষয়। তারা মুগ্ধা রাধাকে নানাভাবে প্রেমের প্রথম পাঠ দিচ্ছেন। কৃষ্ণ আদর করলে কৃত্রিম মান ও লজ্জার অনুরাগকে আরও কি করে বাড়িয়ে তুলবেন তারও উপদেশ দিচ্ছেন। অলকাতিলকের সাজে সেজে, বঙ্কিমলোচনে কাজল পরে—সর্বদেহ বসনে ঢেকে একটু দূরে দূরে থেকে, প্রথম কথা না বলে আকর্ষণ বাড়াতে হবে।—

১। অনুরূপ আরও পদ বিদ্যাপতি লিখেছেন—

(১) সহজ সুন্দর লোচন সীমা কাজর অঞ্জনে ন কর ভীমা।
তিলক দএ মৃগমদমসী বদন সরিস ন কর শশী॥
... ...
পসর সৌরভ কী অঙ্গরাগে উভয় মন যদি অনুরাগে।
[৯৬ প]

তোমার লোচন স্বভাবেই সুন্দর, কাজল দিয়ে তাকে ভয়ঙ্কর কোরোনা। কালো কস্তুরীর তিলক দিয়ে বদনকে চাঁদের মত কলঙ্কিত কোরোনা। তোমার স্বাভাবিক দেহ-সৌরভতো পাওয়া যাচ্ছে, উভয়ের যদি অনুরাগ থাকে অঙ্গরাগে কি প্রয়োজন?

সজনি পহিলহি নিঅরে না জাবি।
কুটিল নয়নে ধনি মদন জাগাবি॥
ঝাঁপবি কুচ দরসায়বি কন্ধ।
দৃঢ়করি বান্ধবি নীবিক বন্ধ॥
মান কববি কছু রাখবি ভাব।
রাখবি বস জনু পুন পুন আব॥ [৬৬৯ প.]

সজনি প্রথমে নিকটে যেও না। কুটিল কটাক্ষে মদন জাগাবে। কুচ ঢেকে ছলনায় কুচমূল দেখাবে। নীবিবন্ধন দৃঢ় বাখবে। মান করবে, কিছু ভাবও রাখবে। রস রেখো যাতে পুনপুন আসে।[১]

কৃষ্ণেব প্রতিও সখীরা কিছু উপদেশ দিয়েছেন,—

বালি বিলাসিনী জতনে আনলি
রমন করব বাখি।
জৈসে মধুকব কুসুম ন তোড
মধুপিব মুখ মাখি॥

---

(২) মৃগমদ পঙ্ক অলকা। মুখ জনু করহ তিলকা॥
নিপুণ পুনিমকে চন্দা। তিলকে হোএত গএ মন্দা॥
সহজহি সুন্দরি বড়ি রাহী। কি করবি অধিক পসাহী॥
উজর নয়ন নলিনা। কাজরে ন কর মলিনা॥
দুধক ধোএল ভমরা। মসিবুড়ি জাএত সামরা॥
পীন পয়োধর গোরা। উলটল কনককটোরা॥
চন্দনে ধবল ন করু। হিমে বুড়ি জাএত সুমেরু॥ (৯৭ প.)

অলকে চন্দন মৃগমদ, মুখে তিলক দিও না। পুর্ণিমা চাঁদ (রাধার মুখ) তিলকে ম্লান হবে। স্বভাবসুন্দরী রাধার আর বেশী সাজ সজ্জার কি প্রয়োজন? উজ্জ্বল নলিন নয়ন কাজলে মলিন কোরো না। দুধে ধোয়া ভ্রমর মসীতে কালো হবে। উলটানো স্বর্ণ-বাটির ন্যায় গৌরবর্ণ উন্নত পয়োধর। তাকে চন্দনে শুভ্র কোরো না—হিমে (তুষারে) সুমেরু ঢাকা পড়বে।

—এই দ্বিতীয় পদে কবি সুকৌশলে রাধার অঙ্গকান্তিকে সকল প্রসাধন থেকে বেশী সৌন্দর্য দিয়েছেন এটি লক্ষণীয়।

২। এ প্রসঙ্গে ৬৬৬ (খ), ৬৬৭, ৬৬৮ নং পদ দ্রষ্টব্য।

মাধব—করব তৈসনি মেবা
বিনু হকারেও সুনিকেতন
আবএ দোসরি রেরা ॥ [২৮৯ প.]

'বিলাসিনী বালাকে যত্নকরে এনেছি। মধুকর কুসুম না ভেঙে যেমন মধু মুখে মেখে পান করে, তুমিও তেমনি রেখে রমন করবে। মাধব তুমি এমন ভাবে মিলন করবে যে বিনা আহ্বানেও সে দ্বিতীয়বার সুনিকেতনে (কুঞ্জগৃহে) আসে।' কিন্তু এই সখীরাই শেষ পর্যন্ত অভিজ্ঞা অভিসারিকার সঙ্গে আর তাল রাখতে পারেন না।

নিশি নিশিঅর ভম ভীম ভুঅঙ্গম
জলধর বিজুরি উজোর।
তরুণ তিমির নিসি তইঅও চললি জাসি
বড় সখি সাহস তোর ॥ [২০৯ প.]

'রাত্রে নিশাচর এবং ভয়ঙ্কর ভুজঙ্গমেরা ঘুরছে। মেঘে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। সন্ধ্যার অন্ধকার। তবু তুই অভিসারে চলেছিস সখি বড় সাহস তোর। সে কোন পুরুষরতন তোর মন হরণ করেছে—যে লোভে চলেছিস। দুস্তর নদী কিভাবে পার হবি? প্রেম গোপন করিস না সখি।'

প্রেমাভিজ্ঞতায় —
রাধা —

তোরা অছ পচসর তে তোহি নাহি ভর
মোর হৃদয় বরু কাঁপ ॥

'তোর পঞ্চশর আছে তাই ভয় নেই, আমার হৃদয় কিন্তু কাঁপছে।'

—এখানেই রাধা একেশ্বরী, অনন্যা,—সখীগণের থেকে পৃথক। সখিরা বহু যত্নে কৃষ্ণ-রাধাকে মিলিত করছেন। সে মিলনের অপার্থিব প্রেমানন্দে রাধা অসম সাহসী হয়ে উঠেছেন। একটি পদে তিনি বলছেন—

সখি হে আজ জায়ব মোহী।
ঘর গুরুজন ওর ন মানব
বচন চুকব নহী ॥
... ...

'সখি আজ আমি অভিসারে যাবই। ঘরে গুরুজনের ভয় করব না,—কৃষ্ণের কাছে আমার অঙ্গীকার ভাঙব না। দেহে চন্দন লেপে, গজমতির হার দুলিয়ে, নয়নে কাজল না দিয়ে শ্বেতবসনে অভিসারে যাব।'

জইও সগর গগন উগত
সহসে সহসে চন্দা।
ন হম কাহুক ডীঠি নিবারবি
ন হম করব ওতে। [৭৫ প.]

'যদি সকল আকাশ ভরে সহস্র চাঁদও ওঠে তবু আমি যাব। কারও দৃষ্টি নিবারণ করব না, -নিজেকে আড়াল করব না।'

অসম সাহসিকা অভিসারিণী এই রাধাকে বিদ্যাপতি ধীরে ধীরে প্রেমের প্রতিটি পাঠ পড়িয়ে গড়ে তুলেছেন,—তার মানস পরিণতির প্রত্যেকটি স্তর নিপুণ ভাবে গড়ে তুলেছেন।

মান-প্রসঙ্গ

মানের পদেও বিদ্যাপতির বৈচিত্র্য অসাধারণ। সমাজ অভিজ্ঞতা, লোক-চরিত্রজ্ঞান, সংস্কৃত-প্রাকৃত প্রেম-সাহিত্য পঠনে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য তিনি মানিনী রাধার ছবি আঁকার কাজে লাগিয়েছেন। মানে বোধ হয় শ্রেষ্ঠ কবি [illegible]দেব। গীতগোবিন্দের

জয়দেবের প্রভাব

সপ্তম সর্গে বাসকসজ্জিকা রাধার [illegible] কৃষ্ণের জন্যে অপেক্ষমানা চিত্র এঁকেছেন—বিলা[illegible]র চিত্র বড় করুণ। অষ্টম সর্গে খণ্ডিতা রাধার কাছে প্রভাতে যে কৃষ্ণ ফিরে এলেন তার চিত্রও। রাধার শ্লেষ নিপুণ বর্ণনায় তার কিছুটা উদ্ধৃত করছি।—

কজ্জলমলিনবিলোচন চুম্বন বিরচিতনীলিমরূপং।
দশনবসনমরুণং তব কৃষ্ণতনোতি তনোরনুরূপং ॥২

বপুরনুহরতি তব স্মরসঙ্গরখরনখরক্ষতরেখং।
মরকতশকল কলিতকলধৌতলিপেরিব রতিজয়লেখং ॥৩

চরণকমলগলদলক্তসিক্তমিদস্তব হৃদয়মুদারং।
দর্শয়তীব বহির্মদনদ্রুমনবকিশলয় পরিবারং ॥৪

'শ্রীকৃষ্ণের বঙ্কিম অধর ব্রজযুবতীদের কাজলচোখের চুম্বনে নীল হয়ে দেহরঙের সাদৃশ্য পেয়েছে। শ্যামদেহ রতিরণনিপুণাদের নখরেখা[illegible]ত হয়ে যেন মরকতে স্বর্ণময়ী লেখা রতিরণজয়পত্রের মত শোভা পেয়েছে। প্রশস্ত বুকে বরাঙ্গনাদের আলতা পরা পায়ের চিহ্ন যেন হৃদয়ে আঁকা মদনতরুর অরুণরাঙা নব পল্লবের মত শোভা পাচ্ছে।'

শ্রীরাধার এই মানিনীখণ্ডিতা রূপ জয়দেব নিপুণ হাতে এঁকেছেন। শ্রীকৃষ্ণের হয়ে প্রথমে প্রিয়সখী মান ভাঙাতে যত্ন করলেন তাতে রাধার মন কিছু নরম হয়েছে বুঝে এবারে স্বয়ং কৃষ্ণ মানিনীর মান ভাঙাতে যত্নশীল হলেন। দশম সর্গের সে বর্ণনা প্রেম-কাব্যসাহিত্যে অমর হয়ে আছে। কৃষ্ণ বলছেন—

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দান্তরুচিকৌমুদী
হরতি দর তিমিরমতি ঘোরম্।

'প্রিয়ে। তুমি কিছু বললে তোমার দন্তরুচি জ্যোৎস্নালোকে আমার ভয়রূপা মনের আঁধার কাটতে পারে। তোমার বদনচন্দ্রের অধরসুধা পানে আমার নয়নচকোর লোলুপ হয়ে আছে। তুমি আমার প্রতি কুপিতা হলে নয়নবানে আমায় আঘাত কর, ভুজপাশে আমায় বেঁধে দশনাঘাতে শরীর বিক্ষত করে দাও। হে রাধা—

'ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নং।

'তুমিই আমার ভূষণ, আমার জীবন, আমার ভবজলধির (সংসার সাগরের) রত্নস্বরূপ।…রক্তিরঙ্গে আমার হৃদয়শোভাকারী কমললাঞ্ছিত তোমার পদযুগল অলক্তকরঞ্জিত করতে আমায় অনুমতি দাও।—

স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদ পল্লবমুদারং।

'তোমার রমনীয় পদপল্লব আমার মস্তকের শোভা হয়ে উঠুক, আমার মদন বিষের জ্বালা নিবারণ করুক।'

বিদ্যাপতি এবং অন্যান্য চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব কবিবৃন্দ মানিনী রাধার চিত্রাঙ্কনে জয়দেবের চিত্রাবলীর কম বেশী অনুসরণ করেছেন। তবু বোধ হয় বিদ্যাপতি মানিনী রাধার মুখে ভারতীয় সমাজের এবং পুরুষ জাতি সম্পর্কে নারী মনের বাস্তব অভিজ্ঞতার অনেক নতুন মূল্যবান কথা বলেছেন।—

(১) পুরুষ ভমরসম কুসুমে কুসুমে রম—
পেঅসি করএ কি পাবে। [১২৫ প.]

'পুরুষ ভ্রমরের মত ফুলে ফুলে মধু খায়—প্রেয়সী কি করবে আর।'

(২) গগন মণ্ডল দুহুক ভুগন একসর উগ চন্দা।
গত্র চকোরী অমিয় পীবএ কুমুদিনী সানন্দা॥

মালতি কাঁইএ করিঅ রোস।
একল ভমর বহুত কুসুম কমল তাহেরি দোস।
জাতকি কেতকি নবি পদুমিনি সব সম অনুরাগ।
তাহি অবসর তোহি ন বিসর এহে তোর বড ভাগ॥

[৪৩৬ প.]

'গগনে চাঁদ দুয়ের ভূষণরূপে উদিত হয়। চকোরী যখন চন্দ্রসুধা পান করে কুমুদিনী আনন্দিতা হয়। মালতী কেন রোষ ক'রস। ভ্রমর একা কুসুম বহুবিধ —এতে তার কি দোষ হল? জাতকী, কেতকী, নবপদ্ম সকলের তার প্রতি সম অনুরাগ। সেই অবসরে তোকে যে সে ভুলে যায় না এই মহাভাগ্য।

(৩) পরক বেদন দুখ ন বুঝয়ে মুরুখ
পুরুষ নিরাপন চপলমতী। [৪৫৮ প.]

'মুর্খ পরের বেদনা বোঝে না, পুরুষ চপলমতি—সে কখনও আপনার হয় না।' —এমন অনেকগুলি পদে পুরুষদের স্বভাব সম্পর্কে কটাক্ষ রয়েছে। সমাজে বহুবল্লভ। পুরুষের প্রাধান্য সম্পর্কে নারীসমাজের বেদনা রাধার মুখে নারীরূপের উক্তিগুলির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। দূতীরা, প্রিয়সখীবৃন্দ এখানে শ্রীরাধাকে বুঝিয়েছেন—

দিবস তিল আধ রাখবি জৌবন
রহই দিবস সব জাব।
ভালমন্দ দুই সঙ্গ চলি জায়ব
পর উপকার সে লাভ॥ [৬৬৪ প.]

'একে একে সব দিনগুলিই চলে যাবে, যে কদিন যৌবন রয়েছে—তার এক তিলও বেশী তাকে ঘরে রাখতে পারবে না। ভাল মন্দ—দুইই চলে যাবে। যে টুকু পরোপকার করবে তাই লাভ। হে সুন্দরী একথা জেনেও হরি বধের ভাগী কেন হবে?'

'জয়দেবের শ্রীকৃষ্ণের মত বিদ্যাপতির শ্রীকৃষ্ণও রাধার মান ভাঙতে অনেক যত্ন করেছেন, ছলনার আশ্রয় নিয়েছেন।—'রাধা অকারণে আমায় দোষী করছ কেন? রাত জেগে শিবপূজা করেছি তাই আসতে বিলম্ব হল—এসব মৃগমদ কুঙ্কুম পূজোপকরণের চিহ্ন। সারারাত মন্ত্র পড়ে অধর রাগশূন্য হয়েছে। রাত জেগে চোখ লাল হয়েছে। তুমি আমায় চোর বলে কেন অপবাদ দাও।' [৬৪৫ প.]

—'হে ধনি মান সংযত কর। তোমার কুচ হেম-ঘটে রক্ষিত স্বর্ণহার ভুজঙ্গিনীতে আমি হাত রাখছি। সত্যি অপরাধী হলে এই ভুজঙ্গিনী আমায় দংশন করবে। আমার কথায় যদি বিশ্বাস না কর যে শাস্তি উচিত মনে কর দাও।

ভুজপাস বাঁধি জঘন-তর তারি।
পয়োধর পাথর হিয় দহ ভারি॥ [৬৪৭ প.]

হৃদয় কারাগারে দিনরাত আমায় বেঁধে রেখো—বিদ্যাপতি বলেন এই সমুচিত শাস্তি হবে।'

কলহান্তরিতা

কলহান্তরিতা অর্থাৎ মান-বিরহে অনুতপ্তা রাধার চিত্রও কবি এঁকেছেন।—এবারে মানান্তে মিলনের একটি সার্থক চিত্র দিয়ে মানের বর্ণনা শেষ করা যেতে পারে।—

অপরূপ রাধামাধব রঙ্গ।
দুর্জয় মানিনি মান ভেল ভঙ্গ॥
চুম্বই মাধব রাহি বয়ান।
হেরই মুখসসি সজল নয়ান॥
সখিগণ আনন্দে নিমগণ ভেল।
দুহুঁজন মনমাহা মনসিজ গেল॥
দুহুঁজন আকুল দুহুঁ করু কোর।
দুহুঁ দরশনে বিদ্যাপতি ভোর॥ [৬৬২ প.]

'রাধা-মাধবের রঙ্গ অপরূপ। দুর্জয় মানিনীর মান এবারে ভাঙল। মাধব রাধার মুখচুম্বন করলেন; মুখশশী দর্শনে নয়ন সজল হয়ে উঠল। সখিরা আনন্দে মগ্ন হলেন। দু'জনের হৃদয় কন্দর্পের অধীন হল। উভয়ে আলিঙ্গনাকুল হলেন। এই মিলনে দু'জনকে দেখে বিদ্যাপতি আনন্দে বিভোর হলেন।'

মানিনী কলহান্তরিতা শ্রীরাধার চিত্ররূপ বর্ণনে চৈতন্যোত্তর বাঙলার পদকারেরা বিদ্যাপতির তুলনায় বেশী সফল হয়েছেন অনেক সমালোচক এমন মন্তব্য করছেন। —একথা সত্য গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাসের হাতে রাধার মান-চিত্র অনেক স্নিগ্ধ কোমল অভিমানসুন্দর হয়েছে।—এই স্নিগ্ধতা, কোমলতা বাংলাদেশের বৈশিষ্ট্য,— কিন্তু বিদ্যাপতি তীব্র শ্লেষ-প্রয়োগ-নিপুণা যে রাধাকে এঁকেছেন অকৃত্রিমতার প্রাকৃত সৌরভে সে রাধাও সার্থক। পরন্তু জীবনরসাভিজ্ঞ কবি বিদ্যাপতির রাধা অন্যান্য

পর্যায়ের মত মানের পর্যায়েও অনেক বেশী বাস্তব অকৃত্রিম হয়ে উঠেছে এটি লক্ষণীয়।

বিদ্যাপতি ইন্দ্রিয় প্রেমের কবি

পূর্বেই উল্লেখ করেছি বিদ্যাপতি প্রেমের চিত্ররূপায়ণে ইন্দ্রিয়কে অস্বীকার করেননি। তবে 'কাম-প্রেম দুহুঁ একমত' হলেই যে তিনি বেশী আনন্দিত হন অসংখ্য পদে তার সার্থক দৃষ্টান্ত মেলে। লৌকিক প্রেমকে ভোগের ঊর্ধে অসীম ব্যঞ্জনা দিতে তিনি কার্পণ্য করেন নি। মাথুর-বিরহের পদে এই লোক-প্রেমের লোকোত্তর ব্যঞ্জনা বোধহয় সর্বাপেক্ষা বেশী প্রকাশ পেয়েছে। কৃষ্ণ মথুরা গিয়েছেন। রাধা বিলাপ করছেন, 'কাল সন্ধ্যা—প্রিয়তম মথুরা যাবেন বললেন, অভাগিনী আমি জানলাম না। —নইলে সঙ্গে যেতাম। একশয্যায় শুয়েছিলাম—

মাথুর-বিরহ

ন জানল কতি খন তেজি গেলরে
বিছুরল চকেবা জোর।

কখন ত্যাগ করে গেছে জানিনি। চক্রবাক মিথুনের জোড় ভাঙল। ঘরে প্রিয় নেই, শূন্য শয্যা হিয়াকে বিদীর্ণ করছে। সখি। মিনতি শোন, আমার দেহ অগ্নিতে সাজিয়ে দাও!' [১৫৮ প.]। আর একটি পদে রয়েছে,— 'আশায় আশায় বিরহিণী' রাধার কতদিন কাটল,—

ছল ছল কয়কই দিবস গমাওলি
দিবস দিবস কয় মাসে।
মাস মাস কই বরস গমাওলি
আব জীবন কোন আশে॥ [১৬৩ প.]

ক্ষণ ক্ষণ করে দিন, দিন দিন করে মাস, মাস মাস করে বছর কেটে গেল। আর জীবনের কি আশা!

সখীরা গিয়ে মাধবকে রাধার কথা বলছেন,—

মাধব কত পরবোধব তোয়।
দেহ দিপতি গেল হার ভার ভেল
জনম গমাওল রোয়॥

'মাধব তোমায় আর কি বোঝাব! দেহের দীপ্তি গেছে, গলার হার পর্যন্ত তার

কাছে তার মনে হচ্ছে। কেঁদে কেঁদে জনম কাটল! অঙ্গুরী বলয়ের মত হয়েছে, দেহ সুতার মত ক্ষীণ, সখীরা ছুঁতে ভয় পায়।—নবমীদশা দেখে এসেছি তাঁর!'

রাধার আর্ত বেদনার ক্রন্দন সর্বাপেক্ষা গভীর হয়ে উঠেছে যে পদে সেটিও উদ্ধৃত করি।—

চির চন্দন উরে হার ন দেলা।
সো অব নদীগিরি আঁতর ভেলা॥
পিয়াক গরবে হম কাহুক ন গনলা।
সো পিয়া বিনা মোহে কে কিনা কহলা॥
বড় দুখ রহল মরমে।
পিয়া বিছুরল জদি কি আর জিবনে॥
পূরব জনমে বিহি লিখল ভরমে।
পিয়াক দোখ নহি জে ছল করমে॥
আন অনুরাগে পিয়া আনদেসে গেলা।
পিয়া বিনা পাঁজর ঝাঁঝর ভেলা॥ [১২৭ প.]

'যার সঙ্গে মিলন-ব্যবধান আশঙ্কায় রাধা বক্ষে চীর (বস্ত্র), চন্দন এবং হার পরেন নি—সেই প্রিয় আজ নদী গিরির ব্যবধানে চলে গেছেন। তবু বিরহিণী প্রিয়ের ওপর রাগ করতে পারেন নি। প্রিয়ের দোষ নেই, বিধি পূর্বজন্মে যা লিখেছে, কর্মে যা ছিল, তাই হয়েছে।'

প্রকৃতি সচেতন কবি

বিদ্যাপতি প্রকৃতি-সচেতন কবি ছিলেন। বর্ষা এবং বসন্তকে নানাভাবে মিলন-বিরহের পটভূমি-রূপে তিনি চিত্রিত করেছেন। বর্ষা-বিরহ চিত্রণে বিদ্যাপতি যে কালিদাসের যোগ্যতম শিষ্য সে সম্পর্কে শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু বিদগ্ধ আলোচনা করেছেন (দ্র. চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি : ১ সং : পৃ. ৩৭৮-৮০)। কবির বর্ষা বিরহের শ্রেষ্ঠপদটি বাংলা অনুবাদ সহ এখানে উদ্ধৃত করি।—

সখিহে হামারি দুখের নাহি ওর
এ ভর বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর
ঝম্পি ঘন গরজন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।

কন্ত পাহুন কাম দারুন
সঘনে খর সর হন্তিয়া ॥
কুলিশ কত শত পাত মোদিত
ময়ুর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরি ডাকে ডাহুকি
ফাটি জায়ত ছাতিয়া ॥
তিমির ভরি ভরি ঘোর জামিনি
নথির বিজুরিক পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া ॥ [১২০ প.]

'সখি আমার দুঃখের শেষ নেই। এই ভরাবাদল, ভাদ্র মাস, আমার গৃহ শূন্য। চারদিকে ঝেঁপে মেঘ গর্জন করছে। ভুবন ভরে বর্ষণ চলছে। কান্ত প্রবাসী, কাম দারুণ, সঘন তীক্ষ্ণ শর হানছে। শত শত বজ্রপাত হচ্ছে আনন্দোন্মত্ত ময়ুর নৃত্য করছে। মত্তদাদুরী এবং ডাহুকী ডাকছে। আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। চারদিকব্যাপী ঘনান্ধকার, ঘোরযামিনী, অস্থির বিদ্যুৎ-পংক্তি। বিদ্যাপতি ভাবিত হয়ে রাধাকে বলছেন, হরিবিনে এই দিনরজনী কেমন করে কাটাবে ?'

এমন আচ্ছন্ন নিবিড় একটি বর্ষাবিরহের আসন্ন দুর্যোগময় সন্ধ্যার পরিবেশ দ্বিতীয় কোনও বৈষ্ণবপদে আমরা পেয়েছি বলে স্মরণ হয় না। বর্ষার ধারাপাতে যেন শ্রীরাধার আর্ত কান্নাই ঝরে ঝরে পড়ছে—

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভর বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর ॥

মেঘের ঘনগর্জনে বিদ্যুৎঝলকের মত আর একটি মর্মচ্ছেদী বেদনা প্রকাশ পেল রাধার বুক ফাটা আর্তনাদে, 'ফাটি যাওত ছাতিয়া।' একদিকে প্রকৃতির বুকে এত নিবিড় মিলন সমারোহ! মত্তময়ূরের নৃত্য, ডাহুক ও দাদুরীর উল্লাস!—অপর দিকে শূন্য ঘরে ভরা ভাদরে ভাদ্র রজনীতে কৃষ্ণ-বিরহিনী রাধিকার আকুল বুক ভাঙা কান্না। এই পদটি স্মরণ করেই শ্রীবুদ্ধদেব বসু বলেছেন, 'একটি মাত্র মুহূর্তে বৈষ্ণব কবি যা পেরেছেন, শতোত্তর মন্দাক্রান্তা শ্লোক তাতে বিফল হোল'।

শঙ্করীপ্রসাদ বসু এ মন্তব্যকে আর একটু সংশোধন করে আমাদের মনের কথাটি বলেছেন, 'বৈষ্ণব কবি, এবং পরবর্তী রবীন্দ্রনাথ কবি পর্যন্ত বহুকবি, একটি ও অজস্র শ্লোকে শতোত্তর মন্দাক্রান্তাকে 'সফল' ('বিফল' নয়) করিয়া তুলিয়াছেন।'

বৈষ্ণব সাহিত্যে চৈতন্য-পূর্ববর্তী কবি চণ্ডীদাস এবং বিদ্যাপতির কিছু কিছু পদকে তাদাত্ম্যভাবপ্রাপ্তির পদরূপে ভক্ত-ব্যাখ্যাতারা চিহ্নিত করেন। চৈতন্য আবির্ভাবের সংকেত এইসব পদে ভবিষ্যৎদ্রষ্টা কবিদের দ্বারা প্রচারিত হয়েছে বলে তাঁরা গণ্য করেন। এমন ভক্তি-অন্ধ দৃষ্টিতে না দেখে বিদ্যাপতির অনুরূপ দু একটি পদের ভাব ও কবিত্বের বিচার করলে বিস্মিত হতে হয়।—শূন্য গোকুলে যমুনায় গোপ-গোপীরা আর কেলি করে না। পিঞ্জরে শুকপাখী কাঁদছে। রাধা আত্মবিসর্জনের সংকল্প নিচ্ছেন,—

প্রেম-বেদনার গভীরতা

সাগরে তেজিব পরাণ।
আন জনমে হেরব কান॥
কাহ্নু হোয়ব যব রাধা।
তব জানব বিরহক বাধা॥ [৭৫০ প.]

অন্য জন্মে রাধা কৃষ্ণকেই রাধারূপে দেখতে চান। কানু রাধা হয়ে এলে রাধার বিরহ উপলব্ধি করতে পারবেন। প্রেম-বেদনার কত গভীর একটি স্বতস্ফূর্ত প্রকাশরূপ এই দুই ছত্রে ফুটে উঠেছে! আর একটি পদে আরও ভাবগভীর অধ্যাত্ম প্রেমদৃষ্টির তন্ময় রূপচিত্র প্রকাশ পেয়েছে।—

অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে সুন্দরী ভেলি মধাঈ।
ও নিজ ভাব স্বভবহি বিসরল আপন গুণ লুবুধাঈ॥
মাধব, অপরূপ তোহারি সিনেহ।
অপনে বিরহ অপন তনু জর জর জিবইতে ভেল সন্দেহ॥
ভোরহি সহচরি কাতর দিঠি হেরি ছলছল লোচন পানি।
অনুখন রাধা রাধা রটইত আধা আধা কহু বাণি॥
রাধা সয়েঁ জব পুনতহিঁ মাধব মাধব সয়েঁ জব রাধা।
দারুন প্রেম তবহি নহি টুটত বাঢ়ত বিরহক বাধা॥
দুহুঁ দিশে দারুদহনে জৈসে দগধই আকুল কীট পরাণ।
ঐসন বল্লভ হেরি সুধামুখি কবি বিদ্যাপতি ভান॥

[৭৫১ প.]

'অনুক্ষণ মাধব মাধব স্মরণ করতে করতে সুন্দরী মাধব হল। আপনার গুণে লুব্ধ হয়ে সে নিজের ভাব ও স্বভাব ভুলে গেল।[১] মাধব, তোমার প্রেম অপূর্ব। নিজের বিরহে রাধা নিজে জর্জবিত। তার বাঁচাই সংশয়। সে বিহ্বল হয়ে সহচরীদের দিকে কাতব চোখে তাকায়। তার নয়ন ছলছল করে। নিজেকে মাধব জ্ঞানে সর্বদা 'বাধা-রাধা' বলে, আধ-আধ ভাষ বলে আবার নিজেকে রাধা জ্ঞানে 'মাধব-মাধব' বলে। তবু নিদারুণ প্রেম টুটে না, বিরহ বেদনা বেড়ে যায়। কবি বিদ্যাপতি বলছেন, কাষ্ঠে দুদিক থেকে অগ্নি দিলে তার মধ্যে আকুল কীটের প্রাণ দগ্ধ হয়, - সুধামুখিকে সেরূপ দেখছি।'

এ পদটির ব্যাখ্যায় শঙ্করীপ্রসাদ বসু বলেছেন, 'বিদ্যাপতিব কবি স্বভাবের ব্যাপকতা, মুক্তি ও স্ফূর্তি, গহন গাম্ভীর্য এবং জ্ঞানাত্মক ভাবসাধনার প্রমাণরূপে ইহার উল্লেখ কবা চলে। ইহাকে অদ্বৈত ভাবপ্রাপ্তিব বা সম্পূর্ণ সত্তারূপান্তরের দৃষ্টান্ত বলিতে ইচ্ছা করে, এবং যথার্থ মনন ও 'মরমে'ব সমন্বয় যাঁহাব মধ্যে, তিনিই এরূপ একটি পদ লিখিবার অধিকারী।'

এ পদে রাধাব প্রেম-নিবিডতা যেমন সীমাহীন, প্রেমের বেদনাও তেমনি অসীম। মাধবকে অনুখণ স্মরণ কবতে করতে নিজেই মাধব হয়ে এক দেহে উভয়েব মিলন-বিবহেব সকল উপলব্ধি লাভ করেছেন। একদিকে রাধার কৃষ্ণ-বিবহাগ্নি, অপবদিকে কৃষ্ণেব বাধা-বিরহাগ্নি, শ্রীবাধার এই মবদেহ দুদিক থেকে দুই বিবহাগ্নিতে জ্বলছে। এ কল্পনায় বিদ্যাপতি রাধার বিরহকে যে অসীমতা দিয়েছেন তাব তুলনা মিলবে না।

'পদাবলীর ভাবসম্মিলন পরিকল্পনায় শ্রীবাধাব প্রেম-ট্রাজেডি পূর্ণতা লাভ করেছে। ভক্ত-সাধকেরা বলবেন, এবারে রাধার বৃন্দাবনে মর্ত্যলীলায় কৃষ্ণ প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটল। ভাববৃন্দাবনে নিত্য-লীলায় শ্রীরাধাব অন্তরে কৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটল।—আর বিরহ নেই এবার থেকে অনন্ত ভাবামলন। কিন্তু কাব্যেব রসরূপের দিক থেকে

ভাবসম্মিলন

১। ভাগবতের দশমস্কন্ধের ত্রিশ অধ্যায়ে গোপীদের প্রেমতন্ময় অবস্থায় 'আমিই মাধব' এমন বোধ হয়েছিল তার বর্ণনা রয়েছে। জয়দেবও গীতগোবিন্দে লিখেছেন :

মুহুরবলোকিত মণ্ডনলীলা।
মধুরিপুরহমিতি ভাবন শীলা॥ ৬।৫

সখীরা বলছেন কৃষ্ণকে : রাধা তোমার ন্যায় বেশভুষা ধারণ করে বারবার দেখছেন এবং আমিই মধুরিপু শ্রীকৃষ্ণ এরূপ মনে করছেন।

রাধার এই চিত্র বড় করুণ। বিরহের দশ দশার অন্যতম উন্মাদাবস্থা। রাই উন্মাদিনী কৃষ্ণবিরহে বাহ্য চেতনা হারিয়েছেন। কল্পনায় ভাবছেন প্রিয়মিলন হয়েছে তার।—

আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়নু
পেখলু পিয়ামুখচন্দা।
জীবন জৌবন সফল করি মানলু
দসদিস ভেল নিবদন্দা॥ [৭৩০ প.]

'আজ রাধা তাঁর গৃহকে গৃহ বলে মানলেন। বিধাতা রাধার অনুকূল হয়েছেন সব সন্দেহ আজ তার দূরে গেল।...বিদ্যাপতি ভণিতায় বলছেন, হে ধনি তোমাব নব প্রেমের ভাগ্য অল্প নয়। যে প্রেম তন্ময় আকুলতায় ভাবসম্মিলনে কৃষ্ণকে মানস-বৃন্দাবনে টেনে আনে সে প্রেম নবপ্রেম নয়তো কি।

বিদ্যাপতির ভাবসম্মিলনের আর একটি পদেরও উল্লেখ করা যেতে পারে। দারুণ বসন্তের দিনে দূরে চলে গিয়ে শ্রীরাধাকে যত দুঃখ দিয়েছেন হরির মুখ দেখে আজ সব দুঃখ দূর হল। মনের সকল সাধ প্রিয়ের প্রসাদে পূর্ণ হল—

কি কহবরে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥[১] [৭৬১ প.]

১। চৈতন্যচরিতামৃতে (মধ্যলীলা : ৩য় পরিচ্ছেদ) এই পদটির উল্লেখ পাওয়া যায়।

কি কহবরে সখি আজুক আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥
এই পদ গাই হর্ষে করেন নর্তন।
আচার্য নাচেন প্রভু করেন দর্শন॥
স্বেদ কম্প অশ্রু পুলক হুঙ্কার গর্জন।
ফিরি ফিরি কভু প্রভুর ধরেন চরণ॥

এই পদটি পরিবর্তিত ভাবে সংকীর্তনামৃতে এবং পদকল্পতরুতে অনেকটা নিম্নপাঠে পাওয়া যায় :—

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর।'
পাপ সুধাকর যত দুখ দেল।
পিয়া-মুখ দরশনে তত সুখ ভেল॥

আচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাই।
তব হাম পিয়া দূর দেশে না পাঠাই॥
শীতের ওঢনী পিয়া গীরিষির বা।
বরিষার ছত্র পিয়া দারিয়ার না॥

ভনয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
সুজনক দুখ দিন দুই চারি॥ [৭৬১ প. পাদটিকা]

ডাঃ মজুমদার ও অধ্যাপক মিত্র অনুমান করেন পরিবর্তিত এই পদ বাঙালী কোনও বিদ্যাপতির রচনা। [দ্র. বিদ্যাপতি (১ম সং) পৃ ৪৭২]

"সখি আনন্দের সীমার কথা কি বলব। এতদিনে মাধব আমার মন্দিরে এসেছেন। রভস আলিঙ্গনে পুলকিত হলাম, অধর সুধাপানে বিরহ দূরে গেল।' ভাব-তন্ময় এই কল্পমিলন বৈষ্ণব ভক্তদের যতই আনন্দের সামগ্রী হোক না কেন, রসিক শ্রোতার নয়ন করুণ বেদনায় সজল হয়ে উঠবে উন্মাদিনী বিরহিণী রাধার জীবন ট্রাজেডী স্মরণে।

ভাবসম্মিলনের কল্পনায় উল্লসিত শ্রীরাধা কৃষ্ণ অর্চনায় আপন দেহরূপ মন্দিরটি কিভাবে সাজিয়ে তুলবেন একটি পদে তারও চমৎকার চিত্র পাওয়া যায়।—

পিয়া জব আওব এ মঝু গেহে।
মঙ্গল জতহুঁ করব নিজ দেহে॥
কনয়া কুম্ভ ভরি কুচযুগ রাখি।
দরপন ধরব কাজর দেই আঁখি॥
বেদি বনাওব হম অপন অঙ্গমে।
ঝাড়ু করব তাহে চিকুর বিছানে॥
কদলি রোপব হম গরুআ নিতম্ব।
আম-পল্লব তাহে কিঙ্কিনি সুঝম্প॥
দিসি দিসি আনব কামিনি ঠাট।
চৌদিকে পসারব চাঁদক হাট॥
বিদ্যাপতি কহ পূবব আস।
দুই এক পলকে মিলব তুঅ পাস॥ [৭৫৪ প.]

প্রিয় যখন আমার এ ঘরে আসবে নিজদেহে সব মঙ্গলাচার করব। কুচযুগলকে স্বর্ণকলস করব। চোখে কাজল দিয়ে দর্পণ তৈরী করব। আপন অঙ্গে (পূজা) বেদী তৈরী করব। চিকুর বিছিয়ে ঝাড়ু তৈরী করব। গুরু নিতম্বকে কদলীরূপে রোপণ করব। তাতে কিঙ্কিনীকে আম্রপল্লব করে দেব। সকল দিকে কামিনীর ঠাট এনে চাঁদের হাট বসিয়ে দেব। বিদ্যাপতি বলেন, তোমার আশা পূরণ হবে, পলকে সে তোমাপাশে আসবে '

—এ পদ রচনায় অমরুশতকের একটি শ্লোক থেকে[১] কবি সাহায্য পেয়েছেন।

১। দীর্ঘা চন্দনমালিকা বিরচিতা দৃষ্ট্যাবনেন্দীবরৈঃ
পুষ্পাণাং প্রকরঃ স্মিতেন রচিতো নো কুন্দজাত্যাদিভিঃ।
দত্তঃ স্বেদমুচা পয়োধর যুগেনার্ঘ্যো ন কুম্ভাম্ভসা
স্বৈরেবাবয়বৈঃ প্রিয়স্য বিশতস্তন্ব্যা কৃতং মঙ্গলম্॥

কাম যখন প্রেমে রূপান্তরিত হয় তখনই বুঝি মদন রতির দেহপ্রত্যঙ্গগুলিকে এমন প্রেমপূজার উপকরণে রূপায়িত করা চলে। আর সেই পবিত্র প্রেমের অঙ্গীকার বুঝি পরমোল্লাসে সর্বসমক্ষে ঘোষণার ইচ্ছা জাগে।

বিদ্যাপতির পদাবলীর মুখ্য বিষয়ভাগের আলোচনা এক রকম শেষ হল। এখানে আর একবার আমরা স্মরণ করতে পারি, তিনি মুখ্যত কবি ছিলেন বলেই আমাদের ধারনা। অন্যান্য বৈষ্ণব পদকারদের থেকে এখানে তাঁর পার্থক্য। তাঁর যে প্রায় হাজার সংখ্যক পদ রাধা-কৃষ্ণ প্রেমলীলা বিষয়ক পদাবলীতে সংকলিত হয়েছে সেগুলি একটু যত্নের সঙ্গে পাঠ করলেই উপলব্ধি করা যায় বহু পদেই তিনি রাধাকৃষ্ণের নামও উল্লেখ করেননি। যেগুলিতে রাধাকৃষ্ণে নামোল্লেখ রয়েছে সেগুলিও সর্বাংশে আসলে রাধা-কৃষ্ণের বিষয় নিয়ে কবি লিখেছিলেন—না পরে বৈষ্ণব ভক্তদের হাতে এই নামগুলি সংযোজিত হয়েছে সন্দেহের বিষয়। শ্রীরাধার চিত্রাঙ্কনেও কবি যে একাধিক সংস্কৃত কবি ও রতিশাস্ত্র প্রবক্তাদের অনুসরণে পার্থিব কামকলার চিত্রণে স্বাচ্ছন্দ্য দেখিয়েছেন সেখানে ভক্ত কবির পরিবর্তে কামকলা রসিক সৌন্দর্যোপাসক কবির পরিচয় বড়ো হয়ে ওঠে। সংস্কৃত অলঙ্কার ও ছন্দের বিবিধ কারুকৌশলও বিদ্যাপতি তাঁর পদরচনায় যথাসম্ভব সার্থকভাবে প্রয়োগ করেছেন। মনে হয় শ্রীরাধার রূপবর্ণনায়, যৌবন-লীলা-চাতুর্যের বর্ণনায়, সখীদের রাধা-কৃষ্ণ প্রেম সহায়তায় বা লীলা বিস্তারিকা রূপচিত্রে, রাধার কিশোরী মনের মধুর বিকাশে, অভিসারের দুঃসাহসিক প্রেমাবেগ চিত্রণে, বিরহের অসীমতায়—পরবর্তী বৈষ্ণব কবিরা বিদ্যাপতির মাধ্যমেই সংস্কৃত কামকলার প্রাচীন কবিদের সঙ্গে মিলনসূত্রটি গেঁথে নিয়েছেন। পদাবলী সাহিত্যের প্রথম এবং সম্ভবতঃ বৈচিত্র্যের ও ভাব সৌন্দর্যের দিক থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ রূপকার হলেন বিদ্যাপতি। তিনিই রাধা-কৃষ্ণ লীলা আখ্যায়িকার প্রধানতম পর্যায়গুলির প্রথম কাঠামো তৈরী করে দিয়েছেন। শ্রীরাধার যৌবন-কিশোরী স্বর্ণপ্রতিমাটি তিনিই প্রথম সযত্নে তৈরী করে আমাদের উপহার দিয়েছেন। পরবর্তী কবিরা সেই মানুষী মূর্তিকে ধর্মীয় আধ্যাত্মিকতার একটি আচ্ছাদন দিয়েছেন। আদি অকৃত্রিম মাটির মানুষের রূপ সৌরভ বিদ্যাপতির রাধাই বেশী বিতরণ করেছেন, পাঠক মাত্রেই অকপটে সে সত্য স্বীকার করবেন।

বিদ্যাপতি মুখ্যত কবি

বিদ্যাপতির অলঙ্কার ব্যবহারের আশ্চর্য সফলতা লক্ষ্য করবার বিষয়। সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের বর্ণিত শব্দালঙ্কারে ও অর্থালঙ্কারের প্রধান প্রধান প্রায়সকল অলঙ্কারই তিনি ব্যবহার করেছেন। তবু তার মধ্যে উৎপ্রেক্ষা, অতিশয়োক্তি, ব্যতিরেক, দৃষ্টান্ত রূপক প্রভৃতি কয়েকটি অলঙ্কারে তার সৌন্দর্য প্রস্ফুটন অতুলনীয় বলা চলে। উৎপ্রেক্ষার কয়েকটি শ্রেষ্ঠ উদাহরণ:

কবির অলঙ্কার ব্যবহার

(১) সজনী ভল কত্র পেখন না ভেল।
মেঘ-মাল সয়ঁ তড়িত-লতা জনি হিবদয়ে শেল দঈ গেল।
[৬২৪ প.]

(২) যব গোধূলি সময় বেলি ধনি মন্দির বাহির ভেলি
নব জলধর বিজুরি-রেহা দন্দ পসারি গেলি॥
[৩১ প.]

(৩) চিকুরে গলয়ে জলধারা। মেহ বরিখে জনু মোতিম হারা॥
বদন মোছল পরচুর মাজি ধয়ল জনু কনক-মুকুর॥
তেই উদসল কুচ-জোরা। পলটি বৈসাওল কনক-কটোরা।
[৬২৬ প.]

এই তৃতীয় উদাহরণে কবি উৎপ্রেক্ষার মালা গেঁথেছেন বলা যেতে পারে। এবারে রূপকের দু'একটি উদাহরণ দিই।—

(১) বদন সরোরুহ হাসে মুকওলহ তেঁ আকুল মন মোরা।
[৩৮২ প.]

(২) শীতের ওঢ়নী পিয়া গীরিষির বা। বারষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না॥
[৭৬১ প. মন্তব্য)

(৩) হাথক দরপণ মাথক ফুল। নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল॥
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার। দেহক সরবস গেহক সার।
পাখীক পাখ মীনক পানি। জীবক জীবন হাম ঐছে জানি॥
(৭০৪ প.)

এখানে দ্বিতীয় ও তৃতীয় উদাহরণ মালারূপকের। একটি উপমেয়কে অবলম্বন করে কবি চমৎকারভাবে উপমানের রূপক (অভেদ কল্পনা) মালা গেঁথেছেন।

পাশাপাশি দৃষ্টান্ত এবং নিদর্শনা অলঙ্কারের চমৎকার দুটি উদাহরণও তোলা যেতে পারে। দৃষ্টান্ত—

অঙ্কুর তপন তাপে যদি জারব
কি করব বারিদ মেহে।
এ নব যৌবন বিরহে গোঙায়ব
কি করব সো পিয়া নেহে॥ [৭৩২ প.]

নিদর্শনা— জহাঁ জহাঁ পদ-যুগ ধরঈ। তহিঁ তহিঁ সরোরুহ ভরঈ॥
জহাঁ জহাঁ ঝলকত অঙ্গ। তহিঁ তহিঁ বিজুরি তরঙ্গ॥…
জহাঁ জহাঁ নয়ন বিকাস। তহিঁ তহিঁ কমল পরকাস॥
জহাঁ লহু হাস সঞ্চার। তহিঁ তহিঁ অমিয় বিথার॥
জহাঁ জহাঁ কুটিল কটাখ। ততহিঁ মদন সর লাখ॥…
[৬১৯ প.]

ব্যতিরেক অলঙ্কারটি বৈষ্ণব কবিদের বড়ো প্রিয়। শ্রীরাধার সৌন্দর্যের উৎকর্ষ দেখাতে উপমানরূপে একে একে চাঁদ, পদ্ম, হরিণ-নয়ন, কনক কটোরা কত কিছুই আনেন।—কিন্তু নায়িকার দেহ সৌন্দর্যের কাছে সবই ম্রিয়মাণ হয়ে বিদায় নেয়। বিদ্যাপতির অসংখ্য উদাহরণ থেকে একটি তুলছি এখানে।—

কবরী ভয়ে চামরী গিরি কন্দরে মুখ ভয়ে চাঁদ অকাসে।
হরিণি নয়ণ-ভয়ে স্বর ভয়ে কোকিল গতিভয়ে গজ বনবাসে॥
[৬২০ প.]

নিদর্শনা এবং ব্যতিরেক অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত দুটিতেও কবি অলঙ্কারের মালা গেঁথেছেন—তাতে ধ্বনি অনুপ্রাসের সৌন্দর্যও একই সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে। আর উদাহরণ তুলব না। রসজ্ঞ পাঠক বিদ্যাপতির পদ পড়তে গেলে পদে পদে অসংখ্য সার্থক অলঙ্কারের সন্ধান পাবেন। কখনো বা একই পদচিত্র একাধিক অলঙ্কারেও সাজানো হয়েছে। তবে বহু বৈষ্ণব পদকার যেমন অলঙ্করণের বিন্যাসে মাঝে মাঝে বেশ বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন, কাব্য-সৌন্দর্য অলঙ্করণের বাহুল্যে ক্ষুণ্ণ করে ফেলেছেন তেমন উদাহরণ বিদ্যাপতির রচনায় বিরল। বিদ্যাপতি বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে সম্ভবতঃ অলঙ্কার প্রয়োগে সর্বাপেক্ষা সফল হয়েছেন।

বৈষ্ণব পদাবলীর ছন্দের ঐশ্বর্য প্রাচীন সমস্ত কাব্যকে হার মানিয়েছে। সংস্কৃত লঘু গুরু আংশিক উচ্চারণ প্রভাবিত দিগক্ষরা, একাবলী, পজ্ঝটিকা, পয়ারাঙ্গের দ্বিপদী, ত্রিপদী প্রভৃতি পদবন্ধ বৈষ্ণব পদের প্রধানতম ছন্দনিদর্শন। বৈষ্ণবপদে উচ্চারণ প্রকৃতির দিক থেকে প্রধান রীতি হল লঘু-গুরু উচ্চারণ প্রভাবিত মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। এখানে রুদ্ধ দল (closed syllable) দ্বিকলামাত্রিক এবং সময় বিশেষে আ, ঈ, ঊ, এ, ও— সংস্কৃত গুরু স্বরধ্বনির উচ্চারণও দ্বিকলামাত্রিক। অক্ষরবৃত্ত রীতির শিথিলরূপও মেলে তবে চৈতন্য-পরবর্তী কবিতায় বেশী। আর স্বরবৃত্ত বা দলবৃত্ত ছড়াজাতীয় উচ্চারণ প্রকৃতির ছন্দ বোধ হয় লোচনদাসই প্রথম সফলভাবে ব্যবহার করেছেন। বিদ্যাপতির অধিকাংশ পদে প্রাচীন লঘু-গুরু উচ্চারণ প্রভাবিত মাত্রাবৃত্ত প্রকৃতির নিদর্শন পাওয়া যায়। তিনি পজ্ঝটিকা (৪।৪ ৪।৪) বা ত্রিপদী (৮॥৮॥১১।১০) বেশী ব্যবহার করেছেন।[১] সাতমাত্রার, ছয়মাত্রার যতিভাগের ছন্দও লিখেছেন। দু'একটি দৃষ্টান্ত দিই।—

ছন্দের ঐশ্বর্য

১। পজ্ঝটিকা : অব মথু। রাপুর। মাধব। গেল।
গোকুল। মানিক। কো হরি। নেল॥
[৭৩৩ প.]

২। মৃগমদ তিলক॥ অগর অনুলেপিত॥
সামর বসন সমারি। I
হেরহ পছিম দিস॥ কখন হোয়ত নিস॥
গুরুজন নয়ন নিহারি॥ I [২৪ প.]

দ্বিতীয় পদটির প্রথম পংক্তিটিতে ৭।৯॥১১ মাত্রার পদভাগ রয়েছে। শ্রীকালিদাস রায় এই রীতি-শিথিলতাকে প্রাকৃত নরেন্দ্রবৃত্ত ছন্দের প্রভাব বলে উল্লেখ করেছেন।

৩। একাবলী : এ ধনি। কর অব। ধান। I
তো বিনু। উনমত। কান॥ I
কারণ। বিনুখেলে। হাস। I
কি কহ এ। গদ গদ। ভাস॥ I

১। চিহ্নার্থ : শব্দের পাশে। পর্ব বা লঘু-যতি, ॥ পদ-বা অর্ধযতি
I পংক্তি বা পূর্ণ-যতি।

৪। ছয় মাত্রার পর্বভাগ :

ধব। গোধূলি সময়। বেলি ॥
ধনি। মন্দির বাহির। ভেলি I
নব জলধর। বিজুরি রেহা। দন্দ পসারি। গেলি I

এই পদে অতিপর্বের স্পন্দন লক্ষণীয়। তিন মাত্রার উপপর্বভাগের গতি-চঞ্চলতাও লক্ষ্য করার বিষয়। তখনো উচ্চারণ সুনির্দিষ্ট হয়নি বলেই মন্দির শব্দটি গীতিসুর-প্রভাবে তিনমাত্রায় উচ্চারণ করেছেন কবি। বাক্‌ধর্মী মাত্রাবৃত্ত ছন্দে এ-শব্দটি চার মাত্রার কমে উচ্চারণে ছন্দপতন অনিবার্য হয়ে ওঠে।

৫। সাতমাত্রার যতিভাগ :

এ সখি হামারি। দুখের নাহি ওর I
এ ভরা বাদর। মাহ ভাদর ॥ শূন্য মন্দির। মোর I
ঝম্পি ঘন গর-। জন্তি সন্ততি ॥ ভুবন ভরি বরি। খন্তিয়া I
কান্ত পাহুন। কাম দারুণ। সঘনে খরশর। হন্তিয়া I

এখানে অধিকাংশ পর্বে ৩+৪ মাত্রাভাগে শব্দ বিন্যাস করে উপযতি দিয়েছেন এবং গুরু উচ্চারণ-যতি বা উপযতিভাগের সূচনায় দিয়েছেন, তাতে ছন্দে ধ্বনি-তরঙ্গের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে। একপদী পংক্তির সঙ্গে দ্বিপদী, ত্রিপদী পংক্তির ব্যবহার বৈষ্ণব পদাবলীর একটি সুপরিচিত ছন্দরীতি। জয়দেবে তার ব্যবহার আছে। বিদ্যাপতিরও বহু পদে তেমন দৃষ্টান্ত মেলে। আলোচ্য পদটি তার অন্যতম উদাহরণ।

ভাব, ভাষা, চিত্ররূপ, অলঙ্কার ও ছন্দে পরবর্তী বৈষ্ণব কবিরা বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসেরই অনুসরণ করেছেন, সেখানে গোবিন্দদাস, কবিবল্লভ, জগদানন্দ, শশিশেখর, জ্ঞানদাস প্রভৃতি পদকারের বহু পদ পড়তে গেলেই বিদ্যাপতির অলঙ্কার ও ছন্দের সাদৃশ্যবোধ স্মরণ করতে হয়। বৈষ্ণব পদের ভাবরসে কিছু অলৌকিকত্ব গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদকারেরা হয়তো এনেছেন, তবে আলম্বন-বিভাব এবং মূল ভাবলীলা-বিস্তারের সঞ্চারী ভাবে রৌদ্র-ছায়ার লুকোচুরি খেলার চিত্রাবলম্বনে তাঁরা বিদ্যাপতিকেই আদর্শ ধরে অগ্রসর হয়েছেন। নরলীলায় রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের প্রাকৃত চিত্ররসিক বিদ্যাপতিকে বাংলা বৈষ্ণব কাব্যে আদিগুরুর মর্যাদা দিয়ে এবারে অন্যান্য পদকারের আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যেতে পারে।

কবি চণ্ডীদাস :

বাংলাভাষায় রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলাগানের আদিকবি, বাংলার আবালবৃদ্ধবনিতার সর্বজনপ্রিয় পদাবলীগানের কবি হলেন চণ্ডীদাস।—কিন্তু সে কোন্ চণ্ডীদাস? বড়ু চণ্ডীদাস, দ্বিজচণ্ডীদাস আর দীনচণ্ডীদাস—অন্ততঃ পক্ষে তিন চণ্ডীদাসের অস্তিত্বসমস্যা গবেষকদের কৌতূহলী করে তুলেছে। যাঁরা এতকাল ধরে চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত অপূর্ব ভাবতন্ময় রাধা-প্রেমপদাবলী গানে শ্রবণ-মন তৃপ্ত করে এসেছেন তাঁরা হয়তো ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের ভাষায় বলতে চাইবেন, 'ভাষা বিচার করিয়া কে খাঁটি চণ্ডীদাসকে বাশুলী সেবক চণ্ডীদাস · এই চণ্ডীদাসব্যূহের সমস্যা ভেদ করিতে যাইব না,—আমার কাছে চণ্ডীদাস এক বই দ্বিতীয় নাই।' কিন্তু অনুসন্ধিৎসু গবেষকেরা বাঁকুড়ার (ছাতনা গ্রামে) বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথি আবিষ্কার করেছেন,—অশেষ পরিশ্রম করে দীনচণ্ডীদাস নামে (সম্ভবত চৈতন্যোত্তর) তৃতীয় চণ্ডীদাসের পদাবলী পৃথক ভাগে সাজিয়েছেন।[১] যতদিন চণ্ডীদাস সমস্যা সম্পর্কে আরও নির্ভরযোগ্য তথ্যপ্রমাণাদি না মিলছে ততদিন আমরা তিন চণ্ডীদাসের অস্তিত্বই মেনে নিচ্ছি।[১] প্রথম দ্বিজচণ্ডীদাস বীরভূম নান্নুরের বাশুলী সেবক। সম্ভবত চতুর্দশ শতকের শেষভাগে তাঁর জন্ম হয়েছিল। শ্রীচৈতন্যদেব যে জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদরসাস্বাদন করতেন—তিনিই সম্ভবতঃ আদি দ্বিজচণ্ডীদাস। অপূর্ব ভাবতন্ময় কৃষ্ণপ্রেম-সাধিকা রাধাচিত্র এই চণ্ডীদাসেরই উৎকৃষ্ট শত শত পদের মাধ্যমে কয়েক শতাব্দী ধরে বাঙালী রসপিপাসুদের শ্রবণ-মন তৃপ্ত করেছে। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথি সম্ভবতঃ সাধারণ্যে অপ্রচলিত ছিল। ভাষাবিচারে অধিকাংশ পণ্ডিতদের অভিমতে তিনি অন্ততঃ ষোড়শ শতকের পূর্বেকার কবি। পালাগানে বিভক্ত তাঁর পুঁথির অন্তর্গত কিছু পদ এবং বড়ু-চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত অন্য কিছু সংখ্যক পদ প্রচলিত পদাবলীগানেও পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যদেব এসকল পদের রসাস্বাদন করেছেন কিনা বলবার মতো প্রমাণাভাব

পদাবলী গানের চণ্ডীদাস

১। দ্রঃ দীনচণ্ডীদাসের পদাবলী : মণীন্দ্রমোহন বসু (কলি বিশ্ব. প্রকাশিত)।—এ প্রসঙ্গে বনপাশ (বর্ধমান) থেকে আবিষ্কৃত পুঁথি সম্পর্কে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা সাহিত্যের কথা' গ্রন্থের অন্তর্গত 'চণ্ডীদাসের নবাবিষ্কৃত পুঁথি' শীর্ষক আলোচনাটিও দ্রষ্টব্য।

রয়েছে।—এ প্রবন্ধে চৈতন্যপূর্ব বাশুলীসেবক নানুরের কবি চণ্ডীদাসের পদাবলী বিষয়ে আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ করতে চাইছি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সম্পর্কে গ্রন্থ পরিশিষ্টে পৃথকভাবে আলোচনার ইচ্ছা রইল।

চণ্ডীদাসের প্রামাণ্য জীবনী পাওয়া যায়নি। সম্ভবত তিনি চতুর্দশ শতকের শেষভাগে বীরভূম জেলার নানুর গ্রামে এক ব্রাহ্মণপরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

কবির জীবন কথা

নানুরে 'চণ্ডীদাসের ভিটি' এবং বাশুলী মন্দির—যেখানে চণ্ডীদাস সেবক ছিলেন,—এখনও দর্শকরা দেখতে আসেন। অন্যান্য বহু বৈষ্ণব কবির ন্যায় চণ্ডীদাসেরও একটি লোকপ্রচলিত পরকীয়া প্রেম-আখ্যায়িকা রয়েছে। বাশুলী মন্দিরে প্রভাত সূর্যালোকে তিনি এক 'সোনার পুতুলী'কে দেখেছিলেন।—প্রেমাকুল হয়ে বাশুলীদেবীর কাছে কর্তব্যপথের নির্দেশ চেয়েছিলেন। দেবীর আদেশেই তিনি ইন্দ্রিয়জিৎ হয়ে রজকিনী রামীকে ভালবেসেছিলেন। বাশুলী নাকি বলেছিলেন, 'তুমি ইন্দ্রিয়জিৎ হইয়া এই নারীকে ভালবাস, ইনি তোমার হৃদয়কে যে পবিত্রতা দিবেন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, কিম্বা আমিও তোমাকে তাহা দিতে পারিব না।'—নানুরের

বসন্তরঞ্জন রায়ের অভিমত

রামীর ভিটা এই লোকশ্রুতির সাক্ষ্য দেয়। পূর্ববঙ্গগীতি-কায় এবং নরহরি সরকারের চণ্ডীদাস বন্দনার পদে রামী আখ্যায়িকার উল্লেখ রয়েছে। রজকিনী রামীর প্রেমাসক্ত হওয়াতে চণ্ডীদাস সমাজচ্যুত হয়েছিলেন এবং তাঁকে সমাজে তুলবার জন্যে ভ্রাতা নকুল চেষ্টা করেছিলেন,—একাধিক পদে তার বর্ণনা পাওয়া যায়। বিদ্বদ্বল্লভ বসন্তরঞ্জন রায় চণ্ডীদাসের মৃত্যু সম্পর্কে লোকশ্রুতির একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন,—

> নানুরে বাশুলী মন্দিরের নিকটে যে ভগ্নগৃহের চিহ্নাদিসহ স্তূপ পড়িয়া আছে, সেখানে নাট্যশালা ছিল। স্থানীয় প্রবাদ এই যে, চণ্ডীদাস তার ভুবনবিজয়ী কীর্তনের দল সহ সেই নাট্যশালায়ই সমাহিত হন। সে প্রবাদ বড় শোকাবহ। সন্নিকটবর্তী পরগণার নবাব তাহার প্রাসাদে চণ্ডীদাসকে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান; দুর্ভাগ্যক্রমে চণ্ডীদাসের ভক্তিপ্রেমের বিজয়মন্ত্র, তাঁহার অপূর্ব পদাবলী যখন তাঁহার কণ্ঠে নিনাদিত হইতে লাগিল, তখন সেই উন্মাদনায় নবাব সাহেবের বেগম একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তিনি চণ্ডীদাসের গান শুনিতে ছদ্মবেশে পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিতেন। নবাব কোনক্রমেই বেগমসাহেবাকে শাসন করিতে পারিলেন না। চণ্ডীদাসের সুর

সত্যই তাঁহার কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিয়াছিল; সেই মর্ম প্রবেশী সংগীত তাঁহার লজ্জা ভয় দূর করিয়া দিয়াছিল। নবাবের ক্রোধ জাগিয়া উঠিল। একদিন যখন নান্নুরের নাট্যশালা চণ্ডীদাসের কীর্তনানন্দে মুখরিত হইতেছিল, তখন সহসা সেই প্রেমস্নিগ্ধ নিকেতন নবাবসৈন্যের কামানের শব্দে কাঁপিয়া উঠিল। কামানের গোলায় নাট্যশালা পড়িয়া গেল। বাঙ্গালা দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি—মর্ত্যধামে স্বর্গের গায়ক তাঁহার দলসহ বিদীর্ণ মন্দিরের নীচে জীবন্ত সমাধিপ্রাপ্ত হইলেন।

[সা. প. সং. শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভূমিকা দ্রঃ]

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের অভিমত

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন রামী রচিত একটি গীতিকার (পদসংখ্যা ২০০) কোনও পদ অবলম্বনে চণ্ডীদাস-মৃত্যু সম্পর্কে আরও মর্মবিদারী একটি কাহিনীর উল্লেখ করেছেন। চণ্ডীদাসের পদাবলী-গানে বিমুগ্ধ বেগমকে নবাব যখন এ-বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন বেগম নির্ভীক ভাবে আপন মনোভাব জানিয়েছিলেন। ক্রুদ্ধ নবাব বেগম এবং রামীকে সম্মুখে রেখে চণ্ডীদাসকে হস্তীপৃষ্ঠে বেঁধে কশাঘাতে হত্যার নির্দেশ দেন। এই আদেশ যথাযথ পালিত হয়েছিল। অপলকে রামীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে চণ্ডীদাস মৃত্যুবরণ করেন। বেগম এই মর্মবিদারী দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে হতচৈতন্য হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। রামী বেগমের এই মহান প্রেম দেখে তাঁর পদ স্পর্শ করে শোক জ্ঞাপক করেন। রামী নাকি চণ্ডীদাসকে অনুযোগ জানিয়েছিলেন, 'বাশুলী শুধু আমাকে ভালবাসিতে বলিয়াছিলেন। তুমি তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে কেন?'—'বাশুলীর [illegible] না কৈলে সম্বরণ তাহাতে মজালে চিত্ত।' শুধু নবাব বেগমই চণ্ডীদাসের প্রতি আসক্ত নন, চণ্ডীদাসও বেগমের প্রতি অনুরক্ত হয়েছিলেন এখানে [illegible] রয়েছে। এই লোকশ্রুতির সত্যতা নিরূপণ সম্ভবপর নয়। তবে চৈতন্যোত্তর যুগের কোনও সহজিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায় এর উদ্ভাবক এরূপ অনুমান অসঙ্গত নয়।

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এবং দীন চণ্ডীদাসের [illegible] পদগুলি বাদ দিলেও চণ্ডীদাসের নামাঙ্কিত সহস্রাধিক পদের সন্ধান পাওয়া যায়। এই সমস্ত পদই দ্বিজ চণ্ডীদাসের রচনা মনে করার কারণ নেই। বহু পদই প্রক্ষিপ্ত, পরবর্তী কবিদের সংযোজন। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার 'চণ্ডীদাসের পদাবলী'

গ্রন্থে (ব. সা. প. সং, ১৩৬৭) ২২১টি পদ দ্বিজ চণ্ডীদাসের নামে সংকলন করেছেন। তার মধ্যেও ১২০টি সন্দেহাতীত, বাকী ১০১টি সন্দেহজনক বোধে দুই ভাগ করেছেন। শ্রীহরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন 'বৈষ্ণব পদাবলী' গ্রন্থে (সা. সংসদ সং, ১৩৬৮) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বড়ু চণ্ডীদাসকে পৃথক রেখে মাত্র একজন পদাবলীর চণ্ডীদাস ধরে তাঁকে চৈতন্য-পূর্ব যুগে স্থাপন করেছেন এবং তাঁর ভণিতায় ১২০টি পদ দিয়েছেন। বলা বাহুল্য উভয়ের সংকলনে যথেষ্ট পার্থক্য রয়ে গেছে। এখানে উভয়েরই গ্রন্থে প্রাপ্ত পদগুলি যথাসম্ভব গ্রহণ করা হল। তবে সুপরিচিত দু-একটি পদ ডঃ মজুমদারের গ্রন্থে সংকলিত না হলেও দ্বিজ চণ্ডীদাসেরই রচিত এই অনুমান সাহিত্যরত্নের গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করা গেল।

পদপরিচয়

একদিক থেকে ধরতে গেলে বিদ্যাপতির মতো চণ্ডীদাসের পদাবলীর সুরও মানবীয় প্রেমরস-সিক্ত। তবে বিদ্যাপতির সঙ্গে এই প্রেমচিত্রণের পার্থক্যও অনেকখানি। তাঁর নিজের জীবনে রজকিনী প্রেম কামগন্ধবিহীন নিকষিত হেম হয়ে উঠেছিল কিনা তা লোকশ্রুতির বিষয়,—কিন্তু পদাবলীর রাধা চিত্র আঁকতে গিয়ে সেখানে যে একটি কামগন্ধহীন পবিত্র প্রেমারতির দেহদীপ বিরহাগ্নির প্রজ্জলনে অনির্বাণ জ্বালিয়ে রেখেছেন সে বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ নেই।

চণ্ডীদাস এবং বিদ্যাপতি—চৈতন্যপূর্ব এই দুই কবি,—সমগ্র পদাবলী গানের দুই শ্রেষ্ঠকবি পদাবলী রচনার দুটি ধারা প্রবর্তন করেছিলেন। সেই যুক্তবেণী সঙ্গমেই চৈতন্যোত্তর পদাবলীগানের বিপুল সমৃদ্ধ প্রবাহ দেখা দিয়েছিল। একই বিষয়বস্তুকে বাংলার রজকিনী প্রেমিক বাশুলী সেবক পল্লীকবি এবং মিথিলার তৎকালীন শাস্ত্রবিদ, ছন্দবিদ, আলঙ্কারিক, রাজদরবারের শ্রেষ্ঠ নাগরিক কবি—দুই পৃথক আধারে সাজিয়ে রসিক শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে পরিবেশন করেছেন। লোকশ্রুতির কিছু মর্যাদা দিয়ে বলতে ইচ্ছা হয়, রামীকে কেন্দ্র করে নান্নুরের কবি কামগন্ধহীন নিকষিত হেম-সদৃশ যে প্রেমামৃতের সন্ধান পেয়েছিলেন কৃষ্ণপ্রিয়ার চিত্রাঙ্কনে সেই বৈরাগিনী যোগিনী প্রেম-সাধিকাকেই ফুটিয়ে তুলেছেন। এ যুগের কবিতায় চণ্ডীদাসের মর্মকথাটি যেন ব্যক্ত হয়েছে—

আর পাব কোথা?
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।

[সোনার তরী : বৈষ্ণবকবিতা]

চণ্ডীদাসের রাধা বিদ্যাপতির রাধার মতো মন ও দেহের বর্ণোজ্জ্বলতায় অত চমক সৃষ্টি করেননি,—কামাসক্তিবিহীন প্রগাঢ় প্রেমচিত্রাঙ্কনে ভাষা ও ছন্দেও কবি নিরাভরণ তন্ময় চিত্ররূপের আশ্রয় নিয়েছেন। বিদ্যাপতির রাধার চিত্র বর্ণবৈভবে,—কৈশোর, বয়ঃসন্ধি ও নবযৌবনে পূর্বরাগ, অভিসার, মান, রসোদ্গারের লীলা-বিভ্রমে দর্শককে প্রতি মুহূর্তে যেন চমকিত করে তুলতে থাকে। আর চণ্ডীদাসের প্রেমবিভোর রাধাচিত্রের প্রথম আবরণ উন্মোচনেই দেখা যায়,—

চণ্ডীদাসের রাধা

রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে, থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়ান তারা।
বিরতি আহারে রাঙাবাস পরে
যেমত যোগিনী পারা॥

[বৈ. প. হরেকৃষ্ণ : চণ্ডীদাস ৩৬]

—এই রাধাচিত্র আঁকবার জন্যে বর্ণবৈচিত্র্যের বেশী প্রয়োজন নেই। মাত্র দুটি রঙই যথেষ্ট,—বাইরের সাজে নিরাভরণ যোগিনীর রাঙা রঙ, অন্তরে গাঢ় কৃষ্ণশ্যাম রঙ। এতেই ত্রিভুবন তন্ময় হয়ে উঠবার সুযোগ পায়। বিদ্যাপতি সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রের অনুসরণে রাধিকার নয়ন-মুগ্ধকর যে বর্ণোজ্জ্বল লীলাবিভ্রমের চিত্র এঁকেছেন সে রাধা শ্যামল বাংলার নরম মাটির কোমল মেয়েটি নয়। বাংলার যে মেয়েকে দেখে এযুগের কবি লিখেছেন—

মা বলিতে প্রাণ করে আনচান চোখে আসে জল ভরে।

সেই ভক্তিরস সৃজনকারী ভগবৎ প্রেম সাধিকার কোমল বেদনাশ্রু মূর্তি রূপটি যেন চণ্ডীদাসের চোখে ধরা দিয়েছিল। সে জন্যেই তাঁর ভাষা ও ছন্দে সরল অলঙ্কার-বিহীন এক প্রাণস্পর্শী আবেগ অজস্র করুণাধারায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। প্রতিটি কথায় তিনি যেন এক প্রাণভরা অভিমান স্নেহ-বিষাদ মেশানো গভীর রসনিষিক্ততার স্বাক্ষর রেখেছেন। রাধা প্রেমচিত্রের চিত্রকর হিসাবে বিদ্যাপতি অনেকাংশে নিরপেক্ষ,—অসম্পৃক্ত। রূপের পূজারী তিনি, নানা আলঙ্কারিক বিশ্লেষণে এঁকেছেন নবীনা

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের রাধার পার্থক্য

কিশোরীর যৌবনোন্মেষের স্তর একে একে বিশ্লেষণ করে চলেছেন। সেই বিশ্লেষণ রীতিতে কালিদাস, বাৎস্যায়ন, অমরু, ভর্তৃহরি, জয়দেব প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় কবি-দার্শনিকদেরই উত্তরসূরী তিনি। বিদগ্ধ নাগরিক, রাজসভার কবি শ্রীরাধিকা নাম্নী শৃঙ্গাররস-বিলাসের নাগরিকা নায়িকার হৃদয়স্তর ধীরে ধীরে উন্মোচন করে চলেছেন। কৈশোরের যৌবনোন্মেষ থেকে প্রেমলীলার পূর্ণ বিরহরূপ পর্যন্ত সেখানে লীলা বিলাসের কত বিচিত্র রঙের খেলা। শিল্পী নিরাসক্ত দ্রষ্টার ভূমিকা নিয়ে সেই প্রেমপুত্তলীর বৈচিত্র্যময় চিত্ররূপটি সযত্নে বর্ণে রেখায় অঙ্কিত করে তুলেছেন। চণ্ডীদাসের এত বৈদগ্ধ্যপূর্ণ অলঙ্করণের অবকাশ কোথায়?—তিনি নিজেই রাধা প্রেমাকুল। সব প্রসাধন প্রেমাকুল ভাব-বিগলনে একাকার হয়েছে। রসতন্ময়তায় রাধিকা কৃষ্ণপ্রেমে আত্মসম্বিত হারিয়েছে। কবিও রাধার ভাবতন্ময়তায় একাত্ম হয়েছেন।

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥ ৪০॥[১]

বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের পূর্বরাগ-ব্যাখ্যায় নাম প্রসঙ্গে পূর্বরাগ সঞ্চারের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু একি পূর্বরাগ! শ্যামনামের জন্য রাধিকার অন্তর যেন আজন্ম তৃষিত ছিল।

তন্ময় প্রেমাকুলতা

তাই শ্রবণমাত্রেই 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো।' কৃষ্ণপ্রেমাকুলতায় সর্ব দেহমন পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। সামান্য নাম শুনেই রাধিকার তন্ময়তা প্রাপ্তি—তাহলে অঙ্গের স্পর্শ ঘটলে কি হবে! ভক্ত কবির লেখনীও সে পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারে নি—ভাবকল্পনা তার আগেই বুঝি প্রেমাবশ হয়েছে।

নাম-পরতাপে যার ঐছন করল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়। ৪০॥

এই তন্ময় প্রেমাকুলতার রস-বিগলনে চণ্ডীদাস নিজে বিগলিত হয়েছেন,—কয়েক শতাব্দী ধরে কোটি কোটি রসিক শ্রোতার মন বিগলিত করেছেন। এই ভাবাকুল রাধিকা-চিত্র শ্রীচৈতন্যকেও বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল মনে হয়।

১। উদ্ধৃত পদগুলির পাশে প্রদত্ত সংখ্যা শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'বৈষ্ণব পদাবলী'র সংখ্যা-নির্দেশক।

তাঁর জীবনালেখ্য অঙ্কনে এবং চৈতন্যোত্তর রাধিকার প্রেমচিত্রণে ভক্তকবিরা চণ্ডীদাসের ধারাটিকে বিশেষভাবেই অনুসরণ করেছেন সন্দেহ নেই।[২]

বৈষ্ণব রসতত্ত্বের বিচারে চণ্ডীদাসের পূর্বরাগ-বিষয়ক পদসংখ্যা কম নয়।

পূর্বরাগ (?)

কিন্তু সেই রাধিকাকে পূর্বরাগের নায়িকা না বলে কৃষ্ণ প্রেমবিভোর তন্ময় অনুরাগিণী বলাই সঙ্গত হবে। প্রথম থেকেই,—নাম-প্রসঙ্গ শুনবার সময় থেকেই রাধার হৃদয়ে কৃষ্ণানুরাগের পাকা রঙ ধরেছে।

না জানি কতেক মধু   শ্যামনামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম   অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে॥ ৪০॥

রাধিকা কৃষ্ণপ্রেমে প্রাকৃত সংসারধর্ম ত্যাগ করে যোগিনীর রাঙাবাস পরে প্রেম বৈরাগিনী হয়েছেন।

এলাইয়া বেণী   ফুলের গাঁথনি
দেখয়ে খসায়ে চুলি।

২। এ-পদটির সঙ্গে রূপগোস্বামীর 'বিদগ্ধ মাধব' নাটকের একটি শ্লোকের সাদৃশ্য দেখে মণীন্দ্রমোহন বসু এটিকে 'দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী'—ভুক্ত করেছেন। ডঃ মজুমদারও এটিকে সন্দেহজনক পদগুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। 'বিদগ্ধ মাধবে'র শ্লোকটি হল :

তুণ্ডে তাণ্ডবিনীং রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলী লব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়-কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্বুদেভ্যঃ স্পৃহাং।
চেতঃ প্রাঙ্গণ-সঙ্গিনী বিজয়তে সর্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিম্
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতিবর্ণদ্বয়ী॥

বঙ্গানুবাদ : কৃষ্ণ বর্ণদ্বয়ে যে কত অমৃত আছে তা জানিনা। এই নাম যখন আমার রসনায় নৃত্য করে মনে হয়, আরও বহু রসনা যদি পেতাম। কর্ণমধ্যে প্রবেশ করলে অর্বুদ কর্ণলাভের ইচ্ছা হয়, চিত্ত-প্রাঙ্গণে যখন প্রবেশ করে সর্ব ইন্দ্রিয়কে জয় করে নেয়।

পদটি দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণিতায় ছাড়া অন্য কোনও ভণিতায় পাওয়া যায় না। ভাবের দিক থেকেও চণ্ডীদাসের পদের সঙ্গে এর গভীর মিল। আমাদের মনে হয়, রূপগোস্বামীই হয়তো চণ্ডীদাসের এই অপূর্ব বাংলা পদটির আদর্শে সংস্কৃত শ্লোকটি রচনা করে থাকবেন।

হসিত বয়ানে চাহে মেঘপানে
কি কহে দুহাত তুলি ॥
এক দিঠ করি ময়ুর-ময়ুরী
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাস কয় নব পরিচয়
কালিয়া-বঁধুর সনে ॥ ৩৬ ॥[1]

কালিয়াবঁধুর সঙ্গে নব-পরিচয়ের দিনেই রাধার অন্তর কৃষ্ণপ্রেমের রঙে রাঙিয়েছেন। যোগিনীর গেরুয়াবসনে প্রাকৃত চেতনার প্রতি বৈরাগ্য ফুটিয়ে তুলেছেন। শ্রীচৈতন্যদেব চণ্ডীদাসের এই রাধিকার প্রেম-রঙেই আপনাকে রাঙিয়ে নেবার অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন কি ?

চণ্ডীদাসের তুলিতে আঁকা কৃষ্ণদর্শনাকুলা রাধিকার রূপ হল,—

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন
কদম্ব কাননে চায় ॥ ৩৫ ॥[2]

[illegible]শতাব্দীকাল পরের রাধামোহনের তুলিতে আঁকা শ্রীচৈতন্যেরই আর এক রূপ স্মরণ করিয়ে দেয়,—

হাজু হাম কি পেখলু নবদ্বীপচন্দ।
করতলে করই বয়ন অবলম্ব ॥
পুন পুন গতাগতি করু ঘর পন্থ।
খেনে খেনে ফুলবনে চলই একান্ত ॥

১। এ-পদটি 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ে'র এবং শ্রীধরদাসের 'সদুক্তি কর্ণামৃতে'র 'আহারে বিরতিঃ সমস্ত বিষয় গ্রামে' পদের ভাবাদর্শে রচিত মনে হয়। 'উজ্জ্বল নীলমণি'তেও শ্লোকটি উদ্ধৃত হয়েছে। চণ্ডীদাস এবং রূপ গোস্বামী উভয়েই উক্ত প্রাচীন সংগ্রহ-গ্রন্থ থেকে রাজশেখরের এই পদটি ব্যবহার করে থাকবেন ডঃ মজুমদারের এই অনুমান যুক্তিযুক্ত মনে হয়।

২। এ-পদটির সঙ্গে রূপ গোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি'র অন্তর্গত 'কুমুদবসিতা নিজ্ঞাময়ী' শ্লোকটির এবং শ্রীধর দাসের 'সদুক্তি কর্ণামৃত '২।৪৮ বীচির' অন্তর্গত পাঁচটি শ্লোকের অনেকটা সাদৃশ্য রয়েছে। [illegible] 'সদুক্তিকর্ণামৃত থেকে ভাব নিয়ে লিখেছেন এবং পরবর্তী কালে রূপ গোস্বামী [illegible] উক্ত কবির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন এমন অনুমান কিছু অসঙ্গত হবেনা।

ছল ছল নয়ন-কমল-সুবিলাস।
নব নব ভাব করত পরকাশ॥ [ঐ. রাধামোহন ২১.]

রীতি রক্ষার্থে বৈষ্ণব কবিরা নায়ক শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগের পদ লিখেছেন।—তবে রাধার পূর্বরাগ চিত্রেই অপেক্ষাকৃত বেশী নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। চণ্ডীদাস সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। কৃষ্ণের পূর্বরাগ চিত্রে নায়ক চরিত্রকে সম্মুখে রেখে রাধারূপেরই বর্ণনা প্রকাশ পেয়েছে। কৃষ্ণের পূর্বরাগের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য সেখানে অধিকাংশ পদেই লক্ষিত হয়না। তবে দু-একটি উৎকৃষ্ট পদে এই গতানুগতিকতাকে পরিহার করে কবি ভাব ও সৌন্দর্যের যে গাঢ়তা এনেছেন তা সত্যই অতুলনীয়। এখানে একটি পদ উদ্ধৃত করি।—

বেলি অসকালে দেখিনু যে ভালে
পথেতে যাইছে সে।
জুড়ায় কেবল নয়ন যুগল
চিনিতে নারিনু কে।
সই সে রূপ কে চাহিতে পারে।
অঙ্গের আভা বসনের শোভা
পাসরিতে নারি তারে॥
বাম অঙ্গুলিতে মুদরী সহিতে
কনক কটোরি হাতে।
সীঁথায় সিন্দুর নয়নে কাজর
মুকুতা শোভিত নথে॥
সুনীল শাড়ী মোহনকারী
উছলিতে দেখি পাশ।
কি আর পরাণে সোঁপিনু চরণে
দাস করি মনে আশ॥
কুচযুগ গিরি কনক কটোরি
শোভিত হিয়ার মাঝে।
ধীরে ধীরে যায় চমকিয়া চায়
মন না চাহে লোকলাজে॥
কিবা সে ভঙ্গিমা নাহিক উপমা
চলন মন্থর গতি।

কোন ভাগ্যবানে পাঞাছে কি দানে
ভজিয়া সে উমাপতি॥
চণ্ডীদাসে কয় মূরতি এ নয়
বধিতে রসিক জনে।
অমিয় ছানিয়া যতন করিয়া
গড়িল সে অনুমানে॥ ৮৮॥

বিকালের গোধূলি আলোকে কানু নতুন করে রাধাকে দেখছেন। সে দেখায় নয়ন দুটি তৃপ্ত হল। —কিন্তু এ কোন রাধা। কৃষ্ণের পরিচিতা কিশোরী আজ রহস্যময়ী হয়ে দেখা দিয়েছেন। চিত্রটি কত নিখুঁত, অনুপম। বাম অঙ্গুলীতে অঙ্গুরীয়ক, হাতে সোনার ঝাঁপি। সিঁথায় সিঁদুর, চোখে কাজল। নাকের নথে মুক্তা বসানো। পরিধানে নীল শাড়ী, 'উছলিতে দেখি পাশ'— কত সংযত বর্ণনা। এই রাধা 'কনক কটোরা' সদৃশ 'কুচযুগ গিরি' হিয়ায় বহন করে, মন্থর গতিতে

ধীরে ধীরে যায় চমকিয়া চায়
ঘন না চাহে লোকলাজে।

এ বর্ণনায় চপলতা নেই, গভীর প্রেম-সৌন্দর্যের আরতি রয়েছে। এ-প্রেম দেহ ও মনকে একই বাঁধনে বেঁধে দিয়েছে।

মনীন্দ্রমোহন বসু এবং ডঃ মজুমদার এ-পদটি দীন চণ্ডীদাসের রচনা বলে গণ্য করেছেন। কিন্তু ভাবের গাঢ়তা ও বর্ণনার সংযমে এটি দ্বিজ চণ্ডীদাসের রচিত হওয়াই সম্ভব মনে হয়।

রূপানুরাগের পদ চণ্ডীদাসকে আর পৃথক ভাবে লিখতে হয়নি। যে রাধা দেখার আগে নামশুনেই কৃষ্ণকে ভাল বেসেছেন তার আর রূপানুরাগের কি আবশ্যক! উভয়ের প্রগাঢ় প্রেমে বাইরের রূপের বর্ণনা চণ্ডীদাসের কাছে বাহুল্য মনে হয়েছে। নব অনুরাগের মিলন দিনের ছবি আঁকতে গিয়ে কবি লিখেছেন,—

রূপানুরাগ

এমন পিরীতি কভু নাহি দেখি শুনি।
পরাণে পরাণে বাঁধা আপনা আপনি।
দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥ ৭৭॥

অনুরাগে প্রেমবৈচিত্ত্যের সুর এসে পড়েছে। তন্ময় গভীর ভালবাসার স্বভাব এই। দুঃখবিহীন অবিমিশ্র সুখ-চেতনায় সেখানে বোধহয় স্থান হয়না।

অভিসার

চণ্ডীদাসের পক্ষে কাব্যের নায়িকার অভিসার চিত্র আঁকা সম্ভব ছিল মনে হয়না। অভিসার-প্রস্তুতির মধ্যে কিছুটা বাহ্য অলঙ্করণ রয়েছে। তন্ময় সাধিকার তো বহুপূর্বেই পূর্ণ আত্মদান হয়ে গিয়েছে,—সংযত পরিপাটি দেহমনের নতুন সাজসজ্জা তার কাছে বাহুল্য মাত্র দু-একটি পদে সখীকে দিয়ে রাধা প্রতীক্ষারত কৃষ্ণকে সংবাদ পাঠিয়েছেন,—

কহিও তাহার ঠাঁই যেতে অবসর নাই
অফুরান হল গৃহ কাজে ॥ ৫৬ ॥

প্রাকৃত গৃহকর্ম, স্বামী সেবায় রজনী যায়। প্রতীক্ষারত কৃষ্ণের কাছে যেতে রাধা ব্যাকুল হলেও পথ কোথায়?—

লোহার পিঞ্জরে থাকি বাহিব হতে চাহে পাখী
তার হৈল আকুল পরাণ ॥ ৫৬ ॥

অফুরান গৃহকাজে প্রেমিকা গৃহপিঞ্জরাবদ্ধ হয়ে থাকলেও প্রেমিক কৃষ্ণ কিন্তু তার দেরী দেখে নিজেই দেখা দেন। তখন সব বাধা জলাঞ্জলি দিয়ে রাধাকে বেরোতে হয়।—

এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইল বাটে।
আঙ্গিনার মাঝে বঁধুয়া ভিজিছে
দেখিয়া পরাণ ফাটে ॥

... ...

বঁধুর পিরীতি আরতি দেখিয়া
মোর মনে হেন করে।
কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া
আনল ভেজাই ঘরে ॥
আপনার দুখ সুখ কার মানে,
আমার দুখেতে দুখী।
চণ্ডীদাস কহে কানুর পিরীতি
করিয়া জগতে সুখী ॥ ৫৭ ॥

—এ-রাধা ঠিক অভিসারিকা কি ? অভিসার সাজ-সজ্জায় দুর্নিবার পথপরিক্রমায় লীলাময়ী যে রাধাকে বিদ্যাপতি বা গোবিন্দদাস চিত্রিত করেছেন চণ্ডীদাসের এই প্রেমব্যাকুলা রাধা তার থেকে একেবারেই স্বতন্ত্র।

খণ্ডিতাচিত্র

খণ্ডিতা রাধার চিত্র চণ্ডীদাস এঁকেছেন, তিরস্কারের অগ্নি সেখানে অভিমান-অশ্রুতে নির্মল হয়ে উঠেছে। সখীকে আপন দুঃখের কথা বলছেন,—

সই কেমনে ধরিব হিয়া।
আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায়
আমার আঙিনা দিয়া॥ ৫৯ ॥

যে অপরাধিনী শ্যামকে ভাঙিয়ে নিয়েছে তার প্রতি রাধার চরম অভিশাপ-উক্তি হল,—

যুবতী হইয়া শ্যাম ভাঙাইয়া
এমতি করিল কে।
আমার পরাণ যেমতি করিছে
তেমতি হউক সে॥ ৫৯ ॥

রাধার শ্যামকে ভাঙিয়ে নেবার তুলনায় মর্মান্তিক আ'র কি দুঃখ থাকতে পারে ? যে প্রেমের জন্যে ইহলোকের সবকিছু ছেড়েছেন সেই প্রেমিককে যে ভাঙিয়ে নিল তাকে আর কি কঠিন অভিশাপ দিতে পারেন রাধা।

প্রভাতে কৃষ্ণ কুঞ্জে ফিরে এলে অভিমান বিদ্রূপ মেশানো চোখের জলে খণ্ডিতা রাধা বলছেন,—

ভাল হৈল আরে বঁধু আসিলা সকালে।
প্রভাতে দেখিলাম মুখ দিন যাবে ভালে॥ ৬১ ॥

রসোদ্গার

চণ্ডীদাসের রসোদ্গারের পদ কয়টি অনুপম। সখীর কাছে রাধা কৃষ্ণ-প্রেম-মিলনের বর্ণনা দিচ্ছেন। সে বর্ণনা অবিমিশ্র সুখস্মৃতি নয়। যে প্রেমে বিচ্ছেদের কাঁটা ফোটানো আছে, অজানা শঙ্কার বেদনা মেশানো আছে তারই প্রগাঢ় স্মৃতি চিত্রণ।—

এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি।
নিমিখে মানয়ে যুগ কোরে দূর মানি॥
সমুখে রাখিয়া করে বসনের বাও।
মুখ ফিরাইলে তার ভয়ে কাঁপে গাও॥

এক তনু হইয়া মোরা রজনী গোঙাই।
সুখের সাগরে ডুবি অবধি না পাই॥
রজনী প্রভাত হৈলে কাতর হিয়ায়।
দেহ ছাড়ি যেন মোর প্রাণ চলি যায়॥
সে কথা কহিতে সই বিদরে পরাণ।
চণ্ডীদাস কহে রাই সব পরমাণ॥ ১১॥

রজনী প্রভাতে কৃষ্ণের বিচ্ছেদ রাধার দেহ ছাড়ি প্রাণ চলি যাওয়ার সদৃশ। অসীম সুখে নিমগ্ন দুটি হিয়া একতনু হয়ে থাকতেই চায় কিন্তু একটু মুখ ফেরালেই অজানা বিচ্ছেদাশঙ্কায় দেহ কেঁপে ওঠে কেন?

আর একটি পদে রাধা নিশি প্রভাতে কৃষ্ণের বিদায় প্রার্থনার চিত্রটি অপূর্ব ভাবে বর্ণনা করেছেন।—

আমি যাই যাই বলি বোলে তিন বোল।
কতনা চুম্বন করে কত দেই কোল॥
করে কর ধরিয়া শপথি দেয় মোরে।
পুনঃ দরশন মাগি কত চাপে কোরে॥
পদ আধ যায় পিয়া চায় পালটিয়া।
বয়ান নিরখে কত কাতর হইয়া॥
নিগূঢ় পিয়ার প্রেম আরতি করু বহু।
চণ্ডীদাস কহে প্রেম হিয়ার মাঝে রহু॥ ১২॥

যাই যাই বলেও রাধাকে রেখে কৃষ্ণ যেতে পারছেন না। বারবার ফিরে এসে চুম্বনালিঙ্গন করছেন। অর্ধপদ এগিয়ে পিছন ফিরে কাতর চোখে শ্রীরাধার পানে চাইছেন। প্রিয়ের এই নিগূঢ় প্রেমারতির অনুভাব চিত্রই দেওয়া চলে—হৃদয় রহস্য সম্পূর্ণ উদ্ঘাটন করে দেখাবেন কি ভাবে!

আক্ষেপানুরাগ : চণ্ডীদাসের শ্রেষ্ঠ রাধাচিত্র

কোনও সমালোচক চণ্ডীদাসকে আক্ষেপানুরাগ-সর্বস্ব কবি বলেছেন। বাড়িয়ে বলেন নি। যে পীরিতিতে 'দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া' সেই প্রেমবৈচিত্ত্যের সুর মেশানো প্রগাঢ় প্রেমে ডুবে, আর দুঃখ উভয়ই অন্তহীন। অনুরাগ মিশ্রিত আক্ষেপের ভাবব্যঞ্জনায় সেই প্রেমের কিছুটা প্রকাশ পেয়েছে। শ্রীরাধা কৃষ্ণপ্রেমে দেহরিপুগুলিকেও আত্মবশে রাখতে পারেন নি।

তাঁর আক্ষেপ আত্ম পরবশ রিপুগুলির প্রতি, পিরীতি চতুর কৃষ্ণের প্রতি, কৃষ্ণের সেই দুর্নিবার আকর্ষণী বাঁশির প্রতি, সর্বনাশা পীরিতির প্রতি, আপনার প্রতি। সখীদের ডেকে, কৃষ্ণকে ডেকে, দূতী সম্বোধনে, স্বগত কথনে গাঢ় অনুরাগ মেশানো আক্ষেপ জানিয়েছেন। ব্যাকুল প্রকাশনের মাধ্যমে অনুরাগের রঙ গাঢ়তম হয়ে উঠেছে। দু একটি দৃষ্টান্ত তোলা যেতে পারে।

কৃষ্ণকে সম্বোধন করে বলছেন,

কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন ॥
ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর ॥
রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বন্ধু তোমার পিরীতি ॥
কোন্ বিধি সিরজিল সোতের শেওলি।
এমন ব্যথিত নাই ডাকে রাধা বলি ॥
বন্ধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও ॥ ৮২ ॥

কৃষ্ণকে সামনে রেখে প্রাণত্যাগ করবেন,—প্রেমের ক্ষেত্রে এর থেকে আর বড়ো কি নিগ্রহ রাধা কল্পনা করতে পারেন? আর একটি পদেও রয়েছে,—

তোমারে বুঝাই বন্ধু তোমারে বুঝাই।
ডাকিয়া শুধায় মোরে হেনজন নাই ॥
অনুখন গৃহে মোর গঞ্জয়ে সকলে।
নিশ্চয় জানিও মুঞি ভখিমু গরলে ॥
এ ছার পরাণে আর কিবা আছে সুখ।
মোর আগে দাঁড়াও তোমার দেখি চাঁদ মুখ ॥ ৮৩ ॥

কৃষ্ণবশ রিপুগুলির প্রতি অনুযোগ জানিয়ে রাধা বলছেন,—

শয়নে স্বপনে আমি তোমার রূপ দেখি।
ভরমে তোমার নাম ধরণীতে লেখি ॥
গুরুজন মাঝে যদি থাকিয়ে বসিয়া।
পর সঙ্গে নাম শুনি দরবয়ে হিয়া ॥

পুলকে পূরয়ে অঙ্গ আঁখে ঝরে জল।
তাহা নিবারিতে আমি হই যে বিকল॥
নিশি দিশি বঁধু তোমায় পাসরিতে নারি।
চণ্ডীদাস কহে হিয়া রাখ স্থির করি॥ ৮০ ॥

আর একটি পদে পরবশ ইন্দ্রিয়গুলির প্রতি এই আক্ষেপের সুর আরও তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠেছে।—

যত নিবারিয়ে চাই নিবার না যায় রে।
আন পথে যাই সে কানু পথে ধায় রে॥
এ ছার রসনা মোর হইল কি বাম রে।
যার নাম নাহি লই লয় তার নাম রে॥
এ ছার নাসিকা মুই যত করু বন্ধ।
তবু ত দারুণ নাসা পায় শ্যাম গন্ধ॥
সে না কথা না শুনিব করি অনুমান।
পরসঙ্গ শুনিতে আপনি যায় কান॥
ধিক্ রহু এ ছার ইন্দ্রিয় মোর সব।
সদা সে কালিয়া কানু হয় অনুভব॥
কহে চণ্ডীদাস রাই ভালভাবে আছ।
মনের মরম কথা কাবে নাহি পুছ॥ ১২৯ ॥

সখীকে ডেকে বাঁশির প্রতি আক্ষেপ জানিয়ে বলছেন,—

মন মোর আর নাহি লাগে গৃহ কাজে।
নিশিদিন কাঁদি সই হাসি লোকলাজে॥
কালার লাগিয়া হাম হব বনবাসী।
কালা নিল জাতি কুল প্রাণ নিল বাঁশী॥
হাঁ রে সখী কি দারুণ বাঁশী।
যাচিয়া যৌবন দিয়া হনু শ্যামের দাসী॥
তরল বাঁশের বাঁশী নামে বেড়াজাল।
সবার সুলভ বাঁশী রাধার হৈল কাল॥
অন্তরে অসার বাঁশী বাহিরে সরল।
পিবয়ে অধর সুধা উগারে গরল॥

যে ঝাড়ের তরল বাঁশী তারি লাগি পাও।
ডালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাও ॥
দ্বিজ চণ্ডীদাস কহে বংশী কি করিবে।
সকলের মূলে কালা তারে না পারিবে ॥ ৯১ ॥

কানুর প্রেমের প্রতি অভিমান বশে রাধা সখীকে বলছেন,—

সই আমার বচন যদি রাখ।
ফিরিয়া নয়ন কোণে না চাহিও তার পানে
কালিয়া বরণ যার দেখ ॥ ৯২ ॥

আবার পর মুহূর্তেই অকপট স্বীকৃতিতে বলছেন,—

ঘরে গুরুজন বলে কুবচন
সে মোর চন্দন চুয়া।
শ্যাম অনুরাগে এ তনু বেচিনু
তিল তুলসী দিয়া ॥ ৯৪ ॥

অভিমানিনী চোখের জলে সব অনুযোগ ভাসিয়ে দিয়ে সখীদের কাছে প্রেমানু-রাগের নতুন সংকল্প ঘোষণা করছেন,—

ফিরি নিজ ঘরে যাও ধরম লইয়া।
দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া ॥
কাল মাণিকের মালা গাঁথি নিব গলে।
কানুগুণ যশ কানে পরিব কুণ্ডলে ॥
কানু অনুরাগ রাঙ্গা বসন পরিব।
কানুর কলঙ্ক ছাই অঙ্গেতে লেপিব ॥ ৯৯ ॥

পিরীতির প্রতি আক্ষেপ জানিয়ে বলছেন,—

সই, কে বলে পিরীতি ভাল।
হাসিতে হাসিতে পিরীতি করিয়া
কাঁদিতে জনম গেল ॥ ১১৫ ॥

অপর একটি পদে বলছেন,—

পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর
ভুবনে আনিল কে।

মধুর বলিয়া ছানিয়া খাইনু
তিতায় তিতিল দে।। ১৩৫ ।।

আবার পিরীতি-সুখ-স্বপ্নলীন রাধা পরক্ষণেই বলছেন,—

পিরীতি পালঙ্কে শয়ন করিব
পিরীতি শিথান মাথে।
পিরীতি বালিসে আলিস ত্যজিব
থাকিব পিরীতি সাথে।।
পিরীতি সরসে সিনান করিব
পিরীতি বসন লব।
পিরীতি ধরম পিরীতি করম
পিরীতে পরাণ দিব।। ১৩৪ ।।

ভাবগভ অপূর্ব একটি উপমায় চণ্ডীদাস কানুর পিরীতির স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন,—

কানুর পিরীতি চন্দনের রীতি
ঘষিতে সৌরভময়।
ঘষিয়া আনিয়া হিয়ায় লইতে
দহন দ্বিগুণ হয়।। ১৪৩ ।।

সুখ-দুঃখময় পরম পিরীতির এর থেকে আর বেশী কি মর্মব্যাখ্যা হতে পারে।

কবির পদ-পরিচয় এবারে প্রায় শেষ হয়ে এলো। চণ্ডীদাস ঠিক মাথুরের কবি নন। আক্ষেপানুরাগেই রাধার সুখ-দুঃখময় প্রেমানুভূতির নিঃশেষ প্রকাশের পর নতুন করে প্রবাস দুঃখ পালাগানের আর প্রয়োজন কোথায়। যেখানে মিলনের দিনেও 'দুঁহু কোরে দুহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া', সেখানে মাথুর-বিরহ সৃষ্টির আর অবকাশ কবি রেখেছেন কোথায়! বোধ হয় সে কারণেই চণ্ডীদাসের মাথুর-বিরহ তেমন ফোটেনি। বরং সে তুলনায় মাথুর বিরহে বড়ু চণ্ডীদাস অপেক্ষাকৃত বেশী উৎকর্ষ দেখিয়েছেন। এখানে দ্বিজ চণ্ডীদাস-ভনিতার একটি পদ উদ্ধৃত করছি। দূতী মথুরায় চলেছে কৃষ্ণের কাছে শ্রীরাধার বিরহসংবাদ জানাতে। রাধা দূতিকে বলছেন—

মাথুর

সখি কহবি কানুর পায়,
সে সুখ সায়র দৈবে শুকায়ল
পিয়াসে পরাণ যায়।
সখি ধরবি কানুর কর।
আপনা বলিয়া বোল না তেজবি
মাগিয়া লইবি বর ॥
সখি যতেক মনের সাধ।
শয়নে স্বপনে করিনু ভাবনে
বিধি সে করিল বাদ ॥
সখি হাম সে অবলা তায়।
বিরহ আগুন দহে শতগুণ
সহন নাহিক যায় ॥
সখি বুঝিয়া কানুর মনে।
যেমন করিলে আইসে সে জন
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভনে ॥ ১৪৮ ॥

কৃষ্ণানুরাগিনীর বিরহ-আর্তি এখানে ঠিক তেমন স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাসে যেন প্রকাশিত হয়নি। বরং এ তুলনায় মথুরা প্রত্যাগতা কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের বেদনাময় সৌরভ আর একটি পদে চমৎকার প্রকাশ পেয়েছে। রাধা সদ্য মথুরা-প্রত্যাগত কৃষ্ণকে বলছেন,—

মিলন চিত্র

বহুদিন পরে বধূয়া এলে।
দেখা না হইত পরাণ গেলে ॥
এতেক সহিল অবলা বলে।
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হলে ॥
দুখিনীর দিন দুখেতে গেল।
মথুরা নগরে ছিলে তো ভাল ॥
এসব দুঃখ কিছু না গণি।
তোমার কুশলে কুশল মানি ॥ ১৪৯ ॥

—এখানে একটি প্রাথমিক প্রশ্ন মনে আসে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব রস-ব্যাখ্যায় মাথুরের পর কৃষ্ণের পুনর্বার বৃন্দাবন প্রত্যাগমনের কথা নাই। রাই উন্মাদিনী

বাহ্য সম্বিত হারিয়ে মানস ভাব বৃন্দাবনে কৃষ্ণ-মিলন লাভ করেছিলেন। তাই চৈতন্য পরবর্তী বৈষ্ণব কবিদের ভাবসম্মিলনের পদে দিব্যোন্মাদ অবস্থায় রাধা কৃষ্ণের নিত্য মিলন কল্পিত হয়েছে।—কিন্তু বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের একাধিক পদে কৃষ্ণকে মথুরা থেকে বিরহিনী রাধার কাছে বৃন্দাবনে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। সে পদগুলিকে ঠিক ভাবসম্মিলনের পদ বলা চলেনা। বৃন্দাবন মাথুর লীলা ব্যাখ্যায় চৈতন্যপূর্ব ও চৈতন্যোত্তর কবিদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ছিল অনুমিত হয়।

আত্মনিবেদন

সর্বশেষে আত্মনিবেদন। আক্ষেপানুরাগ এবং আত্মনিবেদন এই দুটি সুরের মিলনেই চণ্ডীদাসের প্রায় সমস্ত পদগুলি রচিত। উভয় সুরেব সংমিশ্রণে (আত্মনিবেদিতা, জন্মদুখিনী, কানুপ্রেম সোহাগিনী, কানু প্রেমাকুলিতা রাধা আপন প্রেমের বীণাটি বেঁধে নিয়েছেন। সে সুখ যেমন প্রাণস্পর্শী মধুর,—তেমনি প্রাণস্পর্শী করুণ) এখানে প্রাসঙ্গিক একটি পদ উদ্ধৃত করে চণ্ডীদাস প্রসঙ্গ শেষ করা যেতে পাবে।—

বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি তোহারে সঁপেছি
কুলশীল জাতি মান॥
অখিলের নাথ তুমি হে কালিয়া
যোগীর আরাধ্য ধন।
গোপ গোয়ালিনী হাম অতি হীনা
না জানি ভজন পূজন॥
পিরীতি রসেতে ঢালি তনুমন
দিয়াছি তোমার পায়।
তুমি মোর পতি তুমি মোর গতি
মনে নাহি আন ভায়॥
কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ॥
সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত
ভাল মন্দ নাহি জানি।

কহে চণ্ডীদাস পাপ পুণ্যসম
তোহারি চরণ খানি ॥৮ [বৈ.প কলি. বিশ্ব. ৭সং ৮০ পৃ.]

বৈষ্ণব পদাবলীগানে দুটি ভাষারীতির অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়।—একটি রীতির প্রবর্তক বিদ্যাপতি, অপরটির চণ্ডীদাস। বিদ্যাপতির মৈথিল প্রভাবিত 'ব্রজবুলি' সম্পর্কে ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি, চণ্ডীদাসের ভাষা বাংলার খাঁটি নিজস্ব সম্পদ। এ ভাষারি মাধ্যমে রসিক শ্রোতার সঙ্গে ভক্তকবির সোজাসুজি হৃদয়ের যোগাযোগ ঘটে। প্রকাশের সরলতা ভাব ও ভাষাকে কতটা একাত্ম করে তুলতে পারে চণ্ডীদাসের ভাষারীতি তার প্রকৃষ্ট আদর্শ। দুটি সহৃদয় হৃদয়ের যোগসাধনে ভাষার দৌত্য তখনই সবাপেক্ষা সফল হয়ে ওঠে যখন ভাষা ভাবের অন্তরালে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখতে পারে। চণ্ডীদাসের পদ-রসাস্বাদনে মাঝখানে যে শব্দার্থের দৌত্য রয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে রসিক শ্রোতা তা মনে রাখার অবকাশই পান না। —এখানেই তার চরম সফলতার প্রমাণ। চণ্ডীদাসকে জনৈক সমালোচক বাংলা কবিভাষার জনকরূপে পরিচিত করেছেন। প্রায় ছয় শতাব্দীপূর্বে যে ভাষায় তিনি প্রথম পদরচনা করেছিলেন—ভাষায় হুবহু সেই রূপটি রক্ষিত হওয়া সম্ভব নয়। তবু একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে, ভক্তমনের রসাবেগ তাঁর পদ-ভাষার মাধ্যমে দীর্ঘ কয়েক শতাব্দীর রসিক চিত্তকে ভাবমাধুর্যে বিগলিত করেছে। যে ভাষায় এই বিগলন সম্ভব হয়েছে তাকে বাংলার কবিভাষা বলতে দ্বিধার কারণ নেই। মর্মস্পর্শী অসংখ্য শব্দের মাধ্যমে তিনি বেদনামধুর যে প্রেমের কল্পলোক গড়ে তুলেছেন চৈতন্য-পরবর্তী পদাবলী গীতিকারেরা সেই শব্দার্থসৃষ্ট কল্পলোকের কাছে কম ঋণী নন। বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস ভাব-বৃন্দাবনের এই শিল্পলোকের প্রথম চিত্রকার। মিথিলা ও নান্নুরের দুই পৃথক রীতি উভয়ের পদাবলীতে যে যুক্ত-বেণী প্রবাহ এনেছে—পরবর্তীরা, বৈষ্ণব ভক্তকবিরা কমবেশী তারই অনুসরণ,—সংযোগ-বিয়োগের দ্বারা পদাবলীর বিপুল ধারাস্রোতের সৃষ্টি করেছেন। চণ্ডীদাসের ভাষায় শব্দসম্পদে বাংলার স্বকীয় স্নেহ অনুযোগ, সৌন্দর্যের ধারাস্নান, সুখ দুঃখ নিঙড়ানো প্রেমের আর্তি, লোক-চেতনার বিভিন্ন প্রকাশ, পদাবলীর একটি নিজস্ব প্রকাশ-রীতির পরিচয় বহন করছে। কালিয়া বঁধু, পরাণপুতলী, বিনোদ বঁধুয়া, কালা জপমালা, কুলের খাঁখার, কালিয়া ফাঁদ—প্রভৃতি অসংখ্য স্নেহ অনুযোগ মিশ্র কৃষ্ণ-সম্বোধনের শব্দ ব্যবহারে কবির বুঝি আশ মিটতে চায়না। রাধাকৃষ্ণের সৌন্দর্য

চণ্ডীদাসের ভাষারীতি

বর্ণনায়ও কবি কত আবেগাকুল শব্দাবলীর ব্যবহার করেছেন। যেমন—হসিত বদন জলদ বরণ কানু, দোলনি গলার মালা, কুচযুগ গিরি কনক গাগরি, আউলাইয়া বেনী, চূড়ার টালনি,—এমন অসংখ্য শব্দবিশেষণে কবি তার ধ্যানের কৃষ্ণ-রাধাকে অঙ্কিত করেছেন। পিরীতি সর্বস্ব পদাবলী সাহিত্যে হৃদয় নিঙড়ানো সুখ-দুঃখময় প্রেমের আকুলতাও চণ্ডীদাস প্রথম প্রকাশ করেছেন। পাপ পিরীতের লেহা, পিরীতের দায়, প্রথম পিরীতি, কানুর পিরীতি যেমতি কবাতি, কানুর পিরীতি দরিদ্রের হেম, পিরীতি পরাণ ভাগি, পিরীতি বিষম, পিরীতি মন্তর, পিরীতি সায়র, সাধের পিরীতি, নিগূঢ় পিরীতি পিয়ার আরতি, কানুর পিরীতি চন্দনের রীতি—এমন শতাধিক আবেগাকুল শব্দচয়ন করা যেতে পারে। কালাবঁধুকে ডাকবার কত নব নব নাম,—নাগর, বিনোদ রায়, নন্দের নন্দন, গোকুলের কান, আমার বঁধুয়া, সে বঁধু কালিয়া, শ্যাম বন্ধু মোর, সোনার বঁধুয়া, বিনোদনাগর, বিনোদ বঁধুয়া, মদন সোনা। সমাজ ও পরিবার চেতনা বিভিন্ন পদে কত অসংখ্য নিত্য ব্যবহার্য সুপরিচিত শব্দে প্রকাশ করেছেন।—কুলবতী নারী, কুলকলঙ্কিনী, অবলা-অখলা, কলঙ্কের ডালি, পতি গুরুজন, কুলের বৌরী, সতী কুলবতী, ননদী দারুণ, ননদি কাঁটা, ঘরে গুরুজন, ঘর মোর বাদী শাশুড়ী ননদী, মিছা অপবাদ, কি ছার পাড়ার লোক, বাদী এ পাড়াপড়শী, কানুকলঙ্কিনী রাধা, হাটে মাঠে বাটে কুলটা খেয়াতি, কুলের রমনী, ঘর হতে আঙিনা বিদেশ। চণ্ডীদাস পদাবলীতে এমন শব্দের পরিমাণ কতবিপুল পাঠক মাত্রেই উপলব্ধি করবেন।—এই কবিকে বাংলা কবিভাষার জনক আখ্যা না দিলে আর কোন্ কবিকে তা দেওয়া যেতে পারে? বাঙালী প্রেমিক-প্রেমিকা গভীর ভাব অনুভূতি এবং সেই সঙ্গে সমাজ শাসনের প্রতিবন্ধক যে হৃদয়স্রাবী ভাষায় প্রকাশ করতে পারে চণ্ডীদাস আপনার জীবনে প্রত্যক্ষ প্রেমানুভূতির আলোকে সেই প্রেমার্তি প্রকাশের কবিভাষা সৃষ্টি করেছেন নাগর কবি বিদ্যাপতির ভাষা থেকে পল্লীর কবির এ-ভাষার স্বাতন্ত্র্য সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস বা জগদানন্দের তুলনায় চণ্ডীদাসের পদে ধ্বনিতরঙ্গের ঐশ্বর্য কম,—ছন্দের তরঙ্গভঙ্গের দিকে তাঁর সচেতন দৃষ্টিই ছিলনা বলা যেতে পারে। তবু গভীর ভাবাবেশ যে কোমল ধ্বনিমাধুর্যের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে সেও কম বিস্ময়কর নয়। তিন মাত্রার শব্দ বিন্যাসে ছন্দে যে অপূর্ব গতিবেগ সৃষ্টি হয় ছন্দ আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ যে সম্পর্কে আমাদের সচেতন করেছেন। চণ্ডীদাসের ভাবমধুর এবং ধ্বনিমধুর বহুপদেই এই

ছন্দোবৈশিষ্ট্য

তিনমাত্রার শব্দ বিন্যাসের কোমল গতিবেগ সহজেই আমাদের মুগ্ধ করে। একটি দৃষ্টান্ত তোলা যেতে পারে।—

পিরিতি নগরে বসতি করিব
পিরিতে বাঁধিব ঘর।
পিরিতি দেখিয়া পড়সি করিব
সকলি লাগিছে পর।।

পিরিতি দোয়ারে কবাট লাগাব
পিরিতে গোঁয়াব কাল।
পিরিতি আসকে সদাই থাকিব
পিরিতে বাঁধিব চাল।।[১] ১৯৮।।

চণ্ডীদাস পদাবলীর উচ্চারণরীতি দীর্ঘকাল ধরে গায়কদের গায়নরীতির প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে প্রায় আধুনিক উচ্চারণে এসে দাঁড়িয়েছে। অনুমিত হয় সে যুগে পদগুলি বহুলাংশে প্রাচীন অক্ষরবৃত্ত (মিশ্র কলাবৃত্ত) রীতিতেই উচ্চারিত হত। কবির সর্বাধিক প্রিয় ছন্দোবন্ধ ছিল ৬।৬।৮ মাত্রাভাগের লঘুত্রিপদী ছন্দ পয়ারবন্ধও (৮।৬) কবি যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করেছেন। মিশ্র ছন্দোবন্ধও (যেমন লঘু ও দীর্ঘ ত্রিপদী এবং পয়ার পংক্তির মিশ্রণ) ব্যবহার করেছেন। কদাচিত [দ্র. ৭৪] একাবলী ব্যবহারেও কবি চমৎকার কিছু পদ রচনা করেছেন। আটমাত্রা পংক্তির দু-একটি পদও [ঐ: ১৬০, ১৬৮ প.] পাওয়া যাচ্ছে। বড়ু চণ্ডীদাস ভণিতাতে মিশ্র দশ মাত্রা ও চৌদ্দমাত্রা পংক্তির একটি পদও (১৯৯ প.) উল্লেখযোগ্য। এখানে কবির দু-একটি ছন্দোবন্ধের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা যেতে পারে।—

(ক) দীর্ঘ ও লঘু ত্রিপদীমিশ্র ছন্দোবন্ধ:

সাঁজে নিবাইল বাতি কত পোহাইব রাতি
সে যে হৃদয় বিদরে।
না হয় মরণ না রহে জীবন
মরম কহিব কারে।। ৭৪।।

১। ছন্দ-উদাহরণগুলির শেষে প্রদত্ত সংখ্যা ড. বিমানবিহারী মজুমদারের 'চণ্ডীদাসের পদাবলীর' পদসংখ্যা নির্দেশক। অলঙ্কারের উদাহরণ সংসদ-সংখ্যা নির্দেশক।

এখানে প্রথম পংক্তিটি ৮।।৮।।৮I এবং দ্বিতীয় পংক্তিটি ৬।।৬।।৮I মাত্রাভাগে রচিত হয়েছে।

(খ) একপদী ও ত্রিপদী : সই, কহিও তাহার পাশে।
যাহারে ছুঁইলে সিনান করিয়ে
সে মোরে দেখিঞা হাসে ॥
কার শিরে হাত দিঞা।
কদম্ব তলাতে কারে কি বলিলা
যমুনার জল ছুঁইঞা ॥ ১৫৬ ॥

এখানে প্রথম পংক্তি আট মাত্রার একপদী, সঙ্গে দুমাত্রার অতিপর্ব আছে। দ্বিতীয় পংক্তি ৬।।৬।।৮I মাত্রার লঘু ত্রিপদীবন্ধে রচিত।

(গ) একাবলী : বহুদিন পরে বঁধুয়া এলো।
দেখা না হইত পরাণ গেলে ॥
এতেক সহিল অবলা বলে।
কাটিয়া যাইত পাষাণ হলে ॥ [১৭৮]

ডঃ বিমান বিহারী মজুমদার তাঁর 'চণ্ডীদাসের পদাবলী'তে চণ্ডীদাস ভণিতায় স্বরবৃত্ত বা দলবৃত্ত রীতির একটি পদ (১০১ নং) উদ্ধৃত করেছেন। বরাহনগর পুঁথিতে প্রাপ্ত এ-পদটি দ্বিজ চণ্ডীদাসের রচনা কিনা সন্দেহের অবকাশ আছে। তবু ছন্দোবৈচিত্র্যের নিদর্শনরূপে এর থেকে কয়েকপংক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারে।—

(ঘ) দুর দুর কলঙ্কিনি বলে অবোধ লোকে গো।
না জানি কাহার ধন হর্যা দিলাম কাকে গো ॥
কার সনে নাহি কথা থাকি ভয় করি গো।
তবু ত দারুণ লোকে সেই কথা কয় গো ॥ ১০১ ॥

যে যুগে অক্ষরবৃত্ত এবং স্বরবৃত্তের উচ্চারণ-পার্থক্য ততটা সুনির্দিষ্ট হয়নি পদটি সে যুগের রচনা নিদর্শন। বস্তুতঃ এ ছন্দকে স্বরবৃত্ত উচ্চারণ প্রভাবিত অক্ষরবৃত্ত বলাই যেন বেশী যুক্তিযুক্ত মনে হয়।

চণ্ডীদাসের পদে অন্যান্য পদাবলীগীতির তুলনায় অলঙ্কার শিল্পের বৈচিত্র্যাভাব লক্ষনীয়। স্বভাবোক্তিকে অলঙ্কার রূপে স্বীকার করলে বলতে হয়, চণ্ডীদাসের পদের প্রধানতম অলঙ্কার হল স্বভাবোক্তি। স্বতোৎসারিত ভাবে ভক্ত কবিমনের আবেগ যে চিত্ররূপের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছে চণ্ডীদাসের অধিকাংশ পদে তারই প্রতিফলন লক্ষনীয়।

অলঙ্কার প্রয়োগ

চণ্ডীদাস শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার একেবারেই ব্যবহার করেননি এমন নয়। তবে সে অলঙ্কার ভাবের একাত্মতায় এতটা আত্মলীন যে শ্রোতা সে বিষয়ে পৃথক ভাবে সচেতন হবার যেন সুযোগই পান না কিছু কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।—

১। পদান্ত্যানুপ্রাস : জীবনে মরণে জনমে জনমে প্রাণনাথ হইও তুমি।

... ...

একুলে ওকুলে দুকুলে গোকুলে আপনা বলিব কায়।

[বিশ্ব. সং. নিবেদন : ১]

পদ ও পংক্তির অনুপ্রাস মিলে চণ্ডীদাস যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন অসংখ্য পদে তার উদাহরণ মিলবে। চণ্ডীদাস অর্থালঙ্কারের মধ্যে উপমা, উৎপ্রেক্ষা, অতিশয়োক্তি এবং ব্যতিরেক অলঙ্কারের বেশ সার্থক ব্যবহার করেছেন।—

( ) উপমা—

(ক) সুধা ছানিয়া কেবা ও সুধা ঢেলেছে রে
তেমতি শ্যামের চিকন দেহা। ৪৩ ॥

(খ) চকোর পাইল চাঁদ পাতিয়া পিরীতি ফাঁদ
কমলিনী পাওল মধুপ।

(গ) পরবশ পিরীতি আঁধার ঘরে সাপ। ১১৭ ॥

লুপ্তোপমার আর একটি চমৎকার উদাহরণ :

(খ) মাটি খোদাইয়া খাল বানাইয়া
উপরে দেয়ল চাপ।
আহার দিয়া মারয়ে বান্ধিয়া
এমন করয়ে পাপ ॥
নৌকাতে চড়াঞা দরিয়াত লৈয়া
ছাড়য়ে অগাধ জলে।
ডুবুডুবু করি ডুবিয়া না মরি
উঠিতে নারিয়ে কূলে ॥ ৮৬ ॥

পদটিতে বিষম অলঙ্কারে আভাসও লক্ষনীয়।

(৩) উৎপ্রেক্ষা : দুহুঁ করে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
তিল আধ না দেখিলে যায় যে মরিয়া ॥ ৭৭ ॥

(৪) রূপক : পিরীতি পালঙ্কে শয়ন করিব পিরীতি সিথান মাথে। ১৩৪ ॥

(৫) অতিশয়োক্তি : জলদবরণ কানু দলিত অঞ্জন তনু

উদয়িছে শুধু সুধাময়। ব. সা. সং. ৭ ॥

(রাধার মুখে কৃষ্ণরূপবর্ণনা)

(৬) ব্যতিরেক : (ক) বরণ দেখিনু শ্যাম জিনি কোটি কাম

বদন জিতল শশী। ব. স. সং. ১৭ ॥

(রাধা কর্তৃক কৃষ্ণরূপবর্ণনা)

(খ) কেশরী জিনিয়া কৃশ মাঝাখানি মুঠে করি যায় ধরা।

গজকুম্ভ জিনি নিতম্ব বলনী উরু করিকর পারা॥ ৪৯ ॥

ব্যতিরেক অলঙ্কারের একটি চমৎকার মালা গেঁথেছেন কবি পূর্বরাগের 'এমন পিরীতি কভু নাহি দেখি শুনি' পদটিতে, চণ্ডীদাসের খণ্ডিতা পদে (ভাল হৈল আরে বঁধু : ৬১) বিপরীত কুটিল ভাবণের সুন্দর উদাহরণ পাওয়া যায়। 'যত নিবারিয়ে চাই নিবার না যায়রে' (১২৯) পদটি ব্যাজস্তুতির একটি সার্থক পদ। 'ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর' (৮২) পদটি Chiasmas বা পরাবৃত্তির উদাহরণ, 'সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু'[১] পদটি বিষম অলঙ্কারের ভিত্তিতে রচিত হয়েছে। কবির 'রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা' (৩৬), 'কালোজল ঢালিতে সই কালা পড়ে মনে' (১০০) পদগুলি স্মরণ অলঙ্কারের সার্থক উদাহরণ বলা যেতে পারে। অলঙ্কার সচেতন কবি না হলেও চণ্ডীদাসের পদে অনেকাংশে এমন স্নিগ্ধ প্রচ্ছন্ন অলঙ্করণ সৌন্দর্য লক্ষিত হয়।

১। চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাস উভয়েরই ভণিতায় পাওয়া যায়

পঞ্চম অধ্যায়

চৈতন্য-পরবর্তী প্রখ্যাত পদকারত্রয়ী

কবি জ্ঞানদাস

ধর্মীয় অন্যান্য কাব্যশাখার মত মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদাবলীর বিষয়বস্তু এবং বর্ণনারীতিতেও গতানুগতিকভাব ছাপ লক্ষ্য করা যায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মাশ্রিত রাধাকৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদাবলী গান রচনা করতে গিয়ে ভক্ত কবিরা ভক্তির তির্যক দৃষ্টিতে তাঁদের নিজস্ব জগৎ তৈরী করেছেন। রাধাকৃষ্ণের রূপবর্ণনায়, পূর্বরাগ, মান অভিসার, মাথুর প্রভৃতি প্রেমলীলার বিভিন্ন পালা-চিত্রাঙ্কণে, —শ্রীচৈতন্যের অবতার লীলা বর্ণনায় অধিকাংশ বৈষ্ণব কবিই এক ধরণের অলঙ্কার ও ছন্দরীতির প্রয়োগ করেছেন। ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার, নায়ক-নায়িকার রূপবর্ণনা, রসপর্যায় ভাগ ইত্যাদি পদাবলীগানের সামগ্রিক উপকরণ-সজ্জাতেই ভক্তকবিদের এই অত্যধিক সাদৃশ্য বহুলাংশে একঘেয়েমীর সৃষ্টি করেছে। চৈতন্য-পূর্ববর্তী দুই শ্রেষ্ঠ কবি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বর্ণনার যে বিশিষ্ট দুই রীতির প্রবর্তন করেছিলেন চৈতন্য-পরবর্তী ভক্ত বৈষ্ণব কবিগণ আরও সীমাবদ্ধ তত্ত্বদর্শনের আলোকে কমবেশী সেই ধারারই অনুসরণ করে চলেছিলেন। এই গণ্ডীবদ্ধ ভক্তি-প্রেমের জগতে বিচরণ করতে গিয়েও প্রতিভাবান কয়েকজন কবি তাঁদের কবিত্ব প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। চৈতন্য-পরবর্তী সেই অল্প কয়েকজন প্রতিভাবান কবির মধ্যে জ্ঞানদাস এবং গোবিন্দদাসের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়।

বর্ধমান জেলার কাঁদড়া-মাঁদরা (বর্তমান কেতুগ্রামের অন্তর্ভুক্ত) গ্রামে সম্ভবত ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে জ্ঞানদাসের জন্ম হয়। শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ লাভে বঞ্চিত হলেও বাল্যকালে তিনি প্রভু নিত্যানন্দকে দেখেছেন এরূপ অনুমিত হয়। ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে লিখিত 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় কবিকর্ণপুর জ্ঞানদাসের নাম করেননি, বা সমসাময়িক

কবি পরিচিতি

দেবকীনন্দনের বৈষ্ণব-বন্দনায়ও জ্ঞানদাসের উল্লেখ নেই, কিন্তু ষোড়শ শতকের

শেষভাগে বা সপ্তদশ শতকের সূচনাকালে অনুষ্ঠিত খেতরীর মহোৎসবে[1] যখন জ্ঞানদাস যোগ দেন তখন নিত্যানন্দ গোষ্ঠীর নেতৃস্থানীয়দের তিনি অন্যতম ছিলেন দেখা যায়। সুতরাং ষোড়শ শতকের শেষপাদেই জ্ঞানদাসের প্রতিভা সম্যক পরিচিতি লাভ করেছিল এরূপ অনুমিত হয়। 'ভক্তিরত্নাকর' প্রণেতা নরহরি চক্রবর্তী জ্ঞানদাস বন্দনায় একটি পদে লিখেছেন,—

শ্রীবীরভূমেতে ধাম কাঁদড়া-মাঁদড়া গ্রাম
তথায় জন্মিলা জ্ঞানদাস।
আকুমার বৈরাগ্যেতে রত বাল্যকাল হৈতে
দীক্ষা লৈলা জাহ্নবার পাশ॥

... ...

মদনমঙ্গল নাম রূপে গুণে অনুপাম
আর এক উপাধি মনোহর।
খেতুরীর মহোৎসবে জ্ঞানদাস গেলা যবে
বাবা আউল ছিল সহচর॥
কবিকুলে যেন রবি চণ্ডীদাস তুল কবি
জ্ঞানদাস বিদিত ভুবনে।
যার পদ সুধাসার যেন অমৃতের ধার
নরহরি দাস ইহা ভণে॥[2]

এই পদের প্রামাণিকতা অস্বীকারের হেতু নেই। সুতরাং সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে, জ্ঞানদাস প্রভু নিত্যানন্দকে বাল্যকালে দেখে থাকলেও তাঁর তিরোধানের (১৫৪২ ?) পর পত্নী জাহ্নবা দেবীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি চিরকুমার ছিলেন। খেতরী মহোৎসবে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং সেই সময়ে নিত্যানন্দ গোষ্ঠীর নেতৃস্থানীয় স্থান অধিকার করেছিলেন তিনি। নিত্যানন্দের জন্মস্থান একচাকা গ্রামে।—তার চার মাইল পশ্চিমে কাঁদড়া-মাঁদড়া (কেতুগ্রাম)

১। খেতরী মহোৎসব ঠিক কোন্ সময়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবিষয়ে গবেষকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথের মতে ১৬০১-২ এর কাছাকাছি সময়ে এই মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কেহ কেহ এই তারিখ ১৫৮১ বলে ধরেছেন।

২। দ্রঃ জ্ঞানদাস ও তাঁহার পদাবলী : বিমানবিহারী মজুমদার (কলিকাতা, এপ্রিল ১৯৬৫) : কবির পরিচয় পৃ- ১।

জ্ঞানদাসের জন্মস্থান। সেখানে জ্ঞানদাসের নামে যে মঠ রয়েছে এখনো প্রতিবছর পৌষ-পূর্ণিমা তিথিতে সেই মঠে কবির তিরোভাব উৎসব হয়।

একমাত্র পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী ১৭ শতকের শেষ পাদে সংকলিত ব্যতীত প্রাচীন সমস্ত পদসংকলন-গ্রন্থে জ্ঞানদাসের পদ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, এবং সকলেই কবি হিসাবে তাঁকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। বৈষ্ণবদাসের 'পদকল্পতরু'তে ১৮ শতকের তৃতীয় পাদে সংকলিত) ৩১০১ টি পদের মধ্যে জ্ঞানদাসের ১৮৬ টি পদ রয়েছে। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত 'জ্ঞানদাস ও তাঁহার পদাবলী' গ্রন্থে ৪৭৪ টি অসন্দিগ্ধ এবং ৩০ টি সন্দিগ্ধ, মোট ৫০৪ টি পদ সংগ্রহ করে দিয়েছেন।

কবিত্বের উৎকর্ষ বিচারে জ্ঞানদাস-পদাবলীর দুটি স্তর অনুমান করা যায়। প্রথম শিক্ষানবিশী কালে তিনি বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস এবং অন্যান্য দু-একজন পূর্বসূরীর অনুসরণ করেছেন, ক্রমান্বয়ে যখন তাঁর কবিত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে, এই কবিদের,—বিশেষ করে চণ্ডীদাসের কাব্যাদর্শকে যেন স্বীকরণের দ্বারা আত্মসাৎ করে এবং সেই সঙ্গে স্বীয় মৌলিক প্রতিভার সংযোজনের সাহায্যে এক নতুন লিরিক প্রেমানুভূতির কবিরূপে আমাদের সামনে আবির্ভূত হয়েছেন। বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণের প্রেমকথার মাধ্যমে কবি যেন নরনারীর শাশ্বত প্রেম-বেদনার কথাই শোনাতে চেয়েছেন। এই ব্যক্তিক লিরিক-প্রেমানুভূতির ক্ষেত্রে জ্ঞানদাস দীর্ঘ চার শতাব্দীকালের ব্যবধান অতিক্রম করে, মধ্যযুগীয় বিশিষ্ট ধর্মগোষ্ঠীর সীমা অতিক্রম করে বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব নির্বিশেষে এ-যুগের প্রেমাকুল পাঠক ও শ্রোতৃ-হৃদয়ের সঙ্গে একাত্ম হতে পেরেছেন। তাঁর কয়েকটি অবিস্মরণীয় পদ এ-যুগের শ্রেষ্ঠকবি রবীন্দ্রনাথের মনে কি গভীর রেখাপাত করেছিল একাধিক প্রসঙ্গে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। সেই কবি-ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পরিচয় সাধনের পূর্বে কবির প্রাথমিক শিক্ষানবিশী স্তরের,—বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও অন্যান্য পূর্ব সূরীদের অনুসরণ কালের কিছুটা পরিচয় নেওয়া যেতে পারে।

বয়ঃসন্ধি : বিদ্যাপতির প্রভাব

বিদ্যাপতি রাধার বয়ঃসন্ধি বর্ণনায় যে অনন্যকরণীয় মনঃস্তত্ত্বময় চিত্র অঙ্কণ করেছেন ইতি পূর্বে তার পরিচয় দিয়েছি। প্রায় একই আদর্শে জ্ঞানদাসও দুটি চমৎকার পদ রচনা করেছেন। পদ দু'টি এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে।—

খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ।
হেরত না হেরত সহচরি মাঝ ॥
বোলইতে বচন অল্প অবগাই।
হাসত ন হাসত মুখ মুচুকাই ॥
এ সখি এ সখি পেখলুঁ নারি।
হেরইতে হরখি রহল যুগ চারি ॥
উলটি উলটি চলু পদ দুই চারি।
কলসে কলসে জনু অমিয় উঘারি ॥
মনমথ-মন্ত্রি অগোরল বাট।
চকিত চকিত পড়ু কত রস-নাট ॥
কিয়ে ধনি ধাতা নিরমিল তাই।
জগমাহ উপমা করই ন পাই ॥
পরখে পুছলুঁ হম তাকর নাম
জ্ঞানদাস কহ রসিক সুজান ॥ [১] ২৩ ॥

কৃষ্ণ নবোদ্ভিন্ন-যৌবনা বালিকা রাধাকে দেখে কোনও সখিকে বলছেন,—কখনো খেলে, কখনো খেলে না,—লোক দেখলে লজ্জা পায়। সখিদের মাঝে থেকে কখনো দেখে (কৃষ্ণকে), কখনো দেখেনা। কথা বললে, কিছু শোনে কিছু শোনে না। মুখ ঢেকে কখনো হাসে, কখনো হাসেনা। সখি, এ এক নারীকে দেখলাম,—তার দিকে আমি তাকাতে সে যেন চারযুগ ধরে তাকিয়ে রইল। উলটে তাকাতে তাকাতে দু-চারপা এগিয়ে গেল,—যেন ভরা কলস থেকে অমিয় ছলকে পড়ল। মন্ত্রী মন্মথ পথ আগলে রেখেছিল। চকিতে সে কত রসের লীলা দেখাল। বিধাতা কি (অপরূপ) ধনি নির্মাণ করেছেন, জগৎ ভরে তার উপমা মিলবে না। পরীক্ষা-ছলে তাকে নাম জিজ্ঞাসা করলাম। জ্ঞানদাস বলছেন, (কৃষ্ণ!) তুমিই রসিক সুজন।

বিদ্যাপতির 'খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ' পদটির সঙ্গে জ্ঞানদাসের এই পদটির ভাষা, ছন্দ ও অঙ্গিকগত যতটা মিল রয়েছে মূল চিত্রাঙ্কণে কিন্তু সে তুলনায়

১। পদের শেষে লিখিত সংখ্যা বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত 'জ্ঞানদাস ও তাঁহার পদাবলী' ১৩৭২, বৈশাখ সংস্করণের (শতাব্দী গ্রন্থভবন, কলিকাতা), পদ-সংখ্যা নির্দেশক।

যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষিত হয়। বিদ্যাপতির পদে (বয়ঃসন্ধির সবগুলি পদেই) নব যৌবন আগমনের সময়কার পরিবর্তনগুলি চমৎকারী উপমা ও বর্ণনা চাতুর্যের সঙ্গে পাকা অভিজ্ঞতার রঙে চিত্রিত হয়েছে। অপরদিকে জ্ঞানদাসের পদটিতে উদ্ভিন্ন-যৌবনা রাধাকে দেখে কৃষ্ণের রূপমুগ্ধতার ছবিই স্পষ্টতর হয়েছে। তুলনার ক্ষেত্রে অবশ্য, বিদ্যাপতিকে অনেক পরিণত অভিজ্ঞতার কবি বলে স্বীকার করতে হয়।

বয়ঃসন্ধির আর একটি সার্থক পদ উদ্ধৃত করি।—

✓ এ সখি! এ সখি! বুঝই না পারি।
কিয়ে ধনী বালা কিয়ে বরনারী॥
রস-পরসঙ্গ শুনই সুখ পাব।
রসবতী-সঙ্গ ছোড়ি নাহি যাব॥
আধ আধ চাহি যাই পদ আধা।
রস-পরসঙ্গ শুনই বহু সাধা॥
হামরা দুহুজন পথে একু মেলি।
সো আনজন সঞে করু আন খেলি॥
যব কছু পুছয়ে উত্তর না পাব।
অধরক পাশ হাস পশিয়াব॥
ঐছন রমনী দৈবে দেল সঙ্গ।
বিহি উদগীম চাহি দিল ভঙ্গ॥
উহ সে লাজবশ হামারিও লাজ।
জ্ঞানদাস কহে দূর রহু কাজ॥ ২৫ ॥

কৃষ্ণ সখিকে বলছেন, ওগো সখি, আমি বুঝে উঠতে পারছিনা এই ধনী বালিকা না বরযুবতী। সে রসের প্রসঙ্গ শুনতে সুখ পায়, রসবতীদের সঙ্গে ছাড়তে চায় না। আধ আধ দৃষ্টিতে সে তাকায়,—আধপদ গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। রস-প্রসঙ্গ শুনতে তার বড়ই আগ্রহ। পথে একবার দুজনে সাক্ষাৎ হল, সে অপরের সঙ্গে অন্য খেলায় মেতে থাকল। কিছু প্রশ্ন করলে উত্তর দেয়না, অধরপ্রান্তে হাসি খেলে যায়। দৈবে এমন রমণীর সঙ্গ পেলাম। কিন্তু বিধি উদ্‌গ্রীব দেখে সে (রসের খেলায়) ভঙ্গ দিল। সে লজ্জার বশ, আমারও লাজ। জ্ঞানদাস বলেন, (তাহলে) কাজ দূরে থাকুক।

এ-পদটিতে কবিত্বের সৌন্দর্য থাকলেও অপরিণত রচনারও কিছুটা ছাপ রয়েছে। তৃতীয় ও ষষ্ঠ পংক্তি দুটি একই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি। সমগ্র পদের বর্ণনাভঙ্গির গ্রন্থনাতেও বিদ্যাপতির তুলনায় সংবদ্ধতার অভাব রয়েছে।

কৃষ্ণ-মিলনোৎসুকা নবোঢ়া রাধার প্রতি সখিদের উপদেশমূলক পদ রচনাতেও জ্ঞানদাসের উপর বিদ্যাপতির প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষিত হয়। তুলনার সুবিধার্থে এখানে প্রথম বিদ্যাপতির একটি পদ উদ্ধৃত করি।—

নবোঢ়া-মিলন : বিদ্যাপতির প্রভাব

হমর বচন শুন সাজনি।
মান করবি আদর জানি ॥
জব কিছু পিয়া পুছব তোয়।
অবনত মুখ রহবি গোয় ॥
জব পরীহরি চলএ চাহি।
কুটিল নয়ানে হেরবি তাহি ॥
জব কিছু আদর দেখহ থোর।
ঝাপি দেখাওবি কুচ ওর ॥
বচন কহবি কাঁদন মাখি।
মান করবি আদর রাখি ॥
জব করে ধরি নিকট আনি।
উহু উহু কএ কহবি বানি ॥
ভনই বিদ্যাপতি সোই সে নারি।
মানক পিরিতি রাখিঅ পারি ॥

[মজুমদার : বিদ্যাপতি ৬৬৮ নং]

সজনি, আমার কথা শোন। আদর বুঝে মান করবে। প্রিয় কিছু জিজ্ঞাসা করলে মুখ নামিয়ে গোপন করবে। তোমায় ছেড়ে চলে যেতে চাইলে কুটিল কটাক্ষে তার দিকে চাইবে। আদর অল্প দেখলে ঢাকবার ছলে কুচ দেখাবে। কান্না মিশিয়ে কথা বলবে। আদর রেখে মান করবে। হাত ধরে কাছে আনলে 'উহুঁ উহুঁ' বলবে। বিদ্যাপতি বলেন, সেই আসল নারী যে মানের প্রীতি রাখতে পারে।

জ্ঞানদাস অনুরূপ ভাষাভঙ্গিতে কয়েকটি পদ লিখেছেন। একটি উদ্ধৃত করছি—

পহিলহিঁ দরশনে সোঁপবি সেবা।
পুছইতে কুশল উতর নাহি দেবা।
শুন শুন সজনী তু বড়ি সিয়ানি।
কহিব ন কহিব রাখব নিজ মানি॥
সহজেই সুচতুর গোপ কানাই।
অবসর বুঝই করিব চতুরাই॥
যব চিতে বুঝবি বড় অনুরাগ।
তৈখনে কহিব হৃদয়ে জনি লাগ॥
জানয়ে তুহুঁ বড় বিদগধ নারি।
সঙ্কেত জানায়বি আখর চারি॥
সো দিন অবধি রহব পতি আশে।
জ্ঞানদাস কহ গুরুয় পিয়াসে॥ ১২৬॥

প্রথম দর্শনে সেবা সমর্পণ করবে (প্রণাম করবে)। কুশল প্রশ্নের উত্তর দেবে না। সজনি শোন, তুমি বড়ই সেয়ানা, কথা বলেও বলবে না—এ-ভাবে নিজের মান রাখবে। গোপ কানাই স্বভাবতই খুব চতুর। সুযোগ বুঝে তার সঙ্গে চাতুরি করবে। যখন বুঝবে তোমার প্রতি তার খুবই অনুরাগ হয়েছে তখন মনের কথা বলবে। জানি তুমি খুবই বিদগ্ধা নারী, সংকেতে চার অক্ষর (অনুরাগ। চতুর্দশী?) জানাবে। সেইদিন অবধি (চতুর্দশী তিথি?) পতির আশায় থাকবে। জ্ঞানদাস বলেন, এ পিয়াস বড় বেশী।

উভয়ের বর্ণনাভঙ্গিতে সাদৃশ্য থাকলেও বক্তব্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। বিদ্যাপতির সখি উপদেশের পদে বাইরের হাবভাব, লীলাভঙ্গি অর্থাৎ অনুভাব চিত্রণেরই প্রাধান্য বেশী। জ্ঞানদাসে সে তুলনায় সূক্ষ্ম হৃদয়ানুভূতিমূলক উপদেশেরই প্রাধান্য। জ্ঞানদাসের নবোঢ়া মিলনের আর একটি চমৎকার পদে তিনি যেন বিদ্যাপতির সখি-উপদেশের প্রেমাস্ত্রে সজ্জিতা রাধাকেই কৃষ্ণসমীপে পাঠিয়েছেন।—

অবনত নয়নী না কহে কিছু বাণী।
পরশিতে তরখি ঠেলই পহুঁ পাণি॥

সুচতুর নাহে করয়ে অনুরোধ।
অভিনব রাই না মানয়ে বোধ॥
পিরিতি বচন কিছু কহ যে বিশেষ।
রাইকো হৃদয়ে দেখয়ে রসলেশ॥
পহিরণ বাস ধরল যব হাত।
তব ধনী দিব দেওল নিজ মাথ॥
রস পরসঙ্গে করয়ে বহু রঙ্গ।
নিজ পরথার নামে দেই ভঙ্গ॥
নাহক আদর বহুত বাড়ায়।
জ্ঞানদাস কহে এত না জুয়ায়॥ ১৯৭॥

অবনত নয়নী কোন কথা বলেন না। কৃষ্ণ তাঁকে স্পর্শ করলে ত্রাসে হাত ঠেলে সরিয়ে দেন। চতুর নাথ তাঁকে অনুরোধ করেন, কিন্তু আশ্চর্য, রাই তা বুঝতে পারেন না। কৃষ্ণ বিশেষ কোনও পিরীতির কথা বলাতে রাই-এর হৃদয়ে কিছু রস দেখা গেল। কৃষ্ণ যখন তার পরনের বসন হাতে ধরলেন ধনী তখন আপন শিরে হাত রেখে দিব্য দিলেন (কৃষ্ণকে নিবৃত্ত করবার জন্য)। রসের প্রসঙ্গে রাই অনেক রঙ্গ করেন, কিন্তু নিজ প্রস্তাবের বেলায় ভঙ্গ দেন।—এইভাবে নাথের আদর অনেক বাড়ালেন। জ্ঞানদাস বলেন, এতটা যুক্তিযুক্ত নয়।

জ্ঞানদাসের নবোঢ়া মিলনের আরও কয়েকটি পদে বিদ্যাপতির রচনারীতির প্রভাব লক্ষিত হয়। মুখ্যতঃ বয়ঃসন্ধি, নবোঢ়া-মিলন (সখি উপদেশ), রসোদ্গার এবং প্রবাসের চিত্রাঙ্কনেই জ্ঞানদাস বহুলাংশে বিদ্যাপতিকে অনুসরণ করেছেন। এই পদগুলিতে কবির শিল্প প্রতিভার স্বাক্ষরও যথেষ্ট রয়েছে। তবে এমন বহিরঙ্গ রতিকলা-চিত্রণে জ্ঞানদাসের কবিত্বের আসল পরিচয় ফুটে উঠেছে বলা চলে না। এবং সে-কারণেই অনুমিত হয়, শিক্ষানবিশী পর্যায়েই তিনি বিদ্যাপতির অনুসরণে বেশ কিছু সংখ্যক ব্রজবুলি পদ লিখেছিলেন। ধীরে ধীরে চণ্ডীদাসের তন্ময় প্রেমানভূতির ক্ষেত্রে তাঁর কবিব্যক্তিত্ব আত্মপ্রকাশের পথটি খুঁজে পেল।

চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের তন্ময় আত্মলীনতার সুরে এমন একটি গভীর মিল রয়েছে যে বিশুদ্ধ বাংলায় লেখা সহজ প্রেমাকুলতার আবেগ মেশানো জ্ঞানদাসের অনেকগুলি পদই আজ চণ্ডীদাস-পদাবলী থেকে পৃথক করা কঠিন। সুপ্রচলিত একটি বিখ্যাত পদ 'সুখের লাগিয়া

চণ্ডীদাসের প্রভাব

এ ঘর বাঁধিনু' পদকল্পতরুতে চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত, ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার,[২] এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-সংস্করণের সম্পাদকদ্বয় পদটি জ্ঞানদাস ভণিতায় প্রকাশ করেছেন। (জ্ঞানদাসের আর একটি প্রখ্যাত পদ 'সই আর কি কহিতে ডর। যাহার লাগিয়া সব তেয়াগেনু সে কেন বাসয়ে পর।'—এর প্রথম ছয়টি পংক্তি চণ্ডীদাস ভণিতাতেও রয়েছে।) 'পরাণবন্ধুকে স্বপনে দেখিনু বসিয়া শিয়র পাশে।' পদটি সতীশচন্দ্র রায় চণ্ডীদাসের বলে গণ্য করেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত গ্রন্থে জ্ঞানদাস ভণিতা রয়েছে, ডঃ মজুমদারও 'সন্দিগ্ধ' পর্যায়ে জ্ঞানদাস ভণিতায় রেখেছেন। 'কি মোর ঘর দুয়ারের কাজ' পদটিও উভয়ের ভণিতায় পাওয়া যায়। ভাষা ও ভাব-গত সাদৃশ্য সূচক চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাস ভণিতার বহু পদ মেলে। এখানে পাশাপাশি কয়েকটি উদাহরণ তোলা যেতে পারে।—

চণ্ডীদাস লিখেছেন,—

গুরুজন মাঝে যদি থাকিয়ে বসিয়া।
পরসঙ্গে নামশুনি দরবয়ে হিয়া॥
পুলক পুরয়ে অঙ্গ আঁখে নামে জল।
তাহা নিবারিতে আমি হইয়ে বিকল॥ [মজুমদার : চ. প. ৫০]

একই আদর্শে জ্ঞানদাস লিখেছেন,—

গুরু গরবিত মাঝে রহি সখীসঙ্গে।
পুলকে পুরয়ে তনু শ্যাম পরসঙ্গে॥
পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার।
নয়নের ধারা মেরে বহে অনিবার॥ ২৭১॥

চণ্ডীদাসের একটি পদসূচনায় রয়েছে,—

সই কেমনে ধরিব হিয়া।
আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায়
আমার আঙ্গিনা দিয়া॥
সে হেন কালিয়া না চাহে ফিরিয়া
এমতি করিল যে।
আমার অন্তর যেমতি করিছে
তেমতি হউক সে॥

[২] সন্দিগ্ধ'-পর্যায়ভাগে রেখেছেন।

যাহার লাগিয়া সব তেয়াগিনু
লোকে অপযশ কয়।
সে যে গুণনিধি পিরীতি অবধি
আর কার জানি হয় ॥ ঐ. ৫৯ ॥

অনুরূপভাবেই আক্ষেপানুরাগের একটি পদে ([illegible] লিখেছেন,—

বন্ধুর লাগিয়া সব তেয়াগিলু
লোকে অপযশ কয়।
এ ধন আমার লয় অন্যজন
ইহা কি পরাণে সয় ॥
সই কত না রাখিব হিয়া।
আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায়
আমারি আঙ্গিনা দিয়া ॥
. … …
বন্ধুর হিয়া এমন করিলে
না জানি সে জন কে।
আমার পরাণ করিছে যেমন
এমনি হউক সে ॥ ৭৯৫ ॥

এই পদটিই ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে নরহরি ভণিতাতেও মেলে।

জ্ঞানদাসের আর একটি পদাংশ,—

গিরিয়া বসন বিভূতি ভূষণ শঙ্খের কুণ্ডল পরি।
যোগিনীর বেশে যাব সেই দেশে যেখানে নিঠুর হরি ॥ ৪৩১ ॥

চণ্ডীদাসের অনুরূপ একটি পদের দুটি লাইন মনে করিয়ে দেয়,—

বঁধুর লাগিয়া যোগিনী হইব কুণ্ডল পরিব কানে।
সভার আগে বিদায় হইয়া যাইব গহন বনে ॥ ঐ: ১৯ ॥

চণ্ডীদাস লিখেছেন,—

পিরীতি মিরীতি এ দুই বচন
কে বলে পিরীতি ভাল।
হাসিতে হাসিতে পিরিতি করিয়া
জনম কাঁদিতে গেল ॥ ১০২ ॥

জ্ঞানদাস এরই প্রতিধ্বনি করে লিখলেন —

সবাই বোলয়ে পিরীতি কাহিনী
কে বলে পিরীতি ভাল।
কানুর পিরীতি ভাবিতে ভাবিতে
পাঁজর ধসিয়া গেল ॥
পিরীতি মিরীতি তুলে তোলাইনু
পিরীতি গুরুয়াভার।
পিরীতি বিয়াধি যাবে উপজয়
সে বুঝে না বুঝে আর॥ ৬৯ ॥

চণ্ডীদাস লিখেছেন,—

বঁধু কহিলে বাসিবে মনে দুখ।
যতেক রমণী ধনী বৈঠয়ে জগৎ মাঝে
না জানি দেখয়ে তুয়া মুখ ॥ ১৪৯ ॥

জ্ঞানদাসও অনুরূপ ভাষা ও ছন্দে লিখেছেন,—

বন্ধু, কানাই কহিলে বাসিবা দুখ।
আর যত কুলবতী কুলের ধরম রাখে
সে জনি হেরয়ে তুয়া মুখ ॥ ৬৭ ॥

উভয় কবির মধ্যে এমন আরও সাদৃশ্য সহজেই দেখানো যেতে পারে।[১] তবে একটু অন্তরঙ্গ ভাবে লক্ষ্য করলেই উপলব্ধি করা যায়, চণ্ডীদাসের কাব্যে যেখানে ভক্তকবির আত্মলীনতার সুর তাঁকে সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণ-সাধিকা শ্রীরাধার সঙ্গে এক করে দিয়েছে, জ্ঞানদাসের পদে সেখানে অনেক ক্ষেত্রে, সে যুগের পক্ষে একান্ত দুর্লভ, ব্যক্তিক কবিসত্তার লিরিকধর্মী প্রেমবেদনাকে প্রকাশ করেছে।

১। জ্ঞানদাসের কিছু সংখ্যক পদে অন্যান্য বৈষ্ণব কবিদেরও প্রভাব লক্ষিত হয়। যেমন, বসু রামানন্দের 'বেলি অবসানকালে একা গিয়াছিলাম জলে' পদটির আদর্শে তাঁর 'একাকুম্ভ কাঁখে করি যমুনাতে জলভরি' (২৬৭) পদটি রচিত হয়েছে। বিখ্যাত 'মনের মরম কথা তোমারে কহিয়ে এথা' (৪৭৫) পদটি বসু রামানন্দের 'শাওন মাসের দে ঝিমি ঝিমি বরিষে' পদের আদর্শে রচিত হয়েছে। জ্ঞানদাসের 'চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি' ঈষৎ পরিবর্তিত ভাবে ক্ষণদাগীত চিন্তামণিতে যদুনাথ দাস ভণিতায় পাওয়া যায়।

জ্ঞানদাসের স্বকীয়তা

"সেই কারণেই তাঁর পদগুলিতে কিছুটা ভিন্নতর স্বাদ আমাদের চমকিত করে তোলে। বৈষ্ণব পদাবলী গানে,—বিশেষ করে চৈতন্য-পরবর্তী ভক্তকবিদের গানে ব্যক্তিক প্রেমানুভূতির আর্তি প্রকাশের অবকাশ কম। জ্ঞানদাস কিন্তু ভাব-বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণের ধর্মীয় জগতের ছবি আঁকতে গিয়েও তারই ফাঁকে ফাঁকে আপন মনের নিভৃত ভাবনার স্পর্শে আমাদের চমকিত করে তোলেন। কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে আমাদের বক্তব্যকে স্পষ্ট করবার চেষ্টা করা যেতে পারে।—

অচিরন্তন কবি-হৃদয়ের প্রকাশ

ছলনাকারী নাগর কানু কদম্বতলে রাধার মন চুরি করেছে। এই বিস্ময়কর প্রেমানুভূতি অননুকরণীয় ভাষায় জ্ঞানদাস প্রকাশ করেছেন,—

আলো মুই জানিনা জানিলে যাইতাম না কদম্বের তলে।
চিত মোর হরিয়া নিলে ছলিয়া নাগর ছলে॥
রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল॥
ঘরে যাইতে পথ মোর হইল অফুরাণ।
অন্তরে বিদরে হিয়া কি জানি করে প্রাণ॥
চন্দন চাঁদের মাঝে মৃগমদ ধান্দা॥
তার মাঝে হিয়ার পুতলি রৈল বান্ধা॥
কটি পীতবসন রসনা তাহে জড়া।
বিধি নিরমিল কুল কলঙ্কের জোড়া॥
জাতি কুলশীল বুঝি সব মোর গেল।
ভুবন ভরিয়া মোর ঘোষণা রহিল॥
কুলবতী হইয়া দুকুলে দিনু দুখ।
জ্ঞানদাস কহে দঢ় করি থাক বুক॥ [১৫৮]

—এপদের প্রথম ছয়টি পংক্তিতে যে প্রেমার্তি অভিব্যক্ত হয়েছে আধুনিক যে কোনও রোমান্টিক কবি এমনটি প্রকাশ করতে পারলে গৌরব বোধ করতেন। রূপের পাথারে আঁখি ডুবে যাওয়া এবং যৌবনের বনে মন হারিয়ে যাওয়ার মধ্যে প্রেমের অসীমতায় আত্মনিমজ্জনের এক অনির্বচনী উপলব্ধিত অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। সাগরের সৌন্দর্যময় বিস্তৃতির সঙ্গে কৃষ্ণের শ্যাম দেহসৌন্দর্যের তুলনা

এবং গহন অরণ্যের নিবিড় শ্যামলিম রহস্যময়তার সঙ্গে প্রেমিকের যৌবন-স্বপ্নময়তার তুলনা,—এবং সর্বোপরি অসীম সাগরের থই না পেয়ে তাতে ডুবে যাওয়া এবং নিবিড় অরণ্যের মধ্যে পথ হারানোর অনুভূতির সঙ্গে রাধার দৃষ্টি ও চেতনার সংযোগ সাধনের দ্বারা কবি যৌবনানুভূতির অতলান্ত নিবিড়তাকেই আশ্চর্যভাবে পরিস্ফুট করে তুলেছেন। এই চিত্রাঙ্কণে তিনি আর নিছক বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণ লীলার রূপকার নন, সর্বকালের যৌবনের দূত তরুণ-তরুণীর জীবনে অনুভূত আনন্দরহস্যময় প্রেমানুভূতির সহৃদয় চিত্রকর। সব উপমা দিয়েও যেখানে আর নাগাল পাওয়া যায় না তার প্রকাশভঙ্গিও কি অনুপম! কদম্বের তলায় সেই নাগরের রূপের পাথারে আঁখি ডুবে আছে, যৌবনের বনে মনটিকে হারিয়েছেন, সর্বরিক্ত রাধা এখন ঘরে ফিরবেন কিভাবে! 'ঘরে যাইতে পথ মোর হইল অফুরাণ।'—যেখানে কানু রয়েছেন সেই কদম্বতলায় হৃদয়ের সর্বস্ব রেখে শিথিল ক্লান্ত পায়ে তিনি ঘরে ফিরছেন।—সে পথের বুঝি আর শেষ নেই।—'অন্তরে বিদরে হিয়া কি জানি করে প্রাণ' প্রাণ যে কেমন করে সেই অনির্বচনীয় অনুভূতি ভাষায় কি ভাবে ব্যক্ত করবেন তিনি! কথা হৃদয়-বেদনার কতটুকুই বা প্রকাশ করতে পারে! এই ভাবগভীর ব্যঞ্জনায় হৃদয়রহস্যের অনির্বচনীয়তার প্রকাশ জ্ঞানদাসের পদকে বৈষ্ণব ধর্মগোষ্ঠীর সীমা পেরিয়ে সর্বকালের প্রেমাকুল হৃদয়ের সামগ্রী করে তুলেছে।

একটি পদে কালিন্দীকূলে রাধার জল আনার চিত্র এঁকেছেন।—

তরুমূলে কি রূপ দেখিনু কালাকানু।
যে রূপ দেখিনু সই স্বরূপে তোমারে কই,
জল ভরিতে বিসরিনু ॥

... ...

জল ফেলিয়া যাই লোকলাজে ভয় পাই
আপনা খাইয়া সই মনু। (১৬৩)

কত সহজ অথচ কি গভীর প্রেমানুভূতির প্রকাশ! কালারূপ দেখে আত্মবিস্মৃত রাধা জল ভরতেই ভুলে গেলেন। জল ভরেও সে জল ফেলে দিয়ে আবার ভরে আনতে মন চায়, লোক লাজে ভয় পান। রাধার কি অপূর্ব আক্ষেপোক্তি, 'আপনা খাইয়া সই মনু।'—নিজের মরণের পথ করছেন জেনেও দুর্নিবার এ-প্রেমের আকর্ষণ রোধ করবেন কি করে।

বড় প্রেম নিছক ইন্দ্রিয়বিলাসের ঊর্ধ্বে অলৌকিক প্রেম স্বপ্নের জগতে প্রেমিক প্রেমিকাকে উন্নীত করে তারই চমৎকার অভিব্যক্তি একটি পদে সখী কর্তৃক রাধার প্রতি প্রশ্নে প্রকাশ পেয়েছে।—

একলি মন্দিরে আছিলা সুন্দরী
কোরহি শ্যামর চন্দ।
তবহুঁ তোহারি পরশ না ভেল
এ বড় হৃদয়ে ধন্দ ॥ ২১৪ ॥

নিভৃত মন্দিরে শ্যামচাঁদকে কোলে নিয়ে [illegible]নোছিলেন অথচ প্রভাতে তাঁর দেহে কোনও রতি চিহ্ন নেই দেখে সখিরা বিস্মিত! রাধা কৈফিয়ৎ দিচ্ছেন,—

সজনী ও কথা কঠিন নয়।
শ্যাম সুনাগর গুণের সাগর
পরিন্থ কোরে ঘুমায় ॥ ২১৫ ॥

বড় প্রেমে স্বপ্নমিলনের যে পরিপূর্ণতার আনন্দ সৌরভ, স্থূল দেহজ রতিমিলনে রাধা তা কি করে ক্ষুণ্ণ করবেন! এই অনুভূতির ধর্মীয় পৃথক তত্ত্বব্যাখ্যা থাকতে পারে, জ্ঞানদাস কিন্তু যথার্থ প্রেম সত্তা থেকেই এটি উপলব্ধি করেছেন। প্রেমের ক্ষেত্রে দেহজ রতির তুলনায় স্বপ্ন মিলনের অখণ্ডতাকে তিনি কতটা গুরুত্ব দিয়েছিলেন, বহু আলোচিত দুটি প্রখ্যাত পদে তার আরও সাক্ষ্য রয়েছে। পদ দু'টি এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য।—

স্বপ্ন-মিলনের রোমাণ্টিক অনুভূতি

[ক] মনের মরম কথা তোমারে কহিয়ে এথা
শুন শুন পরাণের সই।
স্বপনে দেখিলুঁ যে শ্যামল বরণ দে
তাহা বিনু আর কারো নই ॥
রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন
রিমিঝিমি শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়ন রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিষে ॥
শিখরে শিখণ্ড-রোল মত্ত দাদুর-বোল
কোকিল কুহরে কুতূহলে।

ঝিঁঝা ঝিনিকি বাজে ডাহুকী সে গরজে
স্বপন দেখিলুঁ হেন কালে ॥
মরমে পৈঠল সেহ হৃদয়ে লাগল লেহ
শ্রবণে ভরল সেই বাণী।
দেখিয়া তাহার রীত যে করে দারুণ চিত
ধিক্ রহু কুলের কামিনী ॥
রূপে গুণে রসসিন্ধু মুখছটা জিনি ইন্দু
মালতীর মালা গলে দোলে।
বসি মোর পদতলে গায়ে হাত দেই ছলে
'আমা কিন বিকাইলু' বোলে ॥
কিবা যে ভুরুর ভঙ্গ ভূষণ ভূষিত অঙ্গ
কাম মোহে নয়ানের কোণে।
হাসি হাসি কথা কয় পরাণ কাড়িয়া লয়
ভুলাইতে কত রঙ্গ জানে ॥
রসাবেশে দেই কোল মুখে নাহি সরে বোল
অধরে অধর পরশিল।
অঙ্গ অবশ ভেল লাজ ভয় মান গেল
জ্ঞানদাস ভাবিতে লাগিল ॥[১] ৪৭ ॥

১। পদটি পূর্ববর্তী কবি বসু রামানন্দের নিম্ন পদটির আদর্শে রচিত। তবে জ্ঞানদাসে নয়, পদে যে অসীম রোমান্টিকতার আশ্চর্য রূপকথার জগৎ সৃষ্ট হয়েছে রামানন্দে তার অতি ক্ষীণ আভাষটুকু এসেছে মাত্র। তুলনার সুবিধার্থে রামানন্দের পদটি এখানে উদ্ধৃত করা গেল।—

বসু রামানন্দের পদ প্রভাত

তোমারে কহিয়ে সখি স্বপন-কাহিনী।
পাছে লোকমাঝে মোর হয় জানাজানি ॥
শাওন মাসের দে রিমিঝিমি বরিখে
নিন্দে তনু নাহিক বসন ॥
শ্যাম বরণ এক পুরুষ আসিয়া মোর
মুখ ধরি করয়ে চুম্বন ॥
বলি সুমধুর বোল পুন পুন দেই কোল
লাজে মুখ রহিলুঁ মোড়াই।
আপনা করয়ে পণ সবে মাগে প্রেমধন

প্রেমের স্বপ্ন-বিভোরতার এক অত্যাশ্চর্য অনুভূতির চিত্র এটি। ঘন শ্রাবণের অন্ধকার রাত, রিমিঝিমি বর্ষা, নিবিড় মেঘ-গরজন।—সুন্দরী পালঙ্কে বিগলিত-বসনা হয়ে মনের হর্ষে নিদ্রাগত। রয়েছেন। বাইরে ময়ূরের ডাক, দাদুরীর রোল, কুতূহলী কোকিলের রব, ঝিঁঝির ঝিনিকি ধ্বনি, ডাহুকীর আকুল স্বর। বাইরের পরিবেশটির নিখুঁত ছবি, ঘরের পালঙ্কাসীন সুন্দরীর নিখুঁত নিদ্রিতা-চিত্ররূপ। এবারে স্বপ্নমিলনের বর্ণনারম্ভ। শ্রীরাধার মরমকে আসন করে সে বসেছে, হৃদয়ে তার প্রেমের স্পর্শ লেগেছে, শ্রবণ তার মধুর বাণীতে ভরে উঠেছে। সে যে প্রেমের খেলা শুরু করল তা দেখে চিত্তে যে আকাঙ্ক্ষা জাগে কুলকামিনীর চেতনাকে সে ধিক্কৃত করে। সেই রসিক পরম রূপবান আমারই পদতলে বসে ছলে গায়ে হাত দিয়ে অনুনয় করে বলছেন, আমাকে বিক্রয় করছি, তুমি কিনে নাও।' সেই অপরূপ ভ্রূ ভঙ্গ, ভূষণ-ভূষিত অঙ্গশোভা, নয়ন-কোণের কাম মোহ, পরাণ কেড়ে নেওয়া হাসি,—অবলাকে ভোলাতে কত রঙ্গই না জানে! এবারে পরম মিলন ক্ষণটি উপস্থিত। সে আর গদ্যভাষায় ব্যাখ্যার অবকাশ রাখেননি কবি।—

রসাবেশে দেই কোল মুখে নাহি সরে রোল
অধরে অধর পরশিল।

তখন রাধার অঙ্গ অবশ, লাজ ভয়ের বা মানের চেতনাও হারিয়েছেন তিনি। এই প্রেমের তৃপ্ত পূর্ণতার বোধ স্বপ্নের রূপকথার জগতেই সম্ভব,—নিষ্ঠুর বাস্তবের জাগরণ চেতনার জগতে তার স্থান কোথায়! সেই স্বপ্ন-মিলনের স্বর্গ থেকে রূঢ়

বলে কিন যাচিয়া বিকাই॥
চমকি উঠিলুঁ জাগি কাঁপিতে কাঁপিতে সখি
যে দেখিলুঁ সেহ নহে সতি।
আকুল পরাণ মোর দু-নয়নে বহে লোর
কহিলে কে যায় পরতীতি॥
কিবা সে মধুর বাণী অমিয়ার তরঙ্গিণী
কত রঙ্গ ভঙ্গিমা চালায়।
কহে বসু রামানন্দে আনন্দে আছিল নিন্দে
কেন বিধি চিয়াইল তায়॥
মজুমদার: ষোড়শ শতকের পদাবলী: ৮৮ প.]

বাস্তব জাগরণের জগতে বিচ্যুতির চিত্রটিও আর একটি পদে চমৎকার ফুটে উঠেছে। —

স্বপ্ন মিলন কল্পনার আর একটি পদ

[খ] পরাণ বন্ধুকে স্বপনে দেখিলু বসিয়া শিয়র পাশে।
নাসার বেশর পরশ করিয়া ঈষৎ মধুর হাসে॥
পিয়ল বরণ বসন খানিতে মুখানি আমার মোছে।
শিথান হইতে মাথাটি বাহুতে রাখিয়া শুতল কাছে॥
মুখে মুখ দিয়া সমান হইয়া বন্ধুয়া করল কোরে।
চরণ উপরে চরণ পসারি পরাণ পাইলু বোলে॥
অঙ্গ পরিমল সুগন্ধি চন্দন কুঙ্কুম কস্তুরী পারা।
পরস করিতে রস উপজিল জাগিয়া হইলু হারা॥
কপোত পাখীরে চকিতে বাঁটুল বাজিলে যেমন হয়।
চণ্ডীদাস কহে এমতি হইলে আর কি পরাণ রয়॥[১]
॥ ৪৩৭ ॥

রাধা সখিকে বলছেন, পরাণ বন্ধুকে স্বপ্নে দেখলাম, তিনি শিয়রের পাশে বসে নাকের বেশর স্পর্শ করে ঈষৎ মধুর হাসচেন। তাঁর পীত বসনটি দিয়ে আমার মুখ মুছিয়ে দিলেন। শিথান থেকে আমার মাথাটি তাঁর বাহুতে রেখে কাছে শুলেন। মুখে মুখ রেখে সমান হয়ে বন্ধু আমায় কোলে করলেন। আমার চরণের উপর চরণ প্রসারিত করে 'পরাণ পাইলুঁ' বললেন। তাঁর অঙ্গ সুবাস সুগন্ধি চন্দন কুঙ্কুম কস্তুরীর ন্যায়। তিনি স্পর্শ করতেই রস উদ্রিক্ত হল। জেগে উঠেই সেই মিলন সুখ থেকে বঞ্চিত হলাম। সেই স্বপ্নালিঙ্গন থেকে জাগরণের বিচ্যুতি কেমন ?—

কপোত পাখীরে চকিতে বাটুল বাজিলে যেমন হয়।

পল্লীপরিবেশে পাখিদের জীবনে উপলব্ধ সুপরিচিত দৃশ্য থেকে কবি এমন সার্থক উপমাটি সংগ্রহ করেছেন।

দুটি পদের সুরের পার্থক্য লক্ষণীয়। প্রথমটিতে তৃপ্ত স্বপ্ন-মিলনের মধুর বিবশতার স্বাদ, দ্বিতীয়টিতে পরম মিলন মুহূর্তে স্বপ্ন-জাগরণ জনিত হতাশার কঠিন

১। পদরত্নাকরে এই পদটি 'যদুনাথ' ভণিতায় লিখিত হয়েছে। সতীশচন্দ্র রায় পদটি চণ্ডীদাসের বলে অনুমান করেছেন। কিন্তু স্বপ্ন রোমান্স চিত্রের প্রবণতা বিচারে, সহজ অথচ প্রাণস্পর্শী নূতন উপমা ব্যবহারে-বৈশিষ্ট্যে পদটি জ্ঞানদাসের বলেই অনুমিত হয়।

বেদনানুভূতি। উভয় পদেই কবি স্বপ্নচেতনার রোমান্সকে রূঢ় বাস্তবের তুলনায় অনেক বেশী আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। রোমান্টিক কবি স্বপ্নাবেশের আরও ছবি এঁকেছেন (দ্র, ২১৬, ৪৬১, ৪৯৯)। তাঁর এই অনুপম চিত্রগুলি রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ ভাবের কবিতাকে (তুলনীয় স্বপ্ন ঃ কল্পনা) স্মরণ করিয়ে দেয়।

বিরহানুভূতির পদ

ম্যাথু আর্নোল্ড যে দুটি মানুষের বিরহের অনুভূতিকে দুটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মধ্যবর্তী লবণাক্ত সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর মেঘদূত বিষয়ক প্রবন্ধ ও কবিতায় যে বিরহের ব্যাখ্যা করেছেন ২ ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যিকদের কাছে সে বিরহ একান্ত অজানা ছিল না। কালিদাসের কাব্যে একাধিক শ্লোকে তার পরিচয় রয়েছে। প্রেমবৈচিত্ত্যের রসানুভূতিতে বৈষ্ণব পদকারেরাও সেই বিরহ চেতনাকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। জ্ঞানদাসের একাধিক পদে এই বিরহানুভূতির রোমান্টিক প্রকাশভঙ্গি লক্ষিত হয়। প্রাসঙ্গিক দুটি উদাহরণ তুলছি এখানে,—

[ক] শিশুকাল হৈতে বন্ধুর সহিতে
পরাণে পরাণে লেহা।
না জানি কি লাগি কো বিহি গঢ়ল
ভিন ভিন করি দেহা॥ ৫

... ...

আমার অঙ্গের বরণ সৌরভ
যখন যে দিকে পায়।
বাহু পসারিয়া বাউল হইয়া
তখন সে দিকে ধায়॥ ২২১॥

[খ] হিয়ার উপর হৈতে শেজে না ছোঁয়ায়।
বুকে বুকে মুখে মুখে রজনি গোঙায়॥
নিদের আলসে যদি পাশমোড়া দিয়ে।
কি ভেল কি ভেল বলি চমকি উঠয়ে॥
হিয়ায় হিয়ায় এক বয়ানে বয়ানে। ৮
নাসিকা নাসিকার এক নয়ানে নয়ানে॥
ইথে যদি মুঞি তেজি দীঘ নিশাস।
আকুল হইয়া পিয়া উঠয়ে তরাস॥ ২৩৫॥

২। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অতলস্পর্শী বিরহ। আমরা যাহার সহিত মিলিত হইতে

দুটি পদেই দুই ভিন্নতর দেহ-কারাগারে আবদ্ধ হৃদয়ের একাত্ম হওয়ার রোমান্টিক প্রেমাকুলতার প্রকাশ পেয়েছে। ছোট ছোট ব্যঞ্জনাময় অনুভাব চিত্রণে সেই আর্তি লেখক অপূর্বভাবে প্রকাশ করেছেন। চণ্ডীদাসে আমরা সহজ তন্ময়-তার সুর পাই বটে, কিন্তু সে যেন ভক্ত সাধকের দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত সংগীতাঞ্জলি। সেখানে সর্বত্যাগী বৈরাগিনী রাধাকৃষ্ণ প্রেমাকুল হয়েছেন কোনও ভগবৎ-প্রাপ্তির অলৌকিক অনুভূতিতে। সে অনুভূতি সহজ, আন্তরিক, ভাব-তন্ময়। জ্ঞানদাসের আলোচ্য পদগুলিতে ভাব তন্ময়তা রয়েছে সত্য,—তবে সেই সঙ্গে রোমান্টিকতার প্রেম-স্বপ্নাবেশ মিশ্রিত রয়েছে। স্থূলতা পরিহার করে প্রেমানুভূতি যে অসীম আনন্দময় স্বপ্নলোকে নিয়ে যেতে পারে জ্ঞানদাসের পদে তারই চকিত শিহরণ-মিশ্র ভাবরূপ দেখতে পাওয়া যায়। এ প্রেম ইন্দ্রিয়জ মিলনজাত নহে, ইন্দ্রিয় মিলনে যে অসীম প্রেমস্বপ্নের পরিতৃপ্তি ঘটেনা এ-যেন সেই কল্পবিরহের বেদনামিশ্রিত আনন্দলোকের বার্তা বহন করে আনছে। বোধ হয় সেই কারণেই জ্ঞানদাসের এই রোমান্টিক লিরিকধর্মী কবিত্ব প্রতিভার প্রতি রবীন্দ্রনাথের এতটা আকর্ষণ ছিল। এই মানবীয় প্রেম-রোমান্টিকতার অনুভূতিতে জ্ঞানদাস মধ্যযুগের বৈষ্ণব কবি হয়েও আমাদের একান্ত কাছে আসতে পেরেছেন। এখানেই অন্য বৈষ্ণব কবিদের থেকে তার স্বাতন্ত্র্য।[1]

এবারে কবির এ-পর্যন্ত প্রাপ্ত পাঁচ শতাধিক পদের বিষয়বস্তুগত কিছুটা বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির তুলনায় চৈতন্য পরবর্তী কবিদের পদে বিষয় বৈচিত্র্য অনেক বেশী। তার প্রধান কারণ, তখন গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ও রসতত্ত্বের ভিত্তিতে বহুবিধ পালাগানের উদ্ভব হয়েছিল। ভক্তকবিরা

চাহি সে আপনার মানস সরোবরের অগম তীরে বাস করিতেছে।...আমিই বা কোথায় আর তুমিই বা কোথায়। মাঝখানে একেবারে অনন্ত। কে তাহা উত্তীর্ণ হইবে। অনন্তের কেন্দ্রবর্তী সেই প্রিয়তম অধীনশ্বর মানুষটির সাক্ষাৎ কে লাভ করিবে!...কিন্তু একথা মনে হয়, আমরা যেন কোনো এক কালে একত্র এক মানসলোকে ছিলাম ; সেখানে হইতে নির্বাসিত হইয়াছি। তাই বৈষ্ণব কবি বলেন, তোমার হিয়ার ভিতর হইতে কে কৈল বাহির।...তাই পরস্পরকে দেখিয়া চিত্ত স্থির হইতে পারিতেছে না ; বিরহে বিধুর, বাসনায় ব্যাকুল হইয়া পড়িতেছে।'—[রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন সাহিত্য : মেঘদূত।]

রূপগোস্বামীর ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণির রসতত্ত্বের আদর্শে ভিন্ন ভিন্ন রসের বা নায়িকা প্রকরণের পদ রচনা করতেন। জ্ঞানদাসের পদাবলীকে বিষয়বস্তু বিচারে নিম্নরূপ শ্রেণীভাবে বিন্যস্ত করা যেতে পারে।—(ক) গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ বিষয়ক পদ এবং গৌরচন্দ্রিকা পদ, (খ) কৃষ্ণরাধার বাল্যলীলা বিষয়ক পদ, (গ) বয়ঃসন্ধি পূর্বরাগ, সখিশিক্ষা ও নবোঢ়া-মিলনের পদ, (ঘ) দান ও নৌকালীলার পদ, (ঙ) রূপানুরাগের পদ, (চ) অভিসার-পদ, (ছ) মান-পর্যায়ে বাসক সজ্জিকা, খণ্ডিতা ও কলহান্তরিতা নায়িকা বিষয়ক পদ, (জ) বংশীশিক্ষার পদ, (ঝ) অনুরাগ, রসোদ্গার ও আক্ষেপানুরাগের পদ, (ঞ) মিলন ও রাসের পদ, (ট) মাথুর ও ভাবসম্মেলনের পদ, (ঠ) আত্মনিবেদনের পদ।

পদের বিষয়গত শ্রেণী-বিন্যাস

সবগুলি শ্রেণীভাগের বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। মুখ্য কয়েকটি পদ অবলম্বনে কবি প্রতিভার পরিচয় নেওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে।

গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদ

(ক) চৈতন্য পরবর্তী ভক্তকবিরা গৌরাঙ্গের অবতার লীলা অবলম্বনে বহু পদ লিখেছেন। এই জাতীয় পদে জ্ঞানদাসের প্রতিভার বিশেষ স্ফুরণ হয়নি। এর মধ্যেও একশ্রেণীর পদে তত্ত্ববিষয়ক বর্ণনার আধিক্য। অপর একশ্রেণীর পদে কৃষ্ণ-লীলার বিভিন্ন চিত্র বর্ণনা পালাগানের উপযোগী 'গৌরচন্দ্রিকা'র এই। দ্বিতীয় শ্রেণীর পদগুলি প্রাসঙ্গিক পালাগানের আসরে ভূমিকারূপে সূচনায় গাওয়ার উদ্দেশ্যে রচিত। প্রথম একটি তত্ত্ববিষয়ক পদের নিদর্শন তোলা যেতে পারে।—

> পূরবে আছিলা প্রিয়া রাধা গুণবতী।
> একে গদাধর সঙ্গে অধিক পিরীতি ॥
> অন্তরেতে শ্যাম হেম-বরণ উপরে।
> অধিক উজর ভেল পুলক-নিকরে ॥
> বড় অপরূপ গোরাচান্দ অবতার।
> জগতে উদিত ফিরে করুণা আকার ॥
> রায় রামানন্দ শ্রীনরহরি দাস।
> গোপীর স্বভাব ভাব সবে পরকাশ ॥
> গৌর প্রেমে ভাসল জগতের লোক।
> আনন্দে মোদিত সব নাহি দুখ শোক ॥

সংকীর্তন রসে সব গৌর-গুণ-গাই।
পড়ল সুখের সিন্ধু অবধি না পাই॥
আকিঞ্চনে অধিক ভকতি রতি দেল।
সবে জ্ঞানদাস ইথে বঞ্চিত ভেল॥ ৭৮॥

বৃন্দাবন-লীলায় কৃষ্ণ রাধাকে প্রিয়রূপে পেয়েছিলেন, নবদ্বীপ লীলায় গদাধরের সঙ্গে গৌরাঙ্গের প্রেম। তিনি অন্তরে শ্যাম, বহিরঙ্গে স্বর্ণবরণ; প্রেম-পুলকে সেই রূপ আরও উজ্জ্বল হয়েছে। জগতে প্রেম-করুণা বিতরণের জন্য গৌরাঙ্গ-অবতারের আবির্ভাব। রায় রামানন্দ, নরহরিদাস প্রভৃতি গোপীভাবে লীলাবিস্তারের সখীরূপে মর্ত্যে এসেছেন। জগৎবাসী গৌর-প্রেমানন্দে শোক দুঃখ ভুলে গেছে। সকলে গৌরাঙ্গ-গুণ-সংকীর্তন গাইছে, তাদের সুখের অবধি নেই। তিনি অকিঞ্চনকেই অধিক প্রেমভক্তি বিতরণ করেন। কেবল জ্ঞানদাসই এই সুখ থেকে বঞ্চিত হলেন। এখানে গৌরাঙ্গ আবির্ভাব-তত্ত্ব, নবদ্বীপ লীলার সঙ্গীদের সখিভাব এবং সবশেষে কবির আক্ষেপোক্তি পদটির তত্ত্ব ও তথ্যগত মূল্যবৃদ্ধি করেছে।

নবদ্বীপ-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গৌরাঙ্গরূপে এবং অদ্বৈত, নিত্যানন্দ প্রভৃতি সঙ্গীরা কেউ শিব, কেউ বলরাম ইত্যাদি অবতাররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন বলে কবিকর্ণপূরের 'গৌর গণোদ্দেশদীপিকা'য় বর্ণিত হয়েছে, জ্ঞানদাস এই ধারার অনুসরণে নিত্যানন্দ বর্ণনার পদ রচনা করেছেন। একটি পদে বলেছেন,—

পূরবে গোবরধন ধবল অনুজ যার
জগ-জনে বলে বলরাম।
এবে সে চৈতন্যসঙ্গে আইল কীর্তন রঙ্গে
আনন্দে নিত্যানন্দ ধাম॥ ৮৩॥

একটি পদে নৃত্যরত নিতানন্দের ছবি এঁকেছেন,—

আরে মোর আরে মোর নিত্যানন্দ রায়।
আপে নাচে আপে গায় চৈতন্য বলায়॥
লম্ফে লম্ফে যায় নিতাই গৌরাঙ্গ আবেশে।
পাপিয়া পাষণ্ড-মতি না রাখিল দেশে॥ ৮৫॥

নিত্যানন্দ গোষ্ঠীর ভক্তকবি আরও কয়েকটি পদে বলরাম-অবতার নিতাই-এর সজীব চিত্রাঙ্কণ করেছেন।

গৌরাঙ্গ কৃষ্ণ অবতার। বহিরঙ্গে রাধারূপ নিয়ে অন্তরঙ্গে কৃষ্ণই নবদ্বীপ-লীলায় আবির্ভূত হয়েছিলেন—এই তত্ত্বের আলোকে চৈতন্য-পরবর্তী কবিরা কৃষ্ণ-বিষয়ক কীর্তন পালাভাগের সূচনায় অনুরূপ চৈতন্য-লীলার পদ ভূমিকা বা গৌরচন্দ্রিকা রূপে ব্যবহারের জন্য রচনা করতেন। জ্ঞানদাসের কয়েকটি উৎকৃষ্ট গৌরচন্দ্রিকার পদ রয়েছে।

পূর্বরাগ বিষয়ক একটি গৌরচন্দ্রিকা পদে রাধাগুণ-বিভোর কৃষ্ণের ভাবমূর্তিতে চৈতন্যকে চিত্রিত করেছেন।—

অপরূপ গোরাচান্দে।
বিভোর হইয়া রাধার প্রেমে
তার গুণ কহি কান্দে॥
নয়নে গলয়ে প্রেমের ধারা
পুলকে পূরল অঙ্গ।
খেনে গরজয়ে খেনে সে কাঁপয়ে
উথলে ভাব তরঙ্গ॥
পারিষদগণে কহয়ে যতনে
রাধার প্রেমের কথা।
জ্ঞানদাস কহে গৌরাঙ্গ নাগর
যে লাগি আইল এথা॥ ১১৫॥

আবার রাধাভাবে অনুরাগিণী কৃষ্ণ-মিলনোৎসুকা গৌরাঙ্গের ভাবমূর্তিটিও একটি পদে চমৎকার এঁকেছেন,—

সহচর অঙ্গে গৌর অঙ্গ হেলাইয়া।
চলিতে না পারে খেনে পড়ে ধুরছিয়া॥
অতি দুরবল দেহ ধরনে না যায়।
ক্ষিতিতলে পড়ি সহচর মুখে-চায়॥
কোথায় পরাণ নাথ বলি খেনে কাঁদে।
পূরব বিরহ জ্বরে থির নাহি বান্ধে॥
কেনে হেন হৈল গোরা বুঝিতে না পারি।
জ্ঞানদাস কহে নিছনি লৈয়া মরি॥ ৪২৫॥

গৌরচন্দ্রিকা পর্যায়ে বাসক সজ্জিকার আর একটি চিত্র উদ্ধৃত করা যেতে পারে।—

কি লাগি গৌর মোর।
নিজ রসে ভেল ভোর॥
অবনত করি মুখ।
ভাবয়ে পুরুব দুখ॥
বিহি নিকরুণ ভেল।
আধ নিশি বহি গেল॥
জ্ঞানদাস কহে গোরা।
নিজ রসে ভেল ভোরা॥ [৩৮০]

গৌরচন্দ্রিকার পদে কৃষ্ণরাধার প্রেমালেখ্য

এ-পদগুলি ঠিক গৌরাঙ্গ জীবন আখ্যায়িকা বিষয়ক নহে। ভক্তের ভাবদৃষ্টিতে নবদ্বীপের ভাব-বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রেমলীলায় রাধাকৃষ্ণ লীলারই পুনরাবৃত্তি প্রত্যক্ষীকরণ।

(খ) কৃষ্ণের জন্ম ও গোষ্ঠলীলার পদ এবং রাধার বাল্যলীলার পদ

জন্ম ও বাল্য (গোষ্ঠ) লীলায় পদ

রচনায় জ্ঞানদাসের আখ্যায়িকাধর্মী কাহিনী বিন্যাসের প্রবণতা লক্ষিত হয়। ডঃ মজুমদারের গ্রন্থে উক্ত বিষয়ক ৪৭টি পদের মধ্যে মাত্র একটিতে 'ব্রজবুলি' ব্যবহৃত হয়েছে। বাকী সমস্ত পদগুলিই বিশুদ্ধ বাংলায় পয়ার ও ত্রিপদী বন্ধে রচিত হয়েছে। কৃষ্ণ জন্মলীলার পদ রচনায় কবি ভাগবতের কাহিনী অবলম্বন করেছেন। এ পদগুলিতে কবিত্বের উল্লেখযোগ্য মৌলিকতা লক্ষিত হয় না। তবে রাধার বাল্যলীলা বিষয়ক পদে বাৎসল্য রসের উৎকর্ষ লক্ষিত হয়।

একটি পদে রাধা-জননী কীর্তিদার কাছে কোনও প্রতিবেশিনী রাধার রূপবর্ণনা করছেন,—

এ তোর বালিকা চাঁদের কলিকা
দেখিয়া জুড়াবে আঁখি।
হেন মনে লয় এ হেন রূপক
পদুকা করিয়া রাখি॥

....

স্বরূপ লক্ষণ অতি বিলক্ষণ
তুলনা দিব বা কিয়ে।
মহাপুরুষের প্রেয়সী হইবে
সোঙরিবা যদি জীয়ে ॥
দুহিতা বলিয়া দুখ না ভাবিহ
ইহ উদ্ধারিবে বংশ।
জ্ঞানদাস কয় শুন্যাছি কমলা
ইহার অংশের অংশ ॥ [৮]

লক্ষণীয়, এখানে 'মেয়ে যদি বেঁচে থাকে, মনে রেখ, সে মহাপুরুষের প্রেয়সী হবে'—এই আশীর্বচন এবং 'মেয়ে হয়েছে বলে দুঃখ করোনা,—এর দ্বারাই তোমার বংশোদ্ধার হবে'—এই সান্ত্বনা বাণীর মধ্যে সে দিনের বাংলাদেশের সমাজের ছবিটি কেমন ফুটে উঠেছে।

শ্রীরাধার বাল্যলীলা বিষয়ক অপর দু'টি পদে বাৎসল্য লীলার একটি আখ্যায়িকা সুন্দর বর্ণিত হয়েছে। প্রথম পদে উৎকণ্ঠিতা জননী কীর্তিদা অনেকক্ষণ পর কন্যাকে দেখতে পেয়ে প্রশ্ন করছেন,—

বিহান হইতে কাহার বাটিতে
কোথা গিয়াছিলা বল।
এ ক্ষীর মোদক চিনি কদলক
কে তোর আচরে দেল ॥
অগোর চন্দন কস্তুরী কুম্‌কুম্‌
কে রচিল তোর ভালে।
কে বান্ধিল হেন বিনোদ লোটন
নব মল্লিকার মালে ॥
অলকা তিলক ললাট ফলক
কে দিল চম্পক দান।
জ্ঞানদাস কহে সব বিবরণ
কহ জননীর ঠাম ॥ [৯]

এর উত্তরে সরলা বালিকা রাধা যে কথা বললেন তা বিশেষ তাৎপর্যময়।—

মাগো গেনু খেলাবার তরে।
পথে লাগি পেয়ে এক গোয়ালিনী
লৈয়া গেল মোরে ঘরে ॥
গোপ রাজরানী নন্দের গৃহিনী
যশোদা তাহার নাম।
তাঁহার বেটার রূপের ছটায়
জুড়ায়ল মোর প্রাণ ॥
কি হেন আকুতে তাঁর বাম ভিতে
লৈয়া বসায়ল মোরে।
এক দিঠে রহি তাঁহার আমার
রূপ নিরীক্ষণ করে ॥
বিজুরী উজোর মোর অঙ্গখানি
সেহ নব জলধর।
সুমেল দেখিয়া দিবাকর ঠাঞি
কি হেতু মাগল বর ॥
তবে মোর গোরা গা খানি মাজিয়া
লাস-বেশ বনাইয়া।
হরষিত মোরে পাঠাইলা দেখ
এসব আঁচরে দিয়া ॥
ঝিয়ের কাহিনী শুনি গোয়ালিনী
মুচকি মুচকি হাসে।
কত সুধারস হিয়ায় বরিষে
কহে কবিজ্ঞানদাসে ॥ [১০]

কৃষ্ণ-জননী যশোদার রাধার প্রতি অনুরাগ, বালক কৃষ্ণের প্রতি বালিকা রাধার সহজাত আকর্ষণ এবং যশোদা-কর্তৃক বালক-বালিকার 'সুমেল' দেখে তাদের মিলিত করবার আকাঙ্ক্ষা,—ছোট্ট রাধার মুখে বালিকাসুলভ বর্ণনাভঙ্গিতে কবির এই চিত্রাঙ্কণ সার্থক হতে পেরেছে।

গোষ্ঠলীলার বর্ণনায় বলরামদাসের কৃতিত্ব সর্বাধিক। তবে এখানেও, জ্ঞানদাস সখ্য ও বাৎসল্য রসের সংমিশ্রণে কয়েকটি সার্থক পদ লিখেছেন। একটি উদ্ধৃত করা গেল।—

গোপবালকেরা সখা কৃষ্ণকে বলছেন,—

গোপাল যাবে কি না যাবে আজি গোঠে।
এক বোল বলিলে আমরা চলিয়া যাই,
গোধন চলিয়া গেল মাঠে ॥
উচ্চগু দেখিয়া বেলা, ডাকিতে আইনু মোরা,
যতেক গোকুলের বাথ জান।
একেলা মন্দির মাঝে আছ তুমি কোন কাজে
এ তোমার কোন ঠাকুবান ॥
যদি বা এড়িয়া যাই অন্তরেতে ব্যথা পাই
যাইতে কেমতে প্রাণ ধবি।
না জানি কিগুণ জান সদাই অন্তরে টান
তিল আধ না দেখিলে মবি ॥
মাথেতে ছিদঁন দাড় হাথেতে কনক লাড
বাব হইলা বিহাবেব বেশে।
সকল বালক লৈয়া যমুনার তীবে যাইয়া,
জ্ঞানদাস ছিল তার শেষে ॥ [৮৮]

কাহিনীধর্মী পদ রচনায় জ্ঞানদাসেব যে কিছুটা প্রবণতা ছিল আলোচ্য পদগুলিতে তাব পবিচয় পাওয়া যায়।[১]

জ্ঞানদাস দ্বাদশ গোপালের নামে পৃথক পৃথক পদও রচনা করেছেন। সেখানে কবিত্বের বিশেষ স্ফুরণ হয়নি।

১। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং ডঃ শ্রীকুমাব বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'জ্ঞানদাস পদাবলী'র পরিশিষ্টে 'যশোদার বাৎসল্যলীলা'—বিষয়ক পালা পুঁথি মুদ্রিত হয়েছে। সম্পাদকদ্বয় অবশ্য পদগুলি জ্ঞানদাসেব রচিত নয় বলেই মনে করেন। ডঃ মজুমদার এই পালাটি 'জ্ঞানদাস ও তাহার পদাবলী' গ্রন্থে বাদ দিয়েছেন। কাহিনীধর্মী রচনা হলেও আভ্যন্তরীণ নানা প্রমাণে এইটির অকৃত্রিমতায় বিশেষ সন্দেহ জাগে। এ আলোচনায় উক্ত পালাটি পরিহার করা হল।

(গ) বয়ঃসন্ধি, সখিশিক্ষা ও নবোঢামিলনের চিত্রাঙ্কণে জ্ঞানদাস যে বিদ্যাপতিকেই অনুসরণ করেছেন ইতিপূর্বে তার আলোচনা করেছি। এ-পদগুলিতে তরুণ শিক্ষার্থী-কবি প্রবীণ বিদ্যাপতিকেই ভাব, ভাষা ও ছন্দের দিক থেকে আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু পূর্বরাগের পদরচনাকালে কবি আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়েছেন সন্দেহ নেই।

বয়ঃসন্ধি, পূর্বরাগ, সখিশিক্ষা ও নবোঢা মিলনের পদ

একটি পদে কৃষ্ণানুরাগিনী রাধাকে সখীরা অনুযোগ করে বলছেন,—

চঞ্চল মন চকিত নয়ান
আবেশে অঙ্গ এলায়লি।
ঘরের বাহিরে তিলে শতবার
কোন বা দেবা পায়লি॥

... ...

ইকি বিপরীত চিত চমকিত
লোকজন সব হাসালি।
এই পথে নিতি করে আনাগোনা
আজি গুরুজনা জানালি॥
গোকুল নগরে প্রতি ঘরে ঘরে
তোরে বলে রাজ দুলালি।
রাতা উতপল নয়ান যুগল
কেন্দে কেন্দে আঁখি ফুলালি॥
একে কুলবালা সহজে অবলা
এত দূরে কেন আইলি।
এই রাজপথে কেহ নাই সাথে
কলঙ্কিনী নাম ধরালি।
বন্ধু গেল চলে ডাগুয়া কেনে
চাতকিনী পারা রহলি।
জ্ঞানদাস ভণে নিবেদ চরণে
শুন বৃষভানু দুলালি॥ [১২১]

জ্ঞানদাসের চিত্রাঙ্কণ দক্ষতায় রাতা-উতপল, স্থির নয়না, এলায়িতা দেহী, রাজপথে দণ্ডায়মানা চাতকিনী-পাবা রাধার ছবিটি প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। বিদ্যাপতির রাধা থেকে জ্ঞানদাসের এই রাধা কিছুটা স্বতন্ত্র। বিদ্যাপতির রাধা লোকচক্ষুর আড়ালে রাতের অন্ধকারে অভিসারে যান। জ্ঞানদাসের রাধা প্রেমে লোকলজ্জা ভুলেছেন। আবেশ-বিহ্বলতায় তিনি রাজপথে ছুটে এসে চাতকিনীর মত দাঁড়িয়ে বন্ধুর চলে যাওয়া দেখলেন।[২] সখিরা এই রাধার প্রতি স্নেহপূর্ণ অনুযোগ করছেন। কবিও সখিদের মধ্যে স্থান করে নিয়েছেন। তাদের এই স্নেহ তিরস্কারের মাধুর্য,—প্রচ্ছন্ন অনুরাগ উপভোগ্য।

ছোট ছোট বর্ণাঢ্য তুলির টানে অনুপম ছবি ফুটিয়ে তুলতে জ্ঞানদাসও অপূর্ব দক্ষতা দেখিয়েছেন। কৃষ্ণকে দেখে রাধার দেহ-মনে যে বৈলক্ষণ এসেছে সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় সখীরা তার উল্লেখ করে রাধার কাছে এর কারণ জানতে চাইছেন,—

রাই এমন কেন বা হইলা।
কিরূপ দেখিয়া আইলা॥

... ...

সোনার বরণ তনু।
কাজর বৈ গেল জনু॥

নয়নে বহয়ে ধারা।
কহিতে বচন হারা॥

এর পর কবির ভণিতাটি সুন্দর—

জ্ঞানদাস মনে জাপ।
কহিলে ঘুচিলে তাপ॥ [১২৩]

জ্ঞানদাস মনে মনে জল্পনা করেন, সখিদের কাছে রাধার মনের বেদনাটি ব্যক্ত করাই শ্রেয়, তাতেই তাপ ঘুচবে, মন হালকা হবে।

পূর্বরাগে সখী দৌত্যের আর একটি পদ। রাধার সঙ্গে দেখা করে এসে সখী কৃষ্ণকে বলছেন,—

২। তুলনীয়, 'ওগো মা, রাজার দুলাল গেল চলি মোর ঘরের সমুখ দিয়া।' [রবীন্দ্রনাথ' খেয়া : শুভক্ষণ]

হাম যাইতে পথে ভেটলি গোরী।
তুয়া পরথাব কয়লি কিছু থোরি।।
সজল নয়নে ধনী মঝু মুখ হেরি।
আরতি রহল কহব পুন বেরি।।

... ...

পুলকি বহল তনু পুন পবসঙ্গ।
নীপ নিকরে কিয়ে পূজল অনঙ্গ।।
অধর শুকাযল দীঘ নিশ্বাস।
জনু অনুরোধে ঝাঁপল নিজবাস।। [১২৮]

পথে যেতে গৌরীর সঙ্গে দেখা হল। তোমাব প্রস্তাব কিছু বললাম তাকে। সজল নয়নে ধনী আমার মুখের পানে তাকাল, যেন আর কি বলি জানবার আকুলতা চোখে ফুটে উঠল। পুনর্বাব তোমাব প্রসঙ্গ তুললে তার তনু রোমাঞ্চিত হল, যেন কদম ফুলে কেউ কামের পূজা কবল। দীর্ঘশ্বাস পড়ল, অধর শুষ্ক হল, দেহ-পুলক ঢাকবার জন্য অঙ্গবাস আবৃত করল।

এ-বর্ণনা শুনে কৃষ্ণ সম্ভবতঃ ছলনাময় অজ্ঞতাব ভাণ করেছিলেন। তাতে সখীব মনে যে প্রতিক্রিয়া হল লেখক তাব চিত্র এঁকেছেন,—

কানুক ঐছন বাত।
শুনি অবনত মাথ।।
কিছু না কহল ফেবি।
লোরে পন্থ না হেরি।।
মলিন বদন ভেল।
ধীরে ধীরে চলি গেল।।
আওল রাইক পাশ।
কি কহব জ্ঞানদাস।। [১২৯]

কানুব এমন কথা শুনে দূতী মাথা নত করলেন। ফিরে কৃষ্ণকে কিছুই বললেন না। চোখের জলে পথ দেখতে পাননা, মলিন বদনা ধীরে ধীরে চলে গেলেন। রাই-এর পাশে এলেন। জ্ঞানদাস (কবি এখানে দূতীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছেন) এখন কি বলবেন!

তবে কৃষ্ণের এ ছলনা অচিরেই কেটে গিয়েছিল। সখী ছুটতে ছুটতে এসে আবার রাধাকে জানিয়েছেন,—

শুন শুন গুণবতি রাই।
তো বিনু আকুল কানাই॥
... ...
চীত পুতলি সম দেহ।
মরম না বুঝয়ে কেহ॥
পুছিতে কহএ আধ ভাখি।
নিঝরে ঝর এ দুন আঁখি॥[2] [১৩১]

দানলীলা ও নৌকালীলার পদ

(ঘ) পদাবলীর পালাকীর্তনের বিষয় হিসাবে চৈতন্য-পরবর্তী কাল থেকেই দান ও নৌকা লীলার সমাদর লক্ষিত হয়। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদে এ-প্রসঙ্গ না থাকলেও বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দান ও নৌকা লীলার দুটি বড় পালাভাগ রয়েছে। প্রাচীন কবিদের রচনায় ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে, রাধাতন্ত্রে নৌকালীলার পূর্বসূত্র পাওয়া যায়। রাধাপ্রেমামৃত নামক একটি গ্রন্থে ভারখণ্ড ও নৌকা খণ্ড লীলার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। এ গ্রন্থ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে,—সম্ভবতঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচনারও পূর্বে লিখিত হয়েছিল। শ্রীমদ্ভাগবত টিকায় সনাতন গোস্বামী চণ্ডীদাসের (বড়ু?) দান ও নৌকাখণ্ডের উল্লেখ করেছেন। রূপ গোস্বামী 'দানকেলী কৌমুদী' নামে একটি ভাণিকা রচনা করেছিলেন। তাঁর 'পদ্যাবলী'তে নৌকাবিলাসের পদ (২৭ নং) মেলছে। 'প্রাকৃতপৈঙ্গলে' নৌকাবিলাসের পদ সঙ্কলিত হয়েছে।

১। পদগুলি পাঠ করতে গেলে সন্দেহ থাকে না যে এর আগে পরে আরও প্রাসঙ্গিক পদ গ্রথিত করে পালাগানের পারম্পর্য রক্ষিত হত। সে পদগুলি হয়ত অন্যান্য পদকারের দ্বারা রচিত ছিল। জ্ঞানদাস পদাবলীতে সেই ফাঁক রয়ে গেছে।

২। প্রায় একই প্রকাশভঙ্গী ও ভাষা রবীন্দ্রনাথের কবিতাতেও মেলে। তুলনীয়—

মুখে তার চাহি
কথা বলিবারে গেনু কথা আর নাহি।
... .
দুজনে ভাবিনু কত চাহি দোহা পানে,
অঝরে ঝরিল অশ্রু নিস্পন্দ নয়ানে।

[রবীন্দ্রনাথ: কল্পনা: স্বপ্ন]

দান অর্থে শহরে কোনও দ্রব্য বিক্রয়ের চুঙ্গি (octroi) বোঝানো হয়েছে। দান লীলার বিষয় : রাধা সখীগণ-সহ বড়াই-এর তত্ত্বাবধানে দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি মথুরার হাটে বিক্রয় করতে চলেছেন। শ্রীকৃষ্ণ ঘাটোয়াল পরিচয়ে পথ রোধ করে রাজকর স্বরূপ রাধার যৌবন-দান দাবী করেছেন। নৌকালীলার বিষয় : বৃন্দাবন থেকে মথুরা যেতে যমুনার ঘাট পার হতে হবে। কৃষ্ণ নেয়ে সেজে রাধা ও তার সখীদের পার করার দায়িত্ব নিলেন। সবাইকে নির্বিঘ্নে পার করে রাধাকে পার করার মুখে নৌকা ডুবে গেল। যমুনার জলে কৃষ্ণ রাধার জীবনরক্ষার বিনিময়ে যৌবন-দান আদায় করলেন। কাহিনীর গতানুগতিকতার জন্যই আলোচ্য পালাগানের পদ রচনায় কোনও কবি প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেননি। জ্ঞানদাস সম্পর্কেও একই কথা বলা যেতে পারে। তবে মাঝে মাঝে তাঁর স্বভাব-সিদ্ধ বর্ণনার বিদ্যুচ্চমক লক্ষিত হয়।

দানলীলায় রাধা কৃষ্ণকে ব্যঙ্গ করে বলছেন,—

কাহ্নাই পরনারী ছুইতে কর সাধ।
রাঙ্কের পোয়ে কি সোনার সাধ ॥ [৩১৮]

কানাই, পরনারী স্পর্শ করতে চাও? গরীবের ছেলের সোনা পাবার সাধ কেন?

অপর একটি পদে কৃষ্ণের ত্রিভঙ্গ দেহের প্রতি কটাক্ষ করে বলছেন,—

সহজই তনু তিবিভঙ্গ[১]।
এমন হইয়া এত রঙ্গ ॥
যবে তুমি সুন্দর হইতা।
তবে নাকি কাহারে থুইতা ॥ [৩২২]

একটি পদে নিজের রূপ-যৌবনকে ধিক্কার দিয়ে বলছেন,—

মো-হইলাম সোনার গাছ দানীত না ছাড়ে পাছ
ডালে মূলে নিবে উপাড়িয়া ॥
ঘরে বৈরী ননদিনী পথে বৈরী মহাদানী
দেহের বৈরী হইল যৌবন।
হেন মনে উঠে তাপ যমুনায় দিল ঝাপ
না রাখিব এ ছাড় জীবন ॥ [৩২৮]

উপমার এই চমৎকারিত্ব জ্ঞানদাসের স্বভাবদত্ত প্রতিভারই পরিচায়ক।

নৌকাবিলাসের একটি পদে লিখেছেন,—

মানস গঙ্গার জল ঘন করে কলকল
দুকুল বহিয়া যায় ঢেউ।
গগনে উঠিল মেঘ পবনে বাঢ়িল বেগ
তরণি রাখিতে নাহি কেউ॥

... ...

অকাজে দিবস গেল নৌকা নাহি পার হৈল
পরাণ হইল পরমাদ।
জ্ঞানদাস কহে সখি থির হৈয়া থাক দেখি
এখন না ভাবিহ বিষাদ॥ [৩৩৩]

যে দিন মানসগঙ্গা উত্তাল হয়ে ওঠে, ঘন মেঘাচ্ছন্ন সেই কূলহীন নদীতে প্রিয়তমকে নৌকা পারাপারের কাণ্ডারীরূপে পাওয়া যায়, সে দিন মনের ভুলে নৌকা পারাপার আর শেষ হয় না।—অকাজে আনমনা দিবস বয়ে যায়। এ-অনুভূতি কৃষ্ণ-কাণ্ডারীকে নিয়ে যমুনা পার হতে গিয়ে যেমন রাধার হয়েছে, কবির চিত্রণ দক্ষতায় সবকালের প্রেমিক হৃদয়েও সে-অনুভূতি সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে।

(খ) রূপানুরাগ বিষয়ে জ্ঞানদাসের কয়েকটি উৎকৃষ্ট পদ লিখিত হয়েছে। ইতিপূর্বেই কবিত্বের মৌলিকতা আলোচনা প্রসঙ্গে তার 'আলো মুই জানি না' পদটি উদ্ধৃত করেছি। এখানে আর দু-একটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে।—

রূপানুরাগের পদ

চূড়াটি বাঁধিয়া উচ্চে কে দিলে ময়ূর পুচ্ছ
ভালে সে রমণী মনলোভা।
আকাশ চাহিতে কিবা ইন্দ্রের ধনুকখানি
নবমেঘে করিয়াছে শোভা॥
মল্লিকা মালতী মালে গাঁথনি গাঁথিয়া ভালে
কেবা দিল চূড়াটি বেড়িয়া।
মনে হেন অনুমানি বহিতেছে সুরধনি
নীলগিরি শিখর বহিয়া॥

কালার কপালে চাঁদ চন্দনের ঝিকিমিকি
কেবা দিল কাণ্ড রঙ্গিয়া।
রজতের পত্রে কিবা কালিন্দী পূজিল গো
জবা কুসুম তাহে দিয়া॥
হিঙ্গুল গুলিয়া কালার অঙ্গে কে দিয়াছে
কালিন্দী পূজিল করবীরে।
জ্ঞানদাসেতে কয় মোর মনে হেন লয়
শ্যামরূপ দেখি ধীরে ধীরে॥ [১৬২]

কৃষ্ণের রমণী মনলোভা ভালে ময়ূরপুচ্ছ চূড়াটি কে বেঁধে দিল। মনে হয় যেন নব মেঘাবৃত আকাশে ইন্দ্রধনুর শোভা দেখা দিয়েছে। চূড়া বেষ্টন করে কে আবার ভালে মল্লিকা-মালতীর মালা দিয়ে দিয়েছে। যেন, নীলগিরি শিখর থেকে সুরধুনি প্রবাহিত হয়েছে। কালার কপালে কে চন্দনের চাঁদ এঁকে রাঙা ফাগ ছড়িয়ে দিয়েছে। মনে হচ্ছে যেন রজত-পত্রে কেউ জবাকুসুম সাজিয়ে যমুনার পূজা করছে। কালার অঙ্গে কে হিঙ্গুল গুলে দিয়েছে। বুঝি কে করবী ফুলে যমুনার পূজা করেছে। জ্ঞানদাস মনে ভাবেন, এই শ্যামরূপ দীর্ঘ সময় ধরে ধীরে ধীরে দেখি! উপমার চমৎকারিত্বে, বিশেষ করে কবির অতৃপ্ত নয়নে দীর্ঘকাল ধরে এই শ্যামরূপ অবলোকনের অভিব্যক্তিতে পদটি নতুন সৌন্দর্য লাভ করেছে।

আর একটি পদে, কৃষ্ণরূপ দর্শনের অনুভূতি আনন্দোচ্ছল ভঙ্গিতে রাধা সখীর কাছে ব্যক্ত করছেন,—

দেইখা আইলাম তারে,
সই, দেইখ্যা আইলাম তারে।
এক অঙ্গে এতরূপ নয়নে না ধরে॥
বান্ধ্যাচে বিনোদ চূড়া নবগুঞ্জা দিয়া।
উপরে ময়ূরের পাখা বামে হেলাইয়া॥
কালিয়া বরণখানি চন্দনেতে মাখা।
আমা হৈতে জাতিকুল নাহি গেল রাখা॥
মোহন মুরলী হাতে কদম্ব হিলন।

দেখিয়া শ্যামের রূপ হৈলাম অচেতন ॥
গৃহকর্ম করিতে আউলায় সব দেহ।
জ্ঞানদাস কহে বিষম শ্যামের নেহ॥ [১৬৪]

কত সহজ হৃদয় নিঙড়ানো অভিব্যক্তি! 'এক অঙ্গে এত রূপ' রাধা তার দুটী নয়নে ধরবেন সাধ্যকি! চন্দন-চর্চিত কালিয়াকে দেখে রাধা আর জাতিকুল রাখতে পারেন বুঝি এমন ভরসা নেই। মুরলী হাতে কদম্ব হিলনে সেই মূর্তি দেখে তিনি প্রেমে চেতনা হারাতে বসেছেন। গৃহকর্ম করবেন কি, বিষম শ্যামরূপের বিষক্রিয়ায় তার 'আউলায় সব দেহ'! এই যৌবনোচ্ছল সরলা নায়িকার রূপানুরাগের চিত্রাঙ্কনে, বর্ণনাভঙ্গি ও শব্দচয়নে জ্ঞানদাস যে দক্ষতা দেখিয়েছেন সেটি লক্ষণীয়।

অভিসার

(চ) (অভিসার চিত্রণে বিদ্যাপতি বা গোবিন্দদাসের তুলনায় জ্ঞানদাসের পদগুলি অনেকটা নিষ্প্রভ। একাধিক পদে লক্ষ্য করা যায়, রাধাচিত্র আঁকতে বসে তিনি যেন অনুরূপ ভাব-বিভোর চৈতন্যদেবের ছবিই অঙ্কিত করেছেন।) একটি দৃষ্টান্ত তুলছি।—

শ্যাম অভিসারে চলু বিনোদিনী রাধা।
নীল বসনে মুখ ঝাঁপিয়াছে আধা॥
... ...
আবেশে সখীর অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া।
পদ আধ চলে আর পড়ে মুরছিয়া॥
রবাব খমক বীণা সুমেল করিয়া।
প্রবেশিল বৃন্দাবনে জয় জয় দিয়া॥
নূপুরের রুনুঝুনু পড়ি গেল সাড়া।
নাগর উঠিয়া বলে আইল রাই পারা॥ [১৮৯]

অভিসারিকার এমন 'রবাব খমক বীণা সুমেল করিয়া' জয় জয় নাদে প্রিয়তমের কাছে উপস্থিত হওয়া তত্ত্বের দিক থেকে বিশিষ্ট অর্থদ্যোতক হলেও, তাতে কবিত্বের মাধুর্য কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ না হয়ে পারে না। এমন রাধার অভিসার-রূপকে আমরা 'রাধা-ভাব-দ্যুতি সুবলিত' চৈতন্যদেবের নবদ্বীপ-লীলাকীর্তনের একটি নয়নাভিরাম চিত্র প্রত্যক্ষ করছি। তবে কোনও কোনও পদে প্রতিভার বিদ্যুৎ চমক না আছে এমন নয়। একটি পদে যথার্থ প্রেমিকার অভিসার তাৎপর্য

অল্পকথায় চমৎকার ধ্বনিত হয়েছে। রাধা অন্ধকারে দুর্যোগে একা পথ চলতে পারবেন না বলে সঙ্গে সখীরা রয়েছেন। কিন্তু নব অনুরাগের রীতই আলাদা। শ্রীরাধা যখন অপূর্ব প্রেম-তরঙ্গে ভেসে ত্বরিতে অবলীলাক্রমে প্রিয়তমের কাছে পৌঁছে যান, সখীরা আর তার নাগাল পান না।

দেখ দেখ নব অনুরাগক রীত।
ঘন আন্ধিয়ার ভুজগভয় শতশত
তৃণহু না মানয়ে ভীত॥
সখিগণ সঙ্গ তেজি চলু একসরি
হেরি সহচরিগণ ধায়।
অদভুত প্রেম- তরঙ্গে তরঙ্গিত
তবহুঁ সঙ্গ নাহি পায়॥ [১৮৭]

(প্রেম যে সর্ববাধা অতিক্রমকারী কি অলৌকিক শক্তি সঞ্চার করে কবি অপূর্ব অলঙ্করণ ও ধ্বনিব্যঞ্জনায় তার চিত্রটি এখানে অঙ্কিত করেছেন। দুর্বার প্রেম-সমুদ্রের তরঙ্গ যাকে টেনে নিয়ে যায়, তীরের লোকেরা তার নাগাল পাবে কি ভাবে!)

আর একটী পদে কবি বর্ণনা দিচ্ছেন,—

মেঘ যামিনী অতি ঘন আন্ধিয়ার।
ঐছে সময়ে ধনি করু অভিসার॥
ঝলকত দামিনি দশদিক আপি।
নীলবসনে ধনি সব তনু ঝাঁপি॥
দুই চারি সহচরি সঙ্গহি নেল।
নব অনুরাগ ভরে চলি গেল॥
বরিখত ঝরঝর থরতর মেহ।
পাওল সুবদনি সঙ্কেত গেহ॥ [১৮০]

এ যেন জাগ্রৎ প্রেম-স্বপ্ন-চেতনার চিত্ররূপ। নিবিড় বর্ষায় রাধা নব-অনুরাগের পাখায় ভর করে কৃষ্ণের সঙ্কেত কুঞ্জে চলে এলেন। বর্ষার নিবিড়তার সঙ্গে স্বপ্ন-মিলনাবেগের সুখানুভূতির মিশ্রণে জ্ঞানদাস যেন এক অশরীরী রূপকথার প্রেম-লোক গড়ে তুলেছেন। বিদ্যাপতির বর্ষানুভূতিও নিবিড়তম, তবে সে বর্ষা একান্তভাবে বিরহেরই প্রতীক। বর্ষা-বিরহের চিত্র জ্ঞানদাসের মাথুরের পদেও

কিছু রয়েছে। কিন্তু বর্ষা যে হৃদয়কে ময়ূরের মত প্রেমের মিলনস্বপ্নে নৃত্য-চঞ্চল করে তোলে সেই চিত্রের রূপকার জ্ঞানদাসের বোধ হয় বাংলা সাহিত্যে একমাত্র তুলনা এ-যুগের রবীন্দ্রনাথ।

মান : বাসকসজ্জিকা, খণ্ডিতা এবং কলহান্তরিতার পদ।

(ছ) মান পদাবলীর রসপর্যায়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। প্রেমের বিচিত্র লীলাবিভ্রম এই মানের নায়িকাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। পদাবলীর অষ্টনায়িকার ছয়টি নায়িকা চিত্রই মানের পর্যায়ভুক্ত। অভিসারিকার পৃথক আলোচনা করা হয়েছে। এবার তার পরবর্তী পর্যায়গুলির এক একটি চিত্র উদ্ধৃত করা গেল।

অভিসারিকা সংকেতকুঞ্জ সাজিয়ে নিজে প্রসাধন করে প্রেমিকের জন্য অপেক্ষা করছেন,—এই হল বাসকসজ্জিকা নায়িকার রূপ।—

অপরূপ রাইক চরিত।
নিভৃত নিকুঞ্জ মাঝে ধনি সাজয়ে
পুন পুন উঠয়ে চকিত॥
কিশলয় শেজ বিছায়ই পুন পুন
জারত রতন প্রদীপ।
তাম্বুল কপুর খপুরে পুন রাখয়ে
বাসিত বারি সমীপ॥
মলয়জ চন্দন মৃগমদ কুঙ্কুম
লেই পুন তেজত তাই।
সচকিত নয়নে নেহারই দশদিশ
কাতরে সখিমুখ চাই।
কিঙ্কিণি কঙ্কণ মনিময় অভরণ
পরিহর তেজত তাই।
সখিগণ হেরি কতহু পরবোধয়ে
জ্ঞানদাস কহ ধাই॥ [৩৮১]

রাই চরিত অপরূপ। নিভৃত নিকুঞ্জে তিনি সাজ করতে গিয়ে বার বার চমকে উঠছেন। কিশলয়ের শয্যা বার বার তৈরী করছেন, রতন প্রদীপ জ্বালছেন। সুগন্ধ বারিসহ তাম্বুল কর্পূর এবং সুপারি রাখছেন। স্নিগ্ধ চন্দন, মৃগমদ, কুঙ্কুম

একবার অঙ্গে গ্রহণ করছেন আবার মুছে ফেলছেন। সচকিত নয়নে দশদিকে (কৃষ্ণান্বেষণে) চাইছেন। কাতর হয়ে সখির পানে চাইছেন (যদি তিনি কৃষ্ণকে আনবার কোনও উপায় করতে পারেন!) 'কঙ্কণ কিঙ্কিণি' মণিময় অন্য আভরণ একবার পরছেন,—আবার খুলে ফেলছেন ; সখিরা (এই দশা দেখে) কত প্রবোধ দিচ্ছেন ; জ্ঞানদাস বলেন, 'আমাকে বল আমি এখুনি ছুটে যাই (কৃষ্ণকে খুঁজে আনার উদ্দেশ্যে)।'

উৎকণ্ঠিতা রাধার দুই ভিন্ন মেজাজের দুটি পদ থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে। একটিতে প্রিয়তম এলেন না তার হতাশা। অপরটিতে প্রিয়তম এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে কি করে আসবেন তার উৎকণ্ঠা।

বিফলে সাজায়লু কুঞ্জ।
কী ফল উপচার পুঞ্জ॥
কী ফল অন্ধ সমীপ।
উজরলুঁ রতন প্রদীপ॥
গাথলুঁ মালতী মাল।
মরমে রহি গেল শাল॥
কি ফল চতুঃসম গন্ধে।[১]
ভূষণ বেশ সুছন্দে॥
কাহে আনলুঁ সব খীর।
তাম্বুল বাসিত নীর॥
কাহে উজাগরি রাতি।
জ্ঞানদাস লেউ শাতি॥ [৩৮২]

রাধা বলছেন, বৃথাই কুঞ্জ সাজিয়েছি। উপচার সামগ্রী দিয়ে আর কি হবে। আঁধারে রতন প্রদীপ জ্বালিয়েই বা আর কি হবে! মালতীর মালা গাঁথলাম, মর্মে দুঃখই রয়ে গেল! চতুঃসম গন্ধেই বা কি ফল, সুগন্ধ বেশ-ভূষণেই বা কি লাভ! এই তাম্বুল, সুবাস পানীয়, ক্ষীর দ্রব্যাদি কেনই বা আনলাম। বৃথা রাত জাগাই বা কেন! (কৃষ্ণ আসবেন সে খবর রাধাকে বুঝি কবিই এনে দিয়েছিলেন, তাই রাধার মনোভঙ্গে) জ্ঞানদাস শাস্তি নিতে চান।

উৎকণ্ঠিতার অপর চিত্রটি আরও অনুপম।—

এ ঘোর রজনি মেঘ গরজনি
কেমনে আয়ব পিয়া।
শেজ বিছাইয়া রহিলুঁ বসিয়া
পথপানে নিরখিয়া।। [৩৮৩]

মাঝে মাঝে বিদ্যুতের চমক, মেঘের গর্জন, যেন রাধার বুকেই শেল হানছে,—

দহয়ে দামিনি ঘন ঝলঝলি
পরাণ-মাঝারে হানে। [ঐ]

এর পর খণ্ডিতা রাধার চিত্র। জ্ঞানদাস কাহিনীগত পারম্পর্য রক্ষার খাতিরে মাত্র একটি পদ লিখেছেন। বর্ণনায় বিশেষত্ব নেই। তবে পরাজিত কৃষ্ণের অসহায় রূপটি ফুটে উঠেছে। তিনি মিথ্যা কৈফিয়ৎ তৈরী করতে গিয়ে ধরা পড়ে যাচ্ছেন—

খেনে খেনে নয়ন মুদলি আধ-তারা।
কহইতে বচন রচন আধহারা।। [৩৮৪]

নিশিজাগরণে প্রভাতে খনে খনে কৃষ্ণের নয়ন মুদে আসছে এবং মিথ্যা কাহিনী তৈরী করতে গিয়ে কথার সূত্র হারিয়ে ফেলছেন। তবু কৈফিয়ৎ দিতে চেষ্টা—

সুন্দরি কাহে কহসি কটুবাণী।
তোমারি চরণ ধরি শপতি করিয়ে কহি
তুহুঁ বিনে আন নাহি জানি।। [৩৮৫]

এবার মানিনীর মান ভাঙানোর পালা। জ্ঞানদাস সেখানে উপমার যে সার্থক প্রয়োগ করেছেন, কথার যে চাতুর্য দেখিয়েছেন সেটি তার কবিত্বের বৈদগ্ধ্যেরই পরিচায়ক। রাধাকে কৃষ্ণ বলছেন,—

যে চাঁদের সুধাদানে জগত জুড়াও।
সে চান্দ বদনে কেনে আমারে পোড়াও।। [৩৯৪]

চন্দ্রাননা শ্রীরাধার প্রেম-সৌন্দর্য কিরণ-সুধার সঙ্গে তুলিত হয়েছে। কৃষ্ণের প্রশংসাবাচক অনুযোগ, 'বদনের কিরণ-সুধাদানে জগত জুড়িয়ে দাও, সেই কিরণেই আমাকে আবার পোড়াও কেন।'

মানিনী শ্রীরাধার প্রতি কৃষ্ণের অনুনয়ের অপর একটি চিত্রও এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য।—

চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি।
নয়ান নাচনে নাচে হিয়ার পুতলী ॥

পীত পিন্ধন মোর তুয়া অভিলাষে।
পরাণ চমকে যদি ছাড়হ নিঃশ্বাসে ॥

রাই কত পরখসি মোরে আর।
তুয়া আরাধন মোর বিদিত সংসার ॥

লেহ লেহ লেহ রাই সাধের মুরলী।
পরশিতে চাহি তোমার চরণের ধুলি ॥

তুয়া মুখ নিরখিতে আঁখি ভেল ভোর।
নয়ন-অঞ্জন তুয়া পর-চিত-চোর ॥

রূপে গুণে যৌবনে ভুবনে আগুলি।
বিহি নিরমিল তুয়া পিরীতি পুতলী।

এত ধনে ধনী যেই সে কেনে কৃপণ।
জ্ঞানদাস কহে কেবা জানিবে মরম ॥[১] [৪০৩]

'রাই মুখ তুলে চাও। তোমার নয়ন-নাচনে আমার হৃদয় নেচে ওঠে। তোমায় ভালবেসে আমি পীতবাস (রাধার দেহবর্ণের সাদৃশ্য বশতঃ) পরেছি। তুমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেই আমার প্রাণ চমকে ওঠে (তোমার দুঃখের আশঙ্কায়)। রাই, আমায় আর কত পরীক্ষা করবে। জগত সংসার জানে, তোমায় আমি আরাধনা করি। রাই, আমার হাতের মুরলীটা নাও, তোমার চরণধূলি স্পর্শ করি (মান ভাঙাবার উদ্দেশ্যে)। তোমার মুখ নিরীক্ষণ করতে আঁখি বিভোর হল, তোমার চোখের কাজল আমার চিত্তকে চুরি করেছে। রূপ, গুণ ও যৌবনে তুমি ভুবনে শ্রেষ্ঠা, বিধাতা তোমায় প্রেমের পুতুল করেই গড়েছেন। যে এত ধনে ধনী সে আমার বেলায় এত কৃপণ কেন? জ্ঞানদাস বলেন, এর মর্ম কে বুঝবে!'

শ্রীরাধার মান ভাঙাতে কৃষ্ণ তার পদস্পর্শ করতে চান, কিন্তু হাতে বাঁশি,

---

১। এখানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণের পাঠ গ্রহণ করা গেল।

রাধাকেই অনুনয় করছেন, বাঁশিটী ধর—তোমার পাদস্পর্শ করে মান ভাঙ্গাই। এই মধুর ছলনাটুকু সত্যই উপভোগ্য। এর পর রাধা আর কতক্ষণ মান করে থাকতে পারেন। নিরাশ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে কৃষ্ণ অদর্শন হলেই কলহান্তরিতা রাধার সুর শুনতে পাই,—

সখী প্রতি কমলিনী বোলয়ে মধুর বাণী
মোরে মিলাইয়া দেহ শ্যাম।
তুমি মোর প্রিয় সখী দেখাও সে নীরজ আঁখি
শূন্যময় হেরি ব্রজধাম॥ [৪১৬]

এর পরবর্তী মিলনচিত্রও কবি এঁকেছেন,—

ছলছল লোচন লোর।
কানু কয়ল ধনি কোর॥
বুঝল হিয় অভিলাষ।
নিধুবন রচই বিলাস॥
চুম্বন করইতে কান।
বঙ্কিম ঈষত বয়ান॥ [৪২৪]

এ যেন তুলির টানে আঁকা ছবি। বাহুল্য নেই, পরিপূর্ণ ব্যঞ্জনাময় প্রকাশ-সুষমা রয়েছে।

(ঞ) বংশী-শিক্ষার পদগুলিতে চৈতন্য-পরবর্তী ভক্ত কবিরা বাঁশিকে বিশিষ্ট অর্থে গ্রহণ করেছেন। জগতের সর্ব জীবকে প্রেমাকর্ষণের উদ্দেশ্যে কৃষ্ণের বাঁশি নিরন্তর বেজে চলেছে। যে প্রকৃত মর্মজ্ঞ তার কানে এই প্রেম-আহ্বান দুর্বার ভাবে প্রবেশ করে।[১] এই বংশীর আকর্ষণ-রহস্য রাধা কৃষ্ণের কাছে জানতে চান।—

বংশী-শিক্ষার পদ

১। জ্ঞানদাসের 'মুরলী করাও উপদেশ' পদটি অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ 'বৈষ্ণব কবির গান' শীর্ষক কয়েকটি চিন্তাশীল সুন্দর ভাব-ব্যাখ্যা -কণিকা রচনা করেছেন। এখানে তার একটি অংশ উদ্ধৃত করা গেল।—

সৌন্দর্য-স্বরূপের হাতে সমস্ত জগৎই একটি বাঁশী। ইহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে তিনি নিঃশ্বাস পূরিতেছেন ও ইহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে নূতন নূতন সুর উঠিতেছে। মানুষের মন আর কি ঘরে থাকে? তাই সে ব্যাকুল হইয়া বাহির হইতে চায়। সৌন্দর্যই তাহার আহ্বান

ঘর হৈতে আইলাম বাঁশী শিখিবারে।
নিজ দাসী বলি বাঁশী শিখাহ আমারে॥
কোন্ রন্ধ্রেতে শ্যাম গাও কোন্ তান।
কোন্ রন্ধ্রের গানে বহে যমুনা উজান॥
কোন রন্ধ্রেতে শ্যাম গাও কোন্ গীত।
কোন্ রন্ধ্রের্ গানে রাধার হরিলে হে চিত॥
কোন্ রন্ধ্রের্ গানেতে কদম্ব ফুল ফুটে।
কোন্ রন্ধ্রের গানেতে রাধার নাম ওঠে॥

[হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় : বৈষ্ণব পদাবলী :
জ্ঞানদাস ১৫৫]

কৃষ্ণ বাঁশি শেখাতে গিয়ে দেখেন তিনি বাঁশিতে নিজনাম বাজাতে গেলে রাধানাম বেজে ওঠে।

নিজ নাম শ্যাম তখন বাঁশী পুরে আধা।
নাহি বাজে, শ্যামনাম বাজে রাধা রাধা॥

গান। সৌন্দর্যই সেই দৈববাণী। কদম্বফুল তাঁহার বাঁশীর স্বর, বসন্তঋতু তাহার বাঁশীর স্বর, কোকিলের পঞ্চম তান তাঁহার বাঁশীর স্বর। সে বাঁশীর স্বর কি বলিতেছে। জ্ঞানদাস হাসিয়া বুঝাইলেন, সে কেবল বলিতেছে, 'রাধে, তুমি আমার'—আর কিছুই না। আমরা শুনিতেছি, সেই অসীম সৌন্দর্য অব্যক্ত কণ্ঠে আমাদেরই নাম ধরিয়া ডাকিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, 'তুমি আমার, তুমি আমার কাছে আইস।' এইজন্য আমাদের চারিদিকে যখন সৌন্দর্য বিকশিত হইয়া উঠে তখন আমরা যেন একজন কাহার বিরহে কাতর হই, যেন একজন কাহার সহিত মিলনের জন্য উৎসুক হই—সংসারে আর যাহারই প্রতি মন দিই, মনের পিপাসা যেন দূর হয় না। এই জন্য সংসারে থাকিয়া আমরা যেন চিরবিরহে কাল কাটাই। কানে একটি বাঁশীর শব্দ আসিতেছে, মন উদাস হইয়া যাইতেছে, অথচ এ সংসারের অন্তঃপুর ছাড়িয়া বাহির হইতে পারি না! কে বাঁশী বাজাইয়া আমাদের মন হরণ করিল, তাহাকে দেখিতে পাই না; সংসারের ঘরে ঘরে তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াই। অন্য যাহারই সহিত মিলন হউক না, কেন, সেই মিলনের মধ্যে একটি চিরস্থায়ী বিরহের ভাব প্রচ্ছন্ন থাকে।

[রবীন্দ্র রচনাবলী : অচলিত সংগ্রহ, ২ খণ্ড, ৫০ পৃ.]

তখন রাই বলছেন,

রাই কহে এক রন্ধ্রে দোঁহে দিব ফুক।
না জানি কেমনে বাজে দেখিব কৌতুক॥
এক রন্ধ্রে ফুক তবে দেয় রাধা কানু।
রাধা শ্যাম দুটি নাম বাজে ভিন্নু ভিন্নু॥ [৩৬৯]

বাঁশির সুর কৃষ্ণ রাধা উভয়ে মিলেই বাজিয়ে তুললেন। কৃষ্ণের রাধারূপ গ্রহণ এবং রাধার কৃষ্ণসাজে সেজে বংশীবাদন শিক্ষার মধ্যেও প্রকৃতিময়ী জগৎ কর্তৃক জগৎ-প'তকে তারই বাঁশী বাজিয়ে আহ্বানের তত্ত্বটী নিহিত রয়েছে।

রসোদ্গার ও অনুরাগের (আক্ষেপানুরাগ) পদ

(খ) রসোদ্গারে কৃষ্ণপ্রেমের গৌরবোক্তি। কৃষ্ণ প্রেমধন্য রাধা শতমুখেও বঁধুর ভালবাসার কথা বলে শেষ করতে পারেন কি! সখিদের কাছে তারই প্রেমে বিভোর কৃষ্ণের বর্ণনা দিচ্ছেন রাধা,—

আমার অঙ্গের বরণ সৌরভ
যখন যে দিগে পায়।
বাহু পসারিয়া বাউল হইয়া
তখন সে দিগে ধায়॥ [২২১]

কবি শুধু সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাময় চিত্রটিই উপহার দিলেন।—সর্ব ইন্দ্রিয়বশকারী প্রেমের এই অনীর্বচনীয় উন্মাদনা শ্রোতাকেই উপলব্ধি করে নিতে হবে।

একটি পদে সখিদের কাছে রাধা কৃষ্ণপ্রেমের স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে বলছেন,—

সই, কিবা সে কানুর প্রেম।
আঁখি পালটিতে নাহি পরতীত,
যেন দরিদ্রের হেম॥
তিলে কত বেরি মুখ নেহারই
আচরে মোছই ঘাম।
কোরে থাকিতে দূর হেন বাসে
সদা লএ মোর নাম॥ [২২৩]

এ-পদে কৃষ্ণের প্রেমানুভূতিতে প্রেমবৈচিত্ত্যের সুর ফুটে উঠেছে। প্রেম যেখানে সীমাহীন, পেয়েও হারাবার আতঙ্ক সেখানে দরিদ্রের স্বর্ণলাভের মতই উপমার বিষয়। কৃষ্ণ সত্যিই রাধাকে পেয়েছেন কিনা প্রতীত হচ্ছে না। ঘুরিয়ে

ঘুরিয়ে অতৃপ্ত নয়নে মুখটি দেখছেন, আঁচলে ঘাম মুছিয়ে দিচ্ছেন, কোলে নিয়েও হারাবার আশঙ্কায় অধীর! রাধার সখীদের কাছে এই কৃষ্ণপ্রেম বর্ণনায় রসোদ্‌গারের গৌরবোক্তি প্রকাশ পেয়েছে।

প্রেমানুভূতির ক্ষেত্রে জ্ঞানদাসের সূক্ষ্ম রুচিসুন্দর সৌন্দর্যবোধ পাঠকদের মুগ্ধ করে। বাউল হয়ে কৃষ্ণ যে প্রেমোন্মাদনায় রাধা-অঙ্গের সৌরভ গ্রহণ করতে ছোটেন, সেই একই সৌরভের চেতনায় রাধা আবার ননদিনীর কাছে ধরা পড়ে যান।—

পিয়ার পিরিতে জাগি ঘুমায়লু
না জানি বিহান নিশি।
কানুর সঙ্গের অঙ্গের সৌরভ
ননদী পাওল আসি॥ [২৩০]

কানুর সঙ্গে নিশিযাপন করেছেন, প্রভাতে ননদিনী এসে সেই অঙ্গ-সৌরভ পেয়েছেন। এই প্রেমানুভূতির মধ্যে একটি পরিচ্ছন্ন সূক্ষ্ম রুচিবোধ রয়েছে। রাধা প্রিয়তমের পিরীতে সারারাত যেন জেগে ঘুমিয়েছেন। তন্ময় প্রেমতো স্বপ্ন-মুগ্ধই রাখে। রাধা জেগে ঘুমিয়েছেন বৈকি!

রসোদ্‌গার-প্রেমবৈচিত্ত্যের অপর একটি উৎকৃষ্ট পদ থেকে (হিয়ার উপর হৈতে সেজে না ছোয়ায়) ইতিপূর্বেই জ্ঞানদাসের কবিত্বের বৈশিষ্ট্য বিচার প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করেছি। দু'টি হৃদয় সেখানে এক।—'বুকে বুকে মুখে মুখে রজনী গোঙায়।' তাতেও রাধার দীর্ঘ নিশ্বাস পড়লে 'আকুল হইয়া পিয়া উঠয়ে তরাস।' প্রিয়তমের প্রেমবৈচিত্ত্য, রাধার রসোদ্‌গার।

অনুরাগ আর পূর্বরাগে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। পূর্বরাগ পারস্পরিক প্রেম, তবে মিলনের বাধা রয়ে গেছে। অনুরাগ হল, উভয়ের মিলন জনিত প্রেমের আরও গভীর আকর্ষণ-বোধ। অনুরাগের রাধা বলতে পারেন,—

বন্ধু আর কি ছাড়িয়া দিব।
হিয়ার মাঝারে যেখানে পরাণ
সেখানে বান্ধিয়া থুব॥ [২৫৩]

একবার মিলনের স্বাদ পেয়ে এখন রাধা আর কৃষ্ণকে ছেড়ে দিতে রাজী নন। তাকে বুক চিরে যেখানে প্রাণ সেখানে ধরে রাখতে চান।—এই হল অনুরাগের

আকুলতা এই অনুরাগেই সর্ব ইন্দ্রিয় দিয়ে রাধা কৃষ্ণ-প্রেমরসাস্বাদন করতে ব্যাকুল হয়ে বলতে পারেন,—

রূপলাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥ [২৭১]

এ প্রেম রাধাকে আত্মবশে থাকতে দেয় না। গুরুজনের মাঝেও তাঁকে সম্বিতহারা করে তোলে।—

গুরু গরবিত মাঝে রহি সখি সঙ্গে।
পুলকে পুরয়ে তনু শ্যাম পরসঙ্গে॥
পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥ [২৭১]

তনুপুলক-রোমাঞ্চ গুরুজন যাতে দেখতে না পান তার জন্যে রাধার কতপ্রকার চেষ্টা। কিন্তু দেহমন বাম। একদিকে পুলক সংবরণের চেষ্টা, অপরদিকে অবিরল অশ্রুধারায় দুর্নিবার শ্যাম-অনুরক্তির প্রকাশ। কৃষ্ণপ্রেমের কাছে রাধার এই পরাজয়ের গৌরব বর্ণনায় অনুরাগের যে অনুপম চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে সমগ্র পদাবলী সাহিত্যে তেমন দৃষ্টান্ত বেশী মিলবে না। এই পদেই একটি পংক্তি রয়েছে 'দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা'। রূপের জন্য আঁখির আকুলতা, প্রতি অঙ্গের স্পর্শলাভের জন্য প্রতি অঙ্গের ক্রন্দন। সর্ব দেহমনের এই অনির্বচনীয় আকুলতা কবি কি ভাবে প্রকাশ করবেন। গ্রাম্য, নিতান্তই সহজ, কিন্তু প্রকাশ শক্তির দিক থেকে অব্যর্থ ভাবগর্ভ একটি শব্দ ব্যবহার করলেন, 'আউলাইছে গা', সর্ব ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়াতীত চেতনা দিয়ে রাধার কৃষ্ণ-মিলনাকাঙ্খার এই শিহরণ রসাভিজ্ঞ জনেরা কিছুটা উপলব্ধি করবেন। কবি এখানে পল্লীর মানুষকে তাদেরই ভাষায় এই প্রেমাভিজ্ঞতার কথা বুঝিয়ে দিলেন।

অনুরাগিনী রাধার আর দু-একটি মর্মবিদারী উক্তি উদ্ধৃত করি। কৃষ্ণ-প্রেমে রাধার তৃষ্ণা অপূর্ণ থেকে যায়। তার কারণ বিশ্লেষণে রাধা বলছেন,—

পরবশ প্রেম পুরয়ে নাহি আরতি
অনুখন অন্তর দাহ। [৩১১]

প্রেম পরবশ,—পরের উপর নির্ভরশীল,—অনেক দুঃখে এত সহজ অথচ মর্মভেদী সত্যটি রাধা হৃদয়ঙ্গম করেছেন। তাই আক্ষেপানুরাগের সুরে তাকে কাঁদতে শুনি,—

> পরাণ কাঁদে বঁধু তোমা না দেখিয়া।
> অন্তরে দগধে প্রাণ বিদরয় হিয়া॥
> বার এক দেখা নাই সকল দিনে।
> কেমনে রহিবে প্রাণ দরশন বিনে॥ [৩১২]

সমস্ত দিনে অন্ততঃ একবারটির জন্য দেখা না পেলে রাধার প্রাণ বাঁচে কিরূপে! আক্ষেপানুরাগের আর একটি বিখ্যাত পদ 'সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু'।—এটি চণ্ডীদাস এবং জ্ঞানদাস উভয়েরই ভণিতায় পাওয়া যায়। পদটিতে বিষম অলঙ্কারের আঙ্গিকে আক্ষেপের স্নিগ্ধ সুরটি মর্মগ্রাহীভাবে ফুটে উঠেছে। ইতিপূর্বে উদ্ধৃত 'বঁধুর লাগিয়া সব তেয়াগিনু', 'আলো মুই জনিনা, জানিলে যাইতাম না কদম্বের তলে,' 'মনের মরম কথা তোমারে কহিয়ে এথা', 'পরাণ বন্ধুকে স্বপনে দেখিলু' প্রভৃতি বিখ্যাত পদগুলিতেও আক্ষেপানুরাগের সুরটি চমৎকারভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বস্তুতঃ আক্ষেপানুরাগের পদগুলিতেই জ্ঞানদাসের কবিসত্তার প্রেম-তন্ময় নিভৃত অনুভূতিটি যত সূক্ষ্ম সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে অন্যত্র ততটা নহে।

মিলন ও রাসের পদ

(এ) সার্থক রতি-মিলনের চিত্র সংস্কৃত শৃঙ্গার-রসাত্মক পদের আদর্শে বিদ্যাপতি বেশ কিছু অঙ্কিত করেছেন। চণ্ডীদাসে মিলনের অতৃপ্তির সুরেরই প্রাধান্য। জ্ঞানদাসের মিলন-চিত্রে বাস্তবের অপূর্ণতা জনিত অতৃপ্তিবোধ এবং সেই সঙ্গে স্বপ্নময় পূর্ণতার প্রতি আকর্ষণের সুরই স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। রোমান্টিক কবিচেতনার পক্ষে সেটাই স্বাভাবিক। বোধ করি সে জন্যই কবি উভয়ের মিলনের যে ছবি এঁকেছেন সেটি অখণ্ড সৌন্দর্যময় স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। তাকে রূঢ় বাস্তবের ক্ষেত্রে টেনে এনে বিস্রস্ত করতে কবির এত কুণ্ঠা।—

> একলি মন্দিরে আছিলা সুন্দরী—
> কোরহি শ্যামর চন্দ।
> তবহুঁ তোহারি পরশ না ভেল
> এ বড় হৃদয় ধন্দ॥
> .. ..

কস্তুরী চন্দন অঙ্গেহি বিলেপন
অধিক দেখিয়ে জোর।
অশেষ কুসুমে বান্ধল কবরী
শিথিল না ভেল তোর॥ [২১৪]

সখিদের বিস্ময়, শ্যামচাঁদকে নিয়ে রাধা একলা মন্দিরে রাত কাটালেন অথচ অঙ্গের কস্তুরী চন্দনের বিলেপন নষ্ট না হয়ে আরও উজ্জ্বল দেখাচ্ছে কেন, কত বিচিত্র কুসুমে কবরী বিন্যাস করেছিলেন তার বাঁধন এতটুকু শিথিল হল না কেন!

কারণটি রাধাই ব্যক্ত করলেন কত অল্পকথায়,—

সজনি ও কথা কহিল নয়।
শ্যাম সুনাগর গুণের সাগর পড়িনু কোরে ঘুমায়॥ [২১৫]

শ্যাম ঘুম ভাঙাতে কত যত্ন করলেন, রাধার ঘুম ভাঙল না; ভাঙবে কি! হয়তো স্বপ্নমিলনই তার ইপ্সিত ছিল,—

কুসুম সেজপর কিশোরী কিশোর।
ঘুমল দুহুঁজন হিয়ে হিয়ে জোর। [২১৬]

নিদ্রার আবেশেই উভয়ের রতি মিলন,

রতির আলসে দুহেঁ আঁখি মেলিতে নারে।
দুহুঁ ঢুলি ঢুলি পড়ে দোঁহার উপরে॥ [২১৭]

নিদ্রাজড়িত মিলনবাসর থেকে আবার জাগরণ,—

উঠিয়া নাগর রাজ নিদের আবেশে।
দুটি আঁখি মুদি রহে বিনোদিনী পাশে॥ [২১৯]

স্বপ্নমিলনের এবং মিলন মুহূর্তে জাগরণ জনিত আশাভঙ্গের দুটি উৎকৃষ্ট পদ সম্পর্কে ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি। স্বপ্নমিলনে জ্ঞানদাসের পদগুলি যে রোমান্টিকতার সৌরভ-মণ্ডিত হয়েছে সেখানে তিনি অপর বৈষ্ণব কবিদের থেকে স্বতন্ত্র।

রাস-মিলনের পদে চৈতন্য-পরবর্তী ভক্তকবিরা ভাগবতের আদর্শই গ্রহণ করেছেন। সেগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বৈচিত্র্যহীন। তবে সেখানেও দুএকটি পদে পল্লীবধূ-সুলভ স্নিগ্ধ রোমান্টিকতার আমেজে জ্ঞানদাস চমৎকারিত্ব দেখিয়েছেন। সেখানে বৃন্দাবনের কৃষ্ণরাধা যেন পল্লীবাংলার প্রেম-স্বপ্নমুগ্ধ দুটি কিশোর-কিশোরী হয়ে উঠেছেন।

নিকুঞ্জ বিজই শ্যাম রাধিকার সাথে।
রসের দীপিকা জ্বলে ললিতার হাথে ॥
আগে শ্যাম মাঝে রাই গমন মাধুরি।
তার পিছে দীপ হাতে ললিতা সুন্দরী ॥
আগমনে উত্তরিল যমুনার কূলে।
নাসিকা মাতিয়া গেল নানা গন্ধ ফুলে ॥
ফুল তুলিবারে কৃষ্ণ তরুপানে চায়।
সে ফুল পড়য়ে আসি রাধিকার পায় ॥
রাধার মনের মান ভাঙ্গিবার তরে।
পথে ফুল বিছাইয়া দিলেন নাগরে ॥
ফুলের উপরে রাই চরণ দিয়া যায়।
ঢলিয়া ঢলিয়া পড়ে নাগরের গায় ॥
বৃন্দাবনে রসরঙ্গে আনন্দে মগন।
জ্ঞানদাসেতে মাগে চরণে শরণ ॥ [৩৫৮]

মাথুর ও ভাবমিলনের পদ

(ট) সর্বকালের শ্রেষ্ঠ কবিরাই সেই অজ্ঞাতনামা প্রাচীন কবির সুরে সুর মিলিয়ে যুগে যুগে একই কথা বলে এসেছেন,—সঙ্গমবিরহবিকল্পে বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যাঃ।
সঙ্গমে সৈব তথৈকা ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং তদ্‌ বিরহে ॥

'মিলন বিরহ এ-দুয়ের মধ্যে বিরহই ভাল। মিলনে শুধু তার একটিমাত্র মূর্তি দেখা দেয়, বিরহে সমস্ত ভুবন তার রূপে তন্ময় হয়ে ওঠে।'

এ-তত্ত্ব মধ্যযুগের বৈষ্ণব কবিরাও সমগ্র অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন। সে-কারনেই তাদের কাব্য-কাহিনীর সমাপ্তি মাথুর-প্রবাস চিত্রণে। মাথুরের পদরচনায় বিদ্যাপতির আর্তি আর কোনও কবিই ফোটাতে পারেন নি। জ্ঞানদাসের দক্ষতা মাথুর চিত্রাঙ্কনে ততটা নয়, যতটা স্বপ্নমিলনের রোমান্টিক চিত্রাঙ্কনে বা আক্ষেপানুরাগের তন্ময় ভাবচিত্রণে। তবু কিছু কিছু পদে তার প্রতিভার উপযুক্ত পরিচয় মেলে। একটি ছোট পদে বিরহিনী রাধার অতি সংক্ষিপ্ত কিন্তু স্পষ্ট ও জীবন্ত চিত্র এঁকেছেন।—

সোনার বরণ দেহ।
পাণ্ডুর ভৈ গেল সেহ ॥

গলয়ে সঘনে লোর।
মুরছে সখিক কোর॥
দারুণ বিরহ জ্বরে।
সো ধনি গেয়ান হরে॥
জীবনে নাহিক আশ।
কহয়ে এ জ্ঞানদাস॥ [৪৪৩]

বর্ষাঋতুর সঙ্গে মিলন ও বিরহের যে নিবিড় যোগ রয়েছে সে কথা সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাস যেমন উপলব্ধি করেছিলেন তেমনি পরবর্তী যুগে কবি বিদ্যাপতি ও জ্ঞানদাসও বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন।[১] জ্ঞানদাসের স্বপ্নমিলনের রাতগুলি যেমন নিবিড় বর্ষণমুখর, তেমনি যেদিন প্রিয়তম কাছে না থাকায় বিরহের রাতগুলি পরম বেদনাময় তখনও বর্ষণমুখরতা।

জলধর অম্বর ছাডল রে, পাহুক ঋতু পরবেশ।
হেরি হেরি হিয়া ডাডরায়ল রে নাহ নাহিক নিজ দেশ॥ [৪৩৬]

বর্ষাঋতুর আগমনে জলধর সমস্ত অম্বর আচ্ছন্ন করেছে। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে রাধার হৃদয় টাটিয়ে উঠল। প্রিয়তম আজ ঘরে নেই। 'ডাডরায়ল রে' শব্দের ব্যবহারে রাধার হৃদয়বেদনা আরও মূর্ত হয়ে উঠেছে। পদটি শেষ করতে গিয়ে কবি বলছেন,

জগমাহা জলে জম্নু এক।
জ্ঞানদাস কহে পরতেখ॥

জলে জলময় সারা বিশ্ব যেন একাকার হল।—কিন্তু রাধার সঙ্গে প্রিয়তমের দূরত্ব ঘুচল কই! বর্ষাবিরহের আর একটি পদও উদ্ধৃতিযোগ্য।—

গগন ভরল, নব বারিদহে,
বরখা নব নব ভেল।
বাদর দরদর ডাকে ডাহুকী সব
শবদে পরাণ হরি নেল॥
চাতক চকিত, নিকটে ঘন ডাকই,
মদন বিজয়ী পিকরাব।

১। এই অনুভূতির পরবর্তী উত্তরাধিকার রবীন্দ্রনাথের হাতে এসেছিল বলা যেতে পারে।

মাস আষাঢ় গাঢ় বড় বিরহ
বরখা কেমনে গোঙাব ॥
... ...
উনমতি শকতি আরোপয়ে নিতি নিতি,
মনমথ সাধন লাগি।
ভাদর দরদর অন্তর দোলন,
মন্দিরে একলি অভাগী ॥ [৪৩৫]

'নব বারিদে গগন ভরে উঠেছে। নববর্ষা এল। দরদর ধারায় বর্ষা নেমেছে ডাহুকী ডাকছে, শব্দে (রাধার) প্রাণ হরণ করে নিল। চাতক চকিত হয়ে উঠেছে, কাছেই মদন বিজয়ী পিকরাব শোনা যাচ্ছে। আষাঢ় মাস, বিরহ প্রগাঢ়। বর্ষা কি করে কাটবে।... বুঝি মন্মথ তার (তান্ত্রিক শব-) সাধনের জন্য আমার দেহে প্রতিদিন উন্মত্ত শক্তি আরোপ করছে। ভাদ্রের দরদর ধারা বর্ষণ, হৃদয়ে (প্রেম বেদনার) দোলন। অভাগী মন্দিরে আজ একা!' শেষোক্ত উপমার চমৎকারিত্ব লক্ষনীয়। মন্মথই এখানে তন্ত্রাচারী হয়ে যেন রাধার দেহটিকে শবসাধনার জন্য আজ নিষ্প্রাণ করে তুলেছেন।

ভাবমিলনের তত্ত্বগত যে ব্যাখ্যাই থাকুক, কাব্যগত দিক থেকে এটি প্রবাসেরই আরও বিষাদময় পরিণতি বলা চলে। প্রিয়তমের বিরহে নায়িকা উন্মাদিনী হয়েছেন এবং সেই বাহ্য চৈতন্যের বিলুপ্তির জন্যই প্রিয়তমের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন এমন কল্পনা করেছেন। বিরহোন্মাদিনী রাই-এর এই বিষাদময় রূপটি কাব্য-রসগত দিক থেকে ট্রাজিক বেদনাবোধের সৃষ্টি করে। জ্ঞানদাস এই পর্যায়ের দু-তিনটি পদ লিখেছেন।

ভাবসম্মেলন

একটি পদে রাধা প্রভাতে স্বপ্ন দেখেছেন প্রিয়তম আসবেন। অন্যান্য দিকেও শুভ লক্ষণ :—

প্রভাত সময়ে কাক ফুকারিয়া
আহার বাঁটিয়া খায়।
পিয়া আসিবার বচন কহিতে
তাহিঁ আন থলে যায় ॥

কিন্তু সেখানেও স্বপ্ন-মিলনের আশ্বাস এবং জাগরণের আশাভঙ্গ।—

নিশি অবশেষে কান্দিতে কান্দিতে
নিঁদ আওল আঁখে।

বুকে দুটি হাত　　হৈয়া অতি ভীত
দাঁড়াইলা সম্মুখে ॥
চমকি উঠিয়া　　কোরে আগোরিতে
চেতন হইল মোর।
মূরছি পড়িতে　　নিকটে বিশাখা
আমারে করিল কোর ॥　　[৪৫১]

'প্রভাতে কাক কলরব করে আহার ভাগ করে খেল (শুভসূচক)। আমার প্রিয়তম আসবে খবরটি ছড়িয়ে দিতে যেন অন্যত্র উড়ে গেল।—সারা নিশি কেঁদে কাটিয়ে ভোরের দিকে চোখে ঘুম এল, স্বপ্ন দেখলাম (প্রভাতী স্বপ্ন সত্য হয় বলে প্রবাদ), প্রিয়তম যেন অপরাধীভাবে বুকে দুটি হাত জোড় করে সামনে এসে দাঁড়াল। চমকে উঠে তাকে কোলে নিতে গিয়ে ঘুম ভেঙে গেল। মূর্ছিত হয়ে পড়ে যেতে দেখে বিশাখা ধরে কোলে করল'।

—এ-ও আসলে মিলন নয়, আরও গভীরতর বিরহ। তবু আশা,—

অচিরে পূরব আশা।
বন্ধুয়া মিলব পাশ ॥

তখন রাধার ইচ্ছা তাঁকে এই-দুঃখের কথা বলবেন,—

কিছু গদ-গদ স্বরে।
একথা কহিব তারে ॥
শুনিয়া দুখের কথা।
মরমে পাইবে বেথা ॥···[৪৫২]

সেই প্রিয়তম রাধার জীবনে মর্ত-বৃন্দাবনে আর এলেন না,—ভাব-সম্মেলনে রাই উন্মাদিনী তাকে পেলেন। সে পাওয়ার বেদনা-মাধুর্য কৃষ্ণকেই রাধা জানিয়েছেন,—

শুন শুন হে পরাণ পিয়া।
চির দিন পরে　　পাইয়াছি লাগি
আর না দিব ছাড়িয়া ॥
তোমায় আমায়　　একই পরাণ
ভালে সে জানিয়ে আমি।
হিয়ায় হইতে　　বাহির হইয়া
কিরূপে আছিলে তুমি ॥···[৪৫৩]

বলতে বলতে দুঃখিনী রাধা অচৈতন্য হয়ে—(শ্যামের ক্রোড়েই যেন) ঢলে পড়লেন। ভাববিভোর ভক্তকবিও তখন দেখছেন,—'রসিক নাগর ভাসিল নয়ান-লোরে।' এ-দেখার মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসতত্ত্বের দার্শনিক ব্যাখ্যা লুকিয়ে রয়েছে, তবে কবিত্বের দিক থেকে এটি মাথুরেরই ট্র্যাজিক পরিণতি চিত্র।

পালাভাগে জ্ঞানদাসের পদ বিশ্লেষণ এখানেই শেষ করা যেতে পারে। পদাবলীর ছন্দ ও অলঙ্কার পৃথকভাবে আলোচনার বিষয়। পৃথক একটি অধ্যায়ে সে আলোচনা পরে করা হয়েছে। এখানে প্রাসঙ্গিক দু-একটি উদাহরণ তোলা যেতে পারে।

জ্ঞানদাসকে জয়দেব, বিদ্যাপতি বা গোবিন্দদাসের মত ছন্দ-সচেতন কবি বলা চলে না। তবে স্বভাবদত্ত ছন্দ-সৌকর্যে তাঁর পদগুলি সার্থক হতে পেরেছে।

ছন্দ-বৈশিষ্ট্য

তিনি মুখ্যতঃ বাংলা পদে অক্ষরবৃত্ত এবং ব্রজবুলি পদে মাত্রাবৃত্ত ব্যবহার করেছেন। এখানে বিভিন্ন ছন্দবন্ধের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল।—

(১) অক্ষরবৃত্ত : দীর্ঘ ত্রিপদী : ৮ ॥ ৮ ॥ ১০ I মাত্রা।[১]

একা কুম্ভ কাখে করি ॥ যমুনাতে জল ভরি ॥
জলের ভিতর শ্যামরায় I
ফুলের চূড়াটি মাথে ॥ মোহন মুরলী হাতে ॥
পুন কানু জলেতে মিশায় I [২৬৭]

(২) অক্ষরবৃত্ত : পয়ার : ৮ ॥ ৬ I মাত্রা।

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে ॥ গুণে মন ভোর I
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে ॥ প্রতি অঙ্গ মোর I [২৭০]

(৩) মাত্রাবৃত্ত : ষন্মাত্রপর্বিক চৌপদী : ১২ ॥ ১২ ॥ ১২ ॥ ১০ I

কষিল কনক। রুচির গৌর ॥ অখিল ভুবন। মরম চৌর ॥
করভ শুন্ত। বাহু-দন্ত ॥ কল্মষ তাপ। ত্রাসনি I
প্রচুর পুলক। শোভিত অঙ্গ ॥ নটন লীলা। অধিক রঙ্গ ॥
বয়ান শরদ। পুণিম ইন্দু ॥ সরস হাস। ভাষনি। I
[২১]

১। চিহ্নার্থ লঘু- বা পর্বযতি। মধ্য- বা দযতি ॥, পূর্ণ- বা পংক্তিযতি I

(৪) মাত্রাবৃত্ত : চতুর্মাত্র-পর্বিক দ্বিপদী : ৮।।৮ I মাত্রা।

চন্দনে । রঞ্জিত ।। করু কুচ । কুম্ভ I
দুধে সি । নায়ল ।। কাঞ্চন । শম্ভু I
বেশ ব । নাইতে ।। না পাই । ডর I
জ্ঞান দাস কহ ।। ভয়ে নহ । ভোর I [১৯৩]

(৫) দলবৃত্ত : চতুর্মাত্র-পর্বিক পয়ার : ৮ ।। ৬ I মাত্রা।

নয়ন কোণের । অলখবাণে । হিয়ার মাঝে । কাঁপ I
মুখের ছান্দে । মরম কান্দে । অইস মনে । জাপ I [২৩৬]

এ-পদটি সমগ্রভাবে দেখলে আর বিশুদ্ধ দলমাত্রিক রীতির বলা চলে না। কোথাও মাত্রাবৃত্ত কোথাও বা অক্ষরবৃত্ত উচ্চারণভঙ্গি এসেছে। এত শিথিল ছন্দবন্ধের কবিতা জ্ঞানদাস লিখেছেন কিনা সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। তাছাড়া সমগ্র জ্ঞানদাস পদাবলীতে দলবৃত্ত উচ্চারণ এই একটি কবিতার প্রথম চারপংক্তিতে রয়েছে, তাতেও পদটির অকৃত্রিমতা সম্পর্কে সন্দেহ জাগে।

(৬) সংস্কৃত তোটক ছন্দের আদর্শ : লঘু-লঘু-গুরু ত্রিদলবিন্যাসের চতুষ্পর্ব পংক্তি।—

◡ ◡ — ◡ ◡ — ◡ ◡ — ◡ ◡ —
ক ল ধৌ ত ক লে ব র গৌ র ত নু।
তছু সঙ্গ ও রঙ্গ নিতাই জনু ।। [৫০৩]

এটিও জ্ঞানদাসের রচনা কিনা সন্দেহের বিষয়। জ্ঞানদাসের সময়ে সচেতন ভাবে সংস্কৃত লঘু-গুরু সুনির্দিষ্ট উচ্চারণরীতির বাংলা পদ লেখার রেওয়াজ হয়নি। জ্ঞানদাসের ভনিতাতেও এমন পদ একটি মাত্রই মিলছে।

আট মাত্রা, দশ মাত্রা বা এগার/বারো মাত্রার (একাবলী) পংক্তি-বিন্যাসেও জ্ঞানদাস পদ রচনা করেছেন। প্রাকৃত নরেন্দ্রবৃত্ত রীতিরও (৭ ।। ৯ ।। ১১/১২) ছন্দবন্ধ ব্যবহার করেছেন। মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্তের লঘুত্রিপদী (৬।৬।৮/৯) ব্যবহার করেছেন। এ সকল ছন্দবন্ধেও কবি শব্দগ্রন্থনে, যতিস্থাপনে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। তার আর উদাহরণ তুলছিনা।

অলঙ্কার

অলঙ্কার বৈষ্ণব কবিদের ভাষায় অনেকটা শ্বাসপ্রশ্বাসের মতই স্বাভাবিক ভাবে এসেছে। বিদ্যাপতি বা গোবিন্দদাসের মত আঙ্গিক-সচেতন কবি না হলেও জ্ঞানদাসও অলঙ্কার ব্যবহারে স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছেন। এখানে কয়েকটি উদাহরণ তোলা গেল।—

(১) উপমা : কানুর পিরীতি কহিতে শুনিতে পরাণ ফাটিয়া ওঠে।
শঙ্খবণিকের করাত যেমন আসিতে যাইতে কাটে ॥ [৭০]

(২) উৎপ্রেক্ষা (প্রতীয়মান) :

মো হইলাম সোনার গাছ দানীত না ছাড়ে পাছ
ডালে মূলে নিবে উপাড়িয়া। [৩২৮]

শ্রীরাধা দানলীলার পদে দানীরূপী কৃষ্ণ সম্পর্কে এই মন্তব্য করেছেন।

উৎপ্রেক্ষা (বাচ্য) :

চোরের রমনী যেন ফুকরিতে নারে।
এমতি রহিয়ে পাড়া পড়সীর ডরে ॥ [৬৮]

(৩) ব্যতিরেক :

মুখছান্দে প্রাণ কান্দে পাতএ অঞ্জলি। [৬৯]

(৪) ভ্রান্তিমান :

একা কুম্ভ কাখে করি যমুনাতে জলভরি
জলের ভিতর শ্যামরায়
ফুলের চূড়াটি মাথে মোহন মুরলী হাতে
পুন কানু জলেতে মিশায় ॥ [২৬৭]

সমগ্র পদটিই ভ্রান্তিমান অলঙ্কারের ভিত্তিতে রচিত হয়েছে।

(৫) শ্লেষগর্ভ বক্রোক্তি :

ভাল ভেল মাধব সিদ্ধিভেল কাজ।
অব হাম বুঝলুঁ বিদগধ রাজ ॥
নয়নক কাজর অধরক শোভা।
বান্ধি রাখল অতি অতি মনোলোভা ॥ [৩৮৪]

(৬) অতিশয়োক্তি ও রূপক :

যে চাঁদের সুধাদানে জগত জুড়াও।
সে চাঁদ বদনে কেন আমারে পোড়াও ॥ [৩৯৪]

এখানে প্রথম চাঁদ অতিশয়োক্তি, পরের চাঁদ-বদন রূপক,—আবার চাঁদের সুধা (স্নিগ্ধতা) অতিশয়োক্তি এবং 'চাঁদবদনে পোড়াও' অসঙ্গতি অলঙ্কার। স্বতঃস্ফূর্তভাবে কবির ভাষায় অলঙ্কারের দ্যুতি ঝলসে উঠেছে। অসঙ্গতির পৃথক আর একটি উদাহরণ দেওয়া যাক।—

(৭) অসঙ্গতি :

আর অপরূপ কহিল নহে।
যথা মেঘ তথা বারি না রহে ॥
হৃদয় আকাশে উদয় করি।
নয়ন যুগলে বহায় বারি ॥ [২৯৭]

এখানেও আবার 'হৃদয়-আকাশ' রূপক অলঙ্কারের উদাহরণ।

(৮) বিসম :

কনকাচল যব ছায়া ছোড়ল
হিমকর বরিখয়ে আগি।
দিনকলে দিনকর শীত না নিবারল
হাম জীয়ব কথি লাগি ॥ [১৫৬]

'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু' (৪৯৬) পদটিও বিসম অলঙ্কারের একটি সার্থক উদাহরণ। তবে পদটি চণ্ডীদাসের না জ্ঞানদাসের সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।

(৯) আবৃত্তি :

তুয়া অনুরাগে হাম নিমগন হইলাম।
তুয়া অনুরাগে হাম গোলক ছাড়িলাম ॥
তুয়া অনুরাগে হাম কাননে ধাই।
তুয়া অনুরাগে হাম ধবলী চরাই ॥
তুয়া অনুরাগে হাম পরি নীল শাড়ী।
তুয়া অনুরাগে হাম পীতাম্বর ধারী ॥ [২৬১]

(১০) দৃষ্টান্ত (মালা) :

সজনী নিকরুণ হৃদয় তাহারি।
অব ঘর যাইতে ঠাম নাহি পাইয়ে
পরিজন পাড়য়ে গারি ॥
কৌতুকে দুহুঁ কুল কমল তেয়াগলু
সো পদ পঙ্কজ আসে।
পাউথক মীন দীন যৈছে লাগল
না গুণল মরণ আসে ॥

গগনক চন্দ পানি তলে বারলুঁ
সাগরে নগর বেভার।
অমিয়া ঘটভরি হাথ গসারলুঁ
বাঢ়ল গরলক ধার।। [৩১০]

এই সামগ্রিক মালাদৃষ্টান্তের উদাহরণে স্বাদ-বৈচিত্র্যের জন্য মাঝে মাঝে রূপক (কুল-কমল, পদ-পঙ্কজ), বিষম (অমিয়া ঘটভরি...ধরে) প্রভৃতি অলঙ্কারের মশলা মিশ্রিত হয়েছে। সব শেষে পৃথক ভাবে রূপকের একটি উদাহরণ তুলে এ প্রসঙ্গ শেষ করা যেতে পারে।—

(১১) রূপক (মালা):

হিয়ার মাঝারে প্রেম-অঙ্কুর পশিল।
দিনে দিনে বাড়ি সেই বিরিখি হইল।।
ফল-ফুল কালে এবে পড়িল বিপত্তি। [২৮১]

অলঙ্কার ব্যবহারে বৈষ্ণব কবিরা যে সর্বদা সচেতন থাকতেন এমন নয়। কবিদের একটি বিশিষ্ট ভাষারীতি, অলঙ্করণ ও ছন্দ প্রয়োগের আদর্শ তৈরী হয়ে গিয়েছিল। অনেক সময় স্বতোৎসারিত ভাবেই গতানুগতিক ধারায় অজস্র অলঙ্কার তারা ব্যবহার করতেন। তবু তার মধ্যে কবির কবিত্বের মৌলিকত্ব দেখা যেত। জ্ঞানদাসের রাধাকে সোনার গাছের সঙ্গে বা চোরের রমনীর সঙ্গে তুলনার মধ্যে সেই মৌলিক উপমার চমৎকারিত্ব রয়েছে, সমগ্র এক একটি পদে কখনো ভ্রান্তিমান, কখনো বিষম, কখনো বা দৃষ্টান্তের মাল্য রচনার মধ্যেও কবিত্বের বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

জ্ঞানদাস-পদাবলীর একটি দোষের উল্লেখ প্রায় সমস্ত সমালোচকই করেছেন। তিনি কবিত্ব-প্রতিভার উচ্চমান সর্বত্র রক্ষা করতে পারেননি। এমনকি এরূপ দৃষ্টান্তও রয়েছে যে একই পদের সকল পংক্তিতে কবিত্বের স্ফুরণ সমভাবে হয়নি। মাঝে মাঝে কবিত্বের দ্যুতি বিদ্যুচ্চমকের মত প্রদীপ্ত হয়ে উঠলেও পরক্ষণেই আবার যেন নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে। এ অভিযোগ অস্বীকার করা চলে না সত্য, তবে তার জন্য কবির প্রতিভাকে নিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে আনা ঠিক হবে না। মনোযোগী পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন যে রবীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যেও এমন কিছু কিছু নিদর্শন রয়েছে যেগুলি

কবিপ্রতিভার স্বরূপ

ঠিক তাঁর নামের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। আরও দুএকটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। কবি জ্ঞানদাসের প্রাথমিক ও পরিণত রচনা পৃথকভাবে বিন্যস্ত করা সম্ভবপর নয়। সেদিক থেকেও এমন অভিযোগের দ্বারা তাঁর প্রতিভার প্রতি অবিচারের আশঙ্কা থেকে যায়। তাছাড়া একটি ধর্মগোষ্ঠী ভুক্ত হয়ে কোনও ভক্তকবি যখন পদ রচনা করতে বসেন সেখানে সর্বত্র কবিত্বের উৎকর্ষ প্রত্যাশা করা যায় না। বহু ক্ষেত্রেই পালাগানের প্রয়োজনে, তত্ত্বগত সঙ্গতি রক্ষার প্রয়োজনে কবিকে ফরমায়েসী পদ রচনা করতে হয়েছে। এই প্রতিবন্ধকতাকে বহুলাংশে অতিক্রম করে লিরিক প্রেম বেদনার এক বিশিষ্ট অনুভূতিকে জ্ঞানদাস যে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন সেখানেই বৈষ্ণব কবিগোষ্ঠী থেকে তার স্বাতন্ত্র্য। কবির পদ বিচারে এই কথাটি মনে রাখলেই তাঁর প্রতি সুবিচার করা সম্ভবপর।

———

কবি গোবিন্দদাস কবিরাজ

পদাবলী সাহিত্যে অন্ততঃ চারজন গোবিন্দদাসের উল্লেখ পাওয়া যায়। কবিকর্ণপুর তাঁর 'গৌর গণোদ্দেশদীপিকায়' (১৫৭৬) যে 'আচার্য শ্রীল গোবিন্দো-গীত পদ্যাদি কারকঃ' সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন তিনি সম্ভবতঃ চৈতন্য-সমকালীন কবি গোবিন্দ আচার্য। ড. বিমানবিহারী মজুমদার 'গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ' গ্রন্থে (১৯৬১) গোবিন্দ আচার্যের রচিত বলে ৩২টি পদ নির্দেশ করেছেন। গোবিন্দ চক্রবর্তী নামে একজন কবির নাম পাওয়া যায়। তিনি সম্ভবতঃ প্রখ্যাত কবি গোবিন্দদাসের সমকালীন এবং একই গুরু শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য ছিলেন। উক্ত গ্রন্থে ড. মজুমদার ২৪টি পদ গোবিন্দ চক্রবর্তীর রচনা বলে নির্দেশ করেছেন। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মিথিলার কবি গোবিন্দদাস ঝাঁর উল্লেখ করে তাঁকেই প্রখ্যাত গোবিন্দদাস ভণিতার ব্রজবুলি পদগুলির পদকার হিসাবে গ্রহণ করেন। এই অনুমানের অসারতা সতীশচন্দ্র রায় যুক্তিসহকারে প্রতিপন্ন করেছিলেন। অধুনা ড. মজুমদার উক্ত গ্রন্থেও এ সম্পর্কে মূল্যবান আলোচনা করে লোচনকবির রাগতরঙ্গিনী থেকে গোবিন্দদাস ঝাঁ-এর মাত্র দুটি পদ উদ্ধৃত করেছেন।

শ্রীখণ্ডের দামোদর কুলের ভক্তকবি গোবিন্দদাস কবিরাজ চৈতন্য-পরবর্তী বৈষ্ণব পদাবলী কাব্যের মধ্যমণি স্বরূপ। তিনি ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে

কবি-পরিচয়

সম্ভবতঃ তৃতীয় চতুর্থ দশকের কোনও সময়ে (১৫৩৭ ?)[১] জন্মেছিলেন এবং সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয় দশক (১৬১৩/১৪ ?)[১] পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। নরহরি চক্রবর্তী 'ভক্তিরত্নাকরে' কবি-পরিবারের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন,

রামচন্দ্র গোবিন্দ এ দুই সহোদর
পিতা চিরঞ্জীব মাতামহ দামোদর ॥

১। জগবন্ধু ভদ্র গৌরপদ-তরঙ্গিনীর ভূমিকায় এই তথ্য দিয়েছেন। এটি পুরোপুরি প্রামাণিক বলে গ্রহণ করা কঠিন। গোবিন্দদাসের সমকালীন বলরামদাস তাঁর প্রেমবিলাস গ্রন্থে যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে মনে হয় আনুমানিক ৪০ বছর বয়সে গোবিন্দদাস শ্রীনিবাসের কাছে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নেন এবং তারপর ৩৬ বৎসরকাল জীবিত ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত বৈষ্ণব-পদগুলি এই সময়েই লিখিত হয়েছে। এ বিষয়ে 'গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ' গ্রন্থে ড. মজুমদারের আলোচনা (পৃ. ৩৯৫-৪০৭) দ্রষ্টব্য।

দামোদর সেনের নিবাস শ্রীখণ্ডেতে।
যেহোঁ মহাকবি নাম বিদিত জগতে ।।

গোবিন্দদাস কবিরাজের সমসাময়িক নিত্যানন্দ-শিষ্য বলরাম দাসের 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থ থেকে জানা যায়,[1] তিনি প্রথম শক্তি-উপাসক ছিলেন।| ছোটবেলায় মামাবাড়ীতে শাক্ত পরিবেশে মানুষ হয়েছিলেন বলেই এটা হয়েছিল মনে হয়। তিনি গ্রহণী রোগে মরণাপন্ন হলে তাঁর দাদা কৃষ্ণ-ভক্ত রামচন্দ্রের প্রভাবে শ্রীনিবাসের কাছে দীক্ষা নিয়ে বৈষ্ণব হন। তাঁর প্রকৃত সাহিত্য-প্রতিভার বিকাশ এর পরই হয়েছিল এবং দীর্ঘ ৩৬ বৎসরকাল ধর্মসাধন ও কাব্যচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। প্রেমবিলাসের বিবরণ হল,—

যে কালে আশ্রয় কৈল প্রভুর চরণ।
কিবা আছিল তার হইতে মরণ ।।
কতেক সাধন কৈল কতেক বর্ণন।
এইরূপে ছত্রিশ বৎসর করিল যাপন ।। [১৪ বিলাস]

গোবিন্দদাসের কবিত্বে মুগ্ধ হয়ে শ্রীনিবাস তাঁকে কৃষ্ণলীলার পদ রচনা করতে আদেশ দেন এবং বাসুদেব ঘোষ ইতিপূর্বেই গৌর-লীলার সুন্দর পদ রচনা করেছেন বলে তাঁকে গৌর-লীলার পদ রচনা থেকে নিবৃত্ত করেন। তাঁর কবিত্বে চমৎকৃত হয়ে শ্রীজীব প্রমুখ বৃন্দাবন-গোস্বামীবৃন্দ তাঁকে গান রচনা করে পাঠাতে উৎসাহিত করতেন; তাঁরাই গোবিন্দদাসকে 'কবিরাজ' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। ড. মজুমদার তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত উক্ত গ্রন্থটিতে গোবিন্দদাস কবিরাজ ভণিতার ৭২৮টি পদ সংকলন করেছেন। তার অধিকাংশই বিদ্যাপতি-আদর্শের 'ব্রজবুলি' ভাষায় রচিত। অল্প কিছু সংখ্যক বাংলা পদও রয়েছে। রাধামোহন ঠাকুর 'পদামৃতসমুদ্রে' উদ্ধৃত গোবিন্দদাস ভণিতাযুক্ত যে পদগুলি গোবিন্দদাস কবিরাজের বলে নির্দেশ করেছেন সেগুলি সবই ব্রজবুলি পদ। বিশুদ্ধ বাংলাপদ অধিকাংশই তিনি গোবিন্দ চক্রবর্তীর বলে ধরেছিলেন। এ-প্রবন্ধে ড. মজুমদারের ভণিতা নির্দেশই গ্রহণ করা হল।

বিদ্যাপতির শিষ্যত্ব

গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির ন্যায় সুপণ্ডিত কবি ছিলেন। তিনি শ্রীধরদাসের 'সদুক্তিকর্ণামৃত' এবং রূপ গোস্বামীর 'পদ্যাবলী' দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন সে বিষয়েও সন্দেহ নেই। তবে পদ-রচনাদর্শে তিনি বিদ্যাপতিকেই গুরুরূপে গ্রহণ করেছিলেন। বিদ্যাপতি

বন্দনায় তাঁর দুটি পদ রয়েছে। একটি পদের সূচনায় লিখেছেন,—

বিদ্যাপতি-পদ যুগলসরোরুহ-
নিস্যন্দিত মকরন্দে।
তছু মঝু মানস মাতল মধুকর
পিবইতে করু অনুবন্ধে॥

হরি হরি আর কিয়ে মঙ্গল হোয়।
রসিক-শিরোমণি নাগর-নাগরী-
লীলা স্ফুরব কি মোয়॥ [৪৫][১]

'বিদ্যাপতির যুগল পদ-কমল থেকে মধু নিঃসৃত হচ্ছে। আমার মন মধুকর সেই মধু পান করে মত্ত হয়ে উঠেছে। হরি হরি! আর কি আমার মঙ্গল হবে! রসিক শিরোমণির (বিদ্যাপতিকে পরম কৃষ্ণভক্ত রূপে দেখেছেন কবি) নাগর-নাগরী লীলা কি আমার মধ্যে স্ফুরিত হবে!'

আর একটি পদে লিখেছেন,—

কবি-পতি বিদ্যাপতি মতি মানে।
লাখ গীতে জগচীতে চোরায়ল
গোবিন্দ-গোবি-সরস-রস-গানে।
ভুবনে আছয়ে যত ভারতি-বাণি।
তাকর সার সার পদ সঞ্চয়ে
বান্ধল গীত কতহুঁ পরিমাণি॥
যো সুখ-সম্পদে শঙ্কর ধনিয়া।
সো সুখ সার সার সব রসিকক
কণ্ঠহিঁ কণ্ঠ পরায়ল বলিয়া।
আনন্দে নারদ না ধরয়ে থেহা।
সো আনন্দ-রস জগভরি বরিখল
সুখময় বিদ্যাপতি-রস-মেহা॥

১। বন্ধনী মধ্যস্থ পদ সংখ্যা ড. বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত 'গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ' গ্রন্থের পদ সংখ্যা নির্দেশক।

যত যত রস-পদ করলহি বন্ধে।
কোটি হুঁ কোটি শ্রবণ যব পাইয়ে
শুনইতে আনন্দে লাগয়ে ধন্দে ॥
সো রস শুনি নাগর বর-নারি।
কিয়ে কিয়ে করিয়া চীত চমকাওই
ঐছন রসময় চম্পূ বিথারি ॥
গোবিন্দদাস মতি-মন্দে।
এত সুখ-সম্পদ কহইতে আনমন
যৈছন বামন ধরবহি চন্দে ॥ [৪৬]

'মতিমান কবি বিদ্যাপতি লক্ষ গীতে গোবিন্দ ও গৌরীব (শ্রীরাধার) সরস রসগান করে জগজ্জনেব চিত্ত চুরি করেছেন। ভুবনে যত শ্রেষ্ঠ কবিদেব বাণী রয়েছে, তার সাব সঞ্চয় কবে কত পরিমাণ গীত রচনা করলেন। যে সুখসম্পদে শঙ্কব ধনী সেই সুখের সার শ্রেষ্ঠ বসিকদের কণ্ঠে পরিয়ে দিলেন (এখানে বিদ্যাপতির শৈব গীতির উল্লেখ কবেছেন অনুমতি হয়)। আনন্দে নারদ আর ধৈর্য ধরতে পারেন না। বিদ্যাপতি-রূপ রসময় মেঘ সেই আনন্দ জগৎ ভরে বর্ষণ করলেন। তিনি যত যত রসময় পদ রচনা করলেন, কোটি শ্রবণ পেলেও তা শুনে আনন্দের ধন্দ ঘোচে না। সেই রসগান শুনে কৃষ্ণ রাধা কি অপূর্ব, কি অপূর্ব বলে চমৎকৃত হলেন,—সেই রসময় চম্পূর বিস্তার এমন। মন্দমতি গোবিন্দদাস, এত সুখসম্পদ থাকতেও আবার কিছু বলতে চান,—এ যেন বামন হয়ে চাঁদ ধরার প্রয়াস।'

লক্ষনীয়, উভয় পদেই গোবিন্দদাস বিদ্যাপতিকে রাধাকৃষ্ণ লীলার ভক্ত গায়ক রূপে গণ্য করেছেন এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবাদর্শে পূর্বসূরী ভক্তকবির কৃপা প্রার্থনা করেছেন।

গোবিন্দদাস অবশ্য আরও দুটি পদে কবি জয়দেবের এবং একটি পদে কবি চণ্ডীদাসের বন্দনা করেছেন। তাছাড়া গুরু শ্রীনিবাসের, ঠাকুর নিত্যানন্দ ও নরোত্তমের বন্দনা-সূচক কয়েকটি পদও তাঁর রয়েছে। গোবিন্দদাস আরও অন্ততঃ সাতটি পদে বিদ্যাপতির নাম উল্লেখ করেছেন এ-প্রসঙ্গে সে কথাও স্মরণ যোগ্য।

এবারে গোবিন্দদাসের পদগুলির শ্রেণী-বিন্যাস অনুসারে আলোচনা করা

যেতে পারে। শ্রীনিবাস নিবৃত্ত করাতে গোবিন্দদাস গৌরাঙ্গলীলার পদ বেশী রচনা করেননি, তবে কয়েকটি পদে যে কবিত্বের উৎকর্ষ দেখিয়েছেন তাতে আক্ষেপ হয়, তাঁর হাত থেকে অনুরূপ আরও পদ যদি পাওয়া যেত! গৌরচন্দ্রিকা বা গৌরাঙ্গলীলা বিষয়ক কবির বিয়াল্লিশটি পদ ডঃ মজুমদারের সংকলনে সংগৃহীত হয়েছে। একটি পদে ভাগীরথী তীরবতী নবদ্বীপের কিশোর গৌরাঙ্গের (কৃষ্ণ রাধার যুগল রূপালেখ্য) লীলারূপের চিত্রাঙ্কন করেছেন,—

গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ

নীরদ নয়নে নীরঘন সিঞ্চনে
পুলক মুকুল অবলম্ব।
স্বেদ মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকশিত ভাবকদম্ব ॥
কি পেখলুঁ নটবর গৌর কিশোর।
অভিনব হেম- কল্পতরু সঞ্চরু
সুরধুনি তীরে উজোর ॥ ধ্রু ॥
চঞ্চল চরণ কমলতলে ঝঙ্করু
ভকত ভ্রমরগণ ভোর।
পরিমল লুব্ধ সুরাসুর ধাবই
অহনিশি রহত অগোর ।
অবিরত প্রেম রতন ফল বিতরণে
অখিল মনোরথ পূর।
তাকর চরণে দীনহীন বঞ্চিত
গোবিন্দদাস রহু দূর ॥ [১১]

'নয়ন-মেঘের অবিরল জলসিঞ্চনে পুলক-মুকুল উদগত হচ্ছে।—তার থেকে বিন্দু বিন্দু স্বেদ-মধু নির্গত হচ্ছে। ভাব-কদম্ব বিকশিত হল। নটবর গৌরকিশোরকে কি অপরূপ দেখলাম। সুরধুনী তীর উজ্জ্বল করে অভিনব হেম-কল্পতরু সঞ্চরণ করছে। তাঁর চঞ্চল চরণ-কমল-তলে ভক্ত-ভ্রমরেরা বিভোর হয়ে ঝঙ্কার তুলছেন। দেবতা ও অসুরেরা সেই কমল-পরিমলে লুব্ধ হয়ে ছুটে এসেছেন, অহর্নিশি বিভোর হয়ে তারা পড়ে রয়েছেন সেখানে। অবিরত প্রেম-রত্নফল বিতরণ করে অখিল

জীবের মনোরথ পূর্ণ করেছেন তিনি। এমন পরম করুণাময়ের চরণে বঞ্চিত দীনহীন গোবিন্দদাসই দূরে পড়ে রইলেন।'

ভক্তিভাবের সঙ্গে এখানে অপূর্ব শিল্পদৃষ্টি, উপমা-অলঙ্করণ, ভাষা ও ছন্দের নৈপুণ্যে সংমিশ্রিত হয়ে শ্রীচৈতন্যের একটি সজীব ভাবমূর্তি অঙ্কিত হয়েছে।

নবদ্বীপচন্দ্রের প্রেমাকুলতার আর একটি চিত্ররূপ উদ্ধৃত করি।—

পতিত হেরি কান্দে থীব নাহি বান্ধে
করুণ নয়ানে চায়।
নিরুপম হেমজিনি উজোর গোরাতনু
অবনী ঘন পড়ি যায়॥
গৌরাঙ্গেব নিছনি লইয়া মরি।
ও রূপমাধুরী পিরীতি চাতুরী
তিল আধ পাশরিতে নাবি॥ ধ্রু॥ [৮]

রাধার কৃষ্ণানুরাগের যে চিত্র চৈতন্যোত্তব বৈষ্ণব কবিগণ অঙ্কিত করেছেন—তার পিছনে প্রেমভাবাকুল গৌরাঙ্গের এই চিত্ররূপটিই ছিল। গৌরচন্দ্রিকার এ-পদে তারই সার্থক রূপ পবিস্ফুট করেছেন কবি।

বিরহ চিন্তাক্লিষ্ট রাধারূপের আলেখ্যে শ্রীচৈতন্যের যে মূর্তি কবি এঁকেছেন তাবও অপূর্ব সৌন্দর্য লক্ষণীয়।—

কাহে পুন গৌর কিশোর।
অবনত মাথে লিখত মহি মণ্ডল
নয়নে গলয়ে ঘন লোর।
কনক ববণ তনু ঝামব ভেল জনু
জাগরে নিন্দ নাহি ভায়।
মলিন বদনে কাহে পুন ইতি উতি
ছল ছল লোচনে চায়॥
খেনে খেনে বদন পানি তলে ধারই
ছোড়ই দীঘ নিশাস।
ঐছন চরিতে তারল সব নরনারী
বঞ্চিত গোবিন্দ দাস॥ [৩১]

'গৌর কিশোর অবনত মস্তকে ধরণীতে কি লিখছেন, নয়নে তার অশ্রু ঝরছে। স্বর্ণ বরণ দেহ মলিন (ঝামর) হয়েছে ; জাগরণে সময় কাটে, ঘুম আসেনা চোখে। মলিন বদনে, ছলছল লোচনে কেন এদিক ওদিক চান। খনে খনে বদন জলধারায় আপ্লুত হয়, তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়েন। এই ভাবে তিনি সমস্ত নর নারীকে উদ্ধার করলেন,—গোবিন্দদাসই বঞ্চিত রইল।'

গৌরচন্দ্রিকা-পদে কবির চিত্র-রূপায়ণের অসাধারণ দক্ষতার আর একটি উদাহরণ তুলে প্রসঙ্গান্তরে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে। গৌরাঙ্গের রূপ-গরিমা এবং প্রেম-গৌরব-লাবণ্যের চিত্রায়ণে কবি লিখেছেন,—

চম্পক শোন- কুসুম কনকাচল
জিতল গৌর-তনু-লাবণি রে।
উন্নত গীম সীম নাহি অনুভব
জগ-মনোমোহন ভাঙনি রে॥

জয় শচীনন্দন রে।
ত্রিভুবন-মণ্ডল কলিযুগ-কাল-
ভুজগ-ভয়-খণ্ডন রে॥

বিপুল পুলককুল- আকুল কলেবর
গরগর অন্তর প্রেম-ভরে।
লহু লহু হাসনি গদগদ ভাষনি
কত মন্দাকিনী নয়নে ঝরে॥

নিজ-রসে নাচত নয়ন ঢুলায়ত
গাওত কত কত ভকতহি মেলি।
যো রসে ভাসি অবশ মহিমণ্ডল
গোবিন্দ দাস তহিঁ পরশ না ভেলি॥ [৩]

'গৌর দেহের লাবণ্য চম্পক, শোণফুল ও কনক গিরিকে পরাজিত করেছে, উন্নত গ্রীবা-দেশের সৌন্দর্য-সীমা ধারণাতীত ; জগত মনোমোহন তার ভঙ্গি। শচীনন্দনের জয়। ত্রিভুবনের অলঙ্কার স্বরূপ কলিযুগরূপ কালভুজঙ্গের ভয় তিনি খণ্ডন করেছেন। সকল দেহ প্রেমে পুলক-রোমাঞ্চিত ; প্রেমে অন্তর ভরপুর। মৃদু মৃদু হাসেন গদ গদ কথা বলেন, নয়নে কত মন্দাকিনী ঝরে। আপন

প্রেম রসে নাচেন, নয়ন ঢুলান, ভক্তগণ সহ কত গান করেন। যে প্রেমরসে পৃথিবী বশ হয়েছিল, গোবিন্দদাস তার সামান্য স্পর্শ টুকুও পেলেন না।'

গোবিন্দদাস শ্রীবাস ও নরোত্তমের আদর্শ মেনে নিয়ে অষ্টকালীয় নিত্যলীলার পদ রচনা করছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনায় প্রধান কথা হল 'সর্বদা রাধা-কৃষ্ণলীলা স্মরণ। তৈলধারবৎ অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে অভীষ্ট বস্তুর অনুচিন্তনই হল এই স্মরণ।' এই স্মরণের সুবিধার জন্যই

অষ্টকালীয় নিত্যলীলা

তাঁরা অষ্টকালীয় লীলার পদ লিখেছেন। নিশান্ত, প্রভাত, পূর্বাহ্ন, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ন সায়াহ্ন, প্রদোষ এবং নৈশলীলার পদই অষ্টকালীয় নিত্যলীলা-পদ নামে পরিচিত। এখানে নৈশলীলায় রতি-বিলাসের পর স্বাধীনভর্তৃকা শ্রীরাধাকে সাজিয়ে দিতে কৃষ্ণ যে কতটা প্রেমাকুল হয়েছেন তারই একটি পদ উদ্ধৃত করছি।—

আনন্দ-নীর যতনে হরি বারত
অলক তিলক নিরমাই।
কুঞ্চিত লোচনে হরিমুখ হেরইতে
থরহরি কাঁপয়ে রাই।।
দেখ সখি রাধা-মাধব-লেহ।
নাগরি বেশ বনাওত নাগর
ভাবে অবশ দুহুঁ দেহ।।
কোরহি যাঁতি পুনহু হরি সাজত
পীন পয়োধর জোর।
যামল কর-পঙ্কজ জলে ধোয়ল
মৃগমদ-চীত উজোর।।
মরমক বোল কহত দুহুঁ আকুল
বোধল গদগদ ভাষ।
অধর বিলোকনে ইঙ্গিতে কি কহল
না বুঝল গোবিন্দদাস।। [১১০]

'আনন্দাশ্রু সংবরণ করে কৃষ্ণ রাধার অলকা-তিলক নির্মাণ করছেন। বাঁকা চোখে রাধা কৃষ্ণকে দেখে থরহরি কাঁপতে লাগলেন। সখি রাধামাধবের প্রেম দেখ। নাগরীর বেশ বানাতে গেলে দুজনেরই দেহ ভাবে অবশ হল। রাধাকে

যত্নে কোলে নিয়ে কৃষ্ণ পুনরায় তাঁর উন্নত পয়োধর-যুগল সাজাতে লাগলেন। কৃষ্ণের পদ্মহস্তের ঘামে মৃগমদের উজ্জ্বল চিত্র ধুয়ে গেল। দুজনে মনের কথা বলতে আকুল হলেন. কিন্তু গদগদ ভাষ কণ্ঠ রুদ্ধ করে রাখল। চোখে চোখে তখন ইঙ্গিতে কি বললেন, গোবিন্দ দাস কিছু বুঝলেন না।'

এই পর্যায়ে ড. মজুমদার ৬৫টি পদ সংকলন করেছেন। নিশান্ত-পর্যায়ে 'নিশি অবশেষে জাগিসব সখিগণ' (৪৯) মধ্যাহ্ন পর্যায়ে 'নাহি উঠল তিরে সবহু সখীগণ' (৮৫) এবং নৈশলীলা পর্যায়ে 'রতিরস অবশ অলস অতি পূর্ণিত' (১১৩) পদগুলির কবিত্ব-সৌন্দর্য এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

শব্দালঙ্কারের প্রতি গোবিন্দদাসের কিছুটা বেশী অনুরক্তি লক্ষিত হয়। 'চিত্রগীত' পর্যায়ে সঙ্কলিত ৩৫ টি পদে কবি বর্ণানুক্রমিক স্বর ও ব্যঞ্জনের নানারূপ

চিত্রগীত

ব্যবহার কৌশল দেখিয়েছেন। কোথাও পদের প্রায় সমস্ত শব্দের প্রথম বর্ণ এক, কোথাও প্রতি পংক্তির প্রথম শব্দের সূচনা একই বর্ণে হয়েছে, কোথাও একটি পদে প্রতি দুই পংক্তিতে এক এক বর্ণের ব্যবহার হয়েছে। বিভিন্ন পদ থেকে দু'এক পংক্তি দৃষ্টান্ত তুলি,—

মুখরিত মুরলি-মিলিত মুখ মোদনে
মরকত মুকুর মৈলান।
মানিনি-মান-মথন মুচুকায়নি
মুনি-মানস-মুরছান॥ [১৪৪]

আট পংক্তির সমগ্র পদটিতে এক 'গোবিন্দদাস গুণগান' ভনিতাংশ ছাড়া সব শব্দই 'ম' বর্ণে রচিত হয়েছে।

ললিত কমল ফুলবালা।
লাগল বিরহক জ্বালা॥
লীলা লাবনি খোই।
লোর লহরি ভরে রোই॥ [১৬৪]

এ-পদে পংক্তি সূচনায় প্রথম বর্ণ 'ল'। পদের মাঝেও 'ল' বর্ণের প্রাচুর্য আর একটি পদে পরপর চারটি বর্ণের অনুপ্রাস,—

মুদির-মরকত মধুর মূরতি
মুগধ মোহন ছান্দ।

মল্লি মালতি মালে মধুমত
মধুও মনমথ-ফান্দ ॥
শ্যাম সুন্দর সুঘড-শেখর
শরদ-শশধর হাস।
সঙ্গে সবয়স সুবেশা সম-রস
সতত সুখময় ভাব ॥
চিকণ চাঁচব চিকুব চুম্বিত
চারু চন্দ্রক পাঁতি।
চপল-চমকিত চকিত চাহনি
চীত চোরক ভাঁতি ॥
গিরিক গৈরিক গোরজ গোরচন
গন্ধ-গবভিত বাস।
গোপ গোপন গবিম গুণ-গান
গাওয়ে গোবিন্দদাস। [১৪২]

এমন পদ রচনায় কবির বর্ণ-শিক্ষানৈপুণ্যের যথেষ্ট পরিচয় মেলে সত্য, কিন্তু যথার্থ কবিত্বের বিকাশে এই শব্দালঙ্কারের অতি-সচেতনতা অন্তরায় সৃষ্টি করে।

রূপানুরাগ ও পূর্বরাগ

রূপানুরাগ ও পূর্বরাগের পদ রচনায় গোবিন্দদাসের শিল্পী-সত্তা যেন অভীষ্ট জগতের সন্ধান পেয়েছে। কখনো ধ্বনির অলঙ্করণে কখনো চমৎকারী উপমাধর্মী অলঙ্করণে কৃষ্ণের চোখে রাধা এবং রাধার চোখে কৃষ্ণের যে মূর্তি বর্ণনা করেছেন এ যেন শিল্পীর উজ্জ্বল গাঢ় বর্ণে আঁকা ছবি, বাহুল্য নেই, কিন্তু ঔজ্জ্বল্য রয়েছে, প্রতিটি তুলির টানে শিল্পীর দৃঢ় হাতের স্পর্শ! মাঝে মাঝে অনির্বচনীয় বাক্-বৈদগ্ধ্য। নাগরিকা রাধার বাচন ভঙ্গির এতটা বৈদগ্ধ্য বোধ হয় বিদ্যাপতিও দেখাতে পারেননি।

প্রথম ধ্বনিময় অলঙ্করণে কৃষ্ণ রূপ বর্ণনার চিত্র উদ্ধৃত করি,—

নন্দ নন্দন চন্দ-চন্দন
গন্ধ নিন্দিত অঙ্গ।
জলদ-সুন্দর কম্বু-কন্ধর
নিন্দি সিন্ধুর-ভঙ্গ ॥

প্রেম-আকুল গোপ গোকুল
কুলজ-কামিনি-কন্ত।
কুসুম-রঞ্জন মঞ্জু বঞ্জুল
কুঞ্জ-মন্দির-সন্ত ॥...[১৬১]

'নন্দনন্দনের অঙ্গ-পরিমল চন্দন-গন্ধকে নিন্দিত করে, অঙ্গ-লাবন্য চন্দ্রকে নিন্দিত করে। তিনি জলদের ন্যায় সুন্দর, তাঁর শঙ্খ-গ্রীব হস্তীর গ্রীবাভঙ্গিকে নিন্দিত করে। প্রেমাকুল গোকুলের গোপ কামিনীকুলের তিনি কান্ত। তাঁর সুন্দর বেতস-নির্মিত কুঞ্জ-মন্দির কুসুমরঞ্জিত। এ-বর্নায় শুধু ধ্বনি নয়, বাক চাতুর্য, অর্থালঙ্কার বৈদগ্ধ্যও লক্ষনীয়। ধ্বনিময়তার দিক থেকে 'তনু ঘন গঞ্জন জনু দলিতাঞ্জন' পদটিও (১৬৮) লক্ষণীয়।

রাধারূপের বর্ণনায় কবি যে বচন-চাতুর্য দেখিয়েছেন তার দু একটি উদাহরণ দিচ্ছি।—

এ ধনি না করু পসাহন আন।
এতহুঁ নেহারি মুগধ মধুসূদন
দিন রজনী নাহি জান ॥...[১৮২]

সখি বলছেন রাধাকে 'ধনি, আর প্রসাধন কোরোনা। এই দেখেই মুগ্ধ কানু দিন রাতের প্রভেদ ভুলেছে।'

আর একটি পদে রয়েছে,—

এ ধনি আঁচরে বদন ঝাঁপাও।
লুবধল মধুপ চকোর বিধুন্তুদ
অনত অনত চলি যাও ॥
মুখ মণ্ডল কিয়ে শরদ সরোরুহ
ভালহি অটমিক চন্দ।
মধুরিপু-মরমে ভরমে যাহাঁ ঐছন
তাহে কি গণিয়ে মতিমন্দ ॥ [১৮৩]

সখি বলছেন, 'সুন্দরি! আঁচলে বদন ঢাকো। লুব্ধ মধুপ, চকোর ও রাহু অন্যান্য দিকে চলে যাক্।' তোমার মুখমণ্ডল কি শরতের চাঁদ (যে মধুপ ছুটে এসেছে!), তোমার ভালে কি অষ্টমীর চাঁদ (যে চকোর ও রাহু ছুটে এসেছে!) স্বয়ং কৃষ্ণেরই এরূপ ভুল হয়, তাতে এই মন্দমতিদের আর কি বলি।' অলঙ্কার

ভ্রান্তিমূল ; কৃষ্ণ, মৌমাছি, চকোর এবং রাহুর ভ্রান্তি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করছেন সখি ; আসলে সে ব্যাখ্যাও হল পরোক্ষে রাধারূপের প্রশংসা, অতিশয়োক্তিমূলক প্রশংসা। এমন কবিত্বের চাতুর্যময় কথনে গোবিন্দদাস তুলনারহিত।

এবারে রাধার পূর্বরাগের দু-একটি পদ থেকে উদ্ধৃত করি। রূপগোস্বামী বিদগ্ধ-মাধব নাটকে রাধার পূর্বরাগের—একটি চিত্র এঁকেছেন,—

একস্য শ্রুতমেব লুম্পতি মতিং কৃষ্ণেতি নামাক্ষরং
সান্দ্রোন্মাদ-পরম্পরামুপনয়ত্যন্যস্য বংশীকলঃ।
এষ স্নিগ্ধ-ঘন-দ্যুতির্মনসি মে লগ্নঃ সকৃদ্বীক্ষণাৎ
কষ্টং ধিক্ পুরুষত্রয়ে রতিরভূন্মন্যে মৃতিঃ শ্রেয়সী ।।

'সখি, একজনের কৃষ্ণনামাক্ষর কর্ণে প্রবেশ করে মতি লুপ্ত করেছে, আর একজনের বংশীধ্বনি উন্মাদদশা ঘটিয়েছে, আর এক স্নিগ্ধ মেঘদ্যুতি আমার মনে চিত্র হয়ে লেগে রয়েছে। এই কষ্টে ধিক ! তিন পুরুষে রতির চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়।' গোবিন্দদাস তারই আলেখ্যে লিখলেন,

সজনি ! মরণ মানিয়ে বহু ভাগি।
কুলবতী তিন পুরুষে ভেল আরতি
জীবন কিয়ে সুখ লাগি ।।
পহিলে শুনলু হাম শ্যাম দু' আখর
তৈখনে মন চুরি কেল।
না জানি কোন ঐছে মুরলি আলাপই
চমকই শ্রুতি হরি নেল ।।
না জানি কোন উহ পটে দরশায়লি
নব জলধর জিনি কাঁতি।
চকিত হইয়া হাম যাহা যাহা ধাইয়ে
তাহা তাহা রোধয়ে মাতি ।।
গোবিন্দদাস কহয়ে শুন সুন্দরি
অতএ করহ বিশোয়াস।
যাকর নাম মুরলীরব তাকর
পটে ভেল সো পরকাশ ।। [১৯৯]

'সখি এখন, মরণকেই বহুভাগ্য মনে করি। কুলবতী হয়ে তিনজন পুরুষকে আরতি করলাম, কোন সুখে আর জীবন রাখব! প্রথম শ্যামনামের দু অক্ষর শুনলাম, তাতেই মন চুরি করল। জানিনা কে অমন ভাবে মুরলী আলাপ করছিল, চকিতে সে শ্রুতিও হরণ করে নিল। জানিনা কে পটে নব জলধর কান্তি এঁকে দেখাল,—চমকিত আমি যেদিকে পালাতে চাই এগুলিই পথরোধ করে দাড়ায়। (অর্থাৎ রাধা কৃষ্ণের নাম শ্রবণে, বাঁশির সুর শুনে এবং কৃষ্ণ-চিত্র দর্শনে আত্মসম্বিত হারিয়েছেন)। গোবিন্দদাস বলছেন, হে সুন্দরি! বিশ্বাস কর যাঁর নাম (দু'অক্ষর) পেয়েছ, তারই মুরলীধ্বনি শুনেছ, চিত্রপটেও তিনিই প্রকাশিত হয়েছেন।'

উজ্জ্বলনীলমণিতে দর্শন ও শ্রবণের দ্বারা যে পূর্বরাগের কথা বলা হয়েছে কবি এখানে তারই বর্ণনা দিয়েছেন। সমগ্র পদটি কবি রাধার ভ্রান্তি জনিত আক্ষেপোক্তির অলঙ্করণে চমৎকার সাজিয়ে দিয়েছেন। আলঙ্কারিক বচন-চাতুর্যে গোবিন্দদাসের কৃষ্ণানুরাগিনী রাধা যে কতটা সুনিপুণ আর একটি পদে তার সার্থক পরিচয় রয়েছে।—

আধিক আধ আধ দিঠি অঞ্চলে
যব ধরি পেখলু কান।
কত শত কোটি কুসুম-শরে জরজর
রহত কি যা'ত পরান॥

সজনি! জানলুঁ বিহি মোহে বাম।
দউ লোচন ভরি যো হরি হেরই
তছু পায়ে মঝু পরণাম॥

সুনয়নী কহত কানু ঘন শ্যামর
মোহে বিজুরি সম লাগি।
রসবতী তাক পরস-রস ভাসত
হামারি হৃদয়ে জলু আগি॥

প্রেমবতী প্রেম- লাগি জীউ তেজই
চপল জীবনে রাখত মঝু সাধ।

গোবিন্দদাস ভণে   শ্রীবল্লভ[1] জানে

রসবতি রস মরিযাদ ॥ [২০৪]

অর্ধেকের অর্ধেকের অর্ধেক দৃষ্টিকোণ দিয়ে যখন কানুকে দেখেছি তখন থেকে কত শত কোটি মদন বাণে জর্জরিত হয়েছি। প্রাণ আছে কি নেই এমন অবস্থা! সখি, বুঝেছি বিধি আমার প্রতি অপ্রসন্ন। দুই নয়ন ভরে যে হরিকে দেখে তার পায়ে গড করি (অর্থাৎ আমার এত ক্ষুদ্র দৃষ্টিকোণে দেখেই প্রাণ যায় যায় অবস্থা, সে দুই নয়ন ভরে কি করে দেখে)! সুনয়নী (ব্যাঙ্গার্থে) বলে, কানুর রঙ্ ঘন শ্যাম, আমার তো বিদ্যুতের মত লাগে! রসবতী (ব্যাঙ্গার্থে) তার স্পর্শ-রসের সাগরে আনন্দে ভাসেন, আমাার হৃদয়ে সে স্পর্শে তো আগুন জ্বলে ওঠে! প্রেমবতী (ব্যঙ্গার্থে) প্রেমের জন্য জীবন ত্যাগ করতে চান, আমারতো চপল জীবনেই সাধ (অর্থাৎ কৃষ্ণসঙ্গলাভের আশায় বেঁচে থাকতে সাধ)! গোবিন্দদাস বলেন, রসবতীব এই রসের মর্যাদা শ্রীবল্লভ জানে। 'শ্রীবাধা বৃন্দাবনের অন্যান্য গোপীর তুলনায় যে অনন্যশ্রেষ্ঠ সুকৌশলে রাধার বচন-চাতুর্যের মাধ্যমে এখানে তা সুন্দর অভিব্যক্ত হয়েছে।

কৃষ্ণের পূর্বরাগের ছবিও কয়েকটি পদে চমৎকার প্রকাশ পেয়েছে। বিদ্যাপতির আদর্শে রচিত অতিশয়োক্তি অলঙ্কার-ভূষিত প্রখ্যাত একটি পদ এখানে উদ্ধৃত কবি।—

যাঁহা যাঁহা নিকসই তনু তনু-জোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরি চমক মতি হোতি॥
যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণে চল চলই।
তাঁহা তাঁহা থল-কমল-দল খলই॥
দেখ সখি কো ধনি সহচরি মেলি।
হামারি জিবন সঞে করতহি খেলি॥
যাঁহা যাঁহা ভঙুর ভাঙ্ বিলোল।
তাঁহা তাঁহা উছলই কালিন্দী-হিলোল॥

১। ডঃ মজুমদারের মতে শ্রীবল্লভ গোবিন্দদাসের সমসাময়িক একজন বড কবি। আরও একটি পদে (৭০) গোবিন্দদাস এর নাম করেছেন। বল্লভও একটি পদে গোবিন্দদাসের কবিত্ব সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রসংশোক্তি করেছেন।

যাঁহা যাঁহা তরল বিলোচন পড়ই।
তাঁহা তাঁহা নীল উতপল ভরই ॥
যাঁহা যাঁহা হেরিয়ে মধুরিম হাস।
তাঁহা তাঁহা কুন্দ কুমুদ পরকাশ ॥
গোবিন্দদাস কহ মুগধল কান।
চিনলহু রাই চিনই নাহি জান ॥ [২২৪]

'যেখানে যেখানে রাধার অস্ফুট (বস্ত্রাবরণের জন্য) দেহদ্যুতি নির্গত হচ্ছে সেখানে সেখানে বিদ্যুৎ চমকিত হচ্ছে। রক্তিম চরণে রাধা যেখানে যেখানে হেঁটে চলেছেন সেখানে সেখানে স্থলকমলের দল ঝরে পড়ছে। সখি দেখ, ধনী (রাধা) সহচরিগণ সহ আমার জীবন নিয়ে খেলা করছেন। যেখানে যেখানে ভঙ্গুর ভ্রূর বিলোল কটাক্ষে চাইছেন সেখানে সেখানে কালিন্দী উদ্বেলিত হয়ে উঠছে। যেখানে যেখানে তার তরল চোখের দৃষ্টি পড়ছে সেখানে সেখানে নীলপদ্ম যেন ভরে উঠছে। যেখানে যেখানে তার মধুর হাসি দেখি সেখানে সেখানে কুন্দ কুমুদ প্রকাশিত হয়ে ওঠে। গোবিন্দদাস বলেন, মুগ্ধ কানু এই রাধাকে চিনেও যেন চিনতে পারেন না।'

স্পষ্টতই কবি তারই গুরু বিদ্যাপতির 'জহাঁ জহাঁ পদযুগ ধরঈ' পদের আদর্শে এ পদটি লিখেছেন। বর্ণনাগত যথেষ্ট সাদৃশ্যও রয়েছে। তবে বিদ্যাপতির পদে কৃষ্ণ এই সুন্দরীকে ক্ষণেক দেখে হারিয়ে ফেলেছেন, পুনর্বার দর্শনের আকুল আকাঙ্খা জানাচ্ছেন। এখানে মুগ্ধ কানুর সামনে থেকে রাধা অদর্শন হননি, তবু তার এ নতুন রূপে মুগ্ধ কৃষ্ণ যেন সম্বিতহারা হয়ে পড়েছেন।

আর একটি পদে কবি কৃষ্ণের পূররাগ-প্রেমদৃষ্টিতে রাধার কি অপূর্ব আলেখ্য অঙ্কিত করেছেন :—

কাঞ্চন-কমল পবনে উলটায়ল
ঐছন বদন সঞ্চার।
সরবস লেই পালটি পুন বিঙ্কল
রঙ্গিনি বঙ্ক নেহার।
সজনি কো দেই দারুণ বাধা।

নয়নক সাধ আধ নাহি পূরল
পালটি না হেরলুঁ বাধা॥
ঘনঘন আচর কুচ-গিরি কাঁচর
হাসি হাসি তহি পুন হেরি!
জনু মঝু মন হরি কনয়া কুম্ভ ভরি
মুহরি রাখল কত বেবি॥
যব মন বান্ধল ইন্দ্রিয় ফাঁকর
তাহি মিলন আন আন।
কাঠক পুতলি ঐছে মুরুছায়ত
গোবিন্দদাস পরমাণ॥ [২৩১]

'কৃষ্ণ বলছেন, রাধার মুখ দেখে মনে হচ্ছে যেন, সোনার কমল বাতাস-ভরে উলটে গেছে। সেই রঙ্গিনি আমার সর্বস্ব নিয়ে নিয়েছে, ফিরে আবাব বাঁকা দৃষ্টিতে বিদ্ধ কবছে। সখি কে আমায় দারুণ বাধা দিল (চোখের পলক?)! নয়নের সাধ পূর্ণ হলনা, ফিবে আর রাধাকে দেখতে পেলাম না। মেঘের ন্যায় নিবিড় বস্ত্রাঞ্চল তার কুচ-গিবির উপবকার কাঁচুলি হল, হেসে সেদিকে সে তাকাল, যেন আমার মন চুরি করে সোনাব কলসে ভরে রেখে নানা ভঙ্গিতে শিলমোহর করে রাখল। যখন মনকে বন্দী করল, অন্য অন্য ইন্দ্রিয়েবাও ফাঁপরে পড়ে সেই সঙ্গে গিয়ে মিলিত হল। কাঠের পুতুলও এইরূপে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে; গোবিন্দদাস নিজেই তাব প্রমাণ।'

এখানে প্রথমেই বাতাসে মুখ উলটানো স্বর্ণবরণ পদ্মের সজীব সৌন্দর্যেব সঙ্গে বাধার মুখেব উপমাটি লক্ষনীয়। চিবন্তন মুখ-পদ্মের উপমাকেই কবি এখানে কত নতুন ভাবে, কত জীবন্তভাবে উপস্থিত করছেন। তাছাড়া মনকে কনক-কটোরায় বন্দী করার ছবিটিতেও নূতনত্ব রয়েছে। পুরাতন কথাকেই কত নতুন অনুভূতিতে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে প্রকাশ সম্ভব গোবিন্দদাস এখানে তারই পরিচয় দিয়েছেন।

একটি পদে যমুনাস্নান-যাত্রী শ্রীবাধাব রূপলাবণ্য দর্শনে মুগ্ধ কৃষ্ণ বলছেন, —

সহচরি মেলি চললি বররঙ্গিনি
কালিন্দী করই সিনান।
কাঞ্চন শিরিষ- কুসুম জনু তনুরুচি
দিনকর কিরণে মৈলান॥

সজনি সো ধনি চীতক চোর।
চোরিক পন্থ ভোরি দরশায়লি
চঞ্চল নয়নক ওর।। ধ্রু ।।
কোমল চরণ চলত অতি মন্থর
উতপল বালুক বেল।
হেরইতে হামারি সজল দিঠি পঙ্কজ
দুহুঁ পাদুক করি নেল।।
চীত নয়ন মঝু দুহুঁ সে চোরায়লি
শুন হৃদয় অব যান।
মনমথ পাপ দহনে তনু জারত
গোবিন্দদাস ভালে জান।। [২৩২]

'সহচরীদের নিয়ে বররঙ্গিনী কালিন্দী স্নানে চলেছেন। সোনালী শিরিষ ফুলের মতো তনু-সৌন্দর্য দিনকর কিরণে ম্লান হল। সজনি, সেই ধনী আমার মনচোর। তার চঞ্চল নয়ন আমায় বিভোর করে চুরির পথ দেখাল। উত্তপ্ত বালুকা-বেলায় কোমল পদক্ষেপে ধীরে ধীরে রাধা চলেছেন। তাই দেখে আমার সজল নয়ন-কমল দুটিকে যেন (তাঁর পদের) পাদুকা করে নিলেন। তিনি আমার মন এবং নয়ন দুইই চুরি করে নিলেন এখন আমার হৃদয় শূন্য।' এ পদেও দুটি অবিস্মরণীয় অংশ রয়েছে।—

চোরিক পন্থ ভোরি দরশায়লি
চঞ্চল নয়নক ওর।

কৃষ্ণ চুরি করে বিভোর ভাবে রাধার সৌন্দর্য দেখবার কৌশল রাধার চঞ্চল কটাক্ষ থেকেই শিখে নিলেন। অপর একটি অংশের কবিত্ব আরও হৃদয়গ্রাহী,—

কোমল চরণ চলত অতি মন্থর
উতপত বালুক বেল।
হেরইতে হামারি সজল দিঠি পঙ্কজ
দুহুঁ পাদুক করি নেল।।

যমুনায় স্নানে চলেছেন শ্রীরাধা, উতপ্ত বালুকা-বেলায় আস্তে আস্তে কোমল চরণ ফেলে চলেছেন। তাঁর ক্লেশ উপলব্ধি করে শ্রীকৃষ্ণের দুই নয়ন সজল হয়ে উঠেছে। দুটি সজল চোখ ক্লিষ্ট রাধার রক্তিম পদতলের দিকে বার বার ফিরিয়ে

কৃষ্ণ ভাবছেন যদি কোনও রূপে তাঁর কষ্ট লাঘব করতে পারতেন! তারই কি কবিত্বময় প্রকাশ হয়েছে কবির বাচন চাতুর্যে!

পূর্বরাগ এবং অনুরাগের পার্থক্য সম্পর্কে ইতিপূর্বেই জ্ঞানদাস পদাবলী প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি।[১] এখানে অনুরাগের গভীরতা-সূচক দু' একটি পদ উদ্ধৃত করা যেতে পারে।—

অনুরাগ

শুনইতে অনুখন যছু নব গুণগণ
শ্রবণ নয়ন দৈভ গেলা।
দরশনে তাকর এ হেন লোর ঝর
নয়ন শ্রবণ সম ভেলা॥
হরি হরি কি ভেল দারুণ কাজ।
না জানিয়ে কো বিহি বিঘণ বাঢ়াওল
কানু সমাগম মাঝ॥
যা সঞে কেলি- কলারস লালসে
লাখ মনোরথ কেল।
তাকর পাণি পরশে তনু পরবশ
তবহি বিচেতন ভেল॥
হিয়া ঘন-সার হার নাহি পহিরলু
যাক পরশ রস-আশে।
তাক বিচ্ছেদে জীউ নাহি নিকসয়ে
কহতহিঁ গোবিন্দদাস॥[২] [২৭১]

'যার নতুন গুণসকল সব সময়ে শুনতে শুনতে শ্রবণ নয়নে রূপান্তরিত হয় (অর্থাৎ যেন প্রত্যক্ষ দেখছি এমন মনে হয়), তাকেই দেখবার বেলায় চোখ এত জলে ভরে যায় যে নয়ন যেন শ্রবণে রূপান্তরিত হয়। হরি, কি দারুন ব্যাপাব ঘটল। জানিনা কোন বিধাতা কানুর এই আগমনের মাঝে এমন বিঘ্ন বাড়াল। যার সঙ্গে কেলি-কলা-রসের লক্ষরূপ কল্পনাভিলাষ করেছিলাম তারই পাণিস্পর্শে

১। 'যে প্রিয়তম সর্বদাই হৃদয়ে জাগ্রত রয়েছেন তাকেই নব নবায়মান রাগে অনুভবই অনুরাগ'—উজ্জ্বলনীলমণি।

২। তুলনীয়— চির চন্দনে উরে হার না দেলা।
সো অব নদী-গিরি আঁতর ভেলা॥ [বিদ্যাপতি]

পরবশ দেহ অচেতন হল। যার স্পর্শ লাভের ইচ্ছায় বুকে চন্দন মাখিনি, হার পরিনি, তার বিচ্ছেদে এখনো আমার প্রাণ কেন বার হলনা! গোবিন্দদাস রাধার আক্ষেপের কথাই বলছেন।'

অনুরাগের আর একটি বিখ্যাত পদ উদ্ধৃত করি:—

রূপে ভরল দিঠি সোঙরি পরস মিঠি
পুলক না তেজেই অঙ্গ।
মধুর মুরলী-রবে শ্রুতি পরিপূরিত
না শুনয়ে আন পরসঙ্গ॥
সজনি অব কি করবি উপদেশ।
কানু অনুরাগে মোর তনু মন মাতল
না গুণে ধরম ভয় লেশ॥
নাসিকা সো অঙ্গ- সৌরভে উনমত
বদন না লয়ে আন নাম।
নব নব গুণগণে বান্ধল মঝুমনে
ধরম রহল কোন ঠাম॥
গৃহপতি-তরজনে গুরুজন-গরজনে
অন্তরে উপজয়ে হাস।
তহি এক মনোরথ জনি হয়ে অনরথ
পুছত গোবিন্দদাস॥ [২৬৭]

'তার রূপে আমার নয়ন ভরে গেল, মিষ্টি পরশের কথা স্মরণ করে দেহের পুলক-রোমাঞ্চ আর শেষ হয় না। তার মধুর বাঁশির শব্দে শ্রবণ পূর্ণ হয়ে আছে, অন্য কোনও প্রসঙ্গ আর শুনতে পাইনি। সখি, আর আমায় কি উপদেশ দেবে! কানু-অনুরাগে আমার দেহমন ভরপুর, ধর্ম ও লোকভয়কে গণনা করি না। আমার নাসিকা সেই অঙ্গ সৌরভে উন্মত্ত, বদন অন্যনাম নেয় না। নব নব গুণে আমার মন সে বেঁধেছে, ধর্ম রাখি তার ঠাঁই কোথায়! গৃহকর্তার তর্জন বা গুরুজনের বকুনিতে মনে মনে হাসি পায়। গোবিন্দদাস বলছেন, তোমার তো একটিই মনোরথ তাতে অনর্থ ঘটবে নাতো।'

দুটি পদেই কবি নায়িকার কাছে প্রেম-গভীরতায় নায়কের প্রেম যে প্রতিনিয়ত

কত নূতন দূর প্রসারী অনুভূতি সঞ্চার করে, প্রেমিকাকে আত্মবশে থাকতে না দিয়ে সম্বিত হারা করে দেয় তারই চমৎকার ভাবব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তুলেছেন।

নিখুঁত তুলির টানে চঞ্চল প্রেমাভিব্যক্তির চিত্রাঙ্কনে গোবিন্দদাস যে গুরু বিদ্যাপতিরই যোগ্য শিষ্য ছিলেন অনেকগুলি সার্থক পদেই তার পরিচয় মিলবে। এখানে মিলন সম্ভোগের একটি উদাহরণ তুলছি,—

পহিলহি রাধামাধব মেলি।
পরিচয় দুলহ দূরে রহু কেলি॥
অনুনয় বলইতে অবনত বয়নী।
চকিত বিলোকনে নখে লিখু ধরণী॥
অঞ্চল পরশিতে চঞ্চল কান।
রাই কয়ল পদ আধ পয়ান॥
বিদগধ নাগর অনুভব জানি।
রাইক চরণে পসারল পানি॥
করে কর বারিতে উপজল প্রেম।
দারিদ ঘটভরি পাওল হেম॥
হাসি দরশি মুখ আগোরলি গোরী।
দেই রতন পুন লেওলি চোরি॥
ঐছন নিরুপম পহিল বিলাস।
আনন্দে হেরত গোবিন্দদাস॥ [২৮৫]

'রাধামাধবের প্রথম মিলন। বিলাসতো দূরের কথা, পরিচয় ঘটাই দুর্লভ। মাধব অনুনয় করতেই মুখ অবনত করে চকিত দৃষ্টিতে নখে ধরণীতে আঁচর কাটছেন। কানু রাধার বস্ত্রাঞ্চল স্পর্শ করতে চঞ্চল হলেন, রাধা চলে যাবার ছলে অর্ধপদ প্রয়াণ করলেন। বিদগ্ধ নাগর রাধার মন বুঝে পদস্পর্শ করতে হাত বাড়িয়ে দিলেন। রাধা নিবৃত্ত করতে গেলে হাতে হাত ঠেকল, তাতে প্রেম উদ্রিক্ত হল। হেসে মুখ দেখিয়ে রাধা পুনরায় ঢেকে ফেললেন, যেন দেওয়া রত্ন আবার ফিরিয়ে নিলেন। এই নিরুপম প্রথম প্রেম-বিলাস গোবিন্দদাস আনন্দে প্রত্যক্ষ করলেন।'

ছবিটি গোবিন্দদাসের বর্ণনার গুণে প্রত্যেক শ্রোতাও যেন প্রত্যক্ষ দেখতে

পান ।/মিলনলীলায় নানা ছলা চাতুর্যের আরও দু-একটি চিত্র এখানে উল্লেখ করছি, একটি পদে রাধা ছলনায় কৃষ্ণকে লীলাবিলাসে প্রবৃত্ত করছেন : কুলবতী পুণ্য অভাবে রসিকনাথের দেখা পাননি, তাই নির্জনে পশুপতির (পশুপালক কৃষ্ণের) পূজায় এসেছেন, পথ ধরতে না পেরে বংশীধ্বনি অনুসরণে এখানে এসেছেন এবারে নিজসাধ পূর্ণ করবেন (পশুপতি পূজা, অন্যঅর্থে রতিলীলা-সাধ)। কৃষ্ণ যেন একা দেখে পূজায় বাধা না দেন (৩২৫)।[১] আর একটি পদে রয়েছে : রাতে রাধার পতিগৃহ পাশে এসে কৃষ্ণ ভ্রমর গুঞ্জনের সংকেত করছেন। রাধাও কৌশলে ভ্রমরকে উদ্দেশ করে বললেন, আমার মুখ গন্ধকে পদ্মগন্ধ ভেবে ভুল করছ, আমি এখন স্বামীসেবায় রত, বিঘ্ন ঘটিও না। তুমি এত মধুলোভী হলে কুসুমাস্তীর্ণ মাধবীকুঞ্জে যাও (অর্থাৎ সেখানেও রাধা-কমলের মধুপানের সুযোগ পাবে)। কানাই সঙ্কেতবুঝে তাই চললেন (৩২৬)।[২]

১। এ হবি অতয়ে দেখায়বি পন্থ
পূজব পশুপতি গোরি একন্ত ॥
সহজে বধুজন গতি-মতি-হীন।
ঘর সঞে বাহির পন্থ না চীন ॥
না মিলল কোই বনহিঁ বল আন।
অনুসরি মুরলি আয়লোঁ এহি ঠাম ॥
আয়লো দূর পুরব নিজ সাধে।
একলি বোলি করহ জনি বাধে ॥ [৩২৫]

২। মঝু মুখ বিমল কমল-বর পরিমল
জানলুঁ তুহুঁ অতি ভোর।
স্বামিক নিয়ড়ে কতহুঁ করু কলেবর
না জানি কৈছে দিল তোর ॥
দূরে রহ শ্যাম ভ্রমর-বর রায়।
স্বামিক সেবন করইতে ঐছন
জানি করহ অন্তরায় ॥
এতহুঁ তিয়াসে হোত যব আকুল
কী ফল মন্দিরে গুঞ্জ।
তাঁহি চলহ যাঁহা কুসুম বিথারল
মঞ্জুল মাধবি কুঞ্জ ॥
এতহুঁ সঙ্কেত করল যব কামিনি
কানু চলল সেই-ঠাম।
গোপ গোঙার ভ্রমর বহু খোজত
গোবিন্দদাস রস গান ॥ [৩২৬]

'অভিসারের চিত্রাঙ্কণে বৈষ্ণব পদাবলী গানে গোবিন্দদাসের শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজন-স্বীকৃত। পূর্বসূরী সংস্কৃত কবিদের প্রয়োজনীয় সহায়তা গ্রহণ করে তিনি পদাবলীগানের অভিসারিকা চিত্রাঙ্কণে অপূর্ব বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন। মুখ্যতঃ তিনি বিদ্যাপতির বর্ণনাদর্শই গ্রহণ করেছেন, তবে কাব্যোৎকর্ষে শিষ্য গুরুকেও যেন অতিক্রম করে গেছেন।

অভিসার মানের অংশভূত। অষ্টনায়িকার মধ্যে অভিসারিকার বর্ণনা প্রসঙ্গে

অভিসার রূপ গোস্বামী তাঁর উজ্জ্বলনীলমণিতে লিখেছেন :

যাভিসারয়তে কান্তং স্বয়ং বাভিসরত্যপি।
সা জ্যোৎস্নী তামসী যানযোগ্যবেশাভিসারিকা
লজ্জয়া স্বাঙ্গলীনেব নিঃশব্দাখিল মণ্ডনা।
কৃতাবগুণ্ঠা স্নিগ্ধৈক-সখীযুক্তা প্রিয়ং ব্রজেৎ ॥ [ঐঃ নায়িকা : ৩৭]

'যে নায়িকা কান্তকে অভিসার করান বা নিজে অভিসার করেন, তিনি আবার অভিসার-বেশ অনুসারে জ্যোৎস্নী ও তামসী দুরকম অভিসারিকা হতে পারেন। তিনি লজ্জায় নিজ অঙ্গে লীনা হয়ে, করে সকল ভূষণকে শব্দহীনা করে, অবগুণ্ঠিতা হয়ে একটি মাত্র স্নেহপরায়ণা সখীসহ প্রিয়তমের কাছে যান।'

শুধু জ্যোৎস্নাভিসারিকা ও তামসাভিসারিকা নন, আরও ছয় প্রকার অভিসারিকার বর্ণনা বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে পাওয়া যায়। যেমন,—দিবাভিসারিকা, কুজ্ঝটিকাভিসারিকা, তীর্থযাত্রাভিসারিকা, উন্মত্তাভিসারিকা, বর্ষাভিসারিকা, অসমঞ্জসাভিসারিকা।[১]

সর্বপ্রথম অভিসার প্রস্তুতি দৃশ্য।—

কণ্টক গাড়ি কমলসম পদতল
মঞ্জির চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি বারি ঢারি করু পীছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি ॥

---

[১] সদুক্তি-কর্ণামৃতে দুর্দিনাভিসারিকারও উল্লেখ করা হয়েছে। অভিসার চিত্র প্রাচীন ভারতীয় কাব্য ও রসশাস্ত্রে যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্র-প্রবক্তারা তাকে বিশিষ্ট দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং মনোহারী পরকীয়া অভিসার-চিত্ররূপকে নতুন একটি সংকেতার্থ দিয়েছেন।

হরি অভিসারক লাগি।
দূতর পন্থগমন ধনি সাধয়ে
মন্দিরে যামিনী জাগি॥
করযুগে নয়ন মুন্দি চলু ভাবিনি
তিমির পয়ানক আশে।
কর-কঙ্কণ-পণ ফণিমুখ বন্ধন
শিখই ভুজগগুরু পাশে॥
গুরুজন বচন বধিরসম মানই
আন শুনই কহ আন।
পরিজন বচনে মুগধীসম হাসই
গোবিন্দদাস পরমাণ॥ [৩৬৬]

'আঙ্গিনায় কাঁটা পুতে, কমলসম পায়ের নূপুর কাপড়ে ঢেকে, কলসীর জল ঢেলে আঙিনা পিছল করে, আঙ্গুল টিপে টিপে তার ওপর দিয়ে হাঁটছেন। হরি-অভিসারের উদ্দেশ্যে মন্দিরে রাত জেগে বাধা দূরের পথে যাবার জন্যে সাধনা করছেন। অন্ধকারে পথে যেতে হবে, সে জন্যে ভাবিনী দু'হাতে চোখ ঢেকে চলছেন। হাতের কাঁকন পণ রেখে সাপুড়ের কাছে সাপ ধরবার কৌশল শিখছেন। গুরুজনের কথায় তিনি বধির থাকেন; এক শোনেন, অন্য জবাব দেন। পরিজনদের কথায় মুগ্ধার মতো হাসেন। গোবিন্দদাস তার সাক্ষী।'

'গা'হা-সত্তসঈ'-তে এই ভাবসাদৃশ্যমূলক পদ রয়েছে,—

অজ্জ মএ গন্তব্বং ঘণন্ধআরে বি তসস্ সুহঅস্স।
অজ্জা নিমীলিঅচ্ছী পঅপরিবাডিং ঘরে কুণই॥ [৩।৪৯ শ্লোক]২

'আজ আমায় ঘনান্ধকারে প্রিয়তমের অভিসরে যেতে হবে,—এই ভেবে এই সুন্দরী নায়িকা চোখ বন্ধ করে নিজের ঘরে পদচারণা অভ্যাস করছে।'

কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয়ে এবং পরবর্তী কয়েকটি পদ-সংগ্রহ গ্রন্থেও অনুরূপ ভাব-চিত্রময় শ্লোক পাওয়া যায়।—

২। দ্র. গাথা সপ্তশতী ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাক প্রণীত (১৯৫৬) পৃ ৯৭।

মার্গে পঙ্কিনি তোয়দান্ধতমসে নিঃশব্দ সংচারকং
গন্তব্যা দয়িতস্য মেঽদ্য বসতির্মুগ্ধেতি কৃত্বা মতিম্।
আজানূদ্ধৃতনূপুরা করতলেনাচ্ছাদ্য নেত্রে ভৃশং
কৃচ্ছ্রাল্লব্ধপদস্থিতিঃ স্বভবনে পন্থানমভ্যস্যতি ॥ [৫১৯ শ্লোক

'পঙ্কিল পথে মেঘান্ধকারে নিঃশব্দ সঞ্চারণে আজ আমায় দয়িতের বাসস্থানে যেতে হবে।—এই মনে করে এক মুগ্ধা রমণী নূপুর জানু পর্যন্ত তুলে, দু'হাতে চোখ ঢেকে কষ্টে পা ফেলে নিজের ঘরে পথ চলার অভ্যাস করছে।'

সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রে পারঙ্গম কবি গোবিন্দদাস রাধার অভিসার প্রস্তুতির চিত্রাঙ্কনে এই শ্লোকাবলীর সাহায্য নিয়েছেন —তবে কবিত্বের প্রতিভায় তাকে আরও কতটা মনোহারী করে তুলেছেন, মূল শ্লোকের পাশে কবির পদটি পাঠ করতে গেলেই উপলব্ধি জন্মে।

শ্রীরাধা কৃষ্ণাভিসারে প্রস্তুত হয়েছেন, বাইরের দুর্যোগ দেখে সখীরা তাঁকে নিবারণ করতে চাইছেন।—

মন্দির বাহির কঠিন কবাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট ॥
তঁহি অতি দূরদর বাদর রোল।
বারি কি বারই নীল নিচোল ॥
সুন্দরি কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহ মানস সুরধুনী পার ॥
ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত।
শুনইতে শ্রবণ মরম জরি যাত ॥
দশদিশি দামিনি দহন বিথার।
হেরইতে উচকই লোচন তার ॥
ইথে যদি সুন্দরি তেজবি গেহ।
প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ ॥
গোবিন্দদাস কহ ইথে কি বিচার।
ছুটল বান কিয়ে যতনে নিবার ॥ [৩৫৩

ঘর থেকে বেরোবার মুখেই কঠিন দরজা। তারপরই চলবার পথ শঙ্কিল ও পঙ্কিল। দরদর ধারাশব্দে বৃষ্টি পড়ছে আবার। নীল নিচোলে (ওড়না) কি বৃষ্টি নিবারিত হয়! সুন্দরি কিরূপে অভিসার করবি? হরি মানস-গঙ্গার (বৃন্দাবনের হ্রদবিশেষ অথবা স্বর্গগঙ্গা) ওপারে রয়েছেন। মুহুর্মুহুঃ ঝনঝন শব্দে বজ্রপাত হচ্ছে। শ্রবণ এবং মন জ্বলে যাচ্ছে। দশদিকে বিদ্যুৎ-বহ্নি ছড়িয়ে পড়ছে, দেখে চোখের তারা ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। সুন্দরি এ-সময়ে যদি গৃহত্যাগ করিস্ তাহ'লে প্রেমের জন্যে দেহকে উপেক্ষা করবি (অর্থাৎ মৃত্যুবরণ করবি)। গোবিন্দদাস বলছেন এখন তার বিচারে কি লাভ? নিক্ষিপ্ত তীর কি আর চেষ্টায় নিবারিত হয় (অর্থাৎ রাধার হৃদয় কৃষ্ণাভিমুখী হয়ে ছুটে চলে গেছে—তাঁকে আর চেষ্টায় থামানো যাবে না)।'

শ্রীরাধা এবার সখিদের উপরোক্ত অনুরোধের যে অনুপম প্রত্যুত্তর দিয়েছেন কবির সেই পদটিও এখানে উদ্ধৃত করা গেল।—

কুল মরিযাদ কপাট উদ্‌ঘাটলু
তাহে কি কাঠকি বাধা।
নিজ মরিয়াদ সিন্ধু সঞে পঙরলু
তাহে কি তটিনি অগাধা॥
সহচরি মঝু পরিখন কর দূর।
কৈছে হৃদয় করি পন্থ হেরত হরি
সোঙরি সোঙরি মন ঝুর॥
কোটি কুসুম-শর বরিখয়ে যছু পর
তাহে কি জলদজল লাগি
প্রেম-দহন দহ যাক হৃদয়সহ
তাহে কি বজরক আগি।
যছু পদতলে নিজ জীবন সোঁপলুঁ
তাহে কি তনু অনুরোধ।
গোবিন্দদাস কহই ধনি অভিসর
সহচরি পাওল বোধ॥ [৩৫৪]

'কুলব্রত-(কুলধর্ম)-রূপ কঠিন কবাট খুলতে পেরেছি, কাঠের বাঁধা তার তুলনায় কতটুকু। আত্মমর্যাদার সাগর পার হলাম, সে তুলনায় তটিনী আর

কি অগাধ। সখী আমায় আর পরীক্ষা কোরোনা। কি (ব্যাকুল) হৃদয়ে হরি আমারে পথের দিকে চেয়ে আছেন তা স্মরণ করে আমার হৃদয় কাঁদছে। যার ওপর কোটি কুসুম শর বর্ষিত হয়েছে, তার আর বর্ষার জলধারা কি (গায়ে) লাগবে! প্রেমের দহন যে হৃদয়ে সহ্য করছি সেখানে বজ্রাগ্নিতে আর কি হবে! যার পদতলে নিজের জীবন সঁপে দিয়েছি (এখন তার কাছে যেতে) দেহ বাঁচাতে বলছ আমায়? গোবিন্দদাস বলছেন, ধনি অভিসার কর। সহচরীরা (এতক্ষণে রাধার কৃষ্ণপ্রেম গভীরতার স্বরূপ) বুঝতে পারল।'

বিভিন্ন অভিসারে রাধার ভিন্ন ভিন্ন রূপ চিত্র। জ্যোৎস্নাভিসারিকা রাধার চিত্র এঁকেছেন কবি,—

কুন্দ কুসুমে ভরি কবরিক ভার।
হৃদয়ে বিরাজিত মোতিম হার॥
চন্দন-চরচিত রুচির কপূর।
অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ ভরিপুর॥
চান্দনি রজনি উজোরলি গোরি।
হরি অভিসার রভসরসে ভোরি॥ ধ্রু॥
ধবল বিভূষণ অম্বর বনই।
ধবলিম কৌমুদি মিলি তনু চলই।
হেরইতে পরিজন লোচন ভুলই।
রঙ্গপুতলি কিয়ে রস মহাপুরই॥ [৩৮০]

'(শুভ্র) কুন্দ কুসুমে কবরী আবৃত। বক্ষে মুক্তাহার। কর্পূরমিশ্র চন্দন চর্চিত অঙ্গ। অঙ্গে অঙ্গে অনঙ্গের পূর্ণ রঙ্গ। শ্রীরাধা হরি-অভিসারের লীলায় বিভোর। চাঁদ-শুভ্র রজনীকে গৌরী আরও উজ্জ্বল করে তুললেন। ধবল বসন পরণে, অঙ্গে ধবল অলঙ্কার, কৌমুদীর ধবলতার সঙ্গে দেহকান্তি মিলিয়ে ধনী চললেন। পরিজনরাও দেখতে ভুল করে ভাবলেন, একি পারদে ডোবানো রাঙের পুতুল?'

আবার তিমিরাভিসারিকা রাধার ছবি এঁকেছেন।—

নীলিম মৃগমদে তনু অনুলেপন
নীলিম হার উজোর।

নীল বলয়গণে ভুজযুগ মণ্ডিত
পহিরণ নীল নিচোল ॥
সুন্দরি অভিসারক লাগি।
নব অনুরাগে গোরি ভেল শ্যামরি
কহু যামিনি ভয় ভাগি ॥)
নীল অলকাকুল অলিকে হিলোলত
নীল তিমিরে চলু গোই।
নীল নলিনি জনু শ্যামর সায়রে
লখই ন পারই কোই ॥
নীল ভ্রমরগণ পরিমলে ধাবই
চৌদিকে করত ঝঙ্কার।
গোবিন্দদাস অতয়ে অনুমানল
রাই চললি অভিসার ॥ [৩৫৭]

'তনুতে নীল মৃগমদ লেপন করেছেন, উজ্জ্বল নীল হার গলায় পরেছেন, দুটি হাত নীল বলয়ে মণ্ডিত। পরিধানে নীল নিচোল। অভিসারের জন্য নব অনুরাগে অন্ধকার রাত্রির ভয় ভাঙাতে গৌরী শ্যামাঙ্গী হয়েছেন। অলি-হিল্লোলিত নীল অলক, নীল তিমিরে গোপনে চলেছেন। শ্যাম-সায়রে যেন নীল পদ্ম, কেউই দেখতে পাচ্ছে না। পরিমল লোভে নীল ভ্রমরেরা চতুর্দিকে ঝঙ্কার করছে।—এইসব দেখে গোবিন্দদাস অনুমান করলেন, রাই অভিসারে চলেছেন।'

গোবিন্দদাস হিমাভিসার, গ্রীষ্মাভিসার, বর্ষাভিসার, বিভিন্ন পর্যায়ের দিবাভিসার, উন্মত্তাভিসার, অভিসারোৎকণ্ঠা, কৃষ্ণ-রাধার অভিসার বিষয়ক পরস্পর উক্তি-প্রত্যুক্তি, শ্রীকৃষ্ণের অভিসার প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ক বহু উৎকৃষ্ট পদ লিখেছেন। প্রত্যেকটি পদেই অভিসারিকার চিত্র-রূপাঙ্কণে কবি যে দক্ষতা দেখিয়েছেন পদাবলী সাহিত্যে তার তুলনা বিরল।

হিমাভিসারের বর্ণনায় কবি বলছেন, 'পৌষের রাত হাওয়া বইছে। ঘরে দরজা দিয়েও সবাই শীতে কাঁপছে এমন সময় দেখি সচকিতা রাধা অভিসারে চলেছেন। তুহিন ধবল সজ্জায় সজ্জিত রাধা কৃষ্ণমিলনের আশায় সুখসজ্জা ত্যাগ করে পথে

বেরিয়েছেন (দ্রঃ ৩৪৪ পদ)।[১] গ্রীষ্মের দিবাভিসারে রাধা চলেছেন, কবি তার চিত্র আঁকছেন, মাথার উপর প্রখর সূর্যতাপ, পদতলে উত্তপ্ত বালুকা। তার মধ্যেই সব ভুলে রাধা দিবাভিসারে বেরিয়েছেন (দ্রঃ ৩৬৯ পদ)।[২] বর্ষার দিবাভিসার বর্ণনায় লিখছেন। মেঘে সূর্যদীপ্তি নিভে গেছে, চারদিক দিনের বেলাতেও আঁধার হয়ে এসেছে। রাধা গজগামিনী চালে কৃষ্ণাভিসারে চলেছেন। চারদিকে বাতাসের ঝাপটা জগতভরি বৃষ্টিধারা-বৃষ্টির ঝাপটায় সকলে ঘরে ঘরে দরজা বন্ধ করেছে—রাধা তখন পথে নেমেছেন (দ্রঃ ৩৬১ পদ)।[৩] উন্মত্তাভিসারিকার চিত্রটি আরও চমৎকার। মণিময় মঞ্জীর এনে যত্নকরে হাতে পরেছেন, হার ভ্রমে কিঙ্কিনি গলায় পরছেন, হার নিয়ে মাথায় সাজছেন। কবি মন্তব্য করছেন—

সুন্দরী অপরূপ পেখলুঁ আজ।
হরি অভিসার ভরম ভরে সুন্দরি
বিছুরল সাজ বিসাজ। [৩৭০]

১। পৌখলি রজনি পবন বহে মন্দ।
চৌদিশে হিম হিমকর কর বন্ধ॥
মন্দিরে রহত সবহুঁ তনু ঝাঁপি।
জগজন শয়নে নয়ন রহু ঝাঁপি॥
এসখি হেরি চমক মোহে লাই।
ঐছে সময়ে অভিসারল রাই॥ [৩৪৪]

২। মাথহি তপন তপত পথ-বালুক
আতপ দহন বিথার।
ননিক পুতলি তনু চরণ কমল জনু
তবহি করলি অভিসার॥ ... [৩৬৯]

৩। গগনহি নিমগন দিনমণি-কাঁতি।
লখই না পারিয়ে কিয়ে দিন রাতি॥
ঐছন জলদ করল আন্ধিয়ার।
নিয়ড়হি কোই লখই নাহি পার॥
... .
চৌদিশে অথির পবন ভরু দোল।
জগভরি শীকরনিকর হিলোল॥
চলইতে গোরি নগর পুর বাট।
মন্দিরে মন্দিরে লাগল কপাট॥ [৩৬১]

ঘনান্ধকার রাত্রিতে পথ বিপথ না মেনে রাধা বর্ষার মধ্যে বিষধর সর্পকেও উপেক্ষা করে একা চললেন।

এখানে প্রসঙ্গত গোবিন্দদাসের চিত্রিত অভিসারিকা রাধার সঙ্গে জ্ঞানদাসের অভিসারিকা চিত্রের পার্থক্য লক্ষ্য করা যেতে পারে। জ্ঞানদাসের রাধা যেন লঘুপক্ষ তন্বী। কৃষ্ণাভিসারে তিনি অবলীলাক্রমে তরঙ্গে ভেসে চলেন। সখিরা এই লঘুপক্ষ চলনের নাগাল পান না। রাধা অনায়াসে তাদের অতিক্রম করে দ্রুত পদক্ষেপে চলে যান।—

অভিসারে জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসের তুলনা

সখিগণ সঙ্গ তেজি চলু একসরি
হেরি সহচরীগণ ধায়।
অদভূত প্রেম- তরঙ্গে তরঙ্গিত
তবহুঁ সঙ্গ নাহি পায়॥ [১৮৭]

গোবিন্দ দাসের রাধা অভিসারে যখন চলেন—

(১) গুরুয়া কুচভরে চল উলট পদ
পীন জঘনক ভাররে। [৩৬০]

(২) চললি নিতাম্বিনি হরি অভিসার।
গতি অতি মন্থর আরতি বিথার॥
রস ধাধসে চলু পদ দুই চারি।
লীলা কমল তেজল বরনারি॥
পু[illegible]রি মৌক্তিক মালতি মাল।
তেজল মণিময় গীমক হার॥
নব অনুরাগ ভরম ভরে ভোরি।
নিন্দয়ে পীন পয়োধর জোড়ি॥ [৩৫৮]

মন্থরগতি, যৌবনভার-মদালসা রাধার রূপচিত্রণে গোবিন্দদাস পূর্বসূরী সংস্কৃত প্রেমকাব্যচিত্রণের বাৎসায়ন-বর্ণিত নারীরূপের সাহায্য গ্রহণ করেছেন। বিদ্যাপতির অঙ্কিত রাধারূপও কবির অঙ্কিত এই রাধারূপকে প্রভাবিত করেছে। গোবিন্দদাসের অভিসারিকা রাধার ক্লাসিক ভাস্কর্য-ধর্মী রূপচিত্রণ জ্ঞানদাসকে হার মানিয়ে দিয়েছে সংশয় নেই।

গোবিন্দদাসের বাসকসজ্জিকা, বিপ্রলব্ধা এবং খণ্ডিতা নায়িকার বর্ণনাত্মক

খণ্ডিতা

৫১টি পদ ড. মজুমদারের গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। খণ্ডিতার একটি পদে গোবিন্দদাসের আলঙ্কারিক চাতুর্যের যে চমৎকার নিদর্শন রয়েছে সেটি এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য।

নখপদ হৃদয়ে তোহারি।
অন্তর জলত হামারি॥
অধরহিঁ কাজর তোর।
বদন মলিন ভেল মোর॥
কাহে মিনতি করু কান।
তুহুঁ হাম একই পরাণ॥ ধ্রু॥
হাম উজাগরি রাতি।
তুয়া দিঠি অরুণিম কাঁতি॥
হামারি রোদন অভিলাষ।
তহুঁ কহ গদগদ ভাষ॥
সবে নহ তনু তনু সঙ্গ।
হাম গোরি তুহু শ্যাম অঙ্গ॥
অতয়ে চলহ নিজ বাস।
কহতহিঁ গোবিন্দদাস॥ [৪৪৩]

'তোমার হৃদয়ে (অপরা নায়িকাকৃত) নখচিহ্ন, আমার অন্তর (ঈর্ষায়) জলছে (অথচ তোমার অন্তরই তো জল[illegible]চিত)। তোমার অধরে কাজল দাগ (প্রতিনায়িকাকৃত, আমার মুখ (লজ্জায়) মলিন হচ্ছে। কানু কেন মিনতি করছ? তুমি আমি তো এক প্রাণ (নাহলে তোমাতে কারণ, আমাতে তার কার্য হতে পারে কি?)। আমি রাত জেগেছি (তোমার আশায় পথ চেয়ে), তোমার চোখ লাল হয়েছে। আমার কান্না পাচ্ছে, তোমার গদগদ ভাষণ। কেবল মাত্র উভয়ের তনুতে তনুতে মিল হল না; আমি গৌরী, তুমি শ্যামাঙ্গ। গোবিন্দদাস (খণ্ডিতা মানিনী রাধার হয়ে) বলছেন, অতএব কানু তুমি নিজ ঘরে ফিরে যাও।'

প্রথম আট পংক্তিতে চারটি অসঙ্গতি অলঙ্কারের মালা সাজিয়েছেন। তার পরের দুটি শ্লোকে (হামারি...অঙ্গ) প্রতিবিন্যাস অলঙ্কার দিয়েছেন। বিরোধমূল অলঙ্কারের মাধ্যমে রাধার মানিনী খণ্ডিতারূপটি যেন আরও তীক্ষ্ণোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। পদটির নাট্যসংলাপ-ভঙ্গির আকর্ষণও কম নয়।

ড. মজুমদারের সংকলন গ্রন্থে ৩৩টি কলহান্তরিতার পদ উদ্ধৃত হয়েছে। কয়েকটি পদে কলহান্তরিতা শ্রীরাধার প্রেমাকুলতা, সখিদের স্নেহ তিরস্কার অপূর্ব ধ্বনি-ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। একটি পদে কৃষ্ণ-প্রেমার্ত রাধাকে অনুযোগপূর্ণ তিরস্কার ছলে সখী বলছেন,—

কলহান্তরিতা

শুনইতে কানু মুরলিরব মাধুরি
শ্রবণে নিবারলুঁ তোর।
হেরইতে রূপ নয়নযুগ ঝাঁপলু
তব মোহে রোখলি ভোর॥
সুন্দরি তৈখনে কহলম তোয়।
ভরমহি তা সঞে লেহ বাঢ়ায়লি
জনম গোঙায়বি রোয়॥ ধ্রু॥
যো তুহুঁ হৃদয়ে প্রেমতরু রোপলি
শ্যাম জলদ-রস আশে।
সো অব নয়ন- নীর দেই সীচহ
কহতহি গোবিন্দদাসে॥ [৫০৫]

'কানুর মুরলী-ধ্বনি-মাধুর্য শুনতে তোকে বারণ করলাম। রূপ দেখতে গেলে তো[illegible] চোখ ঢেকে দিয়েছিলাম। তখন মোহে বিভোর হয়ে আমার উপর রাগ করেছিলি। সুন্দরি তোকে তখন বলেছিলাম, ভ্রমেও তার সঙ্গে প্রেম বাড়ালে, কেঁদে জীবন কাটবে।...শ্যাম-জলদের রসের আশায় তুমি হৃদয়ে প্রেমতরু রোপন করেছিলে, এখন নয়ন-নীর সিঞ্চনে তা রক্ষা কর।—গোবিন্দদাস একথা বলছেন।'

গোবিন্দদাস সখীর সুরে সুর মিলিয়ে স্নেহ গঞ্জনায় বলছেন,—শ্যাম মেঘবারির আশায় হৃদয়ে যে প্রেমতরু রোপন করেছ, এখন আপন নয়নবারি সেই তরুমূলে সিঞ্চন কর। আর একটি পদে কবি কলহান্তরিতা রাধার উক্তিতে বলছেন,—

আন্ধল প্রেমে পহিলে নাহি হেরলুঁ
সো বহুবল্লভ কান।
আদর-সাধে বাদ করি তা সঞে
অহনিশি জলত পরাণ ॥
সজনী তোহে কহি মরমক দাহ।
কানুক দোখে যো ধনি রোখই
সো তাপিনি জগমাহ ॥
যো হাম মান বহুত কবি সাধলোঁ
কানুক মিনতি উপেখি।
সো অব মনসিজ শরে ভেল জরজর
তাকর দরশ না দেখি ॥
ধৈরজ লাজ মানসঞে ভাগল
জীবন রহত সন্দেহ।
গোবিন্দদাস কহই সতি ভামিনি
ঐছন কানুক নেহ ॥ [৫০৩]

'প্রেমান্ধ হয়ে প্রথম বুঝতে পারিনি যে কানু বহু বল্লভ। বেশী আদরের আশায় তার সঙ্গে বিবাদ করে এখন নিশিদিন প্রাণ জ্বলছে। সজনি, তোকে প্রাণের জ্বালার কথা বলি। কানুর দোষ ধরে যে ধনি রুষ্ট হয়, জগতে সেই অনুতাপ-ভাগিনী হয়। কানুর মিনতি উপেক্ষা করে মানকেই বড়ো মনে করেছিলাম, এখন মদনের শরে জর্জরিত হয়েছি, তার দেখা নেই। মান যাবার সঙ্গে ধৈর্য, লজ্জাও [illegible] নিয়েছে, এখন প্রাণ থাকে কিনা সন্দেহ। গোবিন্দদাস বলছেন মা[illegible] কানুর প্রেম অমনি।

গোবিন্দদাস অন্যান্য পদকারদের মতো কৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা, দানলীলা ও নৌকালীলার পদ লিখেছেন। বিভিন্ন ঋতুপর্যায়ের রাসলীলার পদও লিখেছেন।

রাসোল্লাস

শারদরাস-বিষয়ক তার প্রখ্যাত পদটি ধ্বনি ও রূপ-সৌন্দর্যের এক বিস্ময়কর নিদর্শন। শরতের পুষ্পাভরণা প্রকৃতি, নায়ক কৃষ্ণের মদন-ভাতি ও মোহন মুরলিধ্বনি, গোপীদের প্রেম-শিথিলতার বিগলন এ-পদে যেমনটি প্রকাশিত হয়েছে সমগ্র বৈষ্ণব পদাবলীতে রসোল্লাসের এত নিবিড় চিত্রণ আর কোথাও মিলবেনা। পদটি এখানে উদ্ধৃত করা গেল।—

শরদচন্দ পবন মন্দ
বিপিনে ভরল কুসুম গন্ধ
ফুল্ল মল্লিকা মালতি যূথি
মত্ত মধুকর ভোরনি।
হেরত রাতি ঐছন ভাতি
শ্যাম মোহন মদনে মাতি
মুরলি গান পঞ্চম তান
কুলবতি চিত চোরণি॥
শুনত গোপি প্রেম রোপি
মনহি মনহিঁ আপন সোঁপি
তাঁহি চলত যাঁহি রটত
মুরলিক কলরোলনি।
বিসরি গেহ নিজহুঁ দেহ
এক নয়নে কাজর রেহ
বাহে রঞ্জিত কঙ্কন একু
এক কুণ্ডল ডোলনি॥
শিথিল ছন্দ নিবিক বন্ধ
বেগে ধাওত যুবতিবৃন্দ
খসত বসন রসন চোলি
বিগলিত বেণি লোলনি।
[illegible]হি বেলি সখিনি মেলি
কেহু কাহুক পথে না গেলি
ঐছে মিলল গোকুল চন্দ
গোবিন্দদাস বোলনি॥ [৫৫৫]

‘শারদ চাঁদিনী রাত, মৃদু পবন বইছে। বৃন্দাবনের কুঞ্জে কুসুম-গন্ধ ভরপুর। মল্লিকা, মালতী, যূথি পুষ্পের হাস, মধুকর মধুপানে বিভোর, মত্ত। এমন অপূর্ব রাত দেখে শ্যাম প্রেমের খেলায় নামলেন; কুলবতীদের মন হরণের জন্য পঞ্চম তানে বাঁশ বাজালেন। গোপীগণ সেই প্রেম-বংশী শুনে মনে মনে আপনাদের বংশীধারীর কাছে সমর্পণ করে যেখান থেকে

বাঁশি বাজছিল সেদিকে চললেন। তাঁরা আপন গৃহ, আপন দেহের আভরণ সজ্জার কথা বিস্মৃত হলেন। এক চোখে হয়ত কাজল পরেছেন, একটি কাঁকণ বাহুতে দিয়েছেন, কর্ণে হয়তো বা একটি কুণ্ডল তুলিয়েছেন। যুবতিগণ বেগে কৃষ্ণের কাছে ছুটে চলেছেন, নীবিবন্ধ শিথিলছন্দ হয়ে পড়েছে। বসন চোলি খসে পড়ছে, লোল বেনী বিগলিত হয়ে পড়ছে।

শব্দ চয়নে এ পদে কবি যে কতটা দক্ষতা দেখিয়েছেন ভাবতে বিস্ময় বোধ হয়। 'বিসরি গেহ…বিগলিত বেনি লোলনি' চিত্ররূপের মনোহারিত্বও অতুলনীয়। প্রেমলোভাতুর কুলবতীদের আত্মবিস্মরণ, পরম প্রেমিকের কাছে পৌছানোর ব্যাকুল চঞ্চলতা কবি যেন প্রত্যক্ষ দেখে গভীর রঙের তুলির টানে সেটি চিত্ররূপে ফুটিয়ে তুলছেন। প্রেমাবেগের গতি-চঞ্চলতাকে এমনভাবে ভাষাচিত্রে প্রকাশ বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসে যে স্ফূর্তি পেয়েছে, অন্যত্র ততটা নহে।

এই প্রসঙ্গে রাসমিলনে কৃষ্ণ-রাধার যে তুলনাত্মক রূপচিত্রালেখ্য এঁকেছেন সেই পদটিও উদ্ধৃতি যোগ্য।—

ও নবজলধর অঙ্গ।
ইহ থির বিজুরি তরঙ্গ॥
ও বর মরকত ঠান।
ইহ কাঞ্চন দশবাণ॥
রাধামাধব মেলি।
মুরতি মদনরস কেলি॥
ও তনু তরুণ তমাল।
ইহ হেম যূথি রসাল॥
ইহ নব পদুমিনি সাজ।
ও মত্ত মধুকর রাজ॥
ও মুখ চান্দ উজোর।
ইহ দিঠি লুবধ চকোর॥
অরুণ নিয়ড়ে পুন চন্দ।
গোবিন্দদাস রহু ধন্দ॥ [২৭০]

'ওখানে (শ্যামের) নবীন মেঘের অঙ্গ, এখানে (রাধা যেন) তরঙ্গিত স্থির বিদ্যুৎ। ওখানে (কৃষ্ণ) সুন্দর মরকত মনিদ্যুতিম, এদিকে

(রাধা) দশবার ধৌত কাঞ্চন। রাধামাধব মিলে মদন রসবিলাসের মূর্তি পরিগ্রহ করেছেন। ওদিকে (কৃষ্ণের) তরুণতমাল-তনু, এদিকে (রাধা) স্বর্ণবরণ রসময় যূথিপুষ্প। এর (রাধার) নব পদ্মিনীর সাজ, ও (কৃষ্ণ) মত্ত মধুকরদের রাজা। ও মুখ (কৃষ্ণের) উজ্জ্বল চাঁদ, এদিকে (রাধার) লুব্ধ চকোরের দৃষ্টি। অরুণের (রাধার কপালের সিন্দুরবিন্দু) নিকটে পূর্ণচাঁদ (কৃষ্ণ মুখ)। গোবিন্দদাস দেখে ধাঁধায় রইলেন।'

শুক এবং শারী (অথবা কৃষ্ণ-সখা ও রাধা-সখী) উক্তিপ্রত্যুক্তির Antithesis বা প্রতিবিন্যাসধর্মী সংলাপে রাঁধা-কৃষ্ণ উভয়ের মিলনদৃশ্যের ছবি এঁকেছেন। ইতিপূর্বেও গোবিন্দদাসের অনেক পদে নাট্যসংলাপ-ধর্মের প্রয়োগ লক্ষ্য করেছি। এ-পদটিও তার সার্থক দৃষ্টান্ত। নায়ক-নায়িকার প্রেম-ঐশ্বর্যের উজ্জ্বলতা বর্ণনার মধ্যে যেন উল্লসিত হয়ে উঠেছে এখানে।

রসোদ্গার

রসোদ্গার চিত্রণে গোবিন্দদাস বিদ্যাপতিরই যোগ্য শিষ্য ছিলেন বলা যেতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের আপ্তদূতী রাধার কাছে এসে কৃষ্ণের রাধা-বিরহের বর্ণনা দিয়ে বলছেন,—

যতনহি মেঘ মল্লার আলাপই
তিমির পয়ানক আশে।
আওত জলদ ততহি উড়ি যাওত
উতপত দীঘ নিশাসে॥ [২৩৭]

'তিমিরাভিসারের আশায় কৃষ্ণ সযত্নে মেঘমল্লার আলাপ করছিলেন ; আকাশে মেঘ এসেও ছিল ; কিন্তু বিরহীর উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে তা আবার মিলিয়ে গেল।'

এমন সংবাদের [illegible] রাধাকেই কৃষ্ণমিলনে যেতে হয়। সখীরা তাই নিয়ে ঠাট্টা করছেন শ্রীমতীকে।—

চৌদিকে চকিত নয়নে ঘন হেরসি
ঝাঁপসি ঝাঁপল অঙ্গ।
বচনক ভাঁতি বুঝই নাহি পারিয়ে
কাঁহা শিখলি ইহ রঙ্গ॥
সুন্দরি কী ফল পরিজনে বাঁচি।
শ্যাম সুনাগর গুপত প্রেমধন
জানলুঁ হিয়া মাহা সাঁচি॥ ধ্রু॥

এ তুয়া হাস মরম পরকাশই
প্রতি অঙ্গ ভঙ্গিম সাখী
গাঁঠিক হেম বদন মাহা ঝলকই
এত দিনে পেখলুঁ আঁখি ॥
গহন মনোরথে পন্থ না হেরসি
জীতলি মনমথ রাজ।
গোবিন্দদাস কহই ধনি বিরমহ
মৌনহি সমুঝলুঁ কাজ ॥ [৫৮৪]

'(সখি বলছেন রাধাকে,) চতুর্দিকে চকিত দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে চলেছিস, আবৃত অঙ্গ পুনরায় আবৃত করছিস্,—এত রঙ্গ কোথায় শিখেছিস। সুন্দরি, আপনজনকে বঞ্চনা করে কি লাভ। শ্যাম-নাগর-রূপ গুপ্ত প্রেমধন হৃদয়ে সঞ্চিত করে রেখেছিস্। তোর এই হাসি মর্মকে প্রকাশ করছে; প্রতি অঙ্গভঙ্গি তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করলাম আঁচলে সোনা লুকানো থাকলে মুখে তার ঝলক দেখা দেয়। গহন মনের অভিপ্রায়ে পথ দেখতে পাচ্ছিস্না (অর্থাৎ গোপন ধন নিয়ে এত আকুল হয়েছিস যে এখন কি করবি কোন পথে চলবি পথ পাচ্ছিস না)। মন্মথকে তুই জয় করেছিস্। (রাধা প্রত্যুত্তর দেবার চেষ্টা করলে সখীদের মুখপাত্ররূপে) গোবিন্দদাস বলছেন, ধনি, তুমি থাম, তোমার মৌনতা থেকেই সব বুঝে নিয়েছি।'

এ-সব পদের বাংলা করতে গিয়ে মনে হয় কবির ভাষায় যে অভিব্যক্তি প্রকাশিত হয়েছে, যে চিত্ররূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে, গ[illegible]সীমাবদ্ধ ভাষা তার সবটুকু ব্যঞ্জনা প্রকাশে অক্ষম। কবি চিত্ররূপাঙ্কনে যখন লেখেন, 'চৌদিকে চকিত নয়নে ঘন হেরসি ঝাঁপসি ঝাঁপল অঙ্গ', যখন রাধার কৃষ্ণপ্রেম-সৌরভ ও দ্যুতিলাবণ্যের পরিচয় দিতে গিয়ে অসঙ্গতি অলঙ্কার ব্যবহার করে লেখেন 'গাঁঠিক হেম বদন মাহা ঝলকই এতদিনে পেখলুঁ আঁখি' নিছক গদ্যভাষায় এর ভাব-ব্যঞ্জনা প্রকাশ অসম্ভব বলেই মনে হয়।

রসোদ্গারের আর একটি পদ উদ্ধৃত করি,—

যব হরিপাণ- পরশে ঘন কাঁপসি
ঝাঁপসি ঝাপল অঙ্গ।

তব কিয়ে ঘন ঘন মণিময় আভরণ
বেশ পসাযনি রঙ্গ ॥
এ ধনি অবহুঁ না সমুঝসি কাজ।
যাহে বিনু জাগরে নিদহুঁ না জীবসি
তাহে কিহে এত ভয় লাজ ॥
করইতে কোরে জোরি তনুবল্লবি
নহি নহি বোলসি থোর।
চুম্বন বেরি জনু মুখ মোড়সি
জনি বিধু-লুবধ চকোর ॥
যব হোয়ে নাহ- রতন বত-আরত
বারত জনি অভিলাষ।
গোবিন্দদাস কহ নহ বহুবল্লভ
কৈছে রহত নিজ পাশ ॥ [৫৮৭]

'সখিরা তিরস্কার ছলে রাধাকে বলছেন, 'হরির করস্পর্শে যখন এত কেঁপে উঠিস্, অঙ্গের সংবৃত বসন আরও সংবৃত করিস তখন এত মণিময় আভরণ, বেশ প্রসাধনের রঙ্গ কেন? ধনি, তোর কাজকর্ম বুঝতে পারি না; যাকে না পেলে জাগরণে নিদ্রায় বেঁচে থাকতে পারিস না, তাকে আবার এত লাজভয় কেন? কোলে করলে তনুলতা এলিয়ে, মৃদুভাবে না না বলিস; চুম্বনের বেলায় চন্দ্রসুধা-লুব্ধ চকোরের ন্যায় মুখ ঘুরিয়ে নেবার ছলনা করিস। যাই করিসনা কেন, নাগররত্ন যখন রা[illegible]ী হবেন তখন যেন নিবারণ করিস না, গোবিন্দদাস বলছেন, না হলে বহুবল্লভকে নিজেব কাছে কিভাবে ধরে রাখবি?'

এখানে সখিরা রাধার কৃষ্ণানুরাগ নিয়ে তাকে স্নেহতিরস্কার ছলে শিক্ষা দিচ্ছেন। কিছুটা যেন চপল লঘু সুর উপলব্ধি করা যায়। আর একটি পদে দেখি কানু-প্রেমানুরাগিনীর নিবিড় অনুভূতির অতলস্পর্শিতা।—

হৃদয়মন্দিরে মোর কানু ঘুমাওল
প্রেম-প্রহরি রহু জাগি।
গুরুজন গৌরব চৌর-সদৃশ ভেল
দূরহি দূরে বহু ভাগি ॥ [৫৭৬]

'হৃদয়মন্দিরে আমার কানু ঘুমিয়ে আছে, প্রেম-প্রহরী জেগে পাহারা দিচ্ছে। চোর সদৃশ গুরুজন-গৌরব দূর থেকে দূরে পালিয়ে গেল।'

আর একটি পদে নিন্দাছলে স্তুতিমূলক চমৎকারী উপমা দিয়ে বলছেন,—

কাজর ভ্রমর তিমির জনু তনু-রুচি
নিবসই কুঞ্জকুটীব।
বাঁশি-নিশাসে মধুর বিষ উগবই
গতি অতি কুটিল সুধীর॥
শুন সজনী কানু সে ববজ-ভুজঙ্গ।
সো মঝু হৃদয়-চন্দন রুহে লাগল
ভাগল ধবম-বিহঙ্গ॥ [৫৯১]

'কাজল, ভ্রমর, তিমিরেব মত তনু-রুচি, কুঞ্জকুটিরে সে বাস কবে। বাঁশির নিঃশ্বাসে সে মধুর বিষ বমন কবে, গতি তার কুটিল অথচ সুধীব। সখি শোন, কানু সেই ব্রজের বিহঙ্গ।—সে আমার হৃদয়-চন্দনবৃক্ষে লেগে বয়েছে, ধর্ম-বিহঙ্গ পালিয়ে গেল।'

এই ভিন্নধর্মী মেজাজের নানা পদেই মূল একটি বক্তব্য ঠিক রযেছে, রাধা কৃষ্ণের তাব প্রতি প্রেম নিয়ে এবং কৃষ্ণের প্রতি তার নিজের অনুবাগ নিয়ে গৌবব বোধ করছেন এবং সেই গৌববোক্তি নানাছলে সকলকে না শুনিয়ে স্বস্তি পাচ্ছেন না।

রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমবৈচিত্ত্যেব কয়েকটি উৎকৃষ্ট পদ লিখেছেন গোবিন্দদাস। একটি পদে লিখেছেন, ধনি রাই শ্যামকে কোলে করে শুয়েছেন, প্রেমালসে দুজনে বিভোর। ভুজে ভুজে নিবিড় আলিঙ্গন-বন্ধন, যেন মণিকাঞ্চনের সংযোগ! এই অবস্থায়ই রাধা কানু-বিরহের বিলাপ করছেন।—

প্রেম বৈচিত্ত্য

কোরহি শ্যাম চমকি ধনি বোলত
কবে মোহে মীলব কান।
হৃদয়ক তাপ তবহিঁ মঝু মীটব
অমিয়া করব সিনান॥ [৬০৩]

কবি এই প্রেমবৈচিত্ত্যের স্বরূপ কিরূপে ব্যাখ্যা করবেন?—আর একটি পদে উপমা দিয়ে বলছেন,—

এ সখি আরতি কহনে না যাই।
আঁচলক হেম আঁচলে রহু যৈছন
খোঁজি ফিরত আন ঠাঞি॥ [৬০৫]

প্রেমবৈচিত্ত্যের ধর্মীয় দার্শনিক ব্যাখ্যার কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কাব্যের দিক থেকে পরম আনন্দক্ষণে পরম দুঃখের অনুভূতির একটি বিশেষ মূল্য রয়েছে। কালিদাসের 'রম্যাণি বীক্ষ মধুরাংশ্চ নিসম্য শব্দান্' বা 'মেঘালোকে ভবতি সুখিনাঽপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ' শ্লোকগুলি এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। বিদ্যাপতি তাঁর অনুপম একটি পদেও অনুরূপ ভাবব্যঞ্জনার পরিচয় দিয়েছেন (দ্র. জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ)। জ্ঞানদাসের' 'দুহু কোরে দুহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া' পদটির কথাও মনে পড়ে। গোবিন্দদাস উল্লাস-আনন্দের মিলনোৎসুকা রাধার চিত্রাঙ্কণেই বেশী আনন্দ পান সত্য, তবু প্রেমবৈচিত্ত্যের পদগুলিতে যে দূরপ্রসারী মিলন-বিরহের ব্যঞ্জনা দিয়েছেন তার মূল্যও কম নয়।

বিরহ

বিরহ-চিত্রণে বিদ্যাপতি অতুলনীয়। সে তুলনায় গোবিন্দদাসের কৃতিত্ব কম। অবশ্য ড. মজুমদারের সংকলনে ৬১টি বিরহের পদ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং তার মধ্যে কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক পদও রয়েছে। ড. মজুমদার সজনীকান্ত দাসের পুঁথি থেকে গোবিন্দদাসের একটি নূতন পদ উদ্ধৃত করেছেন, তাতে বিষ্ণুপ্রিয়ার উক্তিতে বিরহের গৌরচন্দ্রিকা পরিস্ফুট হয়েছে।—

আজু কেনে আরে সখি তনু মোর কাঁপ।
নিরবধি লোরে নয়নযুগ ঝাঁপ॥
অকুশলসূচক তব কাহে হেরি।
মনছন কাহে করু বেরি॥

যব হাম হেরনু গৌউর বয়ান।
তৈখনে পুন পুন অরুণ নয়ান॥
তৈখনে বুঝনু বচন বিশেষ।
গোরা মুঝেছোড়ি চলব দূরদেশ॥

তব হাম ছোড়ব জিবনক সাধ।
গোবিন্দ দাস কহে বড় পরমাদ।। [৬১২]

'সখি, আজ কেন আমার তনু কাঁপছে। নিরন্তর অশ্রুতে চোখদুটি কাঁপছে। অকুশলসূচক কেন তোমায় দেখি। ফিরে ফিরে মন কেন খারাপ করছে। যখন আমি গৌরের মুখ দেখলাম তখনই তাঁর চোখ অরুণ (কান্নায়)। তখনি বিশেষ কথাটি বুঝলাম, গোরা আমায় ছেড়ে দূরদেশে চলে যাবে। তখন আমি জীবনের আশা ছাড়ব। গোবিন্দদাস এতে বড়ই প্রমাদ গণছেন।'

গোবিন্দদাসের যেরূপ ভাষা ও ছন্দেব উপর অসাধারণ দখল ছিল তাতে সন্দেহ হয়, এ পদটি সত্যই তাঁব লিখিত হলে পাঠ অত্যন্ত বিকৃত হয়ে আমাদেব হাতে এসে পৌঁছেছে।

একটি পদে রাধার বিরহ-বিলাপেব সুরটি মর্মস্পর্শী ভাষা ও ভাবে কি চমৎকাব ফুটে উঠেছে লক্ষণীয়।—

শুনলহু মাথুব চলত মুরারি।
চলতহিঁ পেখলোঁ নয়ন পসারি॥
পালটি নেহারিতে হাম রহুঁ হেরি।
শূন্য মন্দিরে আয়ল ফেরি॥
দেখ সখি নীলজ জীবন মোই।
পিরিতি জানায়ত অবঘন রো[illegible]
সো কুসুমিত বন কুঞ্জ -কুটীর।
সো যমুনা-জল মলয় সমীর॥
সো হিমকর হেরি লাগএ চঙ্ক।
কাহ্নু বিনু জীবন কেবল কলঙ্ক॥
এতদিনে জানলু বচনক অন্ত।
চপল প্রেম থির জীবন দুরন্ত॥
তাহে অতি দুরজন আশকি পাশ।
সমতি না আওত গোবিন্দদাস॥ [৬২৬]

'শুনলাম মুরারি মথুরায় চলেছেন। নয়ন প্রসারিত করে তাকে চলে যেতেও দেখলাম তিনি ফিরে তাকাতে আমি তাকিয়েই রইলাম। শূন্য মন্দিরে ফিরে এলাম। সখি দেখ, আমার জীবন কি নির্লজ্জ! কেঁদে কেঁদেই প্রেম জানায়। সেই কুসুমিত বন, কুঞ্জকুটির, যমুনার জল, মলয় সমীর। সেই চন্দ্র যা দেখে আমার আনন্দ হত। কানু বিনে সব জীবনটাই কলঙ্কময়। এতদিনে সত্যকথা জানলাম, প্রেমই চপল, দুরন্ত জীবন স্থির। তাতে আবার আশার বন্ধন অতি দুর্জন। রাধার এই সিদ্ধান্তে গোবিন্দদাসের ঠিক মনের সম্মতি আসছে না।'

এখানে রাধার তীব্র বিরহানুভূতির বাচনভঙ্গি কত তীক্ষ্ণ, স্পষ্ট, ব্যঞ্জনাময় সংক্ষিপ্ত। প্রথম কৃষ্ণের চলে যাওয়ার সময়কার বর্ণনা, তারপর পিছনের প্রেম চিহ্নাঙ্কিত বৃন্দাবনের স্মৃতি-চিত্রণের বেদনাময় শূন্যতা, সবশেষে আত্মধিকার। সেই সঙ্গে মিছা আশার মোহ সম্পর্কে অনুভূতি। সব মিলিয়ে পদটিতে রাধার জীবন-ট্রাজেডির একটি পূর্ণ চিত্র এঁকেছেন কবি।

কৃষ্ণ বিরহের আর্তি গোবিন্দদাস আর একটি পদেও চমৎকার ভাবব্যঞ্জনায়, সার্থক উপমায় প্রকাশ করেছেন,—

প্রেমক অঙ্কুর জাত আত ভেল
না ভেল যুগল পলাশা।

প্রতিপদ-চাঁদ উদয় যৈছে যামিনি
সুখ লব ভৈ গেল নৈরাশা।।

সখি হে অব মোহে নিঠুর মাধাই।
অবধি রহল বিছুরাই।।

কো জানে চাঁদ চকোরিণি বঞ্চব
মাধবি মধুপ সুজান।

অনুভবি কানু পিরিতি অনুমানিয়ে
বিঘটিত বিহি নিরমাণ।।

পাপ পরাণ আন নাহি জানত
কানু কানু করি ঝুর।
বিদ্যাপতি কহ নিকরুণ মাধব
গোবিন্দদাস রস-পুর ॥[১] [৬২৮]

'প্রেমের অঙ্কুর জন্মাতেই (রোদের) উত্তাপ হল, দুটি কচি পাতা আর মেলতে পারল না। যেমন রাতে প্রতিপদের চন্দ্রোদয় তেমনি সুখ-আশা নিরাশায় পর্যবসিত হল। সখি, মাধব এখন নিষ্ঠুর হয়েছেন। কতদিন আমায় ভুলে আছেন। চাঁদ যে চকোরীকে এবং সুজন মধুপ মাধবীকে বঞ্চনা করবে কে জানত! কানুপ্রীতি অনুভব করে অনুমান করছি বিধির রচনা-কৌশল বিস্মিত হয়েছে। পাপ প্রাণ আর কিছুই জানেনা, কানু কানু করেই কাঁদে। বিদ্যাপতি বলেন মাধব বড় নিষ্ঠুর, গোবিন্দদাস বলেন তিনি রস-পূর্ণ।

অলঙ্করণ-চমৎকারিত্বের ভিতর দিয়ে কবি এখানে রাধার বিরহের বেদনাময় ছবিটি অঙ্কিত করেছেন। সবশেষে ভণিতায় যোগ করেছেন, বিদ্যাপতি মাথুরের

ডঃ মজুমদার ব্যাখ্যার আলোচনা

১। ড, মজুমদার এই পদের শেষ পংক্তির ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'বিদ্যাপতি বলেন, মাধব নিষ্ঠুর; গোবিন্দদাস এই রস পুরণ করিলেন।' এরপর মন্তব্য দিয়েছেন 'গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির কোন্ পদের রস পুরণ করিয়াছেন তাহা নির্ধারণ করা গেলনা। নিম্নলিখিত পদাংশের সহিত আলোচ্য পদের কিছু কিছু মিল দেখা যায়: 'নিঠুর পুরুস পিরীতি···[মিত্র-মজুমদার ৫২৬]।'

মনে হয় শেষ পংক্তির ওই ব্যাখ্যার জন্যই তিনি অনুরূপ গোবিন্দদাস-কৃত রস-পূরণের পদ খুঁজে পাননি। দূতীরা বিরহিনী রাধার সঙ্কট-দশায় মথুরায় কৃষ্ণকে ফিরিয়ে আনতে গিয়ে তাঁর প্রতি যেসব সুযোগ করেছেন তার একাধিক সার্থক প[illegible]প্রতি (দ্র. ৭৩৫, ৭৩৭, ৭৪৪ ৭৪৭) মাধবকে নিঠুর বলে গণ্য করেছেন। দুএকটি ভণিতা উদ্ধৃত করি।

১। বিদ্যাপতি কহ নিকরুণ মাধব বুঝলুঁ কুলিসক সার ॥ [৭৩৫]

২। বিরহ বেদন কি তোহে কহব সুনহ নিঠুর কান।
ভন বিদ্যাপতি সে যে কুলবতী জীবন সংসয় জান ॥ [৭৪৪]

৩। ভনই বিদ্যাপতি সুন বর কান।
বুঝলুঁ তুঅ হিয়া দারুণ পসান ॥ [৭৪৭]

বিদ্যাপতি রাধার প্রতি কানুর নিষ্ঠুর ব্যবহারে রাধার পক্ষ নিয়ে তাকে নিষ্ঠুর বলে অনুযোগ করেছেন, চৈতন্যোত্তর গৌড়ীয় তত্ত্বাশ্রিত বৈষ্ণব কবি কৃষ্ণের এই আদর্শনের অন্তর্গত গূঢ় রহস্য জানেন। সে কারণেই মাধবকে 'রসপুর' বলে অভিহিত করেছেন।

কানুকে নিষ্ঠুর বলেন, কিন্তু গোবিন্দদাস তাকে রস-পূর্ণ বলেই জানেন। বিরহ প্রেমকে আরও গভীরতা দেয়, রূপকে অতিক্রম করে রূপাতীত সত্ত্বায় সুন্দরকে হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে,—এ সত্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব কবিরা ধর্ম-দর্শনের মধ্যেই উপলব্ধি করেছিলেন। তাই গুরুর আপাত বক্তব্যের সঙ্গে শিষ্যের অনুভূতির এই পার্থক্য।

বিরহ পর্যায়ে সর্বশেষে কবির একটি তত্ত্ব-দর্শনের পদ উদ্ধৃত করি। এ-পদে কবি ও দার্শনিকের কি অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে লক্ষনীয়।—

যাঁহা পহুঁ অরুণ চরণে চলি যাত।
তাঁহা তাঁহা ধরণি হইয়ে মঝু গাত॥
যো সরোবরে পহুঁ নিতি নিতি নাহ।
হাম ভরি সলিল হোই তথি মাহ॥
এ সখি বিরহ মরণ নিরদন্দ।
ঐ ছনে মিলই যব গোকুল চন্দ॥
যো দরপনে পহুঁ নিজমুখ চাহ।
মঝু অঙ্গ জোতি হই তথি মাহ॥
যো বীজনে পহুঁ বীজই গাত।
মঝু অঙ্গ তাহি হোই মৃদু বাত॥
যাঁহা পহুঁ ভরমই জলধর-শ্যাম।
মঝু অঙ্গ গগন হোই তছু ঠাম॥
[illegible]দাস কহ কাঞ্চন-গোরি।
সো মরকত-তনু তোহে কিয়ে ছোড়ি॥[1] [৬৬৯]।

'প্রভু যেখানে অরুণ পা ফেলে চলে যান সেই সেই স্থানের মাটি যেন আমার দেহ (অর্থাৎ দেহের পঞ্চভূতের ক্ষিতি অংশ) হয়। যে সরোবরে প্রভু প্রতিদিন স্নান করেন আমি যেন তাতে জল (অর্থাৎ দেহের অপ অংশ) হয়ে ভরে থাকি। সখি, যখন গোকুলচন্দ্রের সঙ্গে এই ভাবে মিলিত হতে পারি বিরহ এবং মৃত্যুর বিরোধের অবসান হয়। যে দর্পণে প্রভু নিজ মুখ দেখেন আমার অঙ্গজ্যোতি (অর্থাৎ তেজ-অংশ) যেন তাতে মিশে থাকে। যে পাখায় প্রভু

১। পদটির কিছুটা ভিন্নতর পাঠ বৈষ্ণবপদাবলী (চয়ন), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬২ সংস্করণে বিধৃত হয়েছে।

বাতাস খান তাতে আমার অঙ্গ যেন বায়ু (অর্থাৎ মরুৎ-অংশ) হয়ে মিশে থাকে। জলধর শ্যাম যেখানে ভ্রমণ করেন আমার অঙ্গ যেন সেখানে গগন (অর্থাৎ ব্যোম-অংশ) হয়ে থাকে। গোবিন্দদাস বলেন, হে সোনার দেহ গৌরী, সেই মরকত-দেহী কৃষ্ণ কি তোমায় ছাড়বেন।'

এই দেহ পঞ্চভূতে তৈরী। কৃষ্ণ বিরহে রাধা সেই দেহকে বিলীন করে কৃষ্ণ যে পঞ্চভূতে বিচরণ করেন তারই সঙ্গে লীন হয়ে কৃষ্ণ-সঙ্গ লাভ করতে চান। এই ভাবটি নিয়ে উজ্জ্বল নীলমণিতে রূপগোস্বামী লিখেছেন,—

পঞ্চত্বং তনুরেতু ভূতনিবহাঃ স্বাংশে বিশন্তিস্ফুটং
ধাতারং প্রণিপত্য হন্ত শিরসা তত্রাপি যাচে বরম্।
তদ্‌বাপীষু পয়স্তদীয়মুকুরে জ্যোতিস্তদীয়াঙ্গনে
ব্যোম্নি ব্যোম্ তদীয়বর্ত্মনি ধরা তত্তালবৃন্তেঽনিলঃ ॥'

'এই দেহ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়ে স্পষ্টই আকাশ প্রভৃতি পঞ্চভূতে প্রবেশ করে। আমি মাথা নত করে ধাতাকে প্রণিপাত করে এই বর চাই, কৃষ্ণ যে দীঘিতে স্নান করেন তার সলিল, যে মুকুরে মুখ দেখেন তার তেজ, যে অঙ্গনে ঘোরেন তার ব্যোম,—তারচ লার পথের ধরা এবং তালবৃন্তের অনিল যেন হতে পারি।'

এই বক্তব্যকেই গোবিন্দদাস তার নিজের ভাষায় সাজিয়েছেন। রাধা কৃষ্ণ-বিরহে আর বেঁচে থাকতেও চান না, কিন্তু মৃত্যু হলে যে কৃষ্ণের সঙ্গে ব্যবধান রচিত হবে তাই বা সহ্য করবেন কিরূপে! এই বিরহ ও মরণের কোনটিই সহনীয় নয়।—সেখানে মৃত্যুর ভেতর দিয়ে কি ভাবে প্রিয়তমের সঙ্গে পঞ্চভূতে বিলীন অবস্থায় মিলিত হতে পারেন তারই অভিনব পন্থা উদ্ভাবন করেছেন।

গোবিন্দদাস ভাবোল্লাস এবং প্রার্থনারও অল্প কয়েকটি পদ রচনা করেছেন। তবে সেখানে তার প্রতিভার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয় না।

প্রাচীন বাংলা কাব্যে ছন্দ ও অলঙ্করণের ঐশ্বর্যে,—বাণীদেহের মণ্ডন-শিল্পকলার ঐশ্বর্যে বৈষ্ণব পদাবলীর তুলনা নেই। পদাবলীর এই ধ্বনিগত এবং বাক্‌ভঙ্গিগত ঐশ্বর্য-সৃজনে বিদ্যাপতি এবং গোবিন্দদাসের

অলঙ্কার

দানই সর্বাধিক। এই গঠন-বৈচিত্র্য বিষয়ক বিশদ আলোচনা পরবর্তী একটি অধ্যায়ে পৃথকভাবে করা

১। শ্লোকটির পাঠ ডঃ মজুমদারের 'গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ' গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

হল। এখানে কবির প্রখ্যাত কয়েকটি অলঙ্কার-ও ছন্দ-নির্মিতি কৌশলের উদাহরণ তোলা যেতে পারে। শব্দালঙ্কারের দৃষ্টান্ত 'চিত্রগীত' পর্যায়ে উদ্ধৃত করেছি। এখানে অর্থালঙ্কারের নিদর্শন তুলছি।—

(১) উৎপ্রেক্ষা (বাচ্য):

নব নীরদ তনু তড়িত লতা জনু পীত পতনি বনি ভাল। [১৬০]

উৎপ্রেক্ষা বৈষ্ণব পদাবলীর একটি বহুল ব্যবহৃত সুপরিচিত অলঙ্কার। এখানে বাহুল্যবোধে বেশী উদাহরণ তোলা হল না।

(২) রূপক

নীরদ নয়নে :নীরঘন সিঞ্চনে **পুলক-মুকুল** অবলম্ব।
স্বেদ মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত বিকশিত **ভাব-কদম্ব** ॥ [১১]

(৩) রূপক কাব্যলিঙ্গ :

যো তুহুঁ হৃদয়ে প্রেমতরু রোপলি শ্যাম জলদরস আশে।
সো অব নয়ন নীর দেই সিঞ্চহ কহতহি গোবিন্দদাসে ॥ [৫০৬]

কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কারে বাক্যের অর্থের মধ্যে হেতুত্বের বোধ থাকবে, কিন্তু হেতুত্ববোধক শব্দের ব্যবহার থাকবে না। কবি ব্যঞ্জনাময় এই অঙ্কনের সাহায্যে রাধার কৃষ্ণ-বিরহ চিত্রটি ফুটিয়ে তুলেছেন।

(৪) ধ্বনিগর্ভ অতিশয়োক্তি :

আধক আধ আধ দিঠি অঞ্চলে যব ধরি পেখলুঁ কান।
কত শত কোটি কুসুমশরে জরজর রহত কি যাত পরাণ ॥ [২০৪]

অতিশয়োক্তির বহুবিধ উৎকৃষ্ট উদাহরণ বৈষ্ণব পদাবলীতে, বিশেষ করে বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদা[illegible]দাবলীতে পাওয়া যায়।

(৫) মালা ব্যতিরেকে :

অঞ্জন গঞ্জন জগজন রঞ্জন জলদপুঞ্জ জিনি বরণা।
তরুণারুণ থল-কমল দলারুণ মঞ্জির রঞ্জিত চরণা ॥
দেখ সখি নাগর রাজ বিরাজে।
শুধই সুধারস হাস বিকাশিত চাঁদ মলিন ভেল লাজে ॥
ইন্দীবর বর গরব বিমোচন লোচন মনমথ ফান্দে।...[১৫৮]

উপমেয়কে উপমান থেকে বাড়িয়ে তুললে ব্যতিরেক। উদ্ধৃতিটিতে পর পর চারটি উপমায় চারটি ব্যতিরেক ব্যবহার করে কবি কৃষ্ণরূপের শ্রেষ্ঠত্ব ফোটাতে

চেয়েছেন। ব্যতিরেক বৈষ্ণব কবিদের, বিশেষ করে গোবিন্দদাসের একটি প্রিয় অলঙ্কার।

(৬) মালা নিদর্শনা :

যাঁহা যাঁহা নিকসই তনু তনুজ্যোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরি চমক মতি হোতি ॥
যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণ চল চলই।
তাঁহা তাঁহা থলকমলদল খলই ॥...
যাঁহা যাঁহা ভঙুর ভাঙু বিলোল।
তাঁহা তাঁহা উছলই কালিন্দি হিলোল ॥
যাঁহা যাঁহা তরল বিলোচন পড়ই।
তাঁহা তাঁহা নীল উতপল ভরই ॥
যাঁহা যাঁহা হেরিয়ে মধুরিম হাস।
তাঁহা তাঁহা কুন্দ কুমুদ পরকাশ ॥ [২২৪]

এখানে অসম্ভব বস্তু-সম্বন্ধ দেখিয়ে কবি পরপর পাঁচটি নিদর্শনার মালা গেঁথেছেন। এ উদাহরণ-মালায় অতিশয়োক্তিরও আভাস সুস্পষ্ট।

(৭) প্রতিবিন্যাস : ও নব জলধর অঙ্গ।
ইহ থির বিজুরি তরঙ্গ ॥
ও বর মরকত কান।
ইহ কাঞ্চন দশবাণ ॥... [২৭৯]

সমগ্র পদটিই এই ভাবের antithesis বা বিরুদ্ধবিন্যাস অলঙ্কারে গ্রথিত হয়েছে।

(৮) অসঙ্গতি : নখপদ হৃদয়ে তোহারি।
অন্তর জ্বলত হামারি ॥
অধরহি কাজর তোর।
বদন মলিন ভেল মোর ॥ [৪৪৩]

এ পদে কবি কারণ এক জায়গায় এবং কার্য অন্যত্র বিন্যস্ত করে অসঙ্গতি অলঙ্কারের মালা তৈরী করেছেন।

(৯) ব্যাজস্তুতি : সুনয়নী কহত কানু ঘন-শ্যামর
মোহে বিজুরিসম লাগি।
রসবতী তাক পরশরসে ভাসত
হামারি হৃদয়ে জলু-আগি ॥ [২০৪]

এখানে সুনয়নী, রসবতী ঈষৎ ব্যঙ্গার্থে প্রযুক্ত হয়েছে, তাতেই ব্যাজস্তুতির ব্যঞ্জনা (স্তুতিচ্ছলে নিন্দা) সুন্দর প্রকাশ পেয়েছে।

ছন্দ-বৈশিষ্ট্য

ছন্দের ধ্বনিস্পন্দ এবং যতি-বিন্যাসে গোবিন্দদাস যে চমৎকারিত্ব দেখিয়েছেন সমগ্র বৈষ্ণব পদাবলীতে আর কোনও কবিই ততটা প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেননি। এদিক থেকে তিনি কবি জয়দেব এবং বিদ্যাপতির সঙ্গে তুলনীয়। ব্রজবুলি গানে বিদ্যাপতিকেই অনুসরণ করেছেন, লঘু-গুরু উচ্চারণ সমন্বিত মাত্রাবৃত্ত ব্যবহার করেছেন। বাংলা পদগীতি ছন্দের দিক থেকে অপেক্ষাকৃত বৈচিত্র্যহীন, সেখানে মুখ্যতঃ অক্ষরবৃত্ত পয়ার-ত্রিপদীর ব্যবহার করেছেন। মাত্রাবৃত্ত থেকেই এখানে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।—

(১) পাদাকুলক : ৪ । ৪ ॥ ৪ । ৪ 1,
মন্দির। বাহির ॥ কঠিন ক। পাট 1
চলইতে। শঙ্কিল ॥ পঙ্কিল। বাট 1 [৩৫৩]

বস্তুত এ-ছন্দোবন্ধ থেকেই বাংলা পয়ারের রূপাদর্শ (Pattern) গড়ে উঠেছে।

(২) নরেন্দ্রবৃত্ত : ৭ ॥ ৯ ॥ ৮ ॥ ৪ (২) 1
চম্পক শোন ॥ কুসুম কনকাচল ॥
জিতল গৌরতনু ॥ লাবনি রে 1
উন্নত গীম ॥ সীম নাহি অনুভব ॥
জগ মনমোহন ॥ ভাঙনিরে 1 [৩]

এখানে ৭॥৯॥৮॥৪ মাত্রা ভাগের চৌপদী বন্ধে পংক্তিশেষে 'রে' দুমাত্রার সুরের রেশ রক্ষিত হয়েছে। গোবিন্দদাস এবং চৈতন্য-পরবর্তী বহু বৈষ্ণব কবি এই সুপরিচিত ছন্দোবন্ধটির বহুল ব্যবহার করেছেন। বিদ্যাপতির কিছু সংখ্যক পদেও নরেন্দ্রবৃত্তের ব্যবহার লক্ষিত হয়।

১। চিহ্নার্থ : লঘু বা পর্বযতি।, মধ্য বা পদযতি ॥, পূর্ণ বা পংক্তি যতি 1

(৩) চর্চরী : ৩ : ৪ । ৩ : ৪ ।। ৩ : ৪ । ৩ ।

নন্দ : নন্দন । চন্দ : চন্দন ।। গন্ধ : নিন্দিত । অঙ্গ ।
জলদ : সুন্দর । কম্বু : কন্ধর ।। নিন্দি : সিন্ধুর ।। ভঙ্গ ।

[১৬১]

এ-ছন্দের ব্যবহার বিদ্যাপতি করেছেন। আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথ সাতমাত্রা পর্বভাগের যে মাত্রাবৃত্ত ব্যবহার করেছেন তারও পূর্বরূপ এখানে পাওয়া যায়।

(৪) ষন্মাত্রিক ছন্দ : ৬ । ৬ ।। ৬ । ৬ ।। ৬ । ৬ ।। ৬ । ৪ ।

শিথিল ছন্দ । নিবিক বন্ধ ।।
বেগে ধাওত । যুবতি বৃন্দ ।।
খসত বসন । রসন চোলি ।।
গলিত বেনি । লোলনি ।
ততহি বেলি । সখিনি মেলি ।।
কেহু কাহুক । পথ না হেরি ।।
ঐছে মিলল । গোকুল চন্দ ।
গোবিন্দদাস গাওনি ।। । [৫৫৫]

দীর্ঘ চৌপদী ছন্দোবন্ধও সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের বৈষ্ণব কবিরা যথেষ্ট ব্যবহার করেছেন। জগদানন্দের বিখ্যাত পদগুলি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

(৫) একাবলী ৪ । ৪ । ৩ ।

ও নব । জলধর । অঙ্গ ।
ইহ থির । বিজুরি ত । রঙ্গ ।
ও বর । মরকত । ঠান ।
ইহ কা । ঞ্চন দশ । বাণ । [২৯০]

(৬) মিশ্রছন্দ : একাবলী+পাদাকুলক :

নাচত । নবদ্বিপ । চন্দ ।
জগমন । নিমগন ।। প্রেম আ । নন্দ ।
বিপুল পু । লক অব । লম্বে ।
বিকশিত । ভেলতহিঁ ।। ভাব-ক । দম্বে । [১৬]

৭। দূরান্বিত মিলের চৌপদী : ১২ ॥ ১২ ॥ ১২ ॥ ১১ I
ক ॥ ক ॥ খ ॥ গ I
ঘ ॥ ঘ ॥ খ ॥ গ I

দেখত বেকত। গৌর চন্দ ॥
বেঢ়ল ভকত। নখত বৃন্দ ॥
অখিল ভুবন। উজর-কারি ॥
কুন্দ-কনক। কাঁতিয়া I
অগতি-পতিত। কুমুদ-বন্ধু ॥
হেরি উছল। রসক সিন্ধু ॥
হৃদয়-কুহর। তিমির হারি ॥
উদিত দিনহিঁ। রাতিয়া I [১৭]

গোবিন্দদাসের ছন্দ-বৈচিত্র্যের আরও বহু দৃষ্টান্ত দেখানো যেতে পারে। সমগ্র বৈষ্ণব পদাবলীর ছন্দ বিষয়ে একটি পৃথক অধ্যায়ে আলোচনা সন্নিবেশিত হল বলে এখানে সে প্রয়াস থেকে বিরত থাকা গেল।

গোবিন্দদাসের আলোচনা শেষ করার পূর্বে তার প্রতিভার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে দু একটি কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন রয়েছে। বিদ্যাপতির মত গোবিন্দদাসও সচেতন শিল্পী ছিলেন, ভাবতন্ময়তার তুলনায় বহিরঙ্গ রূপচিত্রণের প্রতি তাঁরও অনুরাগ কিছুমাত্র কম ছিল না। তবে চৈতন্য পূর্ববর্তী কবি বিদ্যাপতির পদে রাধারূপের বর্ণনায় মানবীয় প্রেম বিশ্লেষণের যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভাবচিত্র লক্ষ্য করা যায়, চৈতন্য পরবর্তী কবি গোবিন্দদাস সে সকল বর্ণনায় ক্ষেত্রে ভক্তি-তত্ত্বের প্রভাবে অনেকাংশে সংযত হয়েছেন, রূপদক্ষ শিল্পীর সঙ্গে সেখানে বৈষ্ণব-ভক্তের মিলন ঘটেছে। গোবিন্দদাস চণ্ডীদাসের রচনারীতির অনুসরণ করেননি। কেবল ভক্তি-ভাবাবেগ এবং শিল্প ও শিল্পীর সম্পূর্ণ একাত্মতা চণ্ডীদাসের পদাবলীর প্রধান আকর্ষণ। পরিণত শিল্প বোধে (কিছুটা ভিন্নধর্মী হলেও) জ্ঞানদাসও অনেকটা একই পথের পথিক। গোবিন্দদাস সচেতন শিল্পবোধ নিয়ে শিল্পীকে তার শিল্পকর্ম থেকে পৃথক রেখে পদ রচনা করেছেন। সে কারণেই ভাস্করের হাতের মূর্তির ন্যায় একটু একটু করে তার চিত্রে অলকরণ সৌন্দর্য আরোপ করে ধ্বনি, অলঙ্কার ও ছন্দের মোহন সাজে কাব্য-প্রতিমাকে সাজিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি শিল্পীর পৃথক অস্তিত্ব বা সম্বিৎ হারিয়ে কাব্যের ভাবের মধ্যে কদাচিৎ আত্মনিমজ্জন করেছেন। তিনি সম্প্রদায়-বিশেষের ভক্ত কবি ছিলেন, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তিতত্ত্বের দার্শনিকতা তাঁর পদে কিছুটা

সচেতন ভাবেই এসে পড়েছে। কোথাও কোথাও এর ফলে কাব্যসৌন্দর্যও অনেকটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তবু তিনি ভক্তির আবেগে শিল্পীর রূপ-ভোক্তার সত্তাকে বিসর্জন দেননি। রূপদক্ষ, সচেতন শিল্পী সত্তাতেই তাঁর আসল পরিচয়। এ-যুগের অপর বৈষ্ণব কবিদের তুলনায় ভাষা, অলঙ্কার, ছন্দ এবং ধ্বনিময় রূপনির্মিতির ক্ষেত্রে গোবিন্দদাসের প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব সহজেই উপলব্ধি করা যায়। অন্য অনেক কবি যেখানে অলঙ্কার, ছন্দ বা শব্দ ব্যবহারে কাব্য দেহকে অহেতুক ভারাক্রান্ত করে তুলেছেন গোবিন্দদাস সেখানে কাব্যের ঐশ্বর্যপূর্ণ অঙ্গ-সজ্জায় বিশেষভাবে সফল হয়েছেন বলা যেতে পারে। বস্তুত কাব্যদেহের বহির্সজ্জা অন্তরস্থিত ভাবেরই সহায়ক হয়ে ওঠা প্রয়োজন। শিল্পের এই অলঙ্করণ বোধটি বিদ্যাপতি-শিষ্য গোবিন্দদাস যতটা উপলব্ধি করেছিলেন সে যুগে দ্বিতীয় কোনও কবি তেমনটি ধরতে পারেননি। তাঁর কাব্য-তনু নিরাভরণা নয়, সালঙ্কারা,—উজ্জ্বল বর্ণাভরণে আভিজাত্যের গৌরবে যেন ঝলমল করছে। কিন্তু যেমনটি সাজালে সার্থক হয়ে ওঠে, আন্তর গৌরব বহিরঙ্গে ফুটে ওঠে, রসিক শিল্পী শিল্প তত্ত্বের সেই রহস্যটি আয়ত্ত করেছিলেন।—এখানেই তিনি বিদ্যাপতি-ধারায় চৈতন্য-পরবর্তী বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসনের অধিকারী। বিদ্যাপতি-শিষ্য বিদ্যাপতির মতোই সংস্কৃত কাব্য শাস্ত্রে ও নন্দনতত্ত্বে সুপণ্ডিত ছিলেন। বিদ্যাপতি রাধা-রূপের চিত্রাঙ্কনে কবীন্দ্র-বচন-সমুচ্চয়, সদুক্তিকর্ণামৃত, অমরুশতক, সার্ঙ্গধর-পদ্ধতি, গাহা সত্তসঈ, কামসূত্র (বাৎসায়ন), সুভাষিতাবলী প্রভৃতি গ্রন্থের নায়িকারূপের আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন। গোবিন্দদাসও তাঁর বহুপদে উক্ত কাব্যাদর্শই গ্রহণ করেছেন, সেই সঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত থেকে রাস ও অন্যান্য লীলার আদর্শে পদ লিখেছেন; সনাতন, রূপ ও জীব গোস্বামীর দার্শনিক চিন্তাধারা অবলম্বনে বহু পদ রচনা করেছেন। শ্রীরূপের ভজনপ্রণালীর আদর্শে তাঁর অষ্টকালীয় নিত্যলীলার পদও এ-প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। গোবিন্দদাসের পদাবলীর ধ্বনিতরঙ্গিত সুরবৈচিত্র্য কীর্তনীয়াদের এবং সঙ্গীত-রসিক শ্রোতাদের বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করে। তিনি রূপচিত্রকে যেন অমূর্ত ধ্বনিতরঙ্গে সঞ্চারিত করতে পারেন। আবার মাঝে মাঝে নাট্যধর্মী উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্যে গানগুলিকে নতুনরসে সিঞ্চিত করে পরিবেশন করেন। গোবিন্দদাসের পদাবলীগানে তত্ত্বের গুরুত্ব অবশ্যই রয়েছে। তবে তত্ত্ব কাব্যরসকে ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি সেখানেই কবির আসল গৌরব।

কবি বলরামদাস

বৈষ্ণব সাহিত্যে একাধিক বলরামদাসের উল্লেখ পাওয়া যায়। একজন বলরাম নিত্যানন্দ-শাখার ভক্তকবি। তিনি চৈতন্যদেবের সমসাময়িক, নিত্যানন্দের অনুচর। কবিরাজ গোস্বামী তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন,

কবি পরিচয়

বলরামদাস হয় কৃষ্ণপ্রেমরসাস্বাদী।
নিত্যানন্দ নামে হয় অধিক উন্মাদী॥

এঁর সম্পর্কে আরও জানা যায়, নিত্যানন্দ প্রভুর অনুমতি নিয়ে নিজের আবাসে, কৃষ্ণনগরের নিকটবর্তী দোগাছিয়া গ্রামে গোপালমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।[১] ড. সুকুমার সেন মনে করেন, বাৎসল্যরসের বিশুদ্ধ বাংলা পদগুলি এই নিত্যানন্দের সাক্ষাৎশিষ্য বলরামদাসের রচনা।

অপর বলরামদাস সম্পর্কে পদ-কল্পতরুতে (১৮ প.) বৈষ্ণবদাস লিখেছেন,—

কবি-নৃপ-বংশজ   ভুবন-বিদিত যশ
ঘনশ্যাম বলরাম।
ঐছন দুহুঁ জন   নিরূপম গুণগণ
গৌর-প্রেমময় ধান॥

সুতরাং দ্বিতীয় বলরাম গোবিন্দদাস কবিরাজের বংশধর। সুকুমার সেন বলেছেন, ইনি বুধরী গ্রাম নিবাসী এবং রামচন্দ্র কবিরাজের শিষ্য ছিলেন। দৃঢ় বাঁধুনির ব্রজবুলি পদগুলি এঁরই রচনা। ড. বিমানবিহারী মজুমদারও ড. সেনের এই মত সমর্থন করেছেন।

পদকল্পতরুতে বলরাম ভণিতায় বাংলা ও ব্রজবুলি উভয়রীতির ১২৬টি পদ আছে। ড. মজুমদার মনে করেন এরমধ্যে অন্ততঃ ৮২টি পদ গোবিন্দদাসের আদর্শে দ্বিতীয় বলরামদাস রচনা করেছেন।[২] অপেক্ষাকৃত অপ্রধান আরও

১। দ্র. বলরামদাসের পদাবলী : ব্রহ্মচারী অমর চৈতন্য সম্পাদিত (ফাল্গুন ১৩৬২)। ভূমিকা : 'বৈষ্ণবপদাবলী ও বলরামদাস' প্রবন্ধ সুকুমার সেন লিখিত, পৃ পনর॥

২। ড. সুকুমার সেন এর মধ্যে অন্ততঃ ৫১টি পদ দ্বিতীয় বলরামদাসের বলে নিঃসন্দেহ হয়েছেন।

কয়েকজন বলরামদাসের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে পদাবলী রচনায় তাঁদের বিশেষ গুরুত্ব নেই।[৩]

গোবিন্দদাস কবিরাজের বংশধর কাব বলরামের রচিত বলে উক্ত গবেষকদ্বয় কর্তৃক চিহ্নিত উৎকৃষ্ট পদগুলির মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই গোবিন্দদাসের প্রভাব লক্ষিত হয়। যেমন,—

গোবিন্দদাসের গৌরাঙ্গ-বিষয়ক চিত্রে রয়েছে,—

সহজই-কাঞ্চন গোরা
মদন মনোহর বয়সে কিশোরা [গো.প-বিমান : ১৬ প.]

বলরাম লিখেছেন,—

সহজই কাঞ্চন-কান্তি কলেবর
হেরইতে জগজন-মন মোহনিয়া।
তহিঁ কত কোটি মদন মুরছায়ল
অরুণ কিরণ হর অম্বর বনিয়া॥ [ব. প পৃ. ৮]

গোবিন্দদাস লিখেছেন,—

বরণ আশ্রম কিঞ্চন অকিঞ্চন
কারো কোন দোষ নাহি মানে।
কমলা-শিব-বিহি দুর্লভ প্রেম ধন
দান করল জগজনে। [গো. প. বিমান : ৮ প.]

অনুরূপ ভাষা ও ছন্দে বলরাম লিখেছেন,—

বরণ-আশ্রম কিঞ্চন অকিঞ্চন
কার কোন দোষ নাহি মানে।
শিব-বিরিঞ্চির অগোচর প্রেমধন
যাচিয়া বিলায় জগজনে॥ [ব. প. অমরচৈতন্য : পৃ ১৩]

—এ-পদ বাংলায় লেখা হলেও নিঃসংশয়ে বলা যায় যে গোবিন্দদাস-পরবর্তী কোনও কবির রচনা। তেমনি অনেকগুলি পদে চৈতন্য-লীলার রসাস্বাদে বঞ্চিত

৩। শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 'বৈষ্ণব পদাবলী'-তে মুখ্য একজন কবি বলরামদাস ধরে নিয়ে তার নামে ১৭৬টি পদ সংকলন করেছেন। তাছাড়া দীন বলরাম ও নরোত্তম-ভক্ত বলরামের নামে যথাক্রমে দুটি করে পদ দিয়েছেন।

হয়েছেন বলে কবি আক্ষেপ করেছেন, সেগুলিও পরবর্তী কবির রচনা বলে ড. মজুমদার অনুমান করেছেন যেমন—

শিব-বিহি অগোচর অগম নিগমপব
কলিযুগে শ্রীনিত্যানন্দ।
গৌররসে নিমগন করাইল জগজন
দূরে রহু বলরাম মন্দ ॥ [বৈ. প. হরেকৃষ্ণ ৩১ পৃ]

ও রস-সাগরে মগন সুরাসুর।
কিছু না পরশল বলরামদাস পর ॥ [ব. প অমরচৈতন্য : পৃ ৭]

স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ডুবিল গোরা-প্রেমে।
বঞ্চিত হইল একা দাস বলরামে ॥ [ঐ. পৃ ১২.]

গৌরাঙ্গ বিষয়ক ৩৭টি এবং নিত্যানন্দ-অদ্বৈত বিষয়ক আরও নয়টি পদ ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্যের গ্রন্থে রয়েছে।[১] এর মধ্যে বাংলা ও ব্রজবুলি উভয় রীতিতে লেখা ২৩টি পদে বলরাম প্রভুপদে বঞ্চিত হয়েছেন বলে আক্ষেপ জানিয়েছেন। এই আক্ষেপ বৈষ্ণবোচিত বিনয় ভণিতা হতে পারে, অথবা কবি চৈতন্য-যুগের পরবর্তীকালে জন্ম নিয়েছেন বলেও হতে পারে। আমাদের মনে হয়, ড সুকুমার সেন বা ড. মজুমদার তাঁদের আলোচনায় দুই বলরামের পদগুলি পৃথকভাবে চিহ্নিত করবার যে উপায় গ্রহণ করেছেন সেটি সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্তি নয়। চৈতন্য-সমসাময়িক কবির লেখা বলে সুনিশ্চিত ভাবে চিহ্নিত করা যায় এমন পদ বলরাম ভণিতায় পাওয়া যাচ্ছে কিনা সমালোচকদ্বয় সে বিষয়ে কিছু বলেননি। সুতরাং অনুমান করা অসঙ্গত হবে না, প্রখ্যাত কবি বলরাম এক জনই,—এবং সম্ভবতঃ তিনি চৈতন্য-পরবর্তী কবি। তিনি গোবিন্দদাস বংশজ হতে পারেন। চৈতন্য-সমসাময়িক নিত্যানন্দ শাখার ভক্তকবি হয়ত সামান্য ২।৪টি পদ লিখে থাকবেন। নিত্যানন্দ-বিষয়ক ৭টি পদের মধ্যেও পাঁচটি পদে বলরাম গৌর-রসে বঞ্চিত বলে আক্ষেপ করেছেন। বর্তমান আলোচনায় আমরা কবি বলরাম মুখ্যতঃ একজনই ছিলেন ধরে নিয়ে কাব্যবিচারে অগ্রসর হওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করি।

মূল কবি বলরাম একজন ধরাই সঙ্গত

১। ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্য সম্পাদিত 'বলরামদাসের পদাবলীতে' মোট পদ সংখ্যা ২২৬।

বলরামদাস জ্ঞানদাস বা গোবিন্দদাসের সম পর্যায়ের প্রতিভাসম্পন্ন কবি নহেন। তবে বাৎসল্য রসে বা রসোদ্গারে তাঁর কবিত্বের স্ফূর্তি অতুলনীয়। গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস বিষয়ক পদগুলিও বাসুঘোষের পরেই তাঁর স্থান নির্দেশ করে। বিষয়ানুসারে তাঁর পদগুলিতে প্রধানতঃ গৌরাঙ্গের রূপবর্ণনা, সন্ন্যাস, নিত্যানন্দ বর্ণনা, কৃষ্ণের বাল্যলীলা, কৃষ্ণ-রাধার পূর্বরাগ, রসোদ্গার, অভিসার, আক্ষেপানুরাগ, দান ও নৌকালীলা, মাথুর, কৃষ্ণের দ্বাদশ মাসিক বিরহ ও আত্মনিবেদন সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানে প্রাসঙ্গিক কিছু কিছু পদের আলোচনা করা যেতে পারে।

গৌরাঙ্গকে নবদ্বীপ লীলার আদর্শ নাগর রূপে চিত্রিত করতে গিয়ে ১২। ১২।১২।১০ মাত্রার চৌপদী বন্ধে কবি চমৎকার ধ্বনি অনুপ্রাস দিয়ে লিখেছেন,—

নবদ্বীপ লীলার পদ

বিহরে আজু রসিক রাজ
গৌরচন্দ্র নদীয়া মাঝ
কঞ্জ কেশরপুঞ্জ উজোর
কনক রুচির কাঁতিয়া।

কোটিকাম রূপধাম
ভুবনমোহন লাবণিঠাম
হেরত জগতযুবতি উমতি
ধৈরয ধরম ঘাতিয়া।”

... ...

অরুণ নয়ানে করুণ চাই
সঘনে জপয়ে রাই রাই
নটত উমত লুঠত ভ্রমত
ফুটত মরম ছাতিয়া।

উত্তম মধ্যম অধম জীব
সবহুঁ প্রেম-অমিয়া পীব
তহিঁ বলরাম বঞ্চিত একলে
সাধু ঠামে অপরাধিয়া॥ [বৈ. প. হরেকৃষ্ণ : ১]

আবার রাই-ভাবে ভাবিত গৌরাঙ্গেরও চিত্র এঁকেছেন,—

নাচত গৌর সুনাগর মণিয়া।
খঞ্জন গঞ্জন পদযুগ বঞ্জন
বনরনি মঞ্জির মঞ্জুল ধ্বনিয়া॥
... ...
রাই প্রেমভর গমন সুমন্থর
গরগর অন্তর পড়ই ধরণিয়া।
ঘন ঘন কম্প স্বেদ পুলকাবলি
ঘন ঘন হুঙ্কার ঘন গরজনিয়া॥
... ...
ও রসে ভোর ওর নাহি পায়ই
পতিত কোরে ধরি লোর সেচনিয়া।
হরি হরি বোলি রোই কত বিলপই
বঞ্চিত বলরাম দিবস রজনিয়া॥ [৬]

এই উভয় পদ পাশাপাশি পঠনে ধরা যায়, বলরাম ভাষা ও ছন্দভঙ্গিতে গোবিন্দদাসের আদর্শের দ্বারা কতটা প্রভাবিত হয়েছিলেন। চৈতন্য-লীলা বর্ণনায় কবি নবদ্বীপের নাগরীভাব বা নীলাচল লীলার রাধা-ভাব উভয়কেই মুক্তভাবে গ্রহণ করেছেন। কোনও বিশেষ একটা তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত হননি।

নবদ্বীপের কীর্তন লীলার তথ্যবহুল চিত্র অক্ষরবৃত্ত পয়াররীতির কয়েকটি বাংলা পদে চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন। একটি এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে।—

অঞ্জলিতে লয়ে বারি করি আচমন।
কর্পূরে তাম্বূলে করেন মুখের শোধন॥
মুখের শোধন করি সেই গৌরহরি।
সংকীর্তনের মাঝে যেয়ে নাচে ফিরি ফিরি॥
নাচেরে গৌরাঙ্গ চাঁদ সঙ্কীর্তনের মাঝে
সোনার নূপুর রাঙা চরণে বিরাজে॥
বামে নাচে গদাধর দক্ষিণে মুকুন্দ।
সম্মুখেতে নাচয়ে শ্রীবাস নিত্যানন্দ॥

পূরবে পুরুষোত্তম পরম পণ্ডিত।
দক্ষিণে শ্রীরাম নাচে উত্তরে অদ্বৈত ॥
অগ্নিকোণে অভিরাম মারুতে মুরারি।
ঈশানে ঈশান দাস নৈঋতে নরহরি ॥
বেষ্টিত বৈষ্ণব সব কীর্তন মণ্ডলে।
খোল করতাল বাজে ভাসে অশ্রুজলে ॥
কোলাকুলি হুলাহুলি ভাবে নাহি ওর।
বলরাম দাস তহিঁ ভাবেতে বিভোর ॥

[৪]

এত তথ্যবহুল পদ চৈতন্য-সমকালীন বলরামদাসের রচনা হওয়ার সম্ভাবনা বেশী,—আপাতদৃষ্টে আমাদের এমন মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু যে ভাবে কীর্তন মণ্ডলীটি কবি সযত্নে সাজিয়েছেন সেটি বাস্তব অপেক্ষা 'ভাবেতে বিভোর' কোনও পরবর্তী কবির কল্পনা-চিত্র হওয়ারই সম্ভাবনা অধিক মনে হয়।

নিমাই-এর সন্ন্যাস-চিত্র

বলরামদাস বর্ণনাত্মক চিত্রাঙ্কনে পারদর্শী ছিলেন। সন্ন্যাস-চিত্রণে বাসু ঘোষের আদর্শে কয়েকটি সার্থক পদ রচনা করেছেন। দু একটি দৃষ্টান্ত তোলা যেতে পারে।—

নিতাই করিয়া আগে ধায় শচী অনুরাগে
সভে মেলি গেলা শান্তিপুরে।
মুড়াইয়া মাথার কেশ ধর্যাছে সন্ন্যাসীর বেশ
দেখিয়া সভার মন ঝুরে ॥... [১৯]

পদটি বাসুঘোষ এবং বলরামদাস উভয়ের ভণিতায় সামান্য পাঠান্তরে পাওয়া যায়। ভাব ও ভাষাগত বিচারে এটি বাসুঘোষের রচনা হবারই সম্ভাবনা বেশী ;১ বলরামের অপর একটি পদে মাতা শচীদেবী পুত্রকে বোঝাচ্ছেন,—

শ্রীবাস হরিদাস আদি যত ভক্ত গণ।
তা সভারে লইয়া করো গিয়া সংকীর্তন ॥
মুরারি মুকুন্দ রাম আর যত দাস।
এ সব ছাড়ি কেনে লইলা সন্ন্যাস ॥

১। বাসুঘোষ পর্যায়ে পদটি আলোচিত হয়েছে।

যে করিলা সে করিলা চলরে ফিরিয়া।
পুন যজ্ঞসূত্র দিব ব্রাহ্মণ লইয়া॥ [২০]

বাসুঘোষ প্রত্যক্ষভাবে নিমাইকে এবং শচীমাতাকে জানতেন তাই তাঁর শচী মাতার চিত্রণে জননীর গভীর বেদনা আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেলেও তিনি ছেলেকে 'পুন যজ্ঞসূত্র দিয়ে' ব্রাহ্মণ করে ঘরে ফিরিয়ে নেবার অবাস্তব প্রস্তাব কখনো দেবেন মনে হয় না।[১] অদ্বৈতগৃহের লীলা-বর্ণনায় বলরামদাস লিখেছেন,—

নানা প্রকারে প্রভু মায়েরে বুঝায়।
অদ্বৈত ঘরণি সীতা শচীরে বৈসায়॥
শান্তিপুর ভরিয়া উঠিল জয়ধ্বনি।
অদ্বৈত আঙ্গিনায় নাচে গৌর গুণমণি॥
প্রেমে টলমল প্রভু স্থির নাহি চিতে।
নিতাই নাচিয়া ফিরে শ্রীচৈতন্য ভিতে॥
অদ্বৈত পশারি বাহু ফেবে কাছে কাছে।
আছাড় খাইয়া প্রভু ভূমে পড়ে পাছে॥
চতুর্দিকে ভক্তগণ বোলে হরি হরি।
শান্তিপুর হইলা যেন নবদ্বীপ পুরি॥
পুত্রের সন্ন্যাসী বেশ দেখি শচীমায়।
নয়নের জলে কিবা হিয়া ভাসি যায়॥
বুঝিয়া শচীর মন অবধূত রায়।
সংকীর্তন সমাপিয়া প্রভুরে বৈসায়॥
এইরূপে দশদিন অদ্বৈতের ঘরে।
বিলাস ভোজন প্রভু আনন্দ অন্তরে॥
বলরামদাস কহে কাতর হইয়া।
অদ্বৈতের এই আশা না দেই ছাড়িয়া॥ [২২৪]

১। পূর্বোধৃত 'নিতাই করিয়া আগে,' 'শ্রীবাস হরিদাস আদি ভক্তগণ' এবং এখানে পরে উদ্ধৃত 'নানা প্রকারে প্রভু মায়ের বুঝায়' এবং চৈতন্য লীলার আরও দুএকটি পদ বাসুঘোষ ও বলরাম উভয়ের ভণিতাতেই পাওয়া যায়। আমাদের মনে হয় 'নিতাই করিয়া আগে' পদটি বাসুঘোষের রচনা, বাকীগুলি বলরামদাসের।

বর্ণনা হিসাবে ছবিটি সুন্দর সন্দেহ নেই ;—তবু প্রত্যক্ষ দর্শনের অভিজ্ঞতা-স্বাক্ষরের অভাব রয়েছে। চৈতন্যের নীলাচল লীলার কিছুটা ভাবচিত্র অদ্বৈতগৃহের নৃত্য-লীলায় আরোপিত হয়েছে। —এটি চৈতন্য পরবর্তী কবির পক্ষেই স্বাভাবিক। বস্তুতঃ নবদ্বীপ বা শান্তিপুরের চৈতন্য-লীলা চিত্রণে বাসুঘোষ অপ্রতিদ্বন্দ্বী, বলরামের ছবি সুন্দর হলেও সে তুলনায় নিষ্প্রভ।

বলরাম নিত্যানন্দ-শাখার ভক্তকবি ছিলেন। গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদের পাশাপাশি বলরাম অবতার রূপী নিত্যানন্দ বিষয়েও কয়েকটি চমৎকার পদ লিখেছেন। একটি পদে চৈতন্য নিত্যানন্দকে গৌড়মণ্ডলে প্রেমধর্ম প্রচারের যে দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন তার সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। গৌরাঙ্গ নীলাচলে রয়েছেন, নিত্যানন্দ গৌড়ের ভক্তদের সঙ্গে চৈতন্য সন্দর্শনে সেখানে এসেছেন। চৈতন্য তাঁকে বলছেন,—

নিত্যানন্দ-বিষয়ক পদ

বিরলে নিতাই পাঞা হাতে ধরি বসাইয়া
মধুর কথা কন ধীরে ধীরে।
জীবেরে সদয় হৈয়া হরিনাম লওয়াও গিয়া
যাও নিতাই সুরধুনী তীরে॥
নামপ্রেম বিতরিতে অদ্বৈতের হুঙ্কারেতে
অবতীর্ণ হইনু ধরায়।
তারিতে কলির জীব করিতে তাদের শিব
তুমি মোর প্রধান সহায়॥
নীলাচল উদ্ধারিয়া কৃষ্ণদাসে সঙ্গে লৈয়া
দক্ষিণ দেশেতে যাব আমি।
শ্রীগৌরমণ্ডল ভার লৈয়া কর নাম প্রচার
ত্বরা নিতাই যাও তথা তুমি॥
মো হৈতে না হবে যাহা তুমিত পারিবে তাহা
প্রেমদাতা পরম দয়াল।
বলরাম কহে পহুঁ দোহার সমান দুহু
তার মোরে আমিত কাঙ্গাল॥ [৩২]

এ-পদ নিত্যানন্দ-ভক্তের রচনা সংশয় নেই, তেমনি চৈতন্য-তিরোভাবের পর

নিত্যানন্দ-গোষ্ঠী যখন সুস্পষ্ট রূপ নিতে চলেছে তার পরবর্তী কালের কোনও কবির পদ তাতেও সংশয়ের অবকাশ নেই।[১]

বাৎসল্যলীলার পদে বলরামদাসের শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য। জ্ঞানদাস, বাসুঘোষ বা আরও কোনও কোনও পদকার উৎকৃষ্ট বাৎসল্য-লীলার পদ রচনা করেছেন সত্য, তবু বলরামদাসের মত এতটা স্বাভাবিক কবিত্বের স্ফুরণ আর কারও হয়নি। যশোদার কাছ থেকে কৃষ্ণ-বলরামের ননী প্রার্থনার চিত্রাঙ্কনে কবি লিখেছেন,—,

কৃষ্ণের বাৎসল্যলীলার পদ

দধিমন্থধ্বনি শুনইতে নীলমণি
আওল সঙ্গে বলরাম।
যশোমতী হেরিমুখ পাওল মরমে সুখ
চুম্বয়ে চাঁদ বয়ান ॥
কহে শুন যাদুমণি তোরে দিব ক্ষীরননী
খাইয়া নাচহ মোর আগে।
নবনী লোভিত হরি মায়ের বদন হেরি
করপাতি নবনীত মাগে ॥
রাণী দিল পুরিকর খাইতে রঙ্গিমাধব
অতি সুশোভিত ভেল তায়।
খাইতে খাইতে নাচে কটিতে কিঙ্কিণী বাজে
হেরি হরষিত ভেল মায় ॥[১]··· [৩৯]

পুত্রস্নেহাতুর মায়ের বাৎসল্য-রস-নিসিক্ত সৌন্দর্যামৃত-পান-দৃশ্যটি কবি যথার্থই দরদী হাতে এঁকেছেন।

একটি পদে ননীচোরা পুত্র কানাই-এর মায়ের প্রতি অভিমানের ছবি দিয়েছেন,—

দাঁড়াইয়া নন্দের আগে গোপাল কান্দে অনুরাগে
বুক বাহিয়া পড়ে ধারা।

১। পদটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'বৈষ্ণব পদাবলী'তে বলরামদাসের ভণিতায় দেওয়া হয়েছে। অনুরূপ ভাবে 'গোপাল সাজাইতে নন্দরানী না পারিল' এবং 'আজি খেলায় হারিলা কানাই' পদ দুইটিও উভয়ের ভণিতায় পাওয়া যায়। বাৎসল্য-রসের পদে বলরামও একই ধারা অনুসরণ করেছেন। সুতরাং কোন্‌টি কার পদ অনুমান করা কঠিন।

না থাকিব তোমার ঘরে অপযশ দেহ মোরে
মা হইয়া বলে ননীচোরা ॥ [৪১]

কত মায়ের ছেলেই তো ননী চুরি করে, কোন মা তার জন্যে ছেলের হাত বেঁধে রাখেন ? আসলে তো ননী খেয়েছে বলাই, কানাই সঙ্গে ছিলেন, রাণী তাকেই চোর মনে করে ধেয়ে এসেছেন,—

সঙ্গের সঙ্গীরে পাইয়া মারিতে আসেন ধাইয়া
শিশু বলি দয়া নাহি তার ॥ [ঐ]

একটি পাঠান্তরে আবার আছে, 'পরের ছাওয়াল পাইয়া মারেন আসেন ধাইয়া' অর্থাৎ কানাই বালক হলেও জানেন তিনি বসুদেব-দেবকীর সন্তান, নন্দ যশোদা পালক পিতা-মাতা। কবি এখানে ভগবৎ-ঐশ্বর্য আরোপ করতে গিয়ে শিশু-সারল্যের কবিত্ব-সৌন্দর্য ক্ষুণ্ণ করেছেন।—এ অংশ পরবর্তী কারও সংযোজন হতে পারে। তবুও সমগ্র পদটিতে যেন একটু তত্ত্বগত ভার বেশী এসে পড়ে বালকের অভিমান চিত্রটি একটু আচ্ছন্ন করেছে।)

গোষ্ঠ-লীলা

বালক এবারে গোষ্ঠ-লীলায় যাবেন আবদার ধরেছেন মায়ের কাছে। মাতা যশোমতী তাকে 'সাজায় বিবিধ সাজে মনের আরতি' তবু চোখের আড়াল করতে, শ্রীদাম সুদাম বলরামাদির সঙ্গে পাঠাতে স্বস্তি পাচ্ছেন না ; ওদের ডেকে বলছেন,—

শ্রীদাম সুদাম দাম শুন ওরে বলরাম
মিনতি করিয়ে তো সভারে।
বন কত অতিদূর নব তৃণ কুশাঙ্কুর
গোপাল লইয়া না যাইহ দূরে ॥
সখাগণ আগে পাছে গোপাল করিয়া মাঝে
ধীরে ধীরে করিহ গমন।
নব তৃণাঙ্কুর আগে রাঙ্গা পায় যদি লাগে
প্রবোধ না মানে মায়ের মন ॥
নিকটে গোধন রেখো মা বলে শিঙ্গাতে ডেকো
ঘরে থাকি যেন রব শুনি।
বিধি কৈল গোপ জাতি গোধন পালন বৃত্তি
তেঞি বনে পাঠাই বাছনি ॥

বলরামদাসের বাণী শুন ওগো নন্দরাণী
মনে কিছু না ভাবিহ ভয়।
চরণের বাধা লৈয়া দিব আমি যোগাইয়া
তোমার আগে কহিনু নিশ্চয়। [৪৩]

পদটি যাদবেন্দ্র দাসের 'আমার শপতি লাগে' পদের সঙ্গে তুলনীয়। উভয় পদেই যশোদার কৃষ্ণের প্রতি বাৎসল্য গোষ্ঠলীলা-চিত্রণে উৎসারিত হয়ে উঠেছে। ভণিতায় উভয় পদকারই বালক কানাই-এর সখারূপে শঙ্কান্বিতা মাকে আশ্বাস দিচ্ছেন, পায়ে যাতে তার তৃণাঙ্কুর না ফোটে দেখবেন এবং সময় বুঝে রাঙা পায়ে পাদুকা পরিয়ে দেবেন। যাদবেন্দ্রের পদটি অবশ্য উভয় পদের মধ্যে উৎকৃষ্টতর।

গোপাল যখন আবদার ধরেছেন,—

গোঠে আমি যাব মাগো গোঠে আমি যাব।
শ্রীদাম সুদাম সঙ্গে বাছুরি চরাব॥

তখন মা যশোমতী মনের সাধে ছেলেকে সাজিয়ে পাঠাচ্ছেন,—

শুনি গোপালের কথা মাতা যশোমতী।
সাজায় বিবিধ বেশে মনের আরতি॥
অঙ্গে বিভূষিত কৈল রতনভূষণ।
কটিতে কিঙ্কিণী ধটী পীত বসন॥ [৪২]

অপর একটি পদে রয়েছে, ভাবাবেগে নন্দরানী কানুকে সাজ পরাতে পারছিলেন না। বলাই, শ্রীদাম এসে চূড়া বেঁধে, অঙ্গদ-বলয়-কুণ্ডল-গুঞ্জাহার পরিয়ে দিলেন। কটিতটে পীতধড়া পরিয়ে দিলেন, ললাটে তিলক এঁকে পায়ে নূপুর দিলেন (ঃ৪৫)।

গোষ্ঠ যাত্রার নটবর কিশোরের ছবি এঁকেছেন কবি,—

ঠমকি ঠমকি চলত বঙ্গে
ধূলি ধূসর শ্যাম অঙ্গে
হৈ হৈ হৈ বোলত ঘন
মধুর মুরলী বায় গো॥

... ...

নয়ানে সঘনে উলটি উলটি
হেরি হেরি পালটি পালটি

গোরী গোরী থোরি থোরি

আন নাহিক ভায় গো। [৪৭]

রাখাল বালকদের সঙ্গে কানাই-এর খেলার বর্ণনাও কয়েকটি পদে দিয়েছেন। তাতে দাদা বলাই-এর কাছে তিনি ইচ্ছা করে কেমন হার স্বীকার করতেন তার কৌতুকপূর্ণ বর্ণনা দিয়েছেন (দ্র. ৪৯ প.)।

উত্তর গোষ্ঠের পদে দিবাবসানে গৃহে গোপাল ফিরিয়ে আনার চিত্র। চাঁদমুখে বেণু দিয়ে কানু ডাকছেন, উর্ধ্বপুচ্ছে গাভীরা ফিরে আসছে। তাদের গোকুলে ফেরার ছবি আঁকছেন,—

শ্বেতকান্তি অনুপাম আগে ধায় বলরাম

আর শিশু চলে ডাহিন বাম।

শ্রীদাম সুদাম পাছে ভাল শোভা করিয়াছে

তার মাঝে নব ঘনশ্যাম ॥

ঘনবাজে শিঙ্গাবেণু গগনে গোক্ষুর রেণু

পথে চলে করি কত ভঙ্গে।

যতেক রাখালগণ আবা আবা ঘনে ঘন

বলরামদাস চলু সঙ্গে ॥ [৫২]

চিত্রটি সূক্ষ্ম কারুকার্যময় না হতে পারে কিন্তু প্রাণের স্পর্শে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

সন্ধ্যা হয়ে এল, ছেলে এখনো ঘরে ফিরছে না বলে মায়ের কত দুশ্চিন্তা। এমন সময় ওরা ঘরে ফিরে এলো। নন্দরানীর সেই আকুলতার ছবি দিয়েছেন কবি।—

নন্দ-দুলাল বাছা যশোদা দুলাল।

এতক্ষণ মাঠে থাকে কাহার ছাওয়াল ॥

রতন প্রদীপ লৈয়া আইলা নন্দরানী।

একদিঠে দেখে রাঙ্গা চরণ দুখানি ॥

নেতের আচলে রানী মোছে হাত পা।

তোমার নিছনি লৈয়া মরি যাউক মা ॥

কহে বলরাম নন্দরানী কুতুহলে।

কত লক্ষ চুম্ব দেই বদন কমলে ॥ [৫৩]

শব্দ ব্যবহার সর্বত্র সুষ্ঠু মার্জিত নয়, কিছুটা যেন গ্রাম্যতার ছাপ আছে।—আর সেই কারণেই যেন মায়ের স্নেহ-উৎসার আরও চমৎকৃতি লাভ করেছে। জ্ঞানদাস, যাদবেন্দ্র বা অন্য কেউ দু-একটি উৎকৃষ্টতর বাৎসল্য রসের পদ লিখেছেন সত্য, কিন্তু সব পদগুলি মিলিয়ে বলরামদাসকেই বাৎসল্যরসের,—কিছুটা বা, বাল্য-সখ্য রসের শ্রেষ্ঠ পদকারের সম্মান দিতে হয়।)

বলরামদাস একটি মাত্র কালীয়দমনের পদ লিখেছেন। পদটি বর্ণনার আন্তরিকতায় হৃদয়গ্রাহী হতে পেরেছে।—

ব্রজবাসিগণ কান্দে ধেনু বৎস শিশু।
কোকিল ময়ূর কান্দে যত মৃগপশু॥
যশোদা রোহিণী দেহ ধরণে না যায়।
সবে মাত্র বলরাম প্রবোধে সভায়॥
নন্দ উপানন্দ আদি যত গোপগণ।
ধাইয়া চলয়ে বিষ করিতে ভক্ষণ॥
শ্রীদাম সুদাম আদি যত সখাগণ।
সবে বলে বিষজল করিব ভক্ষণ॥
বলরাম রাখে সভায় প্রবোধ করিয়া।
এখনি উঠিছে কালীদমন করিয়া॥ [৫৬]

একমাত্র বলরামই বালক কৃষ্ণের অলৌকিক শক্তিরহস্য জানতেন,—তাই অন্য সবাইকে তিনি শোক থেকে নিবৃত্ত করছিলেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, কালীয়দমন বিষয়ক উৎকৃষ্টতর পদ রচনা করেছেন মাধবদাস। একাবলীর (৬।৫ মাত্রা) নৃত্য স্পন্দিত ছন্দে কালীয়নাগকে—

ফনায় ফনায় দমন করি।
নটবর-ভঙ্গে নাচয়ে হরি॥ [১৮]

—চিত্রের যে বর্ণনা দিয়েছেন বলরামদাসের পদের তুলনায় তার আবেদন অনেক বেশী। বৈষ্ণব পদাবলী গানে নিঃসন্দেহে মাধবদাসের ছয়টি কালীয়দমনের পদকেই এই পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ পদরূপে গণ্য করতে হয়।

পূর্বরাগ

পূর্বরাগের পদগীতিতে বলরাম কিছুটা নূতনত্ব দেখালেও কাব্যোৎকর্ষের দিক থেকে পদগুলি ততটা আকর্ষণীয় নয়। একখানে কৃষ্ণের আপ্তদূতীর কাছে পূর্বরাগের নায়িকা রাধার চাতুর্যময়

অভিব্যক্তির একটি পদ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। রাধা সত্যই কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্টা কিনা পরীক্ষা করে এসে দূতী কৃষ্ণকে বলছে,—

পহিলহি মোহে নিরখি লহু হাস।
পুন ধনি তেজলি দীঘ নিশাস ॥
ছলে হম কহলম তুয়া পরসঙ্গ।
থোড়ি মোড়ি মুখ ঝাঁপলি অঙ্গ ॥
পরিখত যব হাম মাগত মেলানি।
গাঁথল হার উঘারল আনি ॥
নায়ক-নীলমণি লেই উঘারি।
শিরপর থাপলি সো বরনারি ॥
সো পুন হার তরল করি গাঁথ।
যতনহি পহিরলি নেই মঝু হাথ ॥
তরল-নয়ানি রহলি শির লাই।
বলরাম কহ পহু কহত বুঝাই ॥ [৬৬]

'প্রথমেই আমাকে দেখে মৃদু হাসল (আনন্দ আশ্বাসে, কিন্তু তখনই নিজ দুরাশার কথা ভেবে), পুনরায় ধনী দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। ছলে তোমার প্রসঙ্গ বললাম, অল্প মুখ ঘুরিয়ে (উদাসীনতা দেখাবার ছলে) অঙ্গ ঢাকল (তোমার প্রসঙ্গ উত্থাপনে যেন তুমিই সামনে এসেছ এমন কল্পনায়)। তাকে পরীক্ষা করবার উদ্দেশ্যে যখন বিদায় চাইলাম, গাঁথা মালা কণ্ঠ থেকে খুলে আনল (ইঙ্গিতে এই সাংসারিক বিবাহবন্ধন থেকে মুক্তি চাইল)। হারের মধ্যমণিরূপ নীলমণিটি খুলে সেই সুন্দরী আপন শিরে রাখল (ইন্দ্রনীলমণি সদৃশ তুমিই যে তার শিরোমণি তা জানাল)। পুনর্বার সেই ফুলে তরল করে হার গাঁথল (এই সংসারের বিবাহ-বন্ধন ঘুচিয়ে নতুন বাঁধনে তুমি তাঁকে বন্দী কর এই ইঙ্গিত করে)। আমার হাত দিয়ে হারটি আপন গলায় পরল। চটুল-নয়না মাথা নত করে রইল (দুঃখে)। বলরামদাস (আপ্তদূতীজ্ঞানে) জিজ্ঞাসা করছেন প্রভু, (রাধার এই কর্মধারার রহস্য) আমায় বুঝিয়ে বল।'

অনুরূপ ব্রজবুলিতে লিখিত রাধা-প্রেম চাতুর্যের আরও কয়েকটি পদ রয়েছে। এ-পদে কাব্য মাধুর্য অপেক্ষা চাতুর্যেরই প্রাধান্য লক্ষিত হয়।

মিলন এবং রসোদ্‌গারের কয়েকটি পদে বলরামদাস যে নিষ্ঠার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন তা শ্রোতার হৃদয় স্পর্শ করে। এখানে দু একটি পদ থেকে উদ্ধৃত করা যেতে পারে।—

মিলন ও রসোদ্‌গার

দুহুঁ নব যৌবন নব নব প্রেম।
সজল জলদ কানু রাই কাঁচা হেম॥
দুহুঁ মুখ হেরইতে দোহঁারি আনন্দ।
রাইমুখ পঙ্কজ রাইমুখ চন্দ॥
কত রস আমোদে নব নব রঙ্গ।
ঢল ঢল লোচন পুলকিত অঙ্গ॥
মন্দ পবন বহে রসময় কুঞ্জ।
কুসুমিত কাননে মধুকর গুঞ্জ॥... [৭০]

এটি পূর্বরাগান্তে প্রথম মিলনের চিত্র। রসোদ্‌গারের কয়েকটি অনুপম চিত্র থেকেও দুটী উদ্ধৃত করছি।—

রাতি দিন চোখে চোখে বসিয়া সদাই দেখে
ঘন ঘন মুখখানি মাজে।
উলটি পালটি চায় সোয়াস্ত নাহিক পায়
কত বা আরতি হিয়ার মাঝে॥
সই এই দুখ লাগিয়াছে মনে।
যারে বিদগধ রায় বলিয়া জগতে গায়
মোর আগে কিছুই না জানে॥
জ্বালিয়া উজল বাতি জাগিয়া পোহায় রাতি
নিদ নাহি যায় পিয়া ঘুমে।
ধনি ঘন করে কোলে ক্ষণে করে উতরোলে
তিলে শতবার মুখ চুমে॥
ক্ষণে বুকে ক্ষণে পিঠে ক্ষণে রাখে দিঠে দিঠে
হিয়া হৈতে সেজে না শোয়ায়।
দরিদ্রের ধন হেন রাখিতে না পায় স্থান
অঙ্গে অঙ্গে সদাই ফিরায়॥

ধরিয়া দুখানি হাতে কখন ধরয়ে সাথে
ক্ষণে ধরে হিয়ার উপরে।
ক্ষণে পুলকিত হয় ক্ষণে আঁখি মুদি রয়
বলরাম কি কহিতে পারে।। [৭৮]

বার বার 'উলটি পালটি' তাকিয়েও কানুর স্বস্তি নেই। উজ্জ্বল বাতির আলোয় রাইকে মুখোমুখি বসিয়ে বিনিদ্র রজনী প্রিয়ার সৌন্দর্য সুধা পান করছেন তিনি। হিয়া থেকে লজ্জায় প্রিয়াকে নামাতেও মন চায়না,—এ যেন দরিদ্রের ধন, কোথাও রেখে স্বস্তি পান না। এমন প্রেমার্তির কথা সখিকে কি করে বোঝাবেন রাধা!

আবার সখীও রাধাকে লজ্জা দিচ্ছেন কৃষ্ণ-প্রেম-গৌরবের বর্ণনা-চমৎকৃতিতে,—

দলিত নলিন সম মলিন বদন ছবি
অধরহি খণ্ড বিখণ্ড
মীটল উজ্জ্বল চন্দন কজ্জল
মরদলি আরকত গণ্ড।।
এ সখি তুহুঁ অতি নিরুকণ দেহ।
হিয় চক্রীকুচ- ভরে দই মরদলি
শিরিষ-কুসুম-তনু এহ।।
নিল উতপল দল- কোমল উর-থল
কাবলি নখশর হানি।
ইথে অতি বেদন মুদি রহু লোচন
কিয়ে ভেল গদ গদ বাণী।।
মনমথ ভূপতি- ভীত নহি মানলি
সখিগণ গৌরব ছোড়ি।
চিত্রা বচনে লাজে ধনি নত মুখি-
হেরি বলরাম সুখে ভোরি।। [৮৩]

'দলিত নলিনী সদৃশ মুখ মলিন, অধর (কৃষ্ণের অধর দংশনে) ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। উজ্জ্বল চন্দন ও কাজল নষ্ট হয়েছে। আরক্ত গণ্ড মর্দিত। সখী রাধাকে বলছেন, সখি তুমি অতি নিষ্ঠুর দেহী। হৃদয় চক্ররূপ কুচভারে শিরিষ কোমল

তনুকে মর্দন করলে। নীলোৎপলের কোমল পাপড়ির সদৃশ উরুদেশ নখশর হেনে চিরেছ!—এতে বেদনায় চোখ দুটি মুদিত; ভাষ গদগদ হল কেন? ভূপতি মন্মথের ভয়ে ভীত হলে না। সখিদের গৌরব ত্যাগ করলে। সখী চিত্রার এই কথায় ধনী লজ্জায় নতমুখী হলেন। সে ছবি দেখে বলরাম সুখে বিভোর।'

অভিসার চিত্রণে বলরামদাস বিদ্যাপতি বা গোবিন্দদাসের তুলনায় নিষ্প্রভ।

অভিসার

তবে বর্ণনার নূতনত্ব লক্ষিত হয়। একটি পদে নব অভিসারিকা অসহায়া রাধার পক্ষ নিয়ে সখি কৃষ্ণকে অনুযোগ করছেন,—

মাধব এ তুয়া কোন বিচার।
নবনিক পুতলি তনু সহজই দরবরি
কৈছে করব অভিসার॥
কাঁচুরি ধাড়ি চরণতলে রাধই
নাসিকা মতি না বাধ।
চলই না পারই আরতি বাঢ়ায়ই
কাতরে মাগই পাশ॥
চল তহি তুরিত ক্ষেণে পুন বৈঠত
পদযুগে দেয়ত গারি।
কহ বলরাম তহি আত ঝুরত
লোচনে শাওন বারি॥ [৯৪]

'মাধব,এ তোমার কেমন বিচার। রাধার নবনীকোমল দেহ সহজেই বিগলিত হয়, সে কিভাবে অভিসার করবে? (পথ চলতে) তার অঙ্গবাস ছিঁড়ে পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে। নাসিকায় (শ্রমে) ঘন শ্বাস বইছে। রতি আবেগে সে আর চলতে পারছে না, সকাতরে পাশীর পাশ প্রার্থনা করছে। ছুটে চলতে গিয়ে (ক্লান্তিতে) বসে পড়ছে, আপন পদযুগলকে ধিক্কার দিচ্ছে। বলরাম বলছেন, তাইতো রাধা কাঁদছেন, লোচনে তাঁর শ্রাবণের বারিধারা।

বাসক সজ্জিকা, খণ্ডিতা, মানিনী রাধার চিত্রও বলরামদাস অঙ্কিত করেছেন।

মানিনী

কানু অন্তরে আপন অপরাধ জেনে রাধার পায়ে লুটিয়ে পড়লেন তবু মানিনীর দুর্জয় মান ভাঙল না।—

মালিনী না হেরই নাহ বয়ান।
পদতলে লুঠই নাগর কান॥
চরণ ঠেলি চলি যাওত রাই।
বলরাম দাস কানুমুখ চাই॥ [১০০]

এর পর কলহান্তরিতার বেদনার ছবিটি সুন্দর এঁকেছেন। সখিদের তিরস্কার কলহান্তরিতা রাধার কৃষ্ণবিরহ আরও প্রখর করে তুলেছে।—

সখি নাহি বোলহ আর।
হাম ফল পায়লু তার॥
সহজই গতি মতি বাম।
তৈছন ইহ পরিণাম॥
যৈছে গরবে হিয়া পূর।
সো অব হোয়ল চূর॥
অবহুঁ না রহত পরাণ।
অনুচিত কয়লহুঁ মান॥
যৈছে রহয়ে মঝু দেহ।
সোই করহ অব থেহ॥
তুহু যদি না পুরবি আশ।
কি কহব বলরামদাস॥ [১০৪]

'সখি আর বোলোনা, আমার মানের কর্মফল পেলাম। আমার মতিচ্ছন্ন হয়েছিল তারই পরিণামফল পাচ্ছি। যে গর্বে মন ভরে ছিল এতদিনে সে গর্ব চূর্ণ হল। অনুচিত মান করে এখন প্রাণে বাঁচা কঠিন। এখন আমার প্রাণ যাতে বাঁচে তার উপায় কর। বলরাম বলছেন, তুমিই কানুর আশা পূরণ করনি, এখন আমরা কি করব।

কবি-চমৎকৃতির নিদর্শন স্বরূপ আর একটি সুন্দর পদ উদ্ধৃত করি।—

নিকুঞ্জ মন্দিরে রাই প্রবেশিলা রঙ্গে।
আপনার বরণ দেখয়ে শ্যাম অঙ্গে।
আন রমণী বলি নিবারল দীঠ।
ফিরিয়া চলিলা ধনী শ্যাম করি পীঠ॥
আকুল গোকুল চাঁদ পসরিয়া বাহু
শরদের চাঁদ যেন গরাসয়ে রাহু॥

দরশে বিরস কেন কিয়ে অপরাধ।
চাঁদ বিনে চকোর না জিয়ে তিল আধ॥
বলরামদাস কহে শুন বিনোদিনি।
শ্যামঅঙ্গ কত কোটি দরপণ জিনি॥ [১০৬]

এ পদ খণ্ডিতার না কলহান্তরিতার? পূর্বে খণ্ডিতা হবার ফলেই তো রাধার মনে সন্দেহ এবং ভ্রান্তি। সেই ভ্রান্তি নিরসনে নায়কের আকুলতা। ভ্রান্তিটি নায়ক কৃষ্ণকে কত বেশী লাবণ্য সৌন্দর্য দিয়েছে। 'শ্যাম অঙ্গ কত কোটি দরপণ জিনি' উক্তিতে অতিশয়োক্তি থাকতে পারে, শেষ পংক্তিটিতে স্পষ্টতই ব্যতিরেক অলঙ্কার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অলঙ্করণের এখানে সার্থক প্রয়োগ হয়েছে। রাধাকে খণ্ডিতার 'ভ্রান্তিমান' রোষে গরবিনী ভাবে এঁকেছেন চিত্রকার, কৃষ্ণও তাঁর ভ্রান্তি বুঝে ত্রস্তে তাকে ফেরাতে যত্নবান হয়েছেন। খণ্ডিতার রোষ শেষে কলহান্তরিতা রাধা শ্যাম-মিলনে গিয়েই এমন ভ্রান্তিতে পড়েছিলেন, তারই চমৎকার ছবিটি দিচ্ছেন বলরামদাস।

আক্ষেপানুরাগ

আক্ষেপানুরাগের কিছু হৃদয়গ্রাহী পদ লিখেছেন কবি। সে সব পদে অনেক সময় যেন বাংলা দেশের পল্লীবধূর সাংসারিক বেদনার ছবি ফুটে উঠেছে। একটি পদে রাধা বলেছেন।

বাজার ঝিয়ারী কুলের বৌহারী
স্বামি সোহাগিনী নারী।
পিরীতি লাগিয়া এ তিন খোয়ালু
হইলুঁ কুল খাকারি॥
সই কি ছার পরাণ কাজে।
স্বপনে সে জন নাহি দরশন
জগত ভরিল লাজে॥... [১২২]

রাজনন্দিনীর পিতৃপরিচয়, শ্বশুরকুলের বধূত্বের গৌরব, স্বামী সোহাগিনীর গৌরব—রাধা যে আকর্ষণে এই তিন গৌরব মোহ ত্যাগ করলেন আজ সেই কৃষ্ণদর্শনও দুর্লভ হল। স্বপ্নেও তার আর দেখা মেলে না!

আর একটি পদে আরও ঘরোয়া পারিবারিক চিত্র দিয়েছেন,—

দুখিনীর বেথিত বন্ধু শুন দুখের কথা।
কাহারে মরম কব কে জানিবে বেথা॥

কান্দিতে না পাই পাপ ননদীর তাপে !
আঁখির লোর দেখি কহে কান্দে বন্ধুর ভাবে ॥
বসনে মুছিয়ে ধারা ঢাকি যদি গায়।
আনছলে ধরি গুরুজনেরে দেখায় ॥
কালা নাম লৈতে না দেয় দারুণ শাশুড়ী।
কালা হার কাড়ি লয় কাল পাটের শাড়ী ॥
দুখের উপর বন্ধু অধিক আর দুখ।
দেখিতে না পাই বন্ধু তোমার চাঁদ মুখ ॥... [১২৪]

এখানে কবি ভাববৃন্দাবন থেকে যেন বাংলার পল্লীবধূর সংসারে নেমে এসেছেন। রাধার বেদনার চিত্রে পরকীয়া প্রেমাসক্তা পল্লীবধূর ননদ শাশুড়ীর হাতে গঞ্জনার ছবিটি এঁকেছেন।

দান, নৌকা বা রাসলীলার পদে কবির মৌলিকতা কিছু নেই। রসালস, কুঞ্জভঙ্গের চিত্রও গতানুগতিক। মাথুর পর্যায়ে পরপর কাহিনী গ্রন্থনে রাধার বিরহ, দূতীপ্রেরণ, মথুরায় দূতীকর্তৃক কৃষ্ণের কাছে বিরহী রাধার বর্ণনা, কৃষ্ণের দূতীর কাছে বেদনা প্রকাশ, রাধার কাছে ফিরে দূতী কর্তৃক কৃষ্ণের দ্বাদশ মাসিক বিরহ বর্ণনা, কৃষ্ণের বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্তন ও উভয়ের মিলন চিত্র অঙ্কিত করেছেন। বাহুল্য বোধে সে পদ আর উদ্ধৃত করছি না।

সবশেষে কবির সখী ভাবান্বিত (না দাসরূপ সেবক ভাবাপন্ন ?) প্রার্থনার একটি পদ উদ্ধৃত করে এ প্রসঙ্গ শেষ করা যেতে পারে।—

প্রার্থনার পদ

বিপরিত অম্বর পালটি পিন্ধায়ব
বান্ধব কুন্তলভার।
গাঁথি দুহুক হিয়ে পুন পহিরায়ব
টুটল মোতিমহার ॥
হরি হরি কব নবপল্লব শয়নে।
রতিরণে ছরমে ঘরমে দুহুঁ বৈঠব
বীজব কিশলয় বিজনে ॥
লোচন খঞ্জন কাজরে রঞ্জব
নব কুবলয় দুই কানে।

সিন্দূর চন্দনে তিলক বনায়ব
অলক করব নিরমাণে ॥
তুহুঁ মুখ জোতি মুকুর দরশায়ব
দেয়ব দকপূর পানে।
বলরাম দাসক চির দুখ মীটব
কব তুহু হেরব নয়ানে ॥ [১৭৬]

এ-পদে বলরাম রাধা-কৃষ্ণের মধুর প্রেমলীলার সৌন্দর্য দর্শনাভিলাসী; সখী-সেবিকা রূপে তিনি সেই লীলায় সহায়তা করতে চান।

ছন্দ ও অলঙ্কার

বলরামদাসের অলঙ্কার ও ছন্দ প্রয়োগের দিকে সচেতন কোনও প্রয়াস লক্ষিত হয় না। প্রয়োজনে তিনি উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক, ব্যতিরেক প্রভৃতি স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করেছেন কিন্তু সাধারণভাবে বলা যায় বাংলা পদে তিনি নিরাভরণ সৌন্দর্যের বেশী পক্ষপাতী ছিলেন, ব্রজবুলি পদে কিছুটা অলঙ্করণ ঐশ্বর্য রয়েছে। ছন্দ প্রয়োগে তিনি ব্রজবুলি পদে লঘুগুরু উচ্চারণের মাত্রাবৃত্ত গ্রহণ করেছেন, বাংলা পদে অক্ষরবৃত্ত রীতির পয়ার, ত্রিপদী (লঘু ও দীর্ঘ), চৌপদী, একাবলী প্রভৃতি ব্যবহার করেছেন। নূতনত্ব কিছু না আনলেও অলঙ্কার ও ছন্দের ব্যবহারে তাঁর স্বাভাবিক নৈপুণ্য লক্ষিত হয়।

বলরামের পদগুলি অধিকাংশই অলঙ্কার বাহুল্য বর্জিত, আন্তরিক সারল্যের সুরে বাঁধা। তিনি চৈতন্যাখ্য বৈষ্ণবতত্ত্ব যে একেবারে প্রচার করেননি এমন নয়। একটি মাথুর-পরবর্তী কৃষ্ণরাধার মিলন পদে (দ্র. ১৭১ প.) চৈতন্যরূপে নবদ্বীপে আবির্ভাব আকাঙ্খাও উভয়ের মুখে প্রকাশ করেছেন। তবুও স্বীকার করতে হয়, তাঁর অধিকাংশ পদ সহজ সুরে গাঁথা, আন্তরিক প্রেম-বেদনার সহজ ছবিই তাঁর মূল আলম্বন। পূর্ববর্তী কবিদের বিশেষ করে গোবিন্দদাসের এবং চণ্ডীদাসের প্রভাব তাঁর রচনায় যথেষ্ট। বাৎসল্যের পদে যাদবেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর মিল ও লক্ষণীয়,—কে কার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন অবশ্য বলা কঠিন। বাসু ঘোষ ও ঘনরামের সঙ্গে তাঁর কয়েকটি পদ একাকার হয়ে গেছে। সব সত্ত্বেও সযত্নে কবির পদগুলি পাঠ করলে তাঁর কবি-ব্যক্তিত্বের পরিচয় লাভ কঠিন নয়। সেই কারণেই বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাসের পরই পদাবলী গানে বলরাম দাসের স্থান চিহ্নিত হয়েছে। বাৎসল্য ও রসোদ্গারের পদেই তিনি শ্রেষ্ঠ কবির মর্যাদা লাভ করেছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

উল্লেখযোগ্য অন্য পদকারগণ

বাসুঘোষ

চৈতন্য চরিতামৃত কার বাসুঘোষের পরিচয়-প্রসঙ্গে লিখেছেন,—

কবি পরিচয়

গোবিন্দ, মাধব, বাসুদেব তিনভাই।
যা সবার কীর্ত্তনে নাচে চৈতন্য গোসাঞি ॥

[চৈ চ. আদি ১০প]

গোবিন্দ, মাধব এবং বাসুদেব তিন ভাইই নবদ্বীপে চৈতন্যের সহচর ছিলেন এবং কীর্তন গানে পারদর্শী ছিলেন।—এঁদের মধ্যে পদকার হিসাবে বাসুঘোষই সমধিক খ্যাতি লাভ করেন। বাসুঘোষ মুখ্যতঃ গৌরাঙ্গ লীলার পদই রচনা করেছেন এবং প্রত্যক্ষদর্শী কবির এই পদগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য। শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বৈষ্ণব-পদাবলীতে তার ১১৮টি পদ সংকলিত করেছেন।

বাসুঘোষ বিশুদ্ধ বাংলা এবং মিশ্র ব্রজবুলি উভয় ভাষ-রীতিতেই পদ লিখেছেন। বাংলা পদগুলি উৎকৃষ্ট। ব্রজবলি পদে তুবল শব্দ প্রয়োগ লক্ষিত

চৈতন্য লীলার শব্দ

হয়। তিনি বাল্যলীলা, পূর্বরাগ, রূপানুরাগ, অভিসার, রসোদ্গার, নৌকা ও দান-লীলা, রাসলীলা, আক্ষেপানুরাগ প্রভৃতি রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার আলেখ্যে গৌরাঙ্গলীলা বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া সন্ন্যাসজীবন-অবলম্বনে কয়েকটি সার্থক পদ রচনা করেছেন। চৈতন্য-লীলার অনেক পদে কবির প্রত্যক্ষ দর্শনের আভাস ফুটে উঠেছে। বাৎসল্য রসের একটি পদে বালক বিশ্বম্ভরের ছবি দিয়েছেন,—

শচীর আঙ্গিনায় নাচে বিশ্বম্ভর রায়।
হাসি হাসি, ফিরি ফিরি মায়েরে লুকায় ॥
বয়নে বসন দিয়া বলে লুকাইনু।
শচী বলে বিশ্বম্ভর আমি না দেখিনু ॥
মায়ের অঞ্চল ধরি চঞ্চল চরণে।
নাচিয়া নাচিয়া যায় খঞ্জ গমনে ॥

বাসুদেব ঘোষ কয় অপরূপ শোভা।
শিশুরূপ দেখি হয় জগজন লোভা॥

[বৈ. প. হরেকৃষ্ণ ১০প.]

বৃন্দাবনলীলার যশোদা-কৃষ্ণের বাৎসল্য রস কবি এখানে শচী-নিমাই চিত্রে আরোপ করেছেন।

চৈতন্যকে কৃষ্ণ এবং নবদ্বীপের চৈতন্য- ভক্তদের গোপীভাবে কল্পনা করে নবদ্বীপের চৈতন্য-ভক্তদের মধ্যে যে গৌরপারম্যবাদ গড়ে ওঠে তার পূর্বাভাস বাসুঘোষের পদে রয়েছে। সেখানে বৃন্দাবন-গোপী-ভাবাবেশে নবদ্বীপের নাগরীরা বলছেন,—

নিরমল গোরাতনু কষিল কাঞ্চন জনু
হেরইতে ভৈ গেলুঁ ভোর।
ভাঙ ভুজঙ্গমে দংশল মঝু মন
অন্তর কাঁপয়ে মোর॥ [২১]

রূপানুরাগের আর একটি পদে লিখছেন —

আর একদিন গৌরাঙ্গ সুন্দর
নাহিতে দেখিলুঁ ঘাটে।
কোটি চাঁদ জিনি বদন সুন্দর
ভোগয়া পরা। ঘাটে।

অঙ্গ ঢল ঢল কনক কষিল
অমল কমল আঁখি
নয়ানের শর ভাঙ ধনুবর
বিঁধয়ে কামধানুকী॥

কুটিল কুন্তল তাহে বিন্দুজল
মেঘে মুকুতার দাম।
জলবিন্দু ঝরে থরে থরে যেন
হেরিয়া মুরছে কাম॥

মোছে সব অঙ্গ নিঙ্গাড়ি কুন্তল
অরুণবসন পরে।
বাসুঘোষ কয় হেন মনে লয়
রহিতে নারিব ঘরে ॥ [২৯]

এখানে গৌরাঙ্গ চিত্রে কবি কৃষ্ণ অথবা রাধা কার সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করেছেন যেন কিছুটা সংশয় জাগে। দু একটি পদে এই সংশয় সম্পূর্ণ দূর করে নাগরী ভাবের গৌরপারম্যবাদের পথ দেখিয়েছেন।—

কি ক্ষণে দেখিলাম গোরা কি না মোর হৈল।
নিরবধি গোর রূপ নয়নে লাগিল।
চিত নিবারিতে চাহি নহে নিবারণ।
বাসুঘোষ বলে গোরা রমণীমোহন ॥ [৬০]

সজনী লো গোররূপ জনু কাচা সোনা
দেখিয়া যুবতী ত্যজে ঘরের বাসনা ॥
..
চিন চিন লাগে কিন্তু চিনিতে না যায় পারা।
বাসু কহে নাগরী ঐ গোপীর মন চোরা ॥ [৬১]

আলোচ্য পদগুলিতে চৈতন্যের সাক্ষাৎ ভক্তদের দ্বারাই যে গৌরপারম্যবাদের প্রতিষ্ঠা হতে চলেছিল তার স্বাক্ষর মিলছে।

বাসুঘোষ প্রকৃত কবিত্বের উৎকর্ষ দেখিয়েছেন গোরার সন্ন্যাস বর্ণনায়, শচীদেবীর জননী হৃদয়ের বেদনার চিত্রণে। প্রিয়জনের মনে ভাবী অমঙ্গলের ছায়াপাত হয়। বিষ্ণুপ্রিয়ার একটি ছবিতে তার সার্থক বর্ণনা রয়েছে,—

শচীদেবীর বাৎসল্য চিত্র

পাগলিনী বিষ্ণুপ্রিয়া ভিজাবস্ত্র চুলে।
ত্বরাকার বাড়ী আসি শাশুড়ীরে বলে ॥
বলিতে না পারে কিছু কাঁদিয়া ফাঁফর।
শচী বলে মাগো এত কি লাগি কাতর ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া বলে আর কি কব জননী।
চারিদিকে অমঙ্গল কাঁপিছে পরাণী ॥
নাহিতে পড়িল জলে নাকের বেশর।
ভাঙ্গিবে কপাল মাথে পড়িবে বজর ॥

থাকি থাকি প্রাণ কাঁদে নাচে ডাহিন আঁখি।
দক্ষিণে ভুজঙ্গ যেন রহি রহি দেখি॥
কাঁদি কহে বাসুঘোষ কি কহিব সতি।
আজি নবদ্বীপ ছাড়ি যাবে প্রাণপতি॥ [৮০]

সন্ন্যাসী বেশী চৈতন্যের ছবিটিও প্রত্যক্ষদর্শী কবি মর্মস্পর্শী বর্ণনায় এঁকেছেন,—

কি লাগিয়া দণ্ড ধরে অরুণ বসন পরে
কি লাগিয়া মুড়াইল কেশ,
কি লাগিয়া মুখচাঁদে রাধা রাধা বলি কাঁদে
কি লাগি ছাড়িল নিজ দেশ॥
শ্রীবাসের উচ্চরায় পাষাণ মিলাঞা যায়
গদাধর না জীবে পরাণে।
বহিছে তপত ধারা যেন মন্দাকিনী পারা
মুকুন্দের ও দুই নয়ানে॥
সকল মোহান্ত ঘরে বিধাতা[১] বুঝাঞা ফিরে
তবু স্থির নাহি হয় কেহ।
জ্বলন্ত অনল হেন রমণী ছাড়িল কেন
কি লাগি ত্যাজিল তার লেহ॥
কি কব দুঃখের কথা কহিতে মরমে ব্যথা
যা দেখি বিদরে মোর হিয়া।
দিবানিশি নাহি জানি বিরহে আকুল প্রাণি
বাসুঘোষ পড়ে মুরছিয়া॥ [৮১]

এখানে চৈতন্যের সন্ন্যাসকালের অতীত ইতিহাসের পরম মূল্যবান একটি পৃষ্ঠা বাসুঘোষ সযত্নে রক্ষা করেছেন বলা যেতে পারে।

মায়ের বেদনার ছবি আঁকতেই বাসুঘোষ বোধ হয় সবচেয়ে বেশী দরদী মনের পরিচয় দিয়েছেন। সন্ন্যাস গ্রহণের সংকল্প নিয়ে নবদ্বীপ ত্যাগ করে নিমাই অদ্বৈতগৃহে শান্তিপুরে এলেন। সেখান থেকে সন্ন্যাসী চৈতন্য নীলাচল যাবার মুখে মায়ের কাছে বিদায় নিচ্ছেন,—

১। 'বিধাতা' বলতে এখানে বড় হরিদাসকে বোঝানো হয়েছে। নবদ্বীপলীলায় তিনি ব্রহ্মাবতার রূপে পরিচিত ছিলেন।

নিতাই করিয়া আগে চলিলেন অনুরাগে
আইলা সবাই শান্তিপুরে।
মুড়ায়েছে মাথার কেশ ধরেছে সন্ন্যাসী বেশ
দেখিয়া সভার প্রাণ ঘুরে ॥
এমত হইলা কেনে শিরে কেশ দেখি হীনে
পরিয়াছে কৌপীন যে বাস।
নদীয়ার ভোগ ছাড়ি মায়েরে অনাথা করি
কার বোলে করিলা সন্ন্যাস ॥
কর জোড়ি অনুরাগে দাড়াল মায়ের আগে
পড়িলেন দণ্ডবৎ হৈয়া।
দুই হাতে তুলি বুকে চুম্ব দিয়া চাঁদমুখে
কান্দে শচী গলাটি ধরিয়া ॥
ইহার লাগিয়া যত পড়াইলাম ভাগবত
এ দুখ কহিব আমি কায়।
অনাথিনী করি মোরে যাবে বাছা দেশান্তরে
বিষ্ণুপ্রিয়ার কি হবে উপায় ॥
এ ডোর কৌপীন পরি কি লাগিয়া দণ্ডধারী
ঘরে ঘরে খাবে ভিক্ষা মাগি।
জীয়ন্ত থাকিতে মায় ইহা নাকি সহা যায়
কার বোলে হৈলা বৈরাগী ॥
গৌরাঙ্গের বৈরাগে ধরণী বিদার মাগে
আর তাহে শচীর করুণা।
কহে বাসুদেব ঘোষে গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসে
ত্রিজগতে রহিল ঘোষণা ॥ [৯৮]

পদটি বলরামদাসের ভণিতাতেও পাওয়া যায়। তবে মাতৃ হৃদয়ের বেদনার চিত্রণে বাসুঘোষের যে দক্ষতা অন্যপদে রয়েছে তার সঙ্গে এ-পদের সঙ্গতি রয়েছে বলে তাঁরই রচনা হিসাবে গণ্যকরা হল।

সব শেষে স্বপ্নে মাতা পুত্রের মিলনের একটি পদ উদ্ধৃত করি,—

আজিকার স্বপনের কথা শুন লো মালিনী সই
নিমাই আসিয়াছিল ঘরে।
আঙ্গিনাতে দাড়াইয়া গৃহপানে নেহারিয়া
মা বলিয়া ডাকিল আমারে॥
ঘরেতে শুইয়াছিলাম অচেতনে বাহির হৈলাম
নিমাইর গলার সাড়া পাইয়া।
আমার চরণের ধূলি নিল নিমাই শিরে তুলি
পুনঃ কাঁদে গলাটি ধরিয়া॥
তোমার প্রেমের বসে ফিরি আমি দেশে দেশে
রহিতে নারিলাম নীলাচলে।
তোমারে দেখিবার তরে আসিলাম নৈদ্যাপুরে
কাঁদিতে কাঁদিতে ইহা বলে॥
আইস মোর বাছা বলি হিয়ার মাঝারে তুলি
হেন কালে নিদ্রাভঙ্গ হৈল।
পুনঃ না দেখিয়া তারে পরাণ কেমন করে
কাঁদিয়া রজনী পোহাইল॥
সেই হৈতে প্রাণ কাঁদে হিয়া থির নাহি বাঁধে
কি করিব কহগো উপায়।
বাসুদেব ঘোষে কয় গৌরাঙ্গ তোমারি হয়
নহিলে কি দেখা পাও তায়॥ [১১৫]

নাগরীভাবের গৌরাঙ্গ-লীলার বর্ণনায় বাসুঘোষ কিছুটা অন্যান্য পদকারদের মতোই অলৌকিকতার প্রাধান্য দিলেও সন্ন্যাস বর্ণনায় বা মাতা শচীদেবীর বাৎসল্য বেদনার বর্ণনায় সহজ হৃদয় নিঙড়ানো প্রেমবেদনার ছবিই বিশেষ আন্তরিক ভাবে চিত্রিত করেছেন। তাছাড়া কবি চৈতন্যদেবকে সাক্ষাৎভাবে পেয়েছিলেন বলেই বর্ণনাগুলির মধ্যে তথ্যগত সজীবতার উষ্ণস্পর্শ লাভ করা যায়।

বাংলা পদগুলি কবি অক্ষরবৃত্ত রীতির পয়ার, ত্রিপদী (লঘু ও দীর্ঘ) ও দশমাত্রিক একপদী ছন্দোবন্ধে রচনা করেছেন। মিশ্র-ব্রজবুলি ভাষায় লিখিত পদগুলির শব্দ-ব্যবহার দুর্বল লঘু-গুরু মাত্রাবৃত্ত রীতির প্রয়োগও স্পষ্ট হয়নি।

তাঁর অনুপম বাংলা পদগুলির জন্যই বাসুঘোষ বৈষ্ণব পদকর্তাদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছেন।

লোচন দাস

কবি পরিচয়

চৈতন্য মঙ্গল নামক চৈতন্য-জীবনী কাব্যের লেখকই সম্ভবতঃ ধামালী ছন্দে (লৌকিক দলবৃত্ত) রচিত সুপরিচিত পদাবলী গানের রচয়িতা। বিষয়গত আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যে দেখা যায়, চৈতন্য-জীবনীকার লোচনদাস চৈতন্যের নাগরী ভাব-লীলার যে ছবি অঙ্কিত করেছেন পদ-গুলিতেও অনুরূপ লীলাচিত্রন আরও স্পষ্ট ভাবে রয়েছে। চৈতন্যমঙ্গল থেকে লোচনের আত্মপরিচয়ে জানা যায়, তিনি কোগ্রাম নিবাসী বৈদ্যবংশজ কমলাকর দাস ও সদানন্দীর পুত্র, শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকারের শিষ্য। সম্ভবতঃ ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় পাদে লোচনদাস বৈষ্ণব সাহিত্য জগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

লোচন তাঁর চৈতন্যমঙ্গল লিখেছিলেন পাঁচালী গানের উদ্দেশ্যে, আর দলবৃত্ত রীতির জনপ্রিয় পদগুলি রচনা করেছিলেন ধামালীগানের উদ্দেশ্যে। শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বৈষ্ণব পদাবলী সংকলনে তাঁর ৫৮টি গান সংগ্রহ করে দিয়েছেন। এই পদগুলির মধ্যে গৌরাঙ্গের বিভিন্ন লীলা, বিষ্ণুপ্রিয়ার দ্বাদশবিরহ (ছোট ছোট পয়ার বন্ধের ষট্‌পংক্তিক বারোটি পদ), নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত বন্দনা, রাধা কৃষ্ণের পূর্বরাগ, অভিসার, মান, আক্ষেপানুরাগ ও রসোদ্গারের পদ রয়েছে। ধামালী গানে দলবৃত্ত ছন্দ, বাকী পদগুলি অক্ষরবৃত্ত পয়ার ত্রিপদীতে রচিত।

লোচন গ্রাম্য শব্দব্যবহারে এবং কথ্য বাক্‌রীতিতে অন্য পদকারদের তুলনায় সংস্কৃতানুগ বর্ণনাভঙ্গি বহুলাংশে কাটিয়ে উঠেছিলেন। তার পদ পড়তে গেলে অনেক স্বাভাবিক সজীব গ্রাম-বাংলার মানুষের কণ্ঠস্বর যেন শুনতে পাওয়া যায়। সেটা কিছুটা হয়তো অমার্জিত, কিন্তু প্রাণের স্পর্শ মাখানো।

গৌরাঙ্গের রূপবর্ণনার একটা পদে লিখেছেন,—

গৌরাঙ্গ পরিচয়

ধবল পাটের জোড় পরাছে
রাঙ্গা রাঙ্গা পাড় দিয়াছে
চরণ উপর দুলা যাইছে কোঁচা।
বাঁকমল সোনার নূপুর
বাজ্যা যাইছে মধুর মধুর
রূপ দেখিয়া ভুবন মুরছা॥

দীঘল দীঘল চাঁচর চুল
তায় দিয়াছে চাঁপার ফুল
কুন্দ মালতীর মালা বেড়া ঝুটা।
চন্দন মাখা গোরা গায়
বাহু দোলাইয়া চল্যা যায়
ললাট উপর ভুবন মোহন ফোঁটা। [২]

আক্ষেপানুরাগের একটি পদে লিখছেন,—

রস করিতে জানে যদি তবে সে মনের সুখ।
গোপত কথা বেকত করে এই যে বড় দুখ।।
চলমল্যাকে চতুর বলি হেটমুড়্যাকে জপু।
রস জানিলে রসিক বলি নৈলে বলি ভেপু।। [৪৬]

ননদিনীর সঙ্গে ভ্রাতৃবধূ-রূপী রাধার কলহের চিত্র দিচ্ছেন,—

ঠারে ঠোরে তারে তোরে দেখিলাম নয়ানে।
কিসের কথা কৈতেছিলি নন্দের পোয়ের সনে।।
যুবা মায়্যা পথে পায়্যা মধ্যে কিসের কথা।
হেন বুঝি দাদার আমার হেঁট করিবি মাথা।।

... ...

নন্দের পোয়ের সনে কথা কৈতেছিলাম যদি।
তখন কেনে ধরিস নাইলো খুবরা গরবাথাকী।।

... ...

লোচনদাসের মনের আশ পুরল এতদিনে।
মরে না কেন ছারকপালী দেখ্যা শ্যামের সনে।। [৫০]

নাগরী ভাবের লীলার পদে লিখছেন,—

নাগরীভাবের পদ

আর শুন্যাছ আলো সই গোরা ভাবের কথা।
কোণের ভিতর কুলবধূ কান্দ্যা আকুল তথা।।
হলদি বাঁটিতে গোরী বসিল যতনে।
হলুদ বরণ গোরাচাঁদ পড়্যা গেল মনে।।
কিসের রান্ধন কিসের বাড়ন কিসের হলদি বাঁটা।
আঁখির জলে বুক ভিজিল ভাস্যা গেল পাটা।।

উঠিল গৌরাঙ্গ ভাব সম্বরিতে নারে।
লোহেতে ভিজিল বাঁটন গেল ছারে খারে ॥
লোচন বলে আলো সই কি বলিব আর।
হয় নাই হবার নয় গোরা অবতার ॥ [৭]

এ পদগুলিতে রুচিগত কিছুটা গ্রাম্যতা দোষ রয়েছে সন্দেহ নেই, আর সেই কারণেই অন্যান্য বৈষ্ণব কবিদের গতানুগতিক বর্ণনাভঙ্গি কাটিয়ে গ্রামীণ সজীব লোক-জীবনের আমেজ ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। চিত্রগুলি খুবই স্পষ্ট পরিচিত মনে হবে শ্রোতাদের কাছে।

কৃষ্ণের পূর্বরাগের আর একটি চমৎকার পদ চণ্ডীদাস এবং লোচন উভয়ের ভণিতাতেই পাওয়া যায়। হরেকৃষ্ণ লোচন-ভণিতাতেই পদটি রেখেছেন। চিত্রাঙ্কণ-বৈশিষ্ট্যে পদটি লোচনের হওয়াই বেশী স্বাভাবিক।—

পূর্বরাগ

সখা হে ও ধনী কহ কে বটে।
গোরোচনা গোরী নবীনা কিশোরী
নাহিতে দেখিনু ঘাটে ॥
... ...
নাহিয়া উঠিতে নিতম্ব তটীতে
পড়েছে চিকুর রাশি।
কালিয়া আঁধার কনক চাঁদার
শরণ লইল আসি ॥
চলে নীল শাড়ী নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি
পরাণ সহিত মোর।
সেই হৈতে মোর হিয়া নহে থির
মনমথ জ্বরে ভোর ॥
এ দাস লোচন কহিছে বচন
শুনহ নাগর চান্দা।
সে যে বৃষভানু রাজার ঝিয়ারী
নাম বিনোদিনী রাধা ॥ [৩৮]

সদ্যস্নাতা রাধার নিতম্ব-তটীতে এলায়িত চিকুররাশি এলিয়ে পড়েছে; কবির উপমা, কালিয়া আঁধার যেন কনক-চাঁদায় স্মরণ নিয়েছে। এ-উপমায় প্রচ্ছন্নভাবে

গোরাচাঁদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় লাভের ইঙ্গিত আছে কি? এর পরই প্রেমের অনির্বচনীয় অভিব্যক্তি, রাধা নীল সাড়ী নিঙড়াতে নিঙড়াতে চলেছেন, সে যেন প্রেমিকের হৃদয়কেই নিঙড়ে চলা, সেই থেকে মন্মথজ্বরে কৃষ্ণের মন আচ্ছন্ন। চিত্রটির রূপময়তা ও ভাবব্যঞ্জনা অতুলনীয়।

লোচন অল্প কয়েকটি পদ লিখেছেন, সে পদগুলির ছন্দ বা অলঙ্করণ ঐশ্বর্যও এমন কিছু নয়। পাণ্ডিত্যের পরিচয়ও তিনি কোথাও দিতে চাননি। কিন্তু চৈতন্য পরবর্তী বৈষ্ণব পদাবলীতে যেন অকৃত্রিম গ্রামজীবনের 'লবন-সম্পৃক্ত' প্রেমের স্বাদ বহন করে এনেছেন।

জগদানন্দ

সপ্তদশ অষ্টাদশ শতকে বৈষ্ণব সাহিত্যের নব প্রাণশক্তির প্রবাহ ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে এসেছে বলা যেতে পারে। এই সময়ে আর নতুন কোনও দার্শনিক বোধ বা কবিত্বের ভাব-প্রবাহ বৈষ্ণব মহাজনদের মধ্যে দেখা দেয়নি। পূর্ববর্তী ধারায় বহুধা বিভক্ত হয়ে ক্রমান্বয়ে তার অন্তঃশক্তি ক্ষয়িত হয়ে এসেছে। অষ্টাদশ শতকে বৈষ্ণব গোষ্ঠী প্রধানতঃ সংগ্রহের প্রতি বেশী মনোযোগী হয়েছিলেন। বিশ্বনাথ কবিরাজের ক্ষণদাগীত চিন্তামণি, রাধামোহন ঠাকুরের পদামৃত সমুদ্র, গৌরসুন্দর দাসের কীর্ত্তনানন্দ এবং বৈষ্ণবদাসের পদকল্পতরু এ-যুগের সংকলন গ্রন্থ হিসাবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অষ্টাদশ শতকের কবিসংখ্যা বিপুল, তবে যথার্থ প্রতিভাবান কবি কাউকেই বলা চলে না। জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস বা বলরাম দাসের পর্যায়ে এ-যুগের কোনও কবিই পৌছাতে পারেননি। তাঁদের মধ্যেও জগদানন্দ ও শশিশেখরের নাম করা যেতে পারে।

জগদানন্দ রচনারীতির দিক থেকে লোচনের ঠিক বিপরীত আদর্শের কবি ছিলেন। ছন্দ ও অলঙ্কারের প্রতি তাঁর অত্যধিক আসক্তি গোবিন্দদাসকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু গোবিন্দদাসের স্বভাবদত্ত কবিত্ব-প্রতিভা সেখানে অনুপস্থিত। শব্দ প্রয়োগে তিনি কিছুটা কৃত্রিম সংস্কৃত-ঘেঁষা আদর্শ নিয়েছিলেন। সব মিলিয়ে পদগুলি ধ্বনি-ঐশ্বর্য-সমৃদ্ধ, তবে কবিত্বের ও প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে কিছুটা কৃত্রিম ও আড়ষ্ট। তিনি গৌরাঙ্গ-আবির্ভাব, বাল্য লীলা, রূপ বর্ণনা ও প্রেমানুরাগের যেমন পদ লিখেছেন, তেমনি বৃন্দাবন-লীলায় কৃষ্ণ ও রাধার রূপ-বর্ণনা, পূর্বরাগ, অভিসার বিপ্রলম্ভ আক্ষেপানুরাগ, মাথুর প্রভৃতি পর্যায়ের পদও রচনা করেছেন। হরেকৃষ্ণ

অলঙ্কার-সচেতন কবি

মুখোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থে কবির ৬২টি পদ সংকলিত করেছেন। এখানে তার থেকে বৈশিষ্ট্যদ্যোতক দু-একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

গৌরাঙ্গ রূপ-বর্ণনায় কবির বর্ণানুপ্রাস প্রবণতায় দুটি দৃষ্টান্ত প্রথম উদ্ধৃত করি।—

ন-বর্ণানুপ্রাস : নিতুই নৌতুন নিগূঢ় নিজরস নীরনিধি নিরমাই।
নিয়ত নিমগন ন জানে নিশিদিন নদিয়ানন্দ সদাই ॥
[১২]

চ-বর্ণানুপ্রাস : চারু চাচর চিকুর চূড়াহি চপল চম্পকদাম।
চঞ্চলাচিত চোর মূরতি চাহি চমকিত কাম ॥
[১৩]

উভয় পদে যথাক্রমে ন ও চ বর্ণের ব্যবহার-আধিক্যে আলঙ্কারিক নৈপুণ্য প্রকাশ পেলেও কবিত্ব আদৌ প্রকাশ পায় নি।

জগদানন্দের একটি প্রিয় ছন্দোবন্ধ হল প্রাচীন (বিদ্যাপতি ভঙ্গিম) লঘু-গুরু উচ্চারণ সমন্বিত ছয় মাত্রার মাত্রাবৃত্ত পর্বভাগে ১২॥১২॥১২॥১০ I মাত্রিক পদভাগের চৌপদী। এই ছন্দোবন্ধে কবি কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা, রাধার অভিসার এবং মিলন ও রসালস বিষয়ক কয়েকটি পদ লিখেছেন। সুপরিচিত অভিসার বিষয়ক পদটি এখানে উদ্ধৃত করা গেল।—

অভিসার পদের চমৎকারিত্ব

মঞ্জু বিকচ কুসুম পুঞ্জ
মধুপ শব্দ গঞ্জিগুঞ্জ
কুঞ্জরগতি গঞ্জিগমন মঞ্জুল কুলনারী।
ঘনগঞ্জন চিকুরপুঞ্জ
মালতীফুল মালরঞ্জ
অঞ্জনযুত কঞ্জনয়ন- খঞ্জন গতিহারী ॥
কাঞ্চনরুচি রুচির অঙ্গ
অঙ্গে অঙ্গে ভরু অনঙ্গ
কিঙ্কিনী কর-কঙ্কণ মৃদু ঝঙ্কৃত মনোহারী।
নাচত যুগ ভ্রু-ভুজঙ্গ
কালিয় দমন-দমন রঙ্গ

সঙ্গিনী সব রঙ্গে পহিরে রঙ্গিল নীল শাড়ী ॥
দশন কুন্দকুসুম নিন্দু
বদন জিতল শারদ ইন্দু
বিন্দু বিন্দু ছুরয়ে ঘরমে প্রেম সিন্ধু প্যারী।
ললিতাধরে মিলিত হাস
দেহ দীপতি তিমির-নাশ
নিরখি রূপ রসিক ভূপ ভুলল গিরিধারী ॥
অমরাবতী যুবতীবৃন্দ
হেরি হেরি পড়ল ধন্দ
মন্দ মন্দ হসনানন্দ নন্দন সুখকারী।
মণিমাণিক নখ বিরাজ
কনক নূপুর মধুর বাজ
জগদানন্দ থল-জলরুহ চরণক বলিহারী ॥ [৩৬]

'কিঙ্কিনী কর কঙ্কণ মৃদু ঝঙ্কৃত' শ্রীরাধার অভিসার রূপ-সৌন্দর্যের চিত্রাঙ্কণে কবি এখানে অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছেন। ধ্বনিতরঙ্গে কৃষ্ণ-সমাগমোৎফুল্লা রাধার রূপের তরঙ্গ, উল্লাসের তরঙ্গ যেন উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। পদটি ছন্দ ও অলঙ্কারে যেন সরব চিত্রের আশ্চর্য উদাহরণ হয়ে উঠেছে। ধ্বনি দিয়ে যে কত সার্থক চিত্রাঙ্কণ সম্ভব গোবিন্দদাসের কিছু পদে তার পরিচয় রয়েছে। জগদানন্দের এ পদটিও সেই পর্যায়ভুক্ত হতে পারে। তবে সবত্র যে এরূপ দক্ষতা দেখাতে পেরেছেন এমন বলা চলে না।

আক্ষেপানুরাগ

আক্ষেপানুরাগের একটি সুপরিচিত পদ কয়েকটি পরস্পরিত সুন্দর রূপক-চিত্রণের মাধ্যমে গ্রথিত হয়েছে।—

সজনি কেন গেলাম যমুনার জলে।
নন্দের নন্দন চাঁদ পাতিয়া রূপের ফাঁদ
ব্যাধ ছিল কদম্বের তলে ॥
দিয়া হাস্য সুধাচার অঙ্গছটা আঠা তার
আঁখি-পাখি তাহাতে পড়িল।
মন মৃগী সেই কালে পড়িল রূপের জালে
শূণ্য দেহ-পিঞ্জর রহিল ॥ [৫১]

এই বর্ণনা-ভঙ্গিতেই রূপকে গেঁথে কবি সমগ্র পদটি সাজিয়েছেন, তাতে বৈদগ্ধ্য, নৈপুণ্য এবং চিত্রাঙ্কণের শিল্প-কুশলতা চমৎকার প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু কবিত্ব বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

কৃত্রিম শব্দ-গ্রন্থণের প্রতি কবির কিছুটা মাত্রাতিরিক্ত প্রবণতা ছিল। একাধিক পদে তিনি এমন ভাবে পর্ব বিন্যাস করেছেন যে প্রতি পর্বের প্রথম বর্ণ পরপর সাজালে তার থেকে আবার নতুন কথা সৃষ্টি হয়। কোথাও সেটি 'হরেকৃষ্ণ' নামকীর্তনের রূপ পায়, কোথাও বা তাঁর গুরু নরহরির বন্দনা বাক্য গড়ে ওঠে।[১] এ পদগুলি ভাষার কারুকর্মের পর্যায়ে পড়ে, কবিত্বের মাপকাঠিতে এর বিচার চলেনা।

শশিশেখর

অষ্টাদশ শতকের বৈষ্ণব কবি গোষ্ঠীর মধ্যে নিঃসংশয়ে শশিশেখরকে শ্রেষ্ঠ আসন দিতে হয়। তাঁর রচিত পদ-গীতির সংখ্যা খুব বেশী না হলেও,[২] গুণবিচারে সেগুলি উৎকৃষ্ট। রাধা ও কৃষ্ণের পূর্বরাগ, অভিসার, মান ও মাথুর পর্যায়ে কবির কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর পদ লক্ষিত হয়। পদাবলী রচনায় বিদ্যাপতি এবং চৈতন্য-পরবর্তী বৈষ্ণব কবিরা জয়দেবের ছন্দ-রীতির দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। পয়ার-ত্রিপদী ছন্দে চার বা ছয় মাত্রার পর্ব ব্যবহারের দৃষ্টান্তই বেশী। ৬।৫ মাত্রা ভাগের একাবলীও কবিদের একটি সুপরিচিত প্রিয় ছন্দোবন্ধ। কিন্তু জয়দেবের অত জনপ্রিয় পাঁচমাত্রা পর্বভাগের ছন্দ খুবই কম অনুসৃত হয়েছে। শশিশেখর সেই বিরল-দৃষ্ট কিন্তু অপূর্ব ধ্বনি-সমৃদ্ধ পঞ্চমাত্রিক ছন্দোবন্ধকে পদাবলীতে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন বলা যেতে পারে।

জয়দেবী পঞ্চমাত্রিক ছন্দের অনুসারক কবি

কৃষ্ণের পূর্বরাগ বর্ণনায় রোমান্টিক বর্ণমাধুর্যময় একটি পদ থেকে কয়েকটি পংক্তি প্রথম উদ্ধৃত করি।[৩]—

তুঙ্গমণি মন্দিরে ঘন বিজুরি সঞ্চরে
মেঘরুচি বসন পরিধানা।

১। দ্রঃ শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়: বৈষ্ণব পদাবলী: জগদানন্দ ৫৯, ৬০ পদ।

২। শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 'বৈষ্ণব পদাবলী'তে শশিশেখরের ২৯টি পদ সংকলিত করেছেন।

৩। 'বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি কৌমুদী' গানের ছন্দ দ্রঃ।

যত যুবতী মণ্ডলী পন্থ মাঝে পেখলি
কোই নহ রাইক সমানা ॥
অতএ বিহি তোহারি সুখ লাগি।
রূপগুণ সায়রি সৃজিল ইহ নায়রি
ধনিবে ধনি ধন্য তুয়া ভাগি।। [৪]

মণিমন্দিরের উপবিভাগে ঘনবিদ্যুৎ সঞ্চরণের চমক জাগিয়ে মেঘরুচি বসন পরিধানা রাধা পায়চারি করছেন। দূর থেকে কৃষ্ণ তাকে দেখে পথের অন্য যুবতী মণ্ডলীর সঙ্গে তুলনা করছেন, কোই নহ রাইক সমান',—এই সঞ্চরমান অপূর্ব রোমান্সের মূর্তিটি কবি পঞ্চমাত্রিক পর্বস্পন্দনে (১০।। ১০।। ১৪ মাত্রাভাগে) চমৎকার তুলে ধরেছেন।

বাসকসজ্জিকা রাধার উৎকণ্ঠার আর একটি সুন্দর চিত্র উদ্ধৃত করি। কৃষ্ণ-আগমনে বিলম্বে উৎকণ্ঠিতা রাধা দূতীকে কৃষ্ণের কাছে পাঠিয়েছেন। দূতী কৃষ্ণকে গিয়ে বলছে,—

করি কুসুম সেজ তুয়া সঙ্গ সুখ লালসে
বিজন বনে বৈঠি বর রামা।
তুহারি লাগি যতন করি কুসুম তুলি কামিনি
নিজহি করে রচন করু দামা ॥
মাধব সো ধনি বিলম্ব হেরি তোর।
চকিত চারু-লোচনে নিরখি নিজ সম্মুখে
তমাল তরু তাহে করু কোর ॥
মলয়গিরি শীতল পরিমলে বিষ মানই
শশি-কিরণ বহ্নি বলি জানে।
কোকিল-কুল শব্দ শুনি মুদিত দুহু লোচনে
বজর বলি হাত দেই কানে ॥
অতএ তুহু তুরিত করি চলহ রতি-মন্দিরে
সফল কর সেজ দুহুঁ মেলি।
শশিশেখর তপত আঁখি শীতল হব তৈখনে
নিরখি তুয়া সঙ্গে তছু কেলি।। [১১]

শব্দগ্রন্থিতে মাঝে মাঝে দুর্বলতা নেই এমন নয়, তবু উৎকণ্ঠিতা রাধার পক্ষ নিয়ে দূতীর কৃষ্ণের প্রতি এই অনুনয়ের ছবিটি হৃদয়গ্রাহী হতে পেরেছে।

সুপরিচিত জয়দেবী এই ১০।। ১০।। ১৪ মাত্রার ছন্দে শশিশেখর আরও কয়েকটি সুন্দর পদ রচনা করেছেন। মাথুর পর্যায়ের একটি পদে রাধা বিলাপ করছেন,—

শিতল তছু অঙ্গ দেখি সঙ্গসুখ লালসে
খোয়লুঁ কুল ধরম-গুণ নাশে।
সোই যদি তেজল কি কাজ ইহ জীবনে
আনহ সখি অনল করি গ্রাসে ॥
প্রাণ সঞে অধিক তুহুঁ রোয়সিয়ে কাহে সখি
মরিলে হম করিহ ইহ কাজে।
অনলে নহি দাহবিরে নীরে নহি ডারহি
এ তনু ধরি রাখবি ব্রজমাঝে ॥
হমারি দোন বাহু ধরি সুদৃঢ় করি বাঁধবি
শ্যাম-রুচি-তরু তমাল-ডালে।
প্রতি দিবস সবহুঁ মিলি নিচয়ে আসি দেখবি
শয়ন-তেজি উঠই উষ-কালে ॥ [২৭]

সখিদের প্রতি উক্ত নির্দেশ দিয়ে রাধা একে একে নিজের অলঙ্কারগুলি খুলে তাদের বিলিয়ে দিলেন। এই মর্মবিদারি ছবি কবিকেও হতচেতন করে তুলেছে। দূতী তখন দ্রুত মথুরায় গিয়ে কৃষ্ণকে বলছেন,—

নৃপতি সুখে বাঞ্ছ যদি
ব্রজে কি মন মানেনা।
গোপকুলে বসতি কেবা
নন্দঘোষ জানেনা ॥
রাইক ছোড়ি রহলি ভুলি
তাও কি মনে মিলনা।
তারে হার চাহসি যদি
কুবুজা সনে মিলনা ॥ [২৮]

এখানেও ৫।৫।৫।৫ মাত্রাভাগের ছন্দোবন্ধ।

ছয়মাত্রার ছন্দোবন্ধেও কবি চমৎকার কয়েকটি পদ লিখেছেন। গোষ্ঠবিহারের একটী পদ থেকে উদ্ধৃত করি।—

কটি কাছনি রঙ্গিম ধটি বেণুবর বাম কাঁধে।
জিতি কুঞ্জর গতি মন্থর ভায়া ভায়া বলি ডাকে॥
গলে লম্বিত গুঞ্জাবলি ভুজে অঙ্গদবালা।
গো-ছান্দন ডুরি কান্ধেতে কাণে কুণ্ডল খেলা॥
স্ফুট চম্পক দল নিন্দিত উজ্জ্বল তনু-শোভা।
পদ-পঙ্কজ নূপুর বাজে শশিশেখর লোভা॥ [২]

শব্দসূচনায় কদ্ধদলের ব্যবহার এ পদটিতে ধ্বনিগত একটি স্পন্দন-বৈচিত্র্য এনে দিয়েছে।

বৈষ্ণব কবিরা বিশুদ্ধ সংস্কৃত ছন্দের ব্যবহার কম করেছেন। ছন্দ-সচেতন শশিশেখর কিন্তু যেমন জয়দেবী ছন্দের ব্যবহারে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন, তেমনি সুপরিচিত তোটকের (লঘু-লঘু-গুরু এরূপ চারটি পর্ব ৪। ৪। ৪। ৪) ব্যবহারেও চমৎকারিত্ব এনেছেন,—

। । ২ ১ । ২ ১ ১ ২ ১ ১ ২
বিকলে বিকলে ভেজি বৈঠি বহুঁ।
প্রতিপক্ষ-সভা কহুঁ ভের বহু॥
যব নন্দ সুনন্দন পাদে পড়ি।
তব কোপ বঢ়ে অভিমান চঢ়ে॥ [১৯]

সবশেষে কবির নাট্যরসাশ্রিত একটি সংস্কৃত ও ব্রজবুলি মিশ্র পদ থেকে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করছি। খণ্ডিতা মানিনী রাধার মান ভাঙাতে কৃষ্ণ অনুনয় করছেন, উভয়ের উক্তি-প্রত্যুক্তি, কৃষ্ণ সংস্কৃতে বলছেন, রাধা ব্রজবুলি মিশ্র বাংলাতে বলছেন।—

রাধে জয় রাজপুত্রি সম জীবনদায়িতে।
যাও যাও বঁধু যত বড় তুমি জানা গেল তুয়া চরিতে॥
কিঞ্চিদপি কস্মিন্নপরাধং নহি করোমি।
সঙ্কেত করি আন ঘরে যাহ নিশি জাগিয়ে আমি॥
মানং ময়ি মুঞ্চ প্রিয়ে বচনং শৃণু ধীরে।
শুনিবারে কিবা কাজ চিহ্ন দেখা যায় সব শরীরে॥

গত রাত্রৌ যদভূন্মম দুঃখং শৃণু সরলে।
বধিরা হাম কিয়ে শুনায়সি তাহে শুনায়বি বিরলে॥[১]

[১৮]

শশিশেখরের পদগুলি পড়তে গেলে তাঁর আন্তরিকতার সুর পাঠক মনকে অভিভূত করে। কৃষ্ণের মধ্যে ভগবৎ সত্তা আরোপ করেও বিরহিণী রাধার বেদনায় প্রেমাকুলা নারীর বেদনাই সহৃদয়তার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। ছন্দসচেতন কবি হলেও শশিশেখরের পদে ছন্দ কবিত্বকে কোথাও ক্ষুণ্ণ করেনি, বরং তাকে আরও মনোহারী করে তুলেছে বলা যেতে পারে।

বৈষ্ণব-পদকারদের আলোচনা এখানে শেষ করা যেতে পারে। কয়েকজন পদকার মাত্র দু'একটি প্রখ্যাত পদের জন্যও পদাবলী সাহিত্যে স্থায়িত্ব লাভ করেছেন। রায় রামানন্দের 'পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল', মুরারিগুপ্তের 'সখিহে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও', নরহরির 'গৌরাঙ্গ নহিত কি মেনে হইত' বা বসু রামানন্দের 'তোমারে কহিয়ে সখি স্বপন কাহিনী' পদগুলির কথা এ প্রসঙ্গে সহজেই মনে আসবে। যাদবেন্দ্র দাসের বাৎসল্যের পদ কয়টিও অনুপম। কিন্তু এমন এক আধটি পদ অবলম্বনে কবি প্রতিভার বিশ্লেষণ সম্ভবপর নয় বলে সে প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকা গেল।

১। পদের সংস্কৃত পংক্তিগুলির অর্থ:

১ম। আমার জীবন দয়িতে রাজপুত্রি রাধে, তোমার জয় হোক।

৩য়। আমি কোন অপরাধ কিছুমাত্রও তো করিনি।

৫ম। প্রিয়ে, আমার প্রতি মান ত্যাগ কর, ধীরে কথা শোন।

৭ম। সরলে, গতরাত্রে আমার যে দুঃখ হয়েছে শোন।

সপ্তম অধ্যায়

পদাবলীর গঠনশিল্প

আলোচ্য অধ্যায়ে পদাবলীর গঠনভঙ্গি সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে।

সাহিত্যে বাগর্থের সম্পর্ক

কালিদাস রঘুবংশ কাব্য লিখতে গিয়ে বাগর্থের সম্যক প্রতিপত্তি লাভের আকাঙ্ক্ষায় বাক্ ও অর্থের মতই নিত্য সম্বন্ধযুক্ত পার্বতী পরমেশ্বরের বন্দনা করে কাব্য রচনা শুরু করেছিলেন।

বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থ-প্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতী-পরমেশ্বরৌ ॥ ১।১

বাক্ এবং অর্থ উভয়ের সম্যক মিলনেই কাব্য রচিত হয়: 'শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম্।' কবিমনে এ-দুই বস্তু 'অপৃথগ্‌যত্ননির্বত্য'—এক অভিন্ন প্রেরণাতেই প্রকাশ পায়। দেশ, কাল ও শিল্পী ভেদে ভাষারীতির, চিত্রকলা ও অলঙ্কারের এবং ছন্দস্পন্দের পরিবর্তন ঘটে।—এই উপকরণগুলি অবলম্বনেই শিল্পী তার সাহিত্যের নতুন জগত গড়ে তোলেন। অনেক সময় দেখা যায় এক বিশিষ্ট শিল্পী বা শিল্পীগোষ্ঠী কোনও একটি ভাবকে অবলম্বন করে যে নতুন সাহিত্যধারা গড়ে তোলেন—দীর্ঘকাল ধরে সেই ধারা পরবর্তীরা অনুসরণ করে চলেন। বৈষ্ণব পদাবলীগানের ক্ষেত্রে এই ধারার প্রথম পথিকৃৎ জয়দেব, তারপর বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস। জয়দেব সংস্কৃতে লিখেছেন। তাঁর প্রভাব চিত্রকল্প-অলঙ্করণে বা ছন্দে পরবর্তীদের উপর যতটা পড়েছে, ভাষার দিক থেকে ততটা নয়।

পদাবলীর ভাষা-বৈশিষ্ট্য

বাংলা ভাষার যুগবিভাগে একমাত্র চর্যাপদকে প্রাচীন যুগের (৯৫০-১৩০০ খৃ) নিদর্শন বলা যেতে পারে। আদি-মধ্য যুগের (১৩০০-১৫০০ খৃ) নিদর্শন হল চৈতন্য-পূর্ব যুগের সাহিত্য নিদর্শনগুলি। বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাসের পদাবলীকে

যুগবিভাগ

এই শ্রেণীভুক্ত করতে হয়। এর মধ্যে আবার বিদ্যাপতির রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক পদগীতিগুলি মৈথিল-প্রভাবিত কৃত্রিম ব্রজবুলি ভাষায় লিখিত। তার ভাষারীতি পৃথকভাবে বিচার্য। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পালা কাব্যটিও এই যুগে লিপিত হয়েছে। পরিশিষ্টে সে বিষয়ে

পৃথক আলোচনা করা গেল। অন্ত্য-মধ্য যুগেরই (১৫০০-১৮০০) সাহিত্য নিদর্শন অনেক বেশী পরিমাণে আমাদের হাতে এসেছে। বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস পরবর্তী সমগ্র বৈষ্ণব কবিগোষ্ঠী এই যুগেই বহু সহস্র পদগীতি রচনা করেছেন। তাঁরা মুখ্যতঃ বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাস প্রবর্তিত দু'টি রচনারীতি অবলম্বনে অগ্রসর হয়েছেন। সুতরাং পদাবলীর গঠনশিল্পের আলোচনায় মূল দুই শিল্পীকে অবলম্বন করলেই মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলির সন্ধান মিলতে পারে।

ভাষার বিচার্য বিষয়

ভাষাবিচারে মুখ্য বিচার্য দুটি, ধ্বনিতত্ত্ব (phonology) এবং রূপতত্ত্ব (morphology)। তাছাড়া পদক্রম (syntax) এবং শব্দ-উপকরণও (vocabulary) লক্ষণীয়। তবে পদ্য-গীতির ক্ষেত্রে পদক্রম বিচারের উপযোগিতা কম।

ব্রজবুলি প্রসঙ্গ

পঞ্চদশ শতকের কবি বিদ্যাপতি (১৩৮০-১৪৬০ ?) মিথিলার অধিবাসী। মৈথিল অপভ্রংশ মিশ্রিত কৃত্রিম একটি সুললিত ভাষায় তিনি রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক কয়েকশত উৎকৃষ্ট পদ রচনা করেন। ব্রজলীলা কাহিনীর ভাষা এই অর্থে বিদ্যাপতি উদ্ভাবিত এই কৃত্রিম কবি-ভাষাকে 'ব্রজবুলি' বলা হয়। ব্রজের পশ্চিমী হিন্দী ব্রজভাষার সঙ্গে 'ব্রজবুলি'র সম্পর্ক নেই। সে সময় মিথিলা ভৌগোলিক দিক থেকে বৃহত্তর বাংলার অন্তর্গত ছিল। স্বভাবতই চৈতন্য আবির্ভাবের প্রভাবে ব্রজবুলি কবিতা বাংলাদেশে আদরণীয় হয়ে ওঠে। চৈতন্য-পরবর্তী অধিকাংশ পদাবলী-গানের কবিই চণ্ডীদাসের আদর্শে বিশুদ্ধ বাংলা পদ যেমন লিখেছেন, বিদ্যাপতির আদর্শে ব্রজবুলি পদও রচনা করেছেন। এমনকি ঊনবিংশ শতকের শেষে রবীন্দ্রনাথও এই ব্রজবুলিতে বৈষ্ণব-পদগীতি লিখতে প্রলুব্ধ হয়েছিলেন দেখা যায়।[১]

ধ্বনি বৈশিষ্ট্য

ব্রজবুলির ধ্বনিগত কয়েকটি বৈশিষ্ট্যে প্রাকৃত-অপভ্রংশের সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে।—

স-উচ্চারণ

(ক) তিনটি শ, ষ, স-এর পরিবর্তে একটি 'স' এর প্রয়োগ। যেমন,—

১। বিদ্যাপতির ব্রজবুলি বিষয়ে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যে মন্তব্য করেছেন তার প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে স্মরণ করা যেতে পারে।—

ননদি রুসিএ রহু পরদেস বসপহু সাসুহি ন সুধ সমাজে। (১৬)[১]
দসমী দসা পথ আগিরএো।(৪১)
সৈসবেবাপুড়ে সীমা ছাড়ল (১৮)
অবল অরুণ সসিক মণ্ডল…কদলি উপর কেসরি দেখল (২৬)

(খ) ব্যঞ্জন ধ্বনি বর্জন ও স্বরধ্বনি ব্যবহার প্রবণতা, বোধহয় উচ্চারণগত কোমলতা আনবার উদ্দেশ্যেই বেশী ছিল। শব্দান্তে 'এ' ধ্বনির বাহুল্য লক্ষণীয়।—

স্বরধ্বনি উচ্চারণ প্রবণতা

সাজনি অকথ কহি ন জাএ
…ভীতর রহ লুকাএ (২৮)
উড়এ ন পারএ তইঅও পসারএ পাখি (৩৪)
চুনি চুনি ভএ বলআ ভাগু (৩৪)
তুঅও নঅন লহ…
কহ্নাই নয়না হলিঅ নিবারি।…(অপিনিহিতির উদাহরণ)
…উপভোগ ন আবএ…

Vidyapati Thakur (end of 14th—beginning of 15th century) is the greatest writer of Maithili. Vidyapati's songs on the love of Radha and Krisna are among the fairest flowers in Indian lyric poetry. This exerted a tremendous influence on the Vaishnava lyrics of Bengal. They spread into Bengal, and were admired and imitated by Bengali poets form the 16th century downwards, and the attempts of the people of Bengal to preserve the Maithili language, without studying it properly, led to the development of a curious poetic jargon, a mixed Maithili and Bengali with a few poems on Radha and Krisna. This mixed dilect came to be called ব্রজবুলী (Brajabuli) or speech of Vraja, from the fact that the poems composed in it described Krisna's early life and his love with Radha which had for its scene the Vraja district, roumd abunt Brindavana, near Mathura. This Brajabuli is of course entirely different from the Western Hindi Dialect, called Brajbhakha which is current round about Mathura (ODBL. Vol I p. 103)

১। ভাষা-বৈশিষ্ট্য আলোচনায় বিদ্যাপতির পদ থেকেই দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল। উদাহরণের পাশে প্রদত্ত সংখ্যা মিত্র-মজুমদারের সংস্করণের সংখ্যা নির্দেশক।

চাঁদ গগন বস **অও** তারাগণ...

আনব **কওনে** উপারি।...

...সমহি সম **চালএ**

সে **পাবএ** এহি নারি॥ (৩৭)

নিঅ নিঅ মন্দির সুজন **সমাউ** (১০০)

লাখ **তরুঅর** (৪২)

অন্তস্থ ব এবং য-এর উচ্চারণ অনেক সময়েই স্বরধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়েছে, উপরের দৃষ্টান্তগুলি থেকেও তা ধরা যাবে।

হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বর-শৈথিল্য

(গ) অ/আ, ই/ঈ, উ/ঊ-এর হ্রস্বদীর্ঘ উচ্চারণে এবং লিখিত বানানে খুবই শৈথিল্য ছিল। উচ্চারণে হ্রস্ব-দীর্ঘতা মূলতঃ ছন্দ দ্বারা প্রভাবিত হত।

সহজহি আনন সুন্দর রে (৩৮)

এখানে 'আ' 'এ' দীর্ঘ হয়েছে। আবার,

তোহর বদন সন চান হোঅথি নহি (৩৬)

এখানে 'চা' দীর্ঘ হলেও 'তো' 'হো' হ্রস্ব উচ্চারিত হচ্ছে।

ইসত হাসনি সনে

মুঝে হানল নয়ন বানে (৩১)

এখানে 'আ,' 'এ'—সর্বত্রই লঘু উচ্চারিত হচ্ছে।

যব গোধুলি সময় বেলি

ধনি মন্দির বাহির ভেলি

নব জলধর বিজুরিরেহা

দন্দ পসারি গেলি (৩১)

এখানে 'রে', 'দন্' দীর্ঘ, তাছাড়া 'গো' 'ধু' 'তে' 'মন' 'যা' 'ভে' 'হা' 'সা' 'মে' সবই হ্রস্ব উচ্চাবণে ব্যবহৃত হয়েছে। 'গোধুলি' বানানেও 'ধু' রাখা হয়েছে।

(ঘ) অপভ্রংশ যুগ থেকেই পূর্বাঞ্চলের আর্যভাষাগুলিতে য এবং ব এর অন্তস্থ 'ইয়' ওয়া' উচ্চারণ ক্রমশঃ লোপ পেয়েছে। দুটি ব-এর লিপি-পার্থক্যই বাংলায় নেই। 'য' এর স্থলেও উচ্চারনানুগ 'জ' বানান বহু ক্ষেত্রে এসে গেছে। যেমন,—

য এবং ওয়াধ্বনির পরিবর্তন

জোবন নগরি বেসাহব রূপ।
ততে মূল ইহহু জতে স্বরূপ ॥ (৫৫)

ওখানে লক্ষণীয় 'ওয়া' উচ্চারণের অভাবে স্বরূপ 'সরূপ'-এ রূপান্তরিত হয়েছে।

অনুভবি বুঝতি জখনে সম্ভোগ (৫৮)
জাগি জাএত পুরপরিজন মোব।
ফাব চোরি জঞো চেতন চোর ॥ (৬৩)

(ঙ) দুই ভিন্ন যুক্তব্যঞ্জন অনেক সময় এক ব্যঞ্জনের দ্বিত্বে রূপান্তরিত হয়েছে।—

যুক্ত ভিন্নধর্মী ব্যঞ্জনের এক ধর্মী রূপান্তর

দূর দুগ্গম দমসি ভঞ্জেও
ঢোল তরল নিসান সদ্দহি
ভেরি কাহল সঙ্খ নদ্দহি
দান দপ্পে দধীচি রথ্খিঅ (৯)

একটি পদ গীতি থেকেই দৃষ্টান্ত তোলা হল। অন্যপদেও বহু নিদর্শন মিলবে।

(চ) অনেক সময় দুই যুক্ত ব্যঞ্জনের একটি লোপ পেয়েছে (কিন্তু প্রচলিত নিয়মানুযায়ী সর্বত্র পূর্ববর্ণ দীর্ঘ হয়নি)। যেমন—

যুগ্মব্যঞ্জনের একটি লোপ

সখি পচারসি মন্দে সাথ (১৫)
সহজ প্রসন মুখ (২৪)
সাজনি অকথ কহি ন জাএ (২৬)
উগল দস সারঙ্গ (২৫)
চকিত ভমএ জনী (২৬)
আচরে বদন ঝপাবহ গোরি (২৯)
সূর উগল পরচারি (৩১)
নিচর সুমেরু (৩১)
জল থল নাব সমহি সম চালএ (৩১)

এখানে 'আচরে' 'চালএ' প্রভৃতি বানান সে যুগের 'অ' কে হ্রস্ব 'আ' উচ্চারণ প্রভাব থেকে এসেছে।

ধ্বনি পরিবর্তন

(ছ) ধ্বনি পরিবর্তনের, বিশেষ করে বিপ্রকর্ষ (দুই ব্যঞ্জনের মাঝে স্বরাগম) এবং স্বরসঙ্গতির (এক স্বরের প্রভাবে অপর স্বরের পরিবর্তন) যথেষ্ট উদাহরণ মেলে। যেমন—

বিপ্রকর্ষ :

পরপুরুষক সিনেহ মন্দ (১৫)
খনি অলপ বয়েস বালা
জনু গাঁথনি পুহুপ মালা।
থোরি দরসনে আশ ন পুরল...(৩১)

স্বরসঙ্গতি :

কমল মিলল দল
মধুপ চলল ঘর
বিহগে গহল নিজ ঠামে। (১৬)
কৈরব সুরুজ কমল চন্দ (১৮)
আসা লুবুধল...গুপুত মনোভব (৩৮)
পহিলা চুমুন কি দূর গেল (৪৪৬)

ষ>হ : পুহপ মালা (৩১), পহলুক (প্রথম : (৭৪), কাহ্ন (৭৬),

মহাপ্রাণ বর্ণে রূপান্তর : বঢ়াউলি (৭৩), পঢ়াঅনি (৮৭), কহবি (৩৮৩), বরিখব

অন্যান্য : (৭১৫), মেহে (৭৩২), মাহ (৭২০), পাঙ্কন (৭২০), অখাঢ় (আষাঢ় : ১৭৪) ইত্যাদি।

আনুনাসিক উচ্চারণ

(জ) আনুনাসিক উচ্চারণ বড়ু চণ্ডীদাসের তুলনায় বিদ্যাপতি বা চণ্ডীদাসে কম। উত্তম পুরুষের ক্রিয়াতেই প্রয়োগ দৃষ্টান্ত বেশী। যেমন,—

চললিহুঁ (৮৯), পুছওঁ (১০৪), জনিতহুঁ (জানিতাম : ১৮৭), ভেলোঁহ (হলাম ৫৯১), চুকলোঁহ (চুকিয়ে দিলাম : ৫৯১), গোওয়লুঁ (৭৩২), বিনলওঁ (বিনয় করি : ৬০৬) ইত্যাদি।

অপর কয়েকটি দৃষ্টান্ত : সঁঅ (সঙ্গে, ১৯৩), তহ্নিকাহুঁ (তাদের, ১২৪). জঁহা (৭৩৩), এতহুঁ (৬৩১), লেলেঁ, পিয়াইকেঁ (৫৯১), ভোহঁ (ভজি, ৬২৩), সঁাঝক (১৫১), তোঁহে (তুমি, ১৫৫), তেঁয় (তুমি, ১৯৩), ভোঁহ (ভ্রূ, ২২৬), সীঁচি (সিঞ্চনকর, ২২৬) ইত্যাদি।

—এরমধ্যে অনেক গুলি দৃষ্টান্তেই ঙ,ঞ অথবা ণ/ন ধ্বনির আনুনাসিক উচ্চারণ এসেছে।

ধ্বনিগত আর কিছু বৈশিষ্ট্য ছন্দ আলোচনা প্রসঙ্গে দেখানো গেল। বিশদ আলোচনা ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর ODBL গ্রন্থে করেছেন।

রূপতত্ত্বে প্রধান আলোচ্য শব্দরূপ-বিভক্তি, ক্রিয়া এবং সর্বনামের ব্যবহার। কারক বিচারে কর্তায় বিভক্তি হীন রূপই বেশী। তবে অনেক সময় উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যে 'অ' 'ই' 'এ' ইত্যাদি যুক্ত হয়েছে। যেমন,

রূপতত্ত্ব : শব্দ বিভক্তি

সামরি ঝামরি তোর দেহ (২৮)—এখানে পরবর্তী ঝামরি-এর সঙ্গে মিলের খাতিরে শ্যামা অর্থে সামর>সামরি হয়েছে। আবার, সামর **পুরুসা** মনু ঘর পাহুন (৭৭)—এখানে পুরুষ>পুরুসা হয়েছে তৎকালীন 'অ'->হ্রস্ব 'আ' রূপে উচ্চারণ-প্রভাবে।

কর্মে বিভক্তিহীন রূপ যথেষ্ট লক্ষিত হয়। যেমন,—

বড় কৌসলি তুআ রাধে
কিনল **কহ্নাঈ** লোচন আধে (১১২)
মধু লএ কে ঘর মধুপক সঙ্গ (১৩১) ইত্যাদি।

'কে বিভক্তির ব্যবহারই বেশী। যেমন,—

কাহুকে পান **কাহু** দিঅ সান (৬)

এখানে প্রথম 'কে' বিভক্তি সহ 'কাহুকে', দ্বিতীয় বিভক্তিহীন 'কাহু',—দুটিই কর্মকারকের পদ।

'এ' বিভক্তি : চাঁদনে আনি (৯৫),

'হি' বিভক্তি : তাহি নিহারএ (৪৩)।

'হু' বিভক্তি : সবহু কহ (৪২৭),

'ল' বিভক্তি : পাছিল ছাড়ি...অ গিলাহু দেখিঅ (৪৪৫) ইত্যাদি।

করণে 'এ' বিভক্তি বেশী ব্যবহৃত হয়েছে।—'**করে** কুচ ঝাঁপু সুচন্দা (৩৯) বা 'ধবল **বসনে** তনু ঝপাওব (৯৫) ইত্যাদি।

'ত' : **নখত** নিখলি (৩২৩),

'সোঁ' : সহস রমণি **সোঁ** ভরল তোহর হিঅ (১১৬),

'দেই' : কর **দেই** ঝাঁপল কান (১৭৯),

'সঞো' : কুসুম সর **সঞো** বিঘটাউলি।

সহিত, সনে, সনি, সঙ্গে ইত্যাদি রূপও লক্ষিত হয়।

সম্প্রদানে পৃথক রূপ নেই। বাংলায় কর্ম ও সম্প্রদানকে এক কারক ধরা যেতে পারে। বতনক **লাগি** (১২৮), বসভবে সক (বসের জন্য খসে গেল, ১৮৬) ইত্যাদি চতুর্থীর অনুসর্গ বলা যেতে পারে।

অপাদানে বিভক্তিহীন রূপ মেলে। যেমন, **কমল** গবএ মকরন্দা (কমল থেকে মধু গলে পড়ে, ১৮৪)। 'এ': **নয়নে** গলএ জলধাবা (নয়ন হতে জল গলে পড়ছে, ১৭৯)।
'করি': অবুঝ **করি** মানল (৪৭), 'সঞে': ঘব **সঞে** বাহিব হোয় (১৮৫) ইত্যাদি।

সম্বন্ধে ক, ম, বে, র, রি, সু-বিভক্তি রূপ বেশী পাওয়া যায়। যেমন,— **বিপদক** লেশ (২৯), **একক** হৃদয় অওক পাওল (৪১), **মোতিম** হাব (৩০), **তোহরে** চিন্তা, **তোহরে** কথা (৪২) সফল জীবন **তোর, তোহারি** মধুব গুণ (৪৭), **তাসু** সমান (৪১)।

সমাসবদ্ধ বিভক্তিহীন সম্বন্ধ পদ যথেষ্ঠ ব্যবহৃত হয়। বচন-বিলাস, সুজন-সিনেহ, অহিবিনি-নাহ, হেম-মুরত ইত্যাদি।

অধিকবণে এ, তে, হে, ক ইত্যাদি বিভক্তিব ব্যবহার লক্ষিত হয়। যেমন,— থোবি **দরসনে** (৩১), **বুঝইতে** অবুঝ কবি মানএ (৪৭), **মেহে** সংসাবক সার (৪২) ইত্যাদি।

সর্বনাম

সর্বনামের পরিচিত কয়েকটি রূপ হল: উত্তমপুরুষে: মোঞে, হম, মোএ, হমে, মোহী, মহু (আমাকে ৪১৬) ইত্যাদি। মধ্যমপুরুষে: তো, তোহি, তঞে, তুঅ, তোহেঁ ইত্যাদি। প্রথম পুরুষে: তে, তসু, সে, তহিকরি (তাহাব, ১১৪) তহিক (তাহার, ১৬১) ইত্যাদি।

ক্রিয়-কাল

ক্রিয়াব কালরূপেব মধ্যে বর্তমানেব বিভিন্ন রূপ (সাধারণ, ঘটমান, পুরাঘটিত), ভবিষ্যৎ, অতীত এবং অনুজ্ঞার ব্যবহার বেশী দেখা যায়।

বর্তমানেব রূপ: লিসি (নিচ্ছিস্, ১৩২), দেসি (দিচ্ছিস, ২৪৫), চলল (১৪৩), গাবএ (গায়, ১৪৩), পাবএ (৫৬), মাঁগ (যাঞা করে, ৫৬), পুছুএ (৫৬), চাহ (৫৬), গাস্তল (গাঁথল, ৬৭), পিন্ধওলুহুঁ (পরাল, ৬২),

গেলি, পলাএল, কক, ভেল, মিঝাএল (নিভিয়ে দিল, ৬২), অএলহু (এল, ১১৫) ইত্যাদি।

ভবিষ্যতের রূপ : লাগত, লুকাএত, বোলইত, পাওত, ভাঙ্গি জাএত (৫৩), বেসাহব (বেসাতি করবে, ৫৫), সহবহি (সইবে, ৬১), পুছব, খেদব, দেবা (দিবে : মধ্যমপুরুষ), বারব, পাবব গাবি (গাল দেবে, ৬১), ববিসব ইত্যাদি।

অতীতের রূপ : বোললহি (বলে'ছলে, ১৬৪) কহলনি (কয়েছিলে ১৬৪), বৈসলাহু (বসেছিলাম, ১৬৭), পঠৌলনি (পাঠিয়েছিলেন, ১৭৮), ছল (ছিল), অঙ্গিব লহ (অঙ্গীকার করেছিলে, ৪৪০) ইত্যাদি।

নিত্যবৃত্ত অতীতের কয়েকটি রূপ : জলিলহুঁ, হেবিতহুঁ, ফেরিতহুঁ, ফসিতহুঁ (বাঁধতাম, ১৮৭), ইত্যাদি।

অনুজ্ঞা

অনুজ্ঞার দু একটি রূপ : পসরও মল্লী পেম পসার (মল্লিকা, প্রেমের পসার সাজাও, ৫৫), বিহব (৬১), বমহ (৬১), জিবথু (১৬১), খেপথু (ক্ষেপণ করুক, ১৬১) ইত্যাদি।

যৌগিক ক্রিয়া

যৌগিক ক্রিয়ার কয়েকটি রূপ : ভএগেলি (হয়ে গেল, ১০৭), চলি অএলিহু (চলে এলাম), অএলহ ধোই (ধুয়ে এলে, ১১৫), রচন দএ (রচনা করে, ১৫১), চলসি যাসি (চলে যাচ্ছিস, ২০৮), ঘটবএ চাহসি (ঘটাতে চাস, ২৫০) ইত্যাদি।

নামধাতু, প্রযোজক ক্রিয়া ইত্যাদি

আরও কয়েকটি বিশেষ ক্রিয়ারূপ (নামধাতু, প্রযোজক ইত্যাদি) : ফুললী (ফুল্ল হল, ১৩৯), কবললি (কবলিত হল, ১৪৬), বেআপল (ব্যাপ্ত হল. ১৪৭), সোহাবএ (শোভা পায়, ১৪৭), রোপলহ (রোপণ করল, ১৫০), উগিলল (উদ্গীরণ করল, ২৯২), গমওলহ (গোঁয়ালে : কাল কাটালে এই অর্থে, ২৬০), পতিআএত (প্রত্যয় করে, ১৫৫), বিঘটওলহি (ব্যাঘাত করল, ৪২৩), বিসর লহ (বিস্মৃত হল, ৪৪৫), মেরাউলি (মেলালাম : প্রয়োজক ৩২৫), সিখউবি (শেখাবি : প্রযোজক , ৩০৮) ইত্যাদি। এখানে অধিকাংশ শব্দ-সংশ্লেষের নিদর্শন তোলা হল।

অব্যয়

কয়েকটি অব্যয়ের রূপ : ককেঁ (কেন, ১৩১), তইও (তবু, ৩৬৫), জতি জতি (যত যত, ১৩৫), জৈসনি তৈসনি (৪২৪), তহিআ (তখন, ১৩৪), জএো তএো (৭১), তথুহ (তথাপি, ১৬১), জইসন জকর (যার যেরূপ, ১৬১) ইত্যাদি। 'ও' এই অর্থে—'হু' ধ্বনির

ব্যবহার দেখা যায়। যেমন, তোহু (তুমিও, ২৮৯), কৌতুকহু (কৌতুকেও, ২৮৯) ইত্যাদি।

পদক্রম

কাব্য-ভাষায় পদক্রম বা syntax আলোচনার উপযোগিতা কম। ছন্দ, মিল বা ভাবগত আবেগ-স্পন্দনের খাতিরে কবিকে প্রচলিত বাংলা পদক্রম রীতির পরিবর্তন করতেই হয়। বাংলা বাক্যগঠন-রীতির স্বাভাবিক ক্রম হল, কর্তা-কর্ম (মুখ্য-গৌণ)-ক্রিয়া। এই ক্রম সে যুগে ব্রজবুলিতেও রক্ষিত হত। তবে পদ্যে প্রয়োজনানুসারে তার খুবই পরিবর্তন ঘটত। যেমন,—

বড় কৌসলি তুঅ রাধে।
কিনল কহ্নাই লোচন আধে॥ (১১২)

ক্রম ঠিক রেখে এর আধুনিক ভাষা-রূপ দাঁড়ায়—

বড় কৌশলি তুই রাধে।
কিন্‌লি কানাই লোচন আধে।

গদ্য ভাষায় এর রূপ হবে, 'রাধে, তুই বড় কৌশলী। কানাইকে অর্ধলোচনে কিনে নিলি।' এই ক্রম পরিবর্তন এ যুগের কাব্যেও হয়, সুতরাং সে যুগের বৈশিষ্ট্যরূপে গ্রহণ করা চলে না।

শব্দ উপকরণ (vocabulary)

ব্রজবুলির শব্দ উপকরণে তৎসম এবং তদ্ভব শব্দই বেশী। দেশজ বা বিদেশী আরবী-পার্শী শব্দ খুব সামান্য পরিমাণে ছিল। বিদ্যাপতির পদে তৎসম শব্দের তুলনায় তদ্ভব শব্দের ব্যবহার বেশী দেখা যায়। আরবী-পার্শী শব্দও চৈতন্য-পরবর্তী কবিদের তুলনায় কম ব্যবহার করেছেন। এখানে শব্দের তালিকা দেওয়া বাহুল্য মাত্র। একটি পদ অবলম্বনে শব্দের অনুপাত দেখানো যেতে পারে।—

অপনহি নাগরি অপনহি দূত।
সে অভিসার ন জান বহুত॥
কী ফল তেসর কান জনাএ।
আনব নাগর নয়নে বঝাএ॥
এ সখি রাখহিসি অপনক লাজ।
পরক দুআরে করহ জনু কাজ॥

পরক দুআরে করিঅ জঞো কাজ।
অনুদিনে অনুখনে পাইঅ লাজ ॥
দুহু দিস এক সয় হোইক বিরোধ।
তকরা বজইত কতএ নিরোধ ॥ [২৪৮]

এখানে তৎসম শব্দ : দূত, অভিসার, ফল, নাগর, নয়নে, সখি, অনুদিনে, বিরোধ, এক, নিরোধ।

অর্ধতৎসম ও তদ্ভব শব্দ : অপনহি, নাগরি, জান, সে, ন, বহুত, কী, তেসর, কান, জনাএ, আনব, বঝাএ, এ, বাখহিসি, অপনক, লাজ, পবক, দুআরে, করহ, জনু, কাজ, করিঅ, জঞো, অনুখনে, পাইঅ, দুহু, দিস, সয়, হোইক, বজইত, কতএ।

আরবী শব্দ : তকরা (তকরর্ ঝগড়া অর্থে)।

এখান থেকেই বিভিন্ন শব্দের অনুপাত সম্পর্কে একটা ধারণা করা যেতে পারে।

পদাবলীর বাংলা ভাষা প্রসঙ্গ

বৈষ্ণব পদাবলীতে বিদ্যাপতি যেমন কৃত্রিম ব্রজবুলির ধারা প্রবর্তন করলেন, পাশাপাশি স্বাভাবিক বাংলা ভাষার ধারাটি তেমনি চণ্ডীদাস কর্তৃক (দ্বিজ ?) প্রবর্তিত হয়েছিল। কিন্তু এই বাংলা ভাষা তৎকালীন বাঙালীদের মুখের জীবন্ত ভাষা হবার ফলেই ব্রজবুলির তুলনায় পরবর্তী লিপিকারদের হাতে বা গায়কদের মুখে অনেক বেশী পরিবর্তিত হয়েছে। সেই পরিবর্তিত ভাষারূপের আড়াল থেকে প্রাচীন পদগুলির যথার্থ লিপিরূপ ও গঠনভঙ্গির হদিস পাওয়াই এখন কঠিন হয়ে পড়েছে। বড়ু চণ্ডীদাসের (সম্ভবত চৈতন্য-পূর্ব পদাবলী গানের কবি চণ্ডীদাস থেকে পৃথক ব্যক্তি) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথিটিও প্রাচীন। দীর্ঘ দিন লোক-লোচনের আড়ালে ছিল বলেই প্রাচীন। বাংলা ভাষার নিদর্শন সেখানে অনেকটা অবিকৃত ভাবে রক্ষিত হয়েছে। এ গ্রন্থটি সম্পর্কে পরিশিষ্টে পৃথক ভাবে আলোচনা করা হল। এখানে চণ্ডীদাস-পদাবলী অবলম্বনে পদাবলীর বাংলা ভাষা-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা গেল।[১]

১। উদাহরণের পাশে প্রদত্ত সংখ্যা ডঃ মজুমদার সম্পাদিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ 'চণ্ডীদাসের পদাবলী'র সংখ্যা নির্দেশক।

ধ্বনিতত্ত্ব

ধ্বনিগত মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি হল :

(১) বিপ্রকর্ষের ব্যবহার : ধৈবজ্ঞ (১), বরণ (২), ধবম (৫), মবম (৩).

বিপ্রকর্ষ

খেয়াতি (৩), মনমথ (৯), জরজর (৯), যুবতি (৯), উপটি (১০) ইত্যাদি।

(২) বিপ্রকর্ষের সঙ্গে স্বরসঙ্গতি : মুরুছি (২), পিরিতি (৬৬), মিরিতি (১০২), নাতিনি (১৪৪) ইত্যাদি।

স্বরসঙ্গতি

যুক্তব্যঞ্জনের একটি লোপ

(৩) যুক্তব্যঞ্জনের একটি লোপ : নিচয় (১১০), নিলজ (৭৯), সোয়াথি (৪৩), নিঠুর (৬০) ইত্যাদি।

অন্যবিধ ধ্বনিপরিবর্তন

(৪) মাঝে মাঝে ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন (বেশীরভাগ মহাপ্রাণ বর্ণে রূপান্তর): গঠিল (১), নমিখে (ষ>খ, ৭), ভাখ (ষ>খ, ১১), বিছুরল (৪৭), বহু (৪৭) ইত্যাদি। হ-মহাপ্রাণ ধ্বনির আরও দৃষ্টান্ত : শুনহ (৪৭), দেহ (৫৬), হাম, (১০২) ইত্যাদি।

আনুনাসিক উচ্চারণ

(৫) আনুনাসিকের ব্যবহার (উত্তম পুরুষে): ভাবিয়া হইলোঁ কাল (৩৬), ফল পানুঁ (২৫), আগুন মৈনুঁ (২৫) ইত্যাদি। অন্যবিধ ব্যবহার : আঁখে (৫০), তুহুঁ (৫০ পা), বাঁটিয়া (৬২), শিংহতেঁ (৭২), পাঁজর (৮৮) ইত্যাদি।

(৬) স্বাভাবিক বাংলা বাক্‌রীতির প্রভাবেই উচ্চারণ-সংকোচ বশতঃ দীর্ঘ 'আ' হ্রস্ব 'আ'-তে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রাকৃতে যে 'আ' ধ্বনি হ্রস্ব 'আ' রূপে উচ্চারিত হত, সে উচ্চারণ আরও ছোট হয়ে 'অ' হয়েছে। তবু প্রাচীন হ্রস্ব 'আ' উচ্চারণের বেশ কিছুটা রয়ে গেছে। যেমন, হইলা (৫), নয়ান (৭), আপনা (৫৭ পা:), অমিয়া (১১০) ইত্যাদি।

হ্রস্ব 'আ' উচ্চারণ

তেমনি উচ্চারণগত সংশ্লিষ্টতার জন্যই হৈল (১), হৈয়াছে (৭), কৈলা (৬৪), কৈয়নাগো (৭৩) প্রভৃতি লিপিপদ্ধতি এসে গেছে।

উচ্চারণ সংশ্লিষ্টতা

অন্যান্য দু একটি উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য ছন্দ আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা গেল।

রূপতত্ত্ব

কারক-বিভক্তিতে আধুনিক রূপই বেশী লক্ষিত হয়। প্রাপ্ত পুথিগুলির অর্বাচীনতা এর অন্যতম কারণ বলা যেতে পারে।

কারক-বিভক্তি

কর্তায় বিভক্তিহীন দৃষ্টান্তই বেশী। অনেক সময় বাক্যের কর্তাসূচক শব্দই উহ্য রয়েছে। যেমন, 'পাসরিতে করি মনে' (আমি : কর্তা উহ্য, ১২২)।

'এ'—বিভক্তির ব্যবহার : কহে চণ্ডীদাসে (১০৯)।

কর্মে বিভক্তিবিহীন রূপ রয়েছে। যেমন, **নাসিকা** মুঞি যত করি বন্ধ (১২৬), সুজন পাইলে (১১১)। বিভক্তি 'রে' 'এ' 'য়' 'কে'—ব্যবহার দেখা যায়। যেমন, **মনেরে** কহিলুঁ (১৩), **পরপুরুষে** যৌবন সঁপিলে (১০৯) **তোমায়** পাসরিতে নারি (৫০), যখন **কালাকে** পড়য়ে মনে (১৯)।

করণে দিয়া, ধরি, এ প্রভৃতি বিভক্তি-অনুসর্গের ব্যবহার লক্ষিত হয়। যেমন, কানের ভিতর দিয়া (১২২), কেশে ধরি লৈয়া যায় (৪১), গুণে বান্ধল (৯৪) ইত্যাদি।

অপাদানে হৈতে, অবধি, বলিয়া প্রভৃতি অনুসর্গের ব্যবহার লক্ষিত হয়। যেমন, হিয়া **হৈতে** পাঁজর কাটি (২১ পা), ঘর হৈতে আঙ্গিনা বিদেশ (৬৪), জনম অবধি বাঢ়ল পিরীতি (৭৮), অমিয়া বলিয়া গরল কিনিয়া (৯৭) ইত্যাদি।

সম্বন্ধে এর, এ বিভক্তির ব্যবহার লক্ষিত হয়। যেমন,—**মানুষে** এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে (১২৮), **কানের** ভিতর দিয়া (১২২)।

বিভক্তিহীন সমাসবদ্ধ সম্বন্ধ পদের ব্যবহার খুব বেশী দেখা যায়। যেমন সকল উপরে (১১৫), কনক গাগরি (১০), সিন্দূর বিন্দু (৭০), ফুল কামিনী (৬৪) ইত্যাদি।

ক্রিয়ার কাল

ক্রিয়ার কালের মধ্যে বর্তমান (সাধারণ, পুরাঘটিত, ঘটমান) ও ভবিষ্যতের ব্যবহার বেশী।

বর্তমানের কয়েকটি রূপ : ঠেকিলুঁ (৪১), গোঙালুঁ (১১), আইলুঁ (১১), কহিয়ে (৩১), ডুবিলাম (৯৬), মৈলুঁ (২৫)—ইত্যাদি উত্তম পুরুষের রূপ। জানহ (৭১), বলসি (২৪), বল (২১) চাও (১৪৫) পাইলে (১২৪), বাঢ়ালো (১২৪) ইত্যাদি মধ্যম পুরুষের রূপ। যায় (৫৯), করিছে (৫৯), বলে (১৫২), করিল (১৫৩), মিলল (৪৫) ইত্যাদি প্রথম পুরুষের রূপ।

বর্তমান

ভবিষ্যতের উত্তম পুরুষের : যাব (২৬), কহিব (২৬), ভখিমু (৪৯), নিবারিব (৩৫)। মধ্যম পুরুষে : হৈও (৫১) কৈয় (৭৩), ধরিবে (৯৭), বুঝিবে (৬২), পোড়াইও (১৪৭) ইত্যাদি;

ভবিষ্যত

এবং প্রথম পুরুষে: হইবে (১০৯), ভাঙ্গিবে, ঘটিবে, ঘুচিবে (১০৯), যাবে (১১০) ইত্যাদি।

অতীত — অতীতের (নিত্যবৃত্ত) কয়েকটি রূপ: জানিতুঁ (৩২), বাড়াতুঁ (৩২), জানিথাউ (৯০), দিতাম (৯৩)।

অনুজ্ঞা — অনুজ্ঞা: হউক (৫৯), লাগে (লাগুক অর্থে, ৪৮), লউক (৪৪), হউ (৪৭), করহ দানে (দান কর, ৬৩), ধৈরজ (ধৈর্য ধর, ৭৩) ইত্যাদি।

অসমাপিকা — কয়েকটি অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপ দেখানো যেতে পারে: খোদাইয়া (৮৬), বাঁন্ধিয়া (৮৬), চড়াঞা (৮৬), লৈয়া (৮৬), খাইতে (৮৭) ইত্যাদি।

যৌগিক ক্রিয়া — কয়েকটি যৌগিক ক্রিয়ারূপ: হইঞা রহিব (১৫), ডাণ্ডাইয়া থাকি (২২), মরিয়া গেলুঁ (২৫ পা), বাটিয়া দি (ভাগ করে দি, ৬২), ঝুরিয়া মরি (১৪৪), মাগিয়া লইবি (১৫৩) ইত্যাদি।

অন্যান্যরূপ — ক্রিয়ার আরও কয়েকটি বিশিষ্ট ব্যবহার: পাসরিব (১২২), আউলাইয়া (৬) সিরজিল (২৬ পা), ভিন না বাসিও (২৩), দঢ়াইলু (দৃঢ় করলাম, ৬৩), পিত্যাইব (প্রত্যয় করব, ৩৩) ইত্যাদি।

সর্বনাম — সর্বনামে আধুনিক প্রচলিত রূপগুলি প্রায় সবই এসে গেছে। যেমন উত্তম পুরুষের, মো, মোরে, আমি, হাম, হামু (১০২), মোর, মুঞি (১২৬), মুই ইত্যাদি; মধ্যম পুরুষের তোমরা, তোর, তোরে, তোমারে ইত্যাদি; প্রথম পুরুষে তাহারে, তারে, তার, কাহারে, কারে ইত্যাদি।

কয়েকটি অব্যয়ের রূপ উদ্ধৃত করা যেতে পারে, —যেমত (৬), যাঁহা তাঁহা (৮), তবহুঁ (১৩), এমতি। যেমতি—তেমতি (৫৯), একে তাহে (১২১) ইত্যাদি।

উপসর্গের ব্যবহার লক্ষিত হয়। যেমন পরিবাদ (৩৮), কুবাদিনী (৫৭)।

স্ত্রীলিঙ্গের ব্যবহার কিছু পাওয়া যায় অভাগিনী, পরাণী, অবলা অথলা, পরাধিনী, দুখিণী, ভ্রমরা, অনাথী ইত্যাদি।

বাক্য গঠন রীতি — বাক্যগঠনরীতিতে ব্রজবুলি সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছি চণ্ডীদাস সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। পদ্যভাষার পদক্রম গদ্যভাষা থেকে কিছুটা পৃথক হয় ছন্দ এবং ভাবের তাগিদে। এখানেও তাই হয়েছে।

শব্দ-উপকরণে তৎসম শব্দের ব্যবহার ক্রমান্বয়ে বেড়েছে। বিদেশী আরবী পার্শী শব্দের ব্যবহার চণ্ডীদাসে কম, পরবর্তী কবিদের রচনায় অপেক্ষাকৃত বেশী। বাহুল্য বোধে আর দৃষ্টান্ত দেওয়া হল না।

শব্দ উপকরণ

পদাবলীর যতি-চিহ্ন বলতে তখন ছন্দ যতিই বোঝাত। দ্বিপংক্তিক শ্লোকে, প্রথম পংক্তি শেষে একটি দাড়ি (।) দ্বিতীয় পংক্তি শেষে দুটি দাড়ি (।।) ব্যবহৃত হত। এ-ছাড়া অন্য কোনও যতি চিহ্নের ব্যবহার ছিল না। পদাবলীর ভাষা সম্পর্কে এখানে যথাসম্ভব সংক্ষেপে আলোচনা করা হল। বিষদ জানতে হলে কৌতূহলী পাঠক অধ্যাপক সুকুমার সেনের 'ভাষার ইতিবৃত্ত' এবং অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ODBL গ্রন্থ থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ দেখতে পারেন।

যতি-চিহ্ন

পদাবলীর চিত্রকলা ও অলঙ্কার

পদাবলীর চিত্রকল্পে জয়দেব রচিত গীতগোবিন্দের প্রভাব লক্ষণীয়। গীত-গোবিন্দের চব্বিশটি গানের মধ্যে প্রথম দু'টিতে পুরাণ-বর্ণিত কৃষ্ণাবতারের স্তুতি। তৃতীয় গীত থেকেই কোমল মলয়পবন, ললিত লবঙ্গলতার স্নিগ্ধ স্পর্শ, অলিগুঞ্জন, কোকিলের কুজন। ব্রজবধূদের নিয়ে এমন উন্মাদ বসন্তে কৃষ্ণের প্রেমবিহার; একদিকে বিরহীদের মদন সন্তাপ, অপরদিকে নবমুকুলিত তমালের সুগন্ধ, পলাশের রক্তিমাভা; কেশর, পাটলি, করুণ (বাতাবী), মাধবী, মালতী প্রভৃতি পুষ্পের মাতাল সৌরভ। এই কেলিকুঞ্জের চিত্রাঙ্কণে জয়দেব কালিদাস বা তৎপূর্ববর্তী অন্যান্য কবিবৃন্দের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন: রতিবিলাস চিত্রণেও যে প্রেমাভিজ্ঞ নায়ক-নায়িকার আবির্ভাব ঘটেছে সেখানে সংস্কৃত কামকলা ও অলঙ্কার শিল্পের ছাপ সুস্পষ্ট। তবু সব মিলিয়ে যে ললিতাঙ্গী রাধার ও রতিরণ-দক্ষ মধুর বনমালীর চরিত্র-চিত্র ফুটে উঠেছে তাতে বাংলায় স্নিগ্ধতার প্রলেপ লক্ষ্য করা যায়। যমুনাতীরের ধীর সমীরণে বংশীবাদনরত নায়কের ছবি বাংলা দেশের পরিচিত দৃশ্যকে মনে করিয়ে দেয়। কৃষ্ণ-বক্ষোহারের তুলনা দিতে গিয়ে যমুনার ফেনপুঞ্জে কবি গঙ্গা বা অজয়ের তৎকালীন চিত্রকেই হয়তো স্মরণ করেছিলেন।

জয়দেব

জয়দেবের প্রতি পদাবলীর কবিরা একটি বিষয়ে বিশেষ ভাবে ঋণী রয়েছেন। পদাবলীর কাহিনী বিন্যাসে, নায়ক-নায়িকার বর্ণনায় রতি-মিলনের

চিত্রণে, নায়িকার মানিনী, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, বাসক সজ্জিকা, স্বাধীন কর্তৃকা প্রভৃতি মনোহারী চিত্রাঙ্কনে, নায়কের, সখিদের মানভঞ্জ বর্ণনায় জয়দেবই একটি বর্ণনারীতি, তার উপযোগী ভাষা ও ছন্দ গড়ে দিয়ে গেছেন। তিনি নিজে পূর্বসূরীদের দ্বারা যতটাই প্রভাবিত হউন না কেন পরবর্তীদের জন্য যে পথ তৈরী করে দিয়ে গেলেন, বিদ্যাপতি থেকে সুরু করে পরবর্তী বৈষ্ণবপদাবলী গানের কবিগোষ্ঠী সেই ধারাই অনুসরণ করে চলেছেন। জয়দেব বাংলা পদাবলী-গানের প্রথম ধারা প্রবর্তনের গৌরব দাবী করতে পারেন।

তবে একথা স্বীকার, নিখুঁত কামচিত্রাঙ্কনে, অলঙ্করণে ও ছন্দের ধ্বনি-নিক্কণে কবি যতটা নৈপুণ্য দেখিয়েছেন, দেহজ রতিবাসনার ঊর্ধ্বে প্রেমের গভীর রসস্ফুরণে তেমন মনোযোগী হননি। তার ফলে গীতগোবিন্দের সংগীত ইন্দ্রিয়কে যতটা আকৃষ্ট করে, স্নায়ুকে যতটা সম্মোহিত করে, ততটা হৃদয়কে ভরে তোলে না। এখানেই কবির চিত্রকল্পের আংশিক ব্যর্থতা। রাগপ্রেম মিলন অনেকটা স্থূল পর্যায়ে রয়ে গেছে। কথার সীমা পেরিয়ে, দেহজ রতি চিত্রণের স্তর পেরিয়ে ভাব এখানে নভোচারী হতে পারে নি। কিন্তু বিদ্যাপতি সে জগতের ইশারা তার কাব্যে এনে দিতে পেরেছেন। তিনিও জয়দেবের মতো মর্তের নর-নারীর রতি-বেদনার কোনো কথাই গোপন করেন নি, কিন্তু তারও বিস্তৃত জীবনবোধ সেখানে প্রকাশ পেয়েছে। জয়দেবের তুলনায় তাঁর পদাবলী কাব্যের পটভূমিও অনেক ব্যাপক। বয়ঃসন্ধিকালের উদ্ভিন্ন যৌবনা কিশোরীর কৌতূহলবোধ থেকে তার সূচনা, আর দূরসঞ্চারী রতিপ্রেম-বেদনার গভীরতর বিরহের মধ্যে তার আত্ম-লীনতা। জয়দেব সেখানে মাত্র এক বসন্তের রতিজ রাসমিলনের পালা রচনা করেছেন।

বিদ্যাপতির সঙ্গে পার্থক্য

জয়দেবের চিত্রকল্পে সবই দৃশ্যমান। রহস্যের মোহ আবরণটি হৃদয়ের ওপর থেকে সরিয়ে দিয়ে তিনি যেন কামকেলী-উৎসুক দুটি যুবক-যুবতীকে উপস্থিত করেছেন। বিদ্যাপতি সেক্ষেত্রে ইঙ্গিতময় অনুভাব চিত্রণের সহায়তা নিয়েছেন। শৈশব আর যৌবনের প্রথম সাক্ষাৎকারে দেহমনের যে অনির্বচনীয় পরিবর্তন সাধিত হয় সে রহস্য মনোবিজ্ঞানী বা চিকিৎসাবিশারদ বোঝাতে পারবেন না, সে কাজ একমাত্র পারেন রূপদক্ষ শিল্পী। তাঁর তুলির টানেই কিশোরী রাধাকে আমরা দেখি—

কবুহ বান্ধয়ে কচ কবহু বিথারি।
কবহু ঝাঁপয় অঙ্গ কবহু উঘারি॥ [৬১২]

'কখনো চুল বাঁধছে, কখনো আলুলায়িত করছে, কখনো অঙ্গ ঢাকছে, কখনো বসন সরিয়ে ফেলছে।' এখন নয়নে চঞ্চলতা, পদযুগল স্থির—বালিকা বয়সের ঠিক বিপরীত চিত্র। এখনো চোখে মুখে, হাবে ভাবে, চলনে বলনে কৈশোর-যৌবনের লুকোচুরি।

কেলিক রভস যব শুনে
অনতএ হেরি ততহি দএ কানে।
ইথে কেই কব পরচারী।
কাঁদন মাখী হাস দেই গারী॥ [৬১৬]

'সখীদের কেলি রসের আলাপ শুনলে অন্যমনস্কতার ভান করে সেদিকে কান সজাগ রাখে। এই গোপনতা কেউ প্রকাশ করে দিলে হাসি কান্না মিলিয়ে গাল দেয়।' ইঙ্গিত-ব্যঞ্জনাময় চিত্রকল্পে নিপুণ শিল্পী কয়েকটি তুলির টানেই উদ্ভিন্ন যৌবনার রহস্যময়তা কি চমৎকার ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

বিদ্যাপতি সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডার থেকেই উপমার সামগ্রী মুখ্যত আহরণ করে এনে তাঁর নায়িকার সৌন্দর্যবর্ণনায় ব্যবহার করেছেন। কুচযুগের তুলনা দিতে নবরঙ্গ (লেবু ?), শ্রীফল, স্বর্ণশম্ভু, দাড়িম্ব, স্বর্ণপদ্ম, স্বর্ণময় সুমেরু শিখর, উলটিয়ে বসানো কনক কটোরা (সোনার বাটি) ইত্যাদি প্রসিদ্ধ সংস্কৃত উপমাই মনে পড়েছে। তবে প্রকাশের অভিনবত্ব লক্ষণীয়। একটি বর্ণনায় বলছেন,—

কর-জুগ পিহিত পয়োধর-অঞ্চল
চঞ্চল দেখি চিত ভেলা।
হেম কমলন জনি অরুনিত চঞ্চল
মিহির-তর নিন্দ গেলা॥ [৬২১]

'অঞ্চল ঢাকা পয়োধরে রাধা হাত রেখেছেন, যেন স্বর্ণকমল রক্তিম চঞ্চল সূর্যের আড়ালে ঘুমিয়ে পড়েছে।' আর একটি উপমা দিচ্ছেন,—

উরহি অঞ্চল ঝাঁপি চঞ্চল
আধ পয়োধর হেরু।
পবন-পরাভব সরদ-ঘন জনু
বেকত কএল সুমেরু॥ [৬২২]

'উড়ন্ত আঁচল দিয়ে ঢাকা দেবার মুখে পয়োধরের আধখানা দেখলাম, যেন শরতের হালকা মেঘ বাতাসে পরাভূত হয়ে সুমেরুকে ব্যক্ত করল।' রতিমিলনান্তে কানু-কুঞ্জ থেকে প্রত্যাগতা রাইকে সখিরা ঠাট্টা করে বলছেন ;—

বঙ্গ পরিহর অতিভেল গোব।
মাজি ধয়ল জনু কনক-কটোর ॥

'তোমার গৌরবর্ণ পয়োধর এত রক্তিম হল কেন? যেন সোনার বাটি কেউ মেজে এনেছে।' এই দেখার অভিনবত্ব কবির নিজস্ব। পুরোনো উপমাকেই নতুন ভাবে সাজিয়ে কবি এত আকর্ষণীয় করে তুললেন।

তুলির এক একটি টানেই রোমান্টিক বর্ণোজ্জ্বল ছবি কত সুন্দর হয়ে উঠতে পারে পদাবলী সাহিত্যে বিদ্যাপতি তার অসংখ্য নিদর্শন রেখে গেছেন। 'সজনী ভল কএ পেখল ন ভেল। মেঘমাল সয়ঁ তড়িত লতা জনি হিরদয়ে সেল দঈ গেল ॥' (৬২৪), 'সজনী অপুরুব পেখল বামা। কনকলতা অবলম্বন উয়ল হরিণহীন হিমধামা॥' (৬০৩), 'বিগলিত চিকুর/মিলিত মুখমণ্ডল/চাঁদ বেঢ়ল ঘনমালা।' (৬৯৭), 'নমিত অলকে বেঢল/মুখকমল শোভে।' (১৬৮) প্রভৃতি নায়কের চোখে দেখা নায়িকার সৌন্দর্যচিত্রগুলি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। রতিমিলন চিত্রণেও প্রয়োজনবোধে কবি অসঙ্কোচ বর্ণন দিয়েছেন, সে বর্ণনায় রোমান্টিকতার আভাস লক্ষণীয়। মুগ্ধা কিশোরী রাধার কাছে রতি অভিজ্ঞ কানু প্রতিদান প্রত্যাশা করছেন, তখন সখিরা রাধার পক্ষ নিয়ে তাকে বলছেন,

ন বুঝয়ে রস নহি বুঝ পরিহাস
নহি আলিঙ্গন ভউহ বিলাস।
সব রস তঁহ খনে চাহহ তাহি
সাগর কওনে পএরেহা থাই।

... ...

এখনক আরতি হর পএ দন্দ
মুন্দলা মুকুল কতএ মকরন্দ। [৫৮]

'আমাদের রাধা আলিঙ্গন, ভ্রূ বিলাস কিছুই শেখেনি। তুমি এখুনি তার কাছে সব রস প্রত্যাশা করছ। সাগরের গভীরতা প্রথমেই কি মাপা যায়?...এখন বেশী রতিঅভিলাসে অহেতুক বিরোধ হবে। মুদিত মুকুলে মধু পাবে কি করে?' এই ব্যঞ্জনাময় উপমায় অনভিজ্ঞ যৌবনার ছবি আঁকা যথার্থ শিল্পীর কাজ।

বিদ্যাপতি একাধারে দেহ ও মনের চিত্রকর। সে চিত্রাঙ্কণে প্রকৃতির সৌন্দর্যরাজ্য তার উপকরণ যুগিয়েছে। কত বিচিত্র তার প্রকাশভঙ্গি! একটি পদে সখিরা বালিকা রাধাকে এনে কৃষ্ণের হাতে সমর্পণ করতে গিয়ে কৃষ্ণকে সাবধান করছেন,—

বালি বিলাসিনি জতনে আনলি রমন করবি রাখি।
জৈসে মধুকর কুসুম ন তোল মধু পিব মুখ মাখি।
... ...
সিরিস-কুসুম কোমল ও ধনি তোহহু কোমল কাহ্ন।
ইঙ্গিত উপর কেলি যে করব জৈসে পরাভব জান।
দিনে দিনে দুন পেম বঢাওব জৈসে বাঢসি সু-শসী।
কৌতুকহু কিছু বাম না বোলব নিঅর জাউবি হসী॥ [২৮৯]

'বিলাসিনি বালিকাকে যত্নে এনেছি, রেখে রমন করবে। যেমন ফুল নষ্ট না করে মধুকর মধুপান করে।...এই ধনী শিরিষ ফুলের মত কোমল, তুমিও তেমনি কোমল। ইশারায় কেলি করবে যেন পরাজয় জানতে না পারে। চাঁদ যেমন বাড়ে, দিনে দিনে প্রেমও দ্বিগুন হবে। কৌতুকেও কিছু অপ্রিয় বোলোনা, হেসে নিকটে যাবে।' প্রেম আর প্রকৃতি উপমা একে অন্যের সঙ্গে মিশে গেছে।

একটি পদে উপমা দিচ্ছেন,—

সরসিজ বিনু সর সর বিনু সরসিজ
কী সরসিজ বিনু সূরে
জোবন বিনু তন তন বিনু জোবন
কী জোবন পিয় দূরে। [১৬৩]

'সরসিজ অর্থাৎ পদ্ম বিনা সরোবর, সরোবর বিনা পদ্ম, বা সূর্যবিনা পদ্ম কি থাকতে পারে? —তেমনি যৌবন বিনা তনু, তনু বিনা যৌবন, বা প্রিয় বিনা যৌবনের স্থান কোথায়?'. এর পরই বসন্ত বিরহের কথা—

চৌদিস ভমর ভম কুসুমে কুসুমে রম
নীরসি মাজরি পিবই।
মন্দ পবন বহ পিক কুহু কুহু কহ
সুনি বিরহিনি কইসে জীবই॥ [১৬৩]

'চারদিকে ভ্রমর ঘুরছে, কুসুমে কুসুমে রমন করছে, নিঃশেষে মঞ্জরির রস পান করছে। মৃদু পবন বইছে, পিক কুহু কুহু ডাকছে।—এ শুনে বিরহিনী বাঁচে কিভাবে।'

শুক্লা একাদশীর চাঁদ নিয়ে কবি লিখছেন,—

মাধব মাস তীথি ভউ মাধব
অবধি কইএ পিয়া গেলা। [১৬৪]

'মাধব মাস (বৈশাখ), মাধব তিথি (শুক্লা একাদশী)। এই সময়ের মধ্যে ফিরবে বলে গিয়েছিল প্রিয়!' বর্ষাবিরহের ছবি আঁকছেন,

গগন গরজ ন সুনি মন সঙ্কিত
বারিস হরি করু রাবে। [১৭১]

'গগনে মেঘগর্জন শুনে মন শঙ্কিত। বর্ষার মেঘ গর্জন করছে।'

অথবা,—

গগন গরজ মেঘা
উঠএ ধরণী থেঘা। [১৭৮]

'গগনে মেঘগর্জন, ধরণীতে তার প্রতি ধ্বনি।' বর্ষাবিরহের বিখ্যাত আর একটি ছবি 'সখি হে হামারি দুখের নাহি ওর' পূর্বেই (পৃ ১০৩-৪) উদ্ধৃত করেছি।—এ প্রসঙ্গে সে ছবিটিও স্মরণ করতে বলি। বিদ্যাপতির কবিতার জগৎ সৃষ্টিতে, চিত্রকল্পের ব্যবহারে প্রকৃতির প্রভাব খুব গভীর।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের চিত্রকল্পের পার্থক্য

বিদ্যাপতি রাজসভার কবি ছিলেন। বর্ণনায় কিছুটা ঐশ্বর্যের আড়ম্বর। রাধা চিত্র আঁকতে লিখলেন,

কনক কদলি পর সিংহ সমারল
তাপর মেরু সমানে॥
মেরু উপর দুই কমল ফুলায়ল
নাল বিনা রুচি পাঈ।—[২৫]

'সোনার কদলীর (উরুদেশ) উপর সিংহ উঠল (কটিদেশ), তারপর মেরু সমান (কুচ), মেরুর ওপর দুটি পদ্ম ফোটাল (স্তনবৃন্ত), নাল বিনা কি শোভা!' ঐশ্বর্য প্রিয় কবি স্বর্গ মর্ত্য খুঁজে সূর্য, চন্দ্র, রাহু, স্বর্ণ-কদলী, মেরুদেশ, কমল, সিংহ, হরিণ, হস্তী, গঙ্গা-ধারা—সংস্কৃত কবিদের আদর্শে এই সকল উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। সে তুলনায় চণ্ডীদাসের চিত্রগুলি নম্র স্নিগ্ধতার মৃদু রেখায়

আঁকা। এত চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল তার রঙ নয়। অনেক নরম, কোমল বর্ণে কবি তার নায়িকাকে উপস্থিত করেছেন। সে নায়িকা ঘর সাজায় না, দেহকে সাজায় না—বরং এ সব বহিরঙ্গ ঐশ্বর্যের প্রতি তার নিরাসক্তি প্রবল। সে আপনার প্রেম-বেদনার এক বৈরাগ্যের রঙে নিজেকে সাজিয়ে নিয়েছে। ধ্যান তন্ময় দৃষ্টিতে মেঘের পানে তাকিয়ে আছে, যোগিনীর রাঙা বাস পরনে, আহার ত্যাগ করেছে।

চণ্ডীদাস

এলাইয়া বেণী   ফুলের গাথনি
দেখয়ে খসয়ে চুলি।
হসিত বয়ানে   চাহে মেঘপানে
কি কহে দুহাত তুলি॥
একদিঠে করি   ময়ূর ময়ূরী
কণ্ঠ করে নিরিখনে।
চণ্ডীদাসে কয়   নব পরিচয়
কালিয়া বধুর সনে॥ [৬]

জয়দেবের রাধা থেকে বিদ্যাপতির রাধা প্রেম-ঐশ্বর্যে গরীয়সী। চণ্ডীদাসের রাধা আবার বিদ্যাপতির রাধা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাতুতে গড়া। তারই উপযোগী করে চণ্ডীদাস তার কবিতার চিত্রকল্প গড়ে নিয়েছেন। চণ্ডীদাসের রাধা এমন প্রেম-পরশমণির সন্ধান পেয়েছে যে লৌকিক লীলা ছলা তার কাছে তুচ্ছ, ভিখারিনী হতেই তার সাধ। চণ্ডীদাসের এই রাধা-চিত্রই যেন পরবর্তীকালে শ্রীচৈতন্যের মধ্যে মূর্তি পরিগ্রহ করেছে। এই বৈরাগ্যের প্রেম সাধনা বাংলার নিজস্ব সম্পদ। মিথিলার রাজসভার জীবনরসিক কবির পক্ষে এ জগৎ আবার অজানা। এখানে কুচদ্বয়কে স্বর্ণকলস করার দিকে কবির মন নেই, দেহকে প্রেমিকের অভ্যর্থনার সাজে সাজাবার চিন্তাই মনে আসেনি। এখানে প্রেমিকা কৃষ্ণধ্যানে জগৎকে কৃষ্ণময় করে দেখছেন। চিকুরের ঘনকৃষ্ণ আঁধারে কৃষ্ণরূপ, আকাশের ঘন কৃষ্ণ মেঘে কৃষ্ণরূপ, ময়ূরের কণ্ঠবর্ণেও কৃষ্ণদর্শন। কৃষ্ণস্বপ্নাতুরা রাধার আকাঙ্ক্ষা,—

বন্ধুর লাগিয়া যোগিনী-হইব কুণ্ডল পরিব কানে।
সভার আগে বিদায় হইয়া যাইব গহন বনে॥ [১৮]

চণ্ডীদাসের চিত্র কল্পনায় ব্যবহারিক ঐশ্বর্যের দৈন্য চোখে পড়ে। তিনি সহজ কথা প্রায় নিরলঙ্কৃত ভাবে বলেছেন। তবে সেখানে সহজভাবেই বাঙালী গৃহস্থ

ঘরের ছবি এসে পড়েছে। রাধা খেতে, শুতে, বসতে কিছুতেই স্বস্তি পাননা, ননদিনীর পাশে শুয়েও কৃষ্ণের কথাই ভাবেন, তাকে ভুলতে কত যত্ন করেন, কিছুতেই ভুলতে পারেন না যে! কুলের কলঙ্কের কথা, সাপের ছোবলের কথা, ননদিনীর গঞ্জনার কথা, পিরীতি শব্দের যাদুশক্তির কথা, বাউল যোগিনীর ছবি, ঘরের বার করার মত দুর্বার বাঁশির সুর, পীরিতি-ব্যাধি ও কৃষ্ণ-ঔষধের উপমা, মেঘলা আঁধারে আঙিনায় অদূরে গাছের তলায় নায়কের বৃষ্টি ভেজার ছবি, কাক ও কোকিলের কলরব, জুঁই জাতি মালতী কদম্বের সুবাস, শঙ্খবণিকের করাতের উপমা, পয়োমুখ বিষকুম্ভের উপমা, পরাধিনী অবলা নারীর 'ঘর হতে আঙিনা বিদেশ'-এর অনুভূতি, কপালে সিঁদুর ও মুখে তাম্বুলের সুপরিচিত নারীমুখ, ঘাট থেকে কলসী ভরে জল আনার ছবি, চোরের মা বা স্ত্রীর লুকিয়ে কান্নার উপমা, কানুপ্রেমকে চন্দনের সঙ্গে তুলনা এবং ঘসে সৌরভ বাড়লেও অঙ্গে নিলে দহন বাড়বার উপমা (বিষম), কানু-প্রেম অন্যমনস্কতায় রান্না নষ্ট হবার চিত্র, জলে নিমজ্জনের শ্বাস রোধকারী অনুভূতির উপমা—এই সব হল চণ্ডীদাসের কবিতার চিত্রোপকরণ। তাই চণ্ডীদাস বাঙালীমনের বড় কাছের কবি। এ যেন দরিদ্র বাঙালীঘরের সাধারণ ব্যঞ্জনের অমৃত স্বাদ,—বিদ্যাপতির মত রাজভোগ পরিবেশন নয়।

বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস দুই ভিন্নধর্মী কল্পনার বৃন্দাবন চিত্র দুই ভিন্ন ভাষা ও ছন্দভঙ্গীতে এনে দিলেন। পরবর্তী বৈষ্ণব কবিরা এই দুই ধারাকে মিলিয়ে যুক্তবেণী ধারায় পদাবলীর ঐ বিচিত্র প্রবাহটি সমৃদ্ধ করে তুললেন। বস্তুত চৈতন্য পরবর্তী বৈষ্ণব কবিরা যেন একটি অখণ্ড কবি সত্তায় আত্মপ্রকাশ করেছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তি-দর্শন তাঁদের যেন এক অখণ্ড চৈতন্য দান করেছিল। তবে সেখানেও নিভৃতে কান পেতে শুনলে গোবিন্দদাসের শিল্প-সচেতন চাতুর্যময় ভাষাভঙ্গি থেকে জ্ঞানদাসের স্বপ্নরোমান্স বেষ্টিত কবি-চেতনার পার্থক্যটি ধরা পড়ে।

গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাস

'অর্ধেকের অর্ধেকের অর্ধেক দৃষ্টিতে কানুকে দেখেও গোবিন্দদাসের রাধার রহত কি যাত পরাণ' (পৃ ২০৭-তে পূর্ণ পদটি দ্রষ্টব্য), সে রাধা তিনটি পুরুষকে একই সঙ্গে ভালবেসেছে এই ভ্রান্তির চাতুর্যে পাঠককে আকৃষ্ট করে (পৃ ২০৬-তে পদটি দ্র.)। জ্ঞানদাসের রাধা এত চতুর নন, তার প্রেম স্নিগ্ধ গভীর অনুভূতির স্বাদ বহন

করে আনে। রূপের পাথারে আঁখির নিমজ্জন, বা যৌবনের বনে মন হারানোর চেতনা (পৃ ১৫০ দ্র.) আর এক স্বতন্ত্র অনুভূতির বিষয়। বর্ষারাতে বিগলিত চীর অঙ্গে যে নায়িকা স্বপ্ন-রসাবেশে প্রিয়তমের সঙ্গে মিলিত হন (পৃ ১৫৩ দ্র.) অথবা স্বপ্নের ঠিক মিলন-মুহূর্তে বাটুল বিদ্ধ বিহঙ্গীর মত জেগে উঠে প্রিয়তমকে হারিয়ে ফেলেন (পৃ ১৫৫ দ্র.) সে কবির চিত্রজগতের স্বাতন্ত্র্য মনোযোগী পাঠকের চোখ এড়াবে না। এমনি ভাবেই সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে জগদানন্দের, লোচন দাসের, বলরামদাসের বা শশিশেখরের চিত্রকল্পের কিছু কিছু স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হয় বৈকি। তবে সাধারণভাবে দেখতে গেলে চৈতন্য পরবর্তী বৈষ্ণব কবিরা একটি অখণ্ড কবিতার জগতই গড়ে তুলেছেন। বৈষ্ণব কবিদের এ-জগত বৃন্দাবন মথুরার কল্পলোক, যমুনার তীরে তীরে তমাল ও কদম্ব তরুতলে, প্রেমের কুঞ্জে, বর্ষা শরৎ বসন্তে তার পদচারণা। সেই সঙ্গে রয়েছে গঙ্গাতীরের নবদ্বীপের ছবি, নদীয়ার দুলালের ভাবচিত্র। রাধা-চিত্রাঙ্কণে, প্রেমের রহস্য বিশ্লেষণে জয়দেব বিদ্যাপতি প্রদর্শিত সংস্কৃত সাহিত্যের অলঙ্করণের সঙ্গে রয়েছে বাংলার বাউল চেতনার বৈরাগ্যবোধ। কাহিনী গাথা হয়েছে লৌকিক গোপ-গোপীর প্রেমকথার সঙ্গে ভাগবত প্রেমকথাকে মিশিয়ে নিয়ে। ভক্তি-ধর্মচেতনা, প্রেমচেতনা, জীবনকে জানার আকুলতা, রমনী হৃদয়ের প্রেমরহস্য উদ্‌ঘাটনের চিরন্তন কৌতূহল,—সব এক অখণ্ড সত্তায় মিলে গেছে বৈষ্ণব পদগীতিকায়। এর ভাষা এবং ছন্দে লেগেছে সংস্কৃত, প্রাকৃত, মৈথিলী (ব্রজবুলি) গানের সুর,—সেই সঙ্গে মিশেছে তৎকালীন বাংলা বাক্‌রীতির সংলাপী সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ ভঙ্গী। সব মিলিয়ে বৈষ্ণব কবিতার চিত্রকল্পময় আকাশটি এত ঐশ্বর্যখচিত হয়ে উঠতে পেরেছে।

বৈষ্ণব কবিতায় শব্দালঙ্কার এবং অর্থালঙ্কার উভয়েরই প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়।

শব্দালঙ্কার

শব্দালঙ্কারে বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, জগদানন্দ প্রভৃতির বিশেষ অনুরাগ পাঠকের শ্রুতি ও দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করে। এধারা জয়দেবের উত্তরাধিকার সূত্রে এসেছে। কবি পরিচয়ে কিছু উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। এখানে আর দু একটি উদাহরণ তোলা গেল।

সখিগণ কন্দরে থোই কলেবর
ঘর সঞে বাহির হোয়।
বিনি অবলম্বনে উঠই ন পারই
অতয়ে নিবেদলুঁ তোয়

মাধব কত পরবোধব তোয় ।
দেহ দিপতি গেল হার ভার ভেল
জনম গমাওল রোয় ॥
... ...
কেলি কলপতরু সুপুরুখ অবতরু
নাগর গুরুবর রতনে ।
ভনই বিদ্যাপতি সিবসিংহ নরপতি
লখিমা দেই পরমানে । [বিদ্যাপতি ১৮৫]

বিদ্যাপতির যদৃচ্ছ একটি পদ এখানে নেওয়া হয়েছে। মোটা হরফের ধ্বনিগুলি একটু লক্ষ্য করলেই ধরা যাবে স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি সূক্ষ্ম অন্তর্মিল শ্রুতিকে কেমন প্রসন্ন করে তোলে। এই ধ্বনি-সম্মিতি কবি সচেতন ভাবে এনেছেন এমন নয়, ভাব ও ভাষার পার্বতী-পরমেশ্বর সম্পৃক্ততাই কবিভাষাকে এত ধ্বনি-অলঙ্কৃত করেছে।

গোবিন্দদাস

গোবিন্দদাস অপেক্ষাকৃত সচেতন শিল্পী। পূর্বোধৃত তাঁর শারদরাসের বিখ্যাত পদটি (পৃ ২২৭ দ্র) শব্দধ্বনির সার্থক নিদর্শন। এখানে অভিসার পর্যায়ের আর একটি পদ উদ্ধৃত করি।—

কুঞ্চিত-কেশিনি নিরুপম-বেশিনি
রস-আবেশিনি ভঙ্গিনি রে
অধর সুরঙ্গিনি অঙ্গ তরঙ্গিনী
সঙ্গিনি নব নব রঙ্গিণি রে ॥
সুন্দরী রাধে আওয়ে বনী ।
ব্রজরমনীগণ-মুকুট-মণি ॥
কুঞ্জর-গামিনি মোতিম দামিনি
দামিনি চমক-নেহারিনি রে ।
অভরন-ধারিনি নব অভিসারিনি
শ্যামর-হৃদয়-বিহারিনি রে ॥
নব অনুরাগিনি অখিল-সোহাগিনি
পঞ্চম রাগিনী মোহিনীরে ।
রাস-বিলাসিনি হাস-বিকাশিনি
গোবিন্দদাস চিতশোহিনীরে ॥ [গোবিন্দদাস : ৩৪৩]

সমগ্র পদটিই ধ্বনি-মিলের নিদর্শন, তবে শিল্পী যে সচেতন ভাবে শব্দ নির্বাচনে মনোযোগী হয়েছেন তা সহজেই ধরা পড়ে।

জগদানন্দের পদেও শব্দধ্বনির প্রাচুর্য লক্ষণীয়। তার বিখ্যাত 'মঞ্জু বিকচ কুসুম পুঞ্জ' পদটি ষষ্ঠ অধ্যায়ে উদ্ধৃত হয়েছে। সংসদ সংস্করণ বৈষ্ণব পদাবলী ধৃত তাঁর ৩১, ৫৯, ৬০ পদগুলি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। শেষ পদ দুটিতে তিনি আবার 'অন্তশ্চিত্র' মিল দিয়েছেন। পদের প্রতি পংক্তির প্রথম হরফ উপর থেকে নীচে, কখনো বা নীচে থেকে উপরে পড়ে গেলে সেখানে ক্ষুদ্র আর একটি পদগীতি পাওয়া যায়। বাহুল্যবোধে সে দৃষ্টান্ত আর তোলা হল না।

কবিদের আলোচনা প্রসঙ্গে চতুর্থ-পঞ্চম অধ্যায়ে পদাবলীগানের শ্রেষ্ঠ কবি চতুষ্টয়ের অর্থালঙ্কারের কিছু কিছু উদাহরণ তোলা হয়েছে। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে, উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, ভ্রান্তিমান, নিদর্শনা, অতিশয়োক্তি, ব্যতিরেক, প্রতীপ, বিষম প্রভৃতি অলঙ্কার বৈষ্ণব পদাবলীকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে। মাঝে মাঝে এই অলঙ্করণের বাড়াবাড়িও ঘটেছে স্বীকার করতে হয়।

অর্থালঙ্কার ও উপমান-উপকরণ

জীবনাচরণে বৈষ্ণব ভক্তেরা সর্ব ঐশ্বর্য-অলঙ্কার ত্যাগ করলেও কাব্যগীতিকে বিশেষভাবে অলঙ্কৃত করতে চাইতেন দেখা যায়। তবে যেখানে স্বতোৎসারিত ভাবে কাব্য অলঙ্কৃত হয়েছে সেখানে বৈষ্ণব কবিদের উৎকর্ষ পাঠককে মুগ্ধ না করে পারে না। অর্থালঙ্কারের মুখ্য উপকরণ উপমান সামগ্রী। বৈষ্ণব কবিরা প্রধানতঃ সংস্কৃত কাব্যের জগত থেকেই প্রসিদ্ধ উপমান সামগ্রী এবং তাদের ব্যবহার রীতি গ্রহণ করেছেন। সেখানে সৌরলোক ও পৃথিবী মন্থন করে তাঁরা সূর্য, চন্দ্র, রাহু, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, মেরুদেশ, দিন, রাত্রি ও বিভিন্ন ঋতুকে, মেঘ ও বিদ্যুৎকে যেমন এনেছেন পশু-পাখি-পতঙ্গদের মধ্যে তেমনি সিংহ, গজ, হরিণ, গোরু, ময়ূর হংস, চকোর, কাক, কোকিল, খঞ্জন, ভ্রমর প্রভৃতিকে ঠাঁই দিয়েছেন। বৃক্ষের মধ্যে তমাল, কদম্ব, বট, কদলী, ভাণ্ডী, তুলসীর যেমন আদর, ফুলের মধ্যে তেমনি, কমল, যূথি, জাতি, কদম্ব, মল্লিকা, মালতি, তিলফুল, শিরিষ, পলাশকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। ফলের মধ্যে শ্রীফল, দাড়িম্ব, কুচ, বিম্ব, আম্র, জম্বু, প্রভৃতির নাম দেখতে পাই। ঋতুর মধ্যে বর্ষাই প্রধান, তারপর বসন্ত এবং শরৎ, শীত, গ্রীষ্মকে প্রাসঙ্গিক ভাবে স্মরণ করেছেন। ভৌগোলিক স্থানের মধ্যে গোকুল, বৃন্দাবন, মথুরা আর নবদ্বীপ, শান্তিপুর ও শ্রীক্ষেত্র। নদী দুটি মাত্র, যমুনা আর গঙ্গা। সেই সঙ্গে

গোপীদের পারাপার ও স্নানের চিত্র। অলঙ্কার সামগ্রীর মধ্যে হার, কঙ্কণ, কেয়ুর, নূপুর, চূড়া, হাতের বাঁশি ; পূজা উপকরণ ও প্রসাধনীর মধ্যে কস্তুরী, চন্দন, অগুরু, কজ্জল, দীপ, ধূপাধার, বেদি, মঙ্গল কলস, আম্রপল্লব, তুলসী, রজত পাত্র ইত্যাদি। রান্নার নানা উপকরণ ও ব্যঞ্জনেব নাম আছে। পাত্র পাত্রীর মধ্যে গোপ, গোপিনী, সখি, দূতী, স্বামী, পরপুরুষ, মাতা, শাশুড়ী, ননদিনী, পাড়া-পরিজনের, এমনকি চোরেব রমনীর কথাও বয়েছে। বাংলা দেশের সুপবিচিত নয়নাভিরাম চিত্র অনেক মেলে, নদীঘাটে তরুণীদেব স্নানলীলা, কলসী ভবে জল আনা, স্নানশেষে সিক্তবসনার ঘরে ফেবার চিত্র, চঞ্চলা মেঘাম্ববী কিশোবীব চঞ্চল বিদ্যুতের মতো ছুটে যাওয়ার ছবি—এসব অতি পবিচিত দৃশ্য। শাশুড়ীর গঞ্জনা, চোরের বমনীর চীৎকাব কবে কেঁদে মন হাল্‌কা না কবতে পাবার ব্যথা-চিত্রও সুপরিচিত। এই হল কবিদেব উপমা জগতের মোটামুটি চিত্র। সেই সঙ্গে রয়েছে ভাগবতাশ্রিত কৃষ্ণলীলার পৌরাণিক কাহিনী এবং মানুষেব সহজাত ভক্তি স্নেহ ও রতিপ্রেমের দুনির্বার আকর্ষণের অভিব্যক্তি।

এবারে কয়েকটি নতুন উদাহবণ তুলে অলঙ্কাব আলোচনা-প্রসঙ্গ শেষ কবা যেতে পারে।—

সসন-পবস খসু অম্বব রে দেখল ধনিদেহ।
নব জলধব তর চমকএরে জনি বীজুবি রেহ॥
আজু দেখলি ধনি জাইতেরে মোহি উপজল রঙ্গ।
কনকলতা জনি সঞ্চররে মহি নিবঅবলম্ব॥
তা পুন অপরুব দেখলরে কুচ-যুগ অরবিন্দ।
বিগসিত নহি কিছু কাবণরে সোঝা মুখচন্দ॥

[বিদ্যাপতি : ৫]

'বাতাসের স্পর্শে বসন খসে গেল, ধনির দেহ দেখলাম। যেন, নবজলধরের তলে বিদ্যুৎ রেখার চমক! ধনিকে আজ পথে যেতে দেখলাম, মোহে আনন্দ জাগল। যেন, মৃত্তিকা অবলম্বনহীন কনকলতা সঞ্চবণ কবে বেড়াচ্ছে। তারপর আবার কুচ-যুগ (সদৃশ) কমল দেখলাম। তত প্রস্ফুটিত হয়নি, তার কিছু কাবণ রয়েছে। সামনেই যে মুখচাঁদ। (অর্থাৎ কমল চাঁদের সামনে ফোটেনা, সূর্যের সামনে ফোটে)।' শেষ দুটি পংক্তিতে ভনিতা—সেটুকু উদ্ধৃত করিনি। বাকী সমগ্র পদটিই উপমা আর রূপকের মালা গেঁথেছেন কবি।

যেখানে বিদ্যাপতি রাধার রূপ বর্ণনায় অলঙ্করণের কিছুটা বাড়াবাড়ি করেছেন এমন একটি পদ উদ্ধৃত করি।—

মাধব, কি কহব সুন্দরি রূপে।
কতেক যতন বিহি আনি সমারল
দেখলি নয়ন সরূপে।
পল্লবরাজ চরণযুগ শোভিত
গতি গজরাজক ভানে।
কনক কদলি পর সিংহ সমারল
তাপর মেরু সমানে।।
মেরু উপর দুই কমল ফুলায়ল
নাল বিনা রুচি পাঈ।
মনিময় হার ধার কহ সুরসরি
তেঁ নহি কমল সুখাঈ।।
অধর বিম্বসন দসন দাড়িম-বিজু
রবি সসি উগথিক পাসে।
রাহু দূরি বসু নিয়রো ন আবথি
তৈ নহি করথি গরাসে।।
সারঙ্গ নয়ন বচন পুন সারঙ্গ
সারঙ্গ তসু সমধানে।
সারঙ্গ উপর উগল দস সারঙ্গ
কেলি করথি মধু পানে।। [বিদ্যাপতি : ২৫]

'মাধব সুন্দরীর রূপের কথা কি বলব? বিধাতা কত যত্নে (বিবিধ উপকরণ) এনে সাজাল নিজের চোখে দেখলাম। চরণ দুটি কমল-শোভিত, গতি গজরাজকে মনে করিয়ে দেয়। কনক কদলীর (উরু যুগল) উপর সিংহকে বসিয়েছে, তার ওপর মেরু সদৃশ (কুচ যুগল)। মেরুর ওপর দুটি কমল ফুটিয়েছে (কুচবৃন্ত), নাল বিনাই কি সুন্দর! মনিময় হার যেন সুরেশ্বরীর (গঙ্গার) ধারা,—সে জন্যই কমল শুকায় না। অধর বিম্বফল, দশন দাড়িম্ব বীজ, পাশাপাশি রবি শশীর উদয় (কপোলের সিন্দুর এবং মুখ); রাহু (কৃষ্ণকেশ) দূরে বসে, নিকটে আসতে পারছে না বলেই গ্রাস করছে না। হরিণ-নয়না, বচন কোকিল সদৃশ,

কটাক্ষ মদনের ; কমলের উপর দশটি ভ্রমর (চূর্ণ কুন্তল) উদিত হয়েছে। খেলছে এবং মধুপান করছে।'

এ পদে এক সঙ্গে উপমা, রূপক, সমাসোক্তি, যমক, অতিশয়োক্তি নানাবিধ অলঙ্কারের সমাবেশ হয়েছে। বিদ্যাপতি অলঙ্কারের মালা গেঁথে কথা বলতে ভালবাসতেন,—এখানে তো নায়িকার রূপ বর্ণনা করতে বসেছেন। তবে যেখানে বাড়াবাড়ি করেননি, অথচ অলঙ্কারের রাজ ঐশ্বর্যে নায়িকার মূর্তিটি অপূর্ব সৌন্দর্যে সাজিয়েছেন এমন চিত্রের সংখ্যা কিছু কম নেই। অনুরূপ একটি পদ এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

গেলি কামিনি গজহু গামিনি
বিহসি পলটি নেহারি।
ইন্দ্রজালক কুসুম-সায়ক
কুহকি ভেলি বরনারি॥
জোরি ভুজযুগ মোরি বেঢ়ল
ততহি বদন সুছন্দ।
দাম-চম্পক কাম পূজল
জইসে সারদ চন্দ॥
উরহি অঞ্চল ঝাঁপি চঞ্চল
আধ পয়োধর হেরু।
পবন পরাভব সরদ ঘন জনু
বেকত কএল সুমেরু॥
পুনহি দরসন জীব জুড়াএব
টুটব বিরহক ওর।
চরণ যাবক হৃদয় পাবক
দহই সব অঙ্গ মোর॥ [৬২২]

'গজগামিনী কামিনী একটু ফিরে হেসে তাকালেন। বরনারী ইন্দ্রজালের কুসুম শায়কে কুহক সৃষ্টি করলেন। সুছন্দ বদন তিনি দুই বাহু ঘুরিয়ে বেষ্টন করলেন, যেন কাম চম্পকদামে (চম্পক অঙ্গুলিতে) শরতের চাঁদকে পূজা করল। আঁচল উড়ছিল, চঞ্চলভাবে ঢাকা দেবার সময় অর্ধপয়োধর দেখলাম। যেন শরৎ মেঘ হাওয়ার কাছে পরাজিত হয়ে সুমেরুকে প্রকাশ করল। আবার দেখা পেলে

জীবন জুড়াবে, বিরহ ঘুচবে। তাঁর চরণের আলতা যেন হৃদয়ের আগুন, আমার সর্ব অঙ্গ দহন করছে।'

উপমা-রূপক-উৎপ্রেক্ষার অলঙ্কৃত চিত্রণে নবীনা নায়িকাকে এখানে প্রত্যক্ষ করে তুলেছেন। অলঙ্কারের প্রাচুর্য আছে, কিন্তু অহেতুক বাহুল্য নেই। নায়িকাকে রাজ-আভরণে সাজাতে সুনির্বাচিত অলঙ্কার প্রয়োজন মত ব্যবহার করেছেন,—এবং সে কাজে অসাধারণ দক্ষতা তাঁর ছিল।

চণ্ডীদাস যে কাব্যের মণ্ডলকলার প্রতি উদাসীন ছিলেন ইতিপূর্বেই তা দেখেছি। তার কিছু কিছু উপমা, উৎপ্রেক্ষাদি অলঙ্কারের উল্লেখ করা হয়েছে (পৃ ১৩৭-৮), এখানে স্বভাবোক্তির একটি উদাহরণ তোলা যেতে পারে।—

কানড় কুসুম করে পরশ না করি ডরে
এ বড় মনের মন ব্যথা।
যেখানে সেখানে যাই সকল লোকের ঠাঞি
কানাকানি শুনি এই কথা॥
সই, লোকে বলে কালা-পরিবাদ।
কালার ভরমে হাম জলদে না হেরি গো
তেজিয়াছি কাজরের সাধ॥
যমুনা-সিনানে যাই আঁখি মেলি নাহি চাই
তরুয়া কদম্বতলা পানে।
যথা তথা বসি থাকি বাঁশীটি শুনিয়ে যদি
দুটি হাত দিয়া থাকি কানে॥
চণ্ডীদাস ইথে কহে সদাই অন্তর দহে
পাসরিলে না যায় পাসরা।
দেখিতে দেখিতে হরে তনু মন চুরি করে
না চিনিয়ে কালা কিবা গোরা॥ [২০২]

শেষ অংশে সন্দেহ অলঙ্কারের আভাস এসেছে। বাকী সবটাই স্বভাবোক্তির যথাযথ বস্তু সংবাদেই এত হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে।

আর একটি পদে প্রচ্ছন্ন অপ্রস্তুত প্রশংসার (বা ইংরেজি Innuendo?) সুরটি চমৎকার ফুটে উঠেছে।—

নীল বরণ, ঝামর হয়েছে, মলিন হয়েছে দেহ।
কোন কুলবতী, রসনিধি পেয়ে, নিঙড়ি লয়েছে স্নেহ ॥
তাম্বুলের দাগ, অধরে লেগেছে, কালার উপরে কাল।
প্রভাতে উঠিয়া, ও মুখ দেখিলাম, দিবস যাইবে ভাল ॥
ভালের উপরে, সিন্দুরের বিন্দু, ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি।
আমাপানে চাও, ফিরিয়া দাঁড়াও, ভাল করে তোমা দেখি ॥

[৬১]

জ্ঞানদাসের অলঙ্কার নিদর্শন পূর্বে দিয়েছি (১৫ পৃ. ১১০-১১৩) এখানে আর একটি নূতন আঙ্গিকের পদ উদ্ধৃত করি।—

ও কি দেহা।
উয়ল জনু নব মেহা ॥
ও কি চূড়া।
মালতি মাল মঞ্জুলা ॥
ও কি এ বয়না।
দুহু দিসে চরকায় নয়না ॥
ও কি এ ছন্দা।
তিমিরে অগোচল চন্দা ॥

... ...

ও কি এ চলনী।
অক বলনী।
ও কি এ রসভোরা।
কুবলয় খঞ্জন জোরা ॥
ও কি এ হাস্য।
ভঙ্গুর ভাঁহু বিলাস ॥
ও কি এ লীলা।
অমিয় গরলময় শীলা ॥
ও কি এ মুরলি।
শুণ শুনইতে মন ঘুরলী ॥
ও কি এ বেশা।

ধীর বিজুরি পরকাশা ॥
ও কি এ শোভা।
জ্ঞানদাস মনোলোভা ॥

[জ্ঞানদাস : ১১৩]

অপ্রস্তুত প্রশংসা, না উৎপ্রেক্ষা, না সন্দেহ—কোন্ অলঙ্কার হবে এটি তার চুলচেরা বিতর্কে না গিয়েও বলা যেতে পারে, কবি এখানে প্রশ্নোত্তরের নতুন আঙ্গিকে চমৎকারিত্ব আনতে পেরেছেন।

গোবিন্দদাসেরও নানাবিধ অলঙ্কারের উদাহরণ কবি পরিচয় প্রসঙ্গে দেওয়া হয়েছে। এখানে কৃষ্ণ-রূপ বর্ণনায় আর একটি অলঙ্কৃত পদ উদ্ধৃত করা গেল।—

সুরপতি ধনুকি শিখণ্ডক চূড়ে।
মালতি ঝুরিকি বলাকিনী উড়ে ॥
ভালে কি ঝাঁপল বিধু আধ খণ্ড।
করিবর-কর কিয়ে ও ভুজদণ্ড ॥
ও কি শ্যাম নটরাজ।
জলদ-কল্পতরু তরুণি সমাজ ॥
করকিশলয় কিয়ে অরুণ বিকাশ।
মুরলী খুরলী কিয়ে চাতকভাষ ॥
হাসকি ঝরয়ে অমিয়া মকরন্দ।
হারকি তারক দোতিক চান্দ ॥
পদতল খুলল কমল অনুরাগ।
তাহে কল হংসকি নূপুর জাগ ॥
গোবিন্দ দাস কহ কিয়ে মতিমন্ত।
ভুলল যাহে দ্বিজরাজ বসন্ত ॥

[গোবিন্দদাস : ১৫৬]

'শিখণ্ডকের (কৃষ্ণের) চূড়ায় কি সুরপতির (ইন্দ্রের) ধনু? (চূড়ায়) মালতি মালা না বলাকা উড়ছে? ও কি কপোলদেশ না আধাঢাকা চাঁদ? হস্তীর শুণ্ড না ভুজদণ্ড? ওকি নটরাজ শ্যাম, না তরুণী সমাজের শ্যাম কল্পতরু? করপল্লব, কি বিকশিত অরুণাভা? ওকি মুরলীধ্বনি, না চাতক ভাষ? হাসি,

না অমৃত-মধু ঝরছে? হায়, না তারার দ্যুতি শোভা? পদতলে কমলের রক্তিমাভা ফুটেছে। তাতে নূপুরধ্বনি, না হংস কলধ্বনি? গোবিন্দদাস বলেন, এ কোন্ মতিমান দ্বিজরাজ বসন্তকে ভোলালেন?'

এখানে মূল অলঙ্কার সম্ভবতঃ (মালা) সন্দেহ, সঙ্গে রূপকের মশলা মিশিয়েছেন কবি। প্রসঙ্গতঃ পূর্বোদ্ধৃত (পৃ ২১৩) 'রূপে ভরল দিঠি' পদটির উল্লেখ করা যেতে পারে। সমগ্র পদটিতে চমৎকার সমাসোক্তি (না ইংরেজি Transfered Epithet-র) অলঙ্কারের আভাস ফুটে উঠেছে। গোবিন্দদাসের এমন অলঙ্কৃত পদের সংখ্যা কম নয়।

এবারে অপেক্ষাকৃত কম খ্যাতিমান কয়েকজন বৈষ্ণব কবির অলঙ্কৃত দু-একটি পদ উদ্ধৃত করি। প্রথম শ্রীরঘুনন্দনের একটি পদ।—

ধরণী জন্মিল এথা কি পুণ্য করিয়া।
মোর বন্ধু যায় যাতে নাচিয়া নাচিয়া॥
নূপুর হয়্যাছে সোনা কি পুণ্য করিয়া।
বন্ধুর চরণে যায় বাজিয়া বাজিয়া॥
বনমালা হল্য পুষ্প কি পুণ্য করিয়া।
বন্ধুর বুকেতে যায় দুলিয়া দুলিয়া॥
মুরলী হইল বাঁশ কি পুণ্য করিয়া।
বাজে ও অধরামৃত খাইয়া খাইয়া॥
এ সকল সখা হল্য কি পুণ্য করিয়া।
যাইছে বন্ধুর সনে খেলিয়া খেলিয়া॥
শ্রীরঘুনন্দন রটে দু পানি জুড়িয়া।
এ সব না জানা যায় ভাবিয়া ভাবিয়া॥

[শ্রীরঘুনন্দন : ২, সংসদ বৈ. প.]

অপ্রস্তুত প্রশংসা বা সমাসোক্তির আধারে পদটি রচিত হয়েছে। ধরণী, সোনার নূপুর, পুষ্পমালা, বাঁশের বাঁশি বা গোপসখাদের প্রতি প্রেমময়ীর প্রচ্ছন্ন ঈর্ষা কিছুটা 'আক্ষেপ' অলঙ্কারেরও আভাস এনেছে। ভাব ও শিল্পকলার সার্থক সংযোগ পদটিকে পরম আস্বাদনীয় করে তুলেছে।

পরমানন্দের একটি পদ।—

পরশমনির সনে কি দিব তুলনা রে
পরশ ছোঁয়াইলে হয় সোনা।
আমার গৌরাঙ্গের গুণে নাচিয়া গাইয়া রে
রতন হইল কত জনা॥
শচীর নন্দন বনমালী।
এ-তিন ভুবনে যার তুলনা দিবার নাই
গোরা মোর পরান-পুতলি॥
গৌরাঙ্গ চাঁদের ছাঁদে চাঁদ কলঙ্কীরে
এমন হইতে নারে আর।
অকলঙ্ক পূর্ণ চন্দ্র উদয় নদীয়াপুরে
দূরে গেল মনের আঁধার॥
এ গুণে সুরভি সুর তরু সম নহে রে
মাগিলে সে পায় কোন জন।
না মাগিতে অখিল ভুবন ভরি জনে জনে
যাচিঞা দেওল প্রেমধন॥
গোরাচাঁদের তুলনা গোরা চাঁদ গোসাঁইরে
বিচার করিয়া দেখ সবে।
পরমানন্দের মনে এ বড় আকুতিরে,
গৌরাঙ্গের দয়া কবে হবে॥

[পরমানন্দ : ৩, সংসদ. বৈ. প.]

এখানে পংক্তি-শেষে একটি অনন্বয় অলঙ্কার 'গোরাচাঁদের তুলনা গোরাচাঁদ গোসাইরে' তাছাড়া সমগ্র পদটিই ব্যতিরেক অলঙ্কারের একটি মালা।

এবারে জগদানন্দের একটি পদ।—

সজনি গো কেন গেলাম যমুনার জলে।
নন্দের দুলাল চাঁদ পাতিয়া রূপের ফাঁদ
ব্যাধ ছিল কদম্বের তলে॥
দিয়ে হাস্য সুধা-চার অঙ্গ ছটা আঠা তার
আঁখি-পাখি তাহাতে পড়িল।

মনমৃগী সেই কালে পড়িল রূপের জালে
শূন্য দেহ পিঞ্জর রহিল ॥
চিত্তশালে ধৈর্য হাতী বান্ধা ছিল দিবা রাতি
ক্ষিপ্ত হৈল কটাক্ষ-অঙ্কুশে।
দন্তের শিকল কাটি চারিদিকে গেল ছুটি
পলাইয়া গেল কোন দিশে ॥
লজ্জাশীল হেমাগার গুরুগৌরব সিংহদ্বার
ধরম কবাট ছিল তায়।
বংশীধ্বনি বজ্রাঘাতে পড়ি গেল অকস্মাতে
সমভূমি করিল আমায় ॥
কালিয় ত্রিভঙ্গ বানে কুল মান কোনখানে
ডুবিল উঠিল ব্রজের বাস।
অবশেষে প্রাণবাকী তাও পাছে যায় নাকি
ভনয়ে জগদানন্দ দাস ॥

[জগদানন্দ : ৫১, সংসদ সং বৈ. প.]

পদটি পরম্পরিত রূপকের সার্থক নিদর্শন। পরপর পাঁচটি রূপকাশ্রয়ী উপমার মালা। রাধার আক্ষেপোক্তি, কেন যমুনায় জল আনতে গেলেন (১) নন্দদুলাল চন্দ্র রূপ-ফাঁদ পেতে ব্যাধের মত কদমতলে বসেছিলেন। হাস্য সুধারূপ চার এবং অঙ্গছটা রূপ আঠার সাহায্যে রাধার আঁখি-পাখিকে বন্দী করলেন। (২) মন-মৃগও একই সঙ্গে (কৃষ্ণ) রূপের জালে বন্দী হল, (রাধার) দেহ-পিঞ্জটি শূন্য রইল। (৩) চিত্ত-শালায় ধৈর্যরূপ হস্তী বাঁধা ছিল, (কৃষ্ণের) কটাক্ষ অঙ্কুশে ক্ষিপ্ত হল। দন্ত শিকল কেটে ছুটে কোনদিকে পালিয়ে গেল। (৪) লজ্জা শীল-রূপ হেমাগারে সিংহদুয়ার হল গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা, ধর্মরূপ কবাট ছিল তাতে, কিন্তু, বংশী-ধ্বনিরূপ বজ্রাঘাতে সেই সিংহদুয়ার ভেঙে পড়ল, রাধাকে ধরাশায়ী করল। (৫) ত্রিভঙ্গ কালিয়া-রূপ প্রবল বানে কুল মান সব ডুবল, ব্রজের বাস উঠল। এখন শুধু প্রাণ অবশেষ, তাও যায় যায়। জগদানন্দ এ-পদে যে কবিত্বময় অলঙ্করণ বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন তা বিশেষ প্রতিভার পরিচায়ক।

এখানে প্রসঙ্গত বাংলা কাব্যের অলঙ্কার বিচার সম্পর্কে একটি কথা বলতে চাই। ছন্দের মত অলঙ্কারেও প্রত্যেক উন্নত ভাষা-সাহিত্যের স্বকীয়তা রয়েছে।

বাংলা তার কিছুব ব্যতিক্রম নয়। বাংলা ছন্দের ক্ষেত্রে সংস্কৃত বা প্রাকৃত থেকে তার মৌলিক উচ্চারণ পার্থক্যের ভিত্তিতে যতটা বিচার বিশ্লেষণ ও সুস্পষ্ট সংজ্ঞা-নির্দেশ হয়েছে, অলঙ্কারের ক্ষেত্রে বাংলা প্রকাশভঙ্গির মৌলিকতা তেমনভাবে আদৌ এখনো আলোচিত হয়নি। সংস্কৃত অলঙ্কারের পুরোনো ধারাতেই, কদাচিত বা ইংরেজি অলকারেব আদর্শে বাংলা কাব্যেব অলঙ্কাব বিচারের চেষ্টা হয়ে থাকে। সেখানে সমগ্র কবিতার অলঙ্করণ সৌন্দর্যেব বিচার না করে বেছে বেছে দুএকটি পংক্তি তা তার ভগ্নাংশ ধরে অলঙ্কারের উদাহরণ সংগ্রহ কবা হয়। এতেও আবার উপমা না উৎপ্রেক্ষা, প্রতিবস্তুপমা না অর্থান্তরন্যাস, নিদর্শনা না দৃষ্টান্ত এমন সব সূক্ষ্ম সংজ্ঞাগত চুলচেবা বিতর্কেব অবতারণা দেখতে পাই। কাব্যের সৌন্দর্য হিসাবে অলঙ্কারের বিশ্লেষণ-আদর্শ প্রবর্তিত হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং সেখানে বাংলা সাহিত্যের চিত্রকলা ও প্রকাশভঙ্গিব প্রতি দৃষ্টি রেখে, অধুনা অপ্রচলিত সংস্কৃত অলঙ্কারের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শ্রেণীভাগ পরিহার করে সহজ স্পষ্টতর শ্রেণী বিভাগের প্রয়োজন রয়েছে।

পদাবলীর ছন্দ প্রসঙ্গ

অলঙ্কারের ন্যায় ছন্দেব দিক থেকেও পদাবলী সাহিত্য বিশেষ ঐশ্বর্যসম্পন্ন। সমগ্র মধ্যযুগে এবং সম্ভবতঃ রবীন্দ্রপূর্ব আধুনিক যুগেও ছন্দের এতটা ঐশ্বর্য বাংলা সাহিত্যে আব কথনো দেখা যায়নি। মাত্রাবৃত্ত (বা কলাবৃত্ত) অক্ষরবৃত্ত (বা মিশ্র কলাবৃত্ত) এবং স্বরবৃত্ত (বা দলবৃত্ত)—বাংলা ছন্দ প্রকৃতিব মুখ্য তিনটি শ্রেণীভাগের নিদর্শনই বৈষ্ণব পদাবলীতে মেলে। তাব মধ্যে চৈতন্য পূর্ব দুই শ্রেষ্ঠ কবি বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাস যথাক্রমে মাত্রাবৃত্ত এবং অক্ষরবৃত্তের মুখ্য দুটি ধাবা পদাবলীগানে আমদানী কবেছেন। স্বরবৃত্তের একটি প্রাচীনরূপ বিদ্যাপতির পদাবলীতে পাওয়া গেলেও এব প্রাকৃত বা দেশজ রূপটি সপ্তদশ শতকের শেষে লোচনদাস প্রবর্তন কবেছেন।

পদাবলীতে মাত্রাবৃত্তের যতিবিভাগ এবং ছন্দোবন্ধের আদর্শ বিদ্যাপতি সম্ভবতঃ জয়দেবেব গীতগোবিন্দ থেকেই পেয়েছিলেন। উচ্চারণে কিছুটা পরিবর্তন অবশ্য এনেছিলেন তিনি। সংস্কৃত উচ্চারণে রুদ্ধদল (clossed syllable) যেমন গুরু দ্বিকলা (double time unit) রূপে উচ্চারিত হয়,—তেমনি আ, ঈ, উ, এ,ও—এই মুক্তদল (open syllable) গুলিও গুরু দ্বিকল

হিসাবে উচ্চারিত হয়। এই উচ্চারণরীতি প্রাকৃতেও ছিল, জয়দেব গীতগোবিন্দেও রেখেছেন। তবে অন্য সংস্কৃত ছন্দোবন্ধ থেকে জয়দেব কিছু নূতনত্ব আনলেন। তিনি সমমাত্রায় (চার, পাঁচ, ছয়, সাত) যতি দিলেন এবং যতিসূচনায় সাধারণত গুরুদল বিন্যাস করে, বাংলা বাক্‌রীতির পক্ষে স্বাভাবিক, যতি সূচনায় ঝোঁক (initial stress) প্রয়োগ করলেন। বিদ্যাপতিও জয়দেবী আদর্শে সমমাত্রার যতিভাগ (pause section) এবং যতি সূচনায় গুরুদল বিন্যাসে প্রাধান্য দিয়েছেন। তবে গুরু মুক্তদলকে দেশজ ভাষায় লঘু উচ্চারণের প্রভাবে কোথাও কোথাও লঘু হিসাবে ব্যবহার করেছেন। এখানে পাশাপাশি জয়দেবী মাত্রাবৃত্ত রূপাদর্শ (pattern) এবং ব্রজবুলি গানের অনুরূপ ছন্দোবন্ধের কয়েকটি দৃষ্টান্ত তোলা যেতে পারে। লঘু এককলা উচ্চারণের দলের উপর চিহ্ন দেওয়া হল না, গুরু দ্বিকলা দলের উপর— চিহ্ন দেওয়া হল। শব্দের পাশে যতিসূচক | দণ্ড চিহ্ন দেওয়া হল।

মাত্রাবৃত্ত

চতুর্মাত্রাভাগের ষোল মাত্রার পাদাকুলক জাতীয় ছন্দবন্ধে জয়দেব লিখলেন,—

চতুর্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত

স্তন বিনি। হিতমপি। হারম্। দারম্। ৪।৪।৪।৪ মাত্রাভাগ
সা মনু। তে কৃশ। তনুরিব। ভারম্ ॥
... ...

সরসম। সৃণমপি। মলয়জ। পঙ্কম্।
পশ্যতি। বিষমিব। বপুষি স। শঙ্কম্ ॥ [গীতগোবিন্দ ৯ গীত]

এই আদর্শেই বিদ্যাপতি লিখলেন,—

চির চন্দন উরে হারন দেলা।
সো অব নদীগিরি আঁতর ভেলা ॥
পিয়াক গরবে হাম কাহুক ন গনলা।
সো পিয়া বিনা মোহে কেকিনা কহলা ॥ [বিদ্যাপতি ১২১]

এই ষোলমাত্রার পাদাকুলকে পংক্তিকপ্রান্তিক এক বা দুই মাত্রা কমে গিয়ে অনেক গানে পনের বা চোদ্দ মাত্রায় রূপান্তরিত হয়েছে। চোদ্দ মাত্রার পয়ার আসলে ষোলমাত্রার পাদাকুলকেরই রূপান্তর।

জয়দেব ৮।৮।১২ মাত্রার দীর্ঘ ত্রিপদী লিখেছিলেন,—

রতিসুখসারে। গতমভিসারে। মদনমনোহর বেশম্।

ন কুরু নিতম্বিনি। গমনবিলম্বন। মনুসরতং হৃদয়েশম্।।

[গীতগোবিন্দ ১১]

বিদ্যাপতি এই আদর্শে লিখছেন,—

অম্বর বিঘটু অ। কামিক কামিনি। করে কুচঝাপু সুছন্দা

কনক সম্ভু সম। অনুপম সুন্দর। দুই পঙ্কজ দস চন্দা।।

[বিদ্যাপতি, ৩৭]

জয়দেব সপ্তমাত্রিক যতিভাগে লিখলেন,—

মামিয়ং চলি। তা বিলোক্য বৃ। তং বধূনিচ। য়েন।

সপ্তমাত্রিক মাত্রাবৃত্ত

৭।৭।৭।৩

সাপ রাধত। ময়াপিন। বারিতাভিভ। য়েন।।

[গীতগোবিন্দ : ৭]

এখানে অবশ্য প্রত্যেক পংক্তির লঘু-গুরু দলবিন্যাস-ক্রম (sequence of the short-long syllables) সুনির্দিষ্ট। বিদ্যাপতি সুনির্দিষ্ট দলবিন্যাস-ক্রম না রেখেই লিখলেন,—

জোরি ভুজযুগ। মোরি বেঢ়ল। ততহি নয়ন সু। ছন্দ। ৭।৭।৭।৩

দামচম্পকে। কাম পূ জল। যৈসে শারদ। চন্দ।।

[বিদ্যাপতি, ৬২২]

স্বীকার করতে হয়, বাংলা ভাষার পক্ষে বিদ্যাপতির এই পরিবর্তিত সপ্তমাত্রিক মাত্রাবৃত্তই বেশী উপযোগী। গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির আদর্শে এর পর লিখলেন,—

নন্দ নন্দন। চন্দ চন্দন। গন্ধ-নিন্দিত। অঙ্গ।

জলদ সুন্দর। কম্বু-কন্ধর। নিন্দি সিন্ধুর। ভঙ্গ।।

[গোবিন্দদাস, ১৬১]

মাত্রাবৃত্তের পঞ্চমাত্রিক যতিভাগের ছন্দ জয়দেবের তিনটি বিখ্যাত গানে (গীতগোবিন্দ, ১৩, ১৯, ২১ গীতি) ব্যবহৃত হয়েছে। পঞ্চমাত্রা-পর্বিক একটি পদ (১১১ নং) বিদ্যাপতি ভণিতায় পাওয়া গেলেও সন্দেহ হয়, অষ্টাদশ শতকে শশিশেখরের পূর্বে এই ছন্দোবন্ধ বৈষ্ণব পদগীতিতে প্রবর্তিত হয়েছিল কিনা। বিদ্যাপতি-ভণিতায় দ্বিতীয় কোনও পঞ্চমাত্রা-পর্বিক পদ মেলেনি, বা তাঁর সুযোগ্য শিষ্য গোবিন্দদাসও পঞ্চমাত্রা-পর্বের কোনও ছন্দোবন্ধ ব্যবহার করেননি। প্রথম শশিশেখরই গীতগোবিন্দ থেকে এই ছন্দোবন্ধ বৈষ্ণব পদাবলীতে তুলে নিয়েছিলেন মনে হয়।

পঞ্চমাত্রিক মাত্রাবৃত্ত

জয়দেব পঞ্চমাত্রার স্পন্দন রেখে, ১০।১০।১৪ মাত্রাভাগে লিখলেন,—

স্থলকমল গঞ্জনং। মমহৃদয় রঞ্জনং। জনিত-রতি-রঙ্গ-পরভাগম্।

ভবমসৃণ বাণি-কর বাণ-চর ণদ্বয়ং। সরসবস দদলক্তকরাগম্ ॥

স্মরগরল খণ্ডনং। মম শিরসি মণ্ডনম্। দেহিপদ পল্লবমুদারম্।

জ্বলতি ময়ি দারুণো। মদনকদনানলো। হরতুতদুপাহিতবিকারম্

[গীতগোবিন্দ, ১৯]

শশিশেখর একই যতিভাগে লিখলেন,—

শিতলতছু অঙ্গদেখি। সঙ্গসুখ লালসে। খোয়লু কুল ধরমগুণনাশে

সোই যদি তেজল কি। কাজ ইহজীবনে। আনহ সখি গরলকরি গ্রাসে ॥

প্রাণ সঙে অধিক তুহুঁ। বোয়সিবে কাহে সখি। মরিলে হাস করিহ ইহ কাজে

অনলে নহি দাহবিরে। নীরে নহি ডারহি। এ তনু ধরি রাখবি ব্রজমাঝে ॥

[বৈ. প. সংসদ: শশি, ২৭]

ছয়মাত্রার স্পন্দন স্পষ্টভাবে না হলেও জয়দেবের একটি গানে রয়েছে। বিদ্যাপতির পদগীতিতে এ ছন্দের ব্যবহার কম থাকলেও তাঁর শিষ্যগণ ষণ্মাত্র-পর্বিক মাত্রাবৃত্তের যথেষ্টই ব্যবহার করেছেন।

ষণ্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত

জয়দেব যথাক্রমে ৬,৫ | ৬,৩ এবং ৬,৪ | ৬,৫ মাত্রাভাগে লিখলেন,—

ধ্বনতি মধুপ সমূহে | শ্রবণমপিদধাতি। ৬,৫ | ৬,৩ মাত্রাভাগ

মনসি বলিত বিরহে | নিশি নিশি রুজ মুপযাতি॥ ৬,৪ | ৬,৫

বসতি বিপিনবিতানে | ত্যজতি ললিতধাম।

লুঠতি ধবণি শয়নে | বহু বিলপতি তব নাম॥

এখানে লঘু-গুরু দলবিন্যাস-ক্রম সুনির্দিষ্ট। মূল ছয় মাত্রার পর্বের সঙ্গে তিন, চার, পাঁচ মাত্রার অপূর্ণ পর্ব এসেছে।

বিদ্যাপতি-ভণিতার একটি দৃষ্টান্ত তুলি,—

কাঠ কঠিন | কয়ল মোদক | উপরে মাখল | গুড়। ৬।৬।৬।৩ মাত্রাভাগ

কনক কলস | বিখে পূরল | উপর দুধক | পূর॥

কানু সে সুজন | হম দুবজন | তকর বচনে | যাব।

হৃদয় মুখে | এক সমতুল | কোটিকে গোটেক | পাব॥

[ন. গু. বিদ্যাপতি, ৪২৭]

পদটি মৈথিল বিদ্যাপতি রচিত কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।

গোবিন্দদাসের একটি ষন্মাত্র-পর্বিক চৌপদী (১২।১২।১২।১০) উদ্ধৃত করি।—

বিপিনে মিলল গোপ নারি | ৬,৬। মাত্রাভাগ

হেরি হসত মুরলি ধারি | ৬,৬।

নিরখি নয়ন পুছত বাত | ৬,৬।

প্রেম সিন্ধু গাহনি | ৬,৩ I

পুছত সবক গমন-খেম |

কহত কীয়ে করব প্রেম।

ব্রজক সবহুঁ কুশল বাত।

কাহে কুটিল চাহনি॥ [গোবিন্দদাস, ৫৫৬]

জগদানন্দের বিখ্যাত 'মঞ্জু বিকচ কুসুম পুঞ্জ' পদটিও এই ছন্দরীতিতে রচিত।

মাত্রাবৃত্তে পাদাকুলক বা পয়ার জাতীয় দ্বিপদী, লঘু এবং দীর্ঘ ত্রিপদী, চৌপদী এবং একাবলী জাতীয় ছন্দোবন্ধের ব্যবহার বেশী লক্ষিত হয়। প্রাচীন পদাবলী গানের মাত্রাবৃত্তের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত আধুনিক মাত্রাবৃত্তের মৌলিক পার্থক্য হল, মুক্ত গুরুদলের ব্যবহারে। উভয় রীতিতেই মুক্ত লঘুদল এক কলামাত্রার এবং রুদ্ধ দল দুই কলামাত্রার গুরুত্ব পায়। তবে পদাবলীর মাত্রাবৃত্তে মুক্ত গুরুদল (আ, ঈ, ঊ, এ, ও) সর্বত্র না হলেও, প্রয়োজনে গুরু দ্বিকলা উচ্চারণে ব্যবহৃত হয়, আধুনিক মাত্রাবৃত্তে এই গুরুদল গুলি সর্বত্রই লঘু এককলার মর্যাদা পেয়েছে। যতিভাগ উভয় ক্ষেত্রেই প্রায় এক রীতির।

পদাবলীর মাত্রাবৃত্ত ও আধুনিক মাত্রাবৃত্তে পার্থক্য

আধুনিক অক্ষরবৃত্তের স্বাভাবিক উচ্চারণ রীতি হল: রুদ্ধদল শব্দ-প্রান্তে দ্বিকলা, অন্যত্র মুক্তদলের ন্যায় এককলা, মুক্তদল সর্বত্রই এককল যতিভাগ সাধারণতঃ জোড় মাত্রিক, আট দশ বা ছয় মাত্রার বিন্যাসই বেশী। প্রাচীন মাত্রাবৃত্তে এই উচ্চারণরীতি এত সুনির্দিষ্ট না হলেও, সাধারণভাবে বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা দিয়েছিল। সঙ্গীতাশ্রয়ী অপেক্ষাকৃত অপরিণত রচনায় উচ্চারণগত শৈথিল্য-নিদর্শন যথেষ্টই লক্ষিত হয়।

অক্ষরবৃত্ত

চৈতন্য-পূর্ব যুগে চণ্ডীদাসের পদাবলীতে এবং বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পালাগানে অক্ষরবৃত্তের প্রাথমিক রূপটি লক্ষিত হয়। চণ্ডীদাসের পদগীতিগুলির ভাষা ও ছন্দ বহুল প্রচারের ফলেই লোকের মুখে মুখে ক্রমান্বয়ে আধুনিক হয়ে উঠেছে, সে তুলনায় লোকচক্ষুর আড়ালে রক্ষিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা ও ছন্দে অনেকটা অবিকৃত প্রাচীন রূপটি পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দ-প্রসঙ্গে এ গ্রন্থের 'পরিশিষ্ট ক' দ্রষ্টব্য। এখানে ড. বিমানবিহারী মজুমদারের গ্রন্থে ধৃতপাঠ অবলম্বনে চণ্ডীদাসের এবং চৈতন্য-পরবর্তী যুগের কবিদের দু-একটি উদাহরণ তোলা যেতে পারে। এখানে রুদ্ধদল দ্বিমাত্রিকে ⌴ চিহ্ন দেওয়া হল।

রুদ্ধদলের উপর—চিহ্নে একমাত্রিক ধরতে হবে। মুক্তদলে কোনও চিহ্ন দেওয়া হল না।

৮।৬ মাত্রাভাগের পয়ার :

তোমারে বুঝাই বন্ধু | তোমারে বুঝাই।
ডাকিয়া সোধায় মোরে | হেন জন নাই॥
অনুখন গৃহে মোর | গঞ্জয়ে সকলে।
নিশ্চয় জানিহ মুঞি | ভখিমু গরলে॥
এ ছার পরাণে আর | কিবা আছে সুখ।
মোর আগে দাঁড়াও তোমার | দেখি চাঁদ মুখ॥

[চণ্ডীদাস, ৪৯]

এখানে অক্ষরবৃত্তের স্বাভাবিক উচ্চারণরীতি সর্বত্রই রক্ষিত হয়েছে। কেবলমাত্র শেষ পংক্তিতে 'দাড়াও' 'তোমার' শব্দদুটির প্রান্তিক রুদ্ধদল সংশ্লিষ্ট একমাত্রিক হিসাবে উচ্চারিত হয়েছে। এতটা সংশ্লিষ্টতা অক্ষরবৃত্তের স্বাভাবিক উচ্চারণ-বিরোধী।

চণ্ডীদাসের পদগীতির একটি পরিচিত গঠনভঙ্গি হল, সূচনায় অতিপর্বসহ একটি একপদার সঙ্গে একটি ত্রিপদী পংক্তির বিন্যাস। যেমন,—

সই) কি আর বলিব তোরে।	২) ৮ I মাত্রাভাগ
কোন্ পুণ্যফলে সে হেন বঁধুয়া	৬। ৬।
আসিয়া মিলল মোরে॥	৮ I

[চণ্ডীদাস, ৪৫]

এরই দীর্ঘতর রূপ,—

সজনি) কি হেরিনু যমুনার কূলে।	৩) ১০ I
ব্রজকুল-নন্দন হরল আমার মন	৮। ৮।
ত্রিভঙ্গ দাঁড়াঞা তরুমূলে॥...	১০ I

এরপর আবার স্বাভাবিক দীর্ঘ-ত্রিপদী বন্ধে লিখছেন,—

মল্লিকা চম্পক দামে চূড়ার টালনি বামে
তাহে শোভে ময়ূরের পাখে।
আশে পাশে ধাঞা ধাঞা সুন্দর সৌরভ পাঞা
অলি উড়ি পরে লাখে লাখে ।। [চণ্ডীদাস, ১২৫]

একমাত্র দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের 'নন্দন' শব্দ মাত্রাবৃত্ত ভঙ্গিতে বিশ্লিষ্ট চারমাত্রায় উচ্চারিত হয়েছে, তাছাড়া দুটি উদ্ধৃতির কোথাও ছন্দ-শৈথিল্য নেই।

অক্ষরবৃত্তের পয়ার এবং ত্রিপদী পরবর্তী বৈষ্ণব কবিরাও এই একই ভঙ্গিতে বহুলভাবে ব্যবহার করেছেন। জ্ঞানদাস এবং তৎপরবর্তী কবিরা আট-দশ মাত্রার একপদী বা এগার/বারো মাত্রার একাবলীও বেশ ব্যবহার করেছেন। একটি আটমাত্রার একপদীর উদাহরণ দিই।—

সোনার বরণ দেহ।
পাণ্ডুর ভৈ গেল সেহ ।।
গলয়ে সঘনে লোর।
মুরছে সখিক কোর ।। [জ্ঞানদাস, ৪৪৩]

চতুর্দল-মাত্রা স্পন্দনের (four syllabic rhythmic) পরিচিত ছড়ারছন্দ বা স্বরবৃত্ত লোচনদাসের পূর্বে পদাবলীগানে দেখা দেয়নি। তবে বিদ্যাপতির ব্রজবুলি গানে এক ধরণের পদ পাওয়া যাচ্ছে যেগুলি দল-মাত্রার ভিত্তিতে রচিত। যেমন,—

স্বরবৃত্ত প্রাকৃতরূপ

পহিলি পিরীতি। পরাণ আঁতর। ৬।৬। দলমাত্রাভাগ
তখনে অইসন। রীতি। I ৮ I
সে আবে কন্হু। হেরি ন হেরথি।
ভেলি নিম সনি তীতি ।।I
সাজনি) জিবথু সএ পচাস।
সহসে রমণি। রয়নি খেপথু।
মোরাহু তহিক আস ।। [বিদ্যাপতি, ১৬১]

এটি লঘু ত্রিপদী, এমনকি চণ্ডীদাসের মত অতিপর্বিক একপদী পংক্তিও এনেছেন, তবে সবই দল-মাত্রার হিসাবে।

বিজোড় মাত্রিক ৯.৭ দলবিন্যাসের আর একটি চমৎকার উদাহরণ তুলি।—

নমিত অলকে বেঢ়লা।
মুখকমল সোভে। I
রাহু ক বাহু পসরলা।
সসিমণ্ডল লোভে॥ I
... ...
কলস কুচ লোটাইলী I
ঘন সামরি .বনী ।I
কনয় পবয় স্তলী।
জনি কাবি নাগিনী॥ I [বিদ্যাপতি, ১৬৮]

আচার্য পিঙ্গলের ভাষায় এ ছন্দকে একজাতীয় বর্ণবৃত্ত (দলবৃত্ত) বলা যেতে পারে।

দেশজ যে বাক্‌রীতি (সংশ্লিষ্ট উচ্চারণের রুদ্ধদল-প্রধান) কবিগান, ছড়া, লোকগীতি, রামপ্রসাদী গান ইত্যাদিতে চতুর্দল-মাত্রা স্পন্দনের স্বরবৃত্তের রূপ নিয়েছে, পদাবলী গানে লোচন দাস তার প্রবর্তক। ষষ্ঠ অধ্যায়ে উদ্ধৃত তাঁর গীতিপদগুলি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এখানে আর একটি পদ উদ্ধৃত করি।—

হাস্যা হাস্যা। আস্যা প্রভু। দাঁড়াইত। না ছে।
সেই অভি। লাষে ওগো। থাকৃতাম গৃহ। মাঝে॥
যে দিন হৈতে। বেণু নিলে। ননদ। ব। ডালী।
সেই দিন হৈতে। নন্দের পোয়ে। আইসে নাকো। বাড়ী॥
[বৈ. প. সংসদ : লোচন, ৫৭]

পুরোনো স্বরবৃত্তে প্রতি পর্বভাগে দলবিন্যাস সুনির্দিষ্ট চতুঃসংখ্যক নয়। মাত্রাবৃত্ত, অক্ষরবৃত্তের মতো এখানেও শৈথিল্য রয়েছে। ঊনবিংশ শতকে এসে এ ছন্দ আধুনিক চতুর্দল পর্বের সুনির্দিষ্টতা লাভ করেছে।

পদাবলীর মিলের ঐশ্বর্যও পাঠকের শ্রুতিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। পংক্তিমিল ছাড়া, পদান্ত. পর্বান্ত, এমন কি শব্দে শব্দেও মিল বিন্যাস করেছেন কবিগণ। গ্রন্থ কলেবরের প্রতি দৃষ্টি রেখে সে দৃষ্টান্ত আর উদ্ধৃত করা সম্ভব হল না। কৌতূহলী পাঠক বিদ্যাপতি গোবিন্দদাস, জগদানন্দ, নসিরমামুদ প্রভৃতির পদগীতি পড়তে গেলে এমন চমৎকারী অসংখ্য মিলের নিদর্শন পাবেন।

পদাবলীর গঠনভঙ্গি বিষয়ক সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানেই শেষ করা গেল। বস্তুতঃ পদাবলীর গঠন বৈচিত্র্য এত ঐশ্বর্যময় যে বিষয়ে পৃথক একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা গ্রন্থের প্রকাশ বাঞ্ছনীয়।

পরিশিষ্ট (ক)

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রসঙ্গ

। ১৩১৬ বঙ্গাব্দে বনবিষ্ণুপুরের কাছে কাঁকিল্যা গ্রামে শ্রীনিবাস আচার্যের দৌহিত্র বংশের দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের গৃহে বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার পালাগানের একটি পুথির সন্ধান পান। ১৩১৮ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের জন্য পুথিটি সংগৃহীত হয়। সাহিত্য পরিষদ থেকেই বসন্তরঞ্জনের সুসম্পাদনায় পুথিটি ১৩২৩ বঙ্গাব্দে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামে প্রকাশিত হয়। মুখবন্ধ লেখেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, পুথির লিপিকাল বিষয়ে নিবন্ধ লেখেন প্রখ্যাত লিপিবিশারদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। বসন্তরঞ্জন নিজেও একটি দীর্ঘ ভূমিকায় গ্রন্থটির বহুবিধ তথ্য আলোচনা করেছেন। বইটির প্রথম পৃষ্ঠাটি নেই। মাঝে মাঝে যে সব পৃষ্ঠা হারিয়েছে তার সংখ্যা ৪৩। বইটির মোট পাতা ছিল ২২৬, তুভঁ৷জ তুলোট কাগজের উভয় পৃষ্ঠায় লেখা। শেষদিকেও পুথিটি খণ্ডিত।[১] পুথিতে তিন হাতের লেখা রয়েছে। তৃতীয় অপেক্ষাকৃত আধুনিক হস্তাক্ষর মাত্র দুটি পাতায় (২, ১১৫) মিলছে, বোধ হয় নষ্ট হয়ে যাওয়াতে পরবর্তী যোজনা হয়ে থাকবে। দ্বিতীয় লিপিতে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন প্রথম লিপিরই অনুকরণ করা হয়েছে। বইটি সম্ভবতঃ বিষ্ণুপুর রাজার সম্পত্তি ছিল কোনও সময়ে। পুথির কোথাও কবিপরিচয় লিপিকারকের নাম বা লিপিকাল,—,—এমনকি গ্রন্থটির নামোল্লেখও নেই।

গ্রন্থ আবিষ্কার

বসন্তরঞ্জন গ্রন্থটির শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নাম ছিল এমন অনুমানের স্বপক্ষে মন্তব্য করেন, 'কথিত হয়, চণ্ডীদাস কৃষ্ণকীর্তন কাব্য রচনা করেন। খেতরীর এক বার্ষিক উৎসবে চণ্ডীদাসের কৃষ্ণলীলা গীত হইয়াছিল, অবশ্য কীর্তনাঙ্গে। আলোচ্য পুথির প্রতিপাদ্য যে শ্রীকৃষ্ণের লীলাকীর্তন তাহাতে তর্কের অবসর নাই। অতএব গ্রন্থের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামকরণ

গ্রন্থের নামপ্রসঙ্গ

১। পৃ ৩-৮, ১০-১৫, ১৭।২-১৮, ১৯।২-৪০, ৪২-৮৮।১, ৮৯-৯৩।১, ৯৪-৯৭ ৯৮।২-১০৩, ১১২-১৪৪, ১৫২-২২৬ পৃষ্ঠা রয়েছে।

পুথিটি অসম্পূর্ণ অবস্থায় খণ্ডিত অথচ শেষে কিছু শাদা পাতা রয়েছে। কেউ নকল করতে করতে অসম্পূর্ণ রেখেছিলেন কি ?

অসমীচীন নয়।' [শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, ৭সং পৃ. ||৵] কথিত হয় অর্থে, ইতিপূর্বে ব্রজসুন্দর সান্যাল চণ্ডীদাস চরিতে (১৩১১), ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য 'বিদ্যাপতি' গ্রন্থে (১৩০১) এবং জগবন্ধু ভদ্র 'মহাজন পদাবলী'তে (১২৮০) এরূপ একটি পালাগানের উল্লেখ করেছেন। সনাতন গোস্বামীও 'শ্রীচণ্ডীদাসাদিদর্শিত দানখণ্ড নৌকাখণ্ডাদি প্রকারশ্চ' এর উল্লেখ করে জয়দেবের গীতগোবিন্দের সঙ্গে তুল্যমূল্য হিসাবে গণ্য করেছেন (বৃ. বৈষ্ণব তোষিণী ১০।৩৩।২৬)। পুঁথিতে দশটি খণ্ড বা অধ্যায় পালা (জন্ম, তাম্বুল, দান, নৌকা, ভার ছত্রসহ, বৃন্দাবন, যমুনা: কালীয় ও হার-সহ, বাণ, বংশী ও বিরহ) থাকলেও বেশী গুরুত্ব পেয়েছে দান, নৌকা, বংশী এবং বিরহের পালা চতুষ্টয়। এই গুরুত্ব বিচারে বোধহয় সম্পাদক গ্রন্থের এরূপ নামকরণ করেছেন এবং পণ্ডিতেরা মোটামুটি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নাম মেনে নিয়েছেন। অবশ্য পুথির মধ্যে প্রাপ্ত একটি রসিদে লেখা রয়েছে, শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চানন নামক এক ব্যক্তি ১০৮৯ সালে (১৬৮২ খৃ ?) শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের ষোলটি পাত' মহারাজের কাছ থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন, এতে ড. বিমানবিহারী ভট্টাচার্য প্রমুখ কোনও কোনও গবেষক সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে গ্রন্থটির নাম হয়তো 'শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ' ছিল।

গ্রন্থকার বড়ু চণ্ডীদাস চৈতন্য-পূর্ব পদাবলী গানের কবি চণ্ডীদাস থেকে পৃথক ব্যক্তি না একই ব্যক্তি এ বিষয়েও গবেষকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। বসন্তরঞ্জন পদাবলীর এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবিকে এক ব্যক্তি মনে করেন। ড. শহীদুল্লাহ পদাবলীর দুই চণ্ডীদাস (দ্বিজ ও দীন)

লেখক প্রসঙ্গ

১। প্রাপ্ত রসিদের অনুলিপি :

প্রাপ্ত রসিদ

শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ব্বের ৯৫ পচানই পত্র হইতে একশত দশ পত্র পর্য্যন্ত
একুনে ১৬ শোলপত্র শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চাননে শ্রীশ্রী মহারাজার
হুজুরকে লইয়া গেলেন পুনশ্চ আনিয়া দিবেন—

সন ১০৮৯
তাং—২৬ আশ্বিন

সন ১০৮৯
তাং ২১ অগ্রহায়ণে—
শ্রীকৃষ্ণপঞ্চানন 'কৃষ্ণসন্দর্ব্ব'
১৬ পত্র দাখিল হইল

স্বীকার করে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বড়ু চণ্ডীদাসকে তৃতীয় ব্যক্তি মনে করেন। অধ্যাপক মনীন্দ্রমোহন বসু এবং ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় চৈতন্য-পূর্ব কবি বড়ু চণ্ডীদাস এবং দ্বিতীয় একজন চৈতন্য পরবর্তী পদাবলীর কবি চণ্ডীদাস (দীন বা দ্বিজ)-কে মানেন। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রস আস্বাদন করতেন বলেই অধ্যাপক বসুর ধারণা। ড. সুকুমার সেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের চণ্ডীদাস ব্যতীত দ্বিতীয় কোনও উল্লেখ-যোগ্য কবি চণ্ডীদাসের অস্তিত্বেই সন্দিহান। ড. বিমানবিহারী মজুমদার মনে করেন, চণ্ডীদাস এক, দুই বা তিন নহেন,—আরও বেশী সংখ্যক। 'বড়ু' বিশেষণেই ধরা যায়, তাঁর পূর্বেই কোনও খ্যাতনামা চণ্ডীদাস ছিলেন,—সে কারণেই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের চণ্ডীদাস 'বড়ু' হয়েছেন।—ইনি সম্ভবতঃ চৈতন্য-সমসাময়িক ছিলেন, তবে মহাপ্রভু এরূপ বিকৃত রুচির কাব্য রসাস্বাদন করতেন তা কখনো সম্ভবপর নয়। দীনেশচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রুচিবিকারে ক্ষুব্ধ হলেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি ও পদাবলীর খ্যাতনামা চণ্ডীদাসকে এক অভিন্ন বলেই ধরেছেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীও এই মতের সমর্থক। এমন আরও মতামত রয়েছে। তবে আরও নতুন তথ্য-প্রমাণ হাতে না আসা পর্যন্ত চণ্ডীদাস-সমস্যার সম্পূর্ণ মীমাংসা সম্ভবপর নহে। চৈতন্য-পূর্ব পদাবলীগানের কোনও চণ্ডীদাসকে স্বীকার করতে হলে ড. শহীদুল্লাহ-র মতানুযায়ী চৈতন্য-পূর্বযুগের বড়ু (শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের) ও দ্বিজ (পদাবলী গানের) এবং চৈতন্য পরবর্তী দীন (পদাবলী গানের),—এই তিনজন চণ্ডীদাসকে স্বীকার করতেই হয়। পদাবলীর আলোচনা-প্রসঙ্গে চতুর্থ অধ্যায়ে দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদাবলীর আলোচনা করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পালাগানের বড়ু চণ্ডীদাস সম্পর্কে এখানে পরিশিষ্টে সংক্ষেপে আলোচনা করা গেল। দীন চণ্ডীদাসের পদাবলীর পৃথক আলোচনা গ্রন্থ-পরিসরের প্রতি দৃষ্টি রেখে পরিহার করা হল। বস্তুতঃ জ্ঞানদাস গোবিন্দদাসের পাশে তিনি স্থান লাভের অধিকারী নন। তাছাড়া মনীন্দ্রমোহন বসু সম্পাদিত 'দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী' নামক সুবৃহৎ গ্রন্থটিতে ধৃত বিপুল সংখ্যক পদ এক চণ্ডীদাসের রচনা কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়ে গেছে।

গ্রন্থের রচনাকাল বিষয়ে অধিকাংশ ভাষাতাত্ত্বিক একমত হয়েছেন যে চতুর্দশ থেকে ষোড়শ শতকের মধ্যে কোনও সময়ে এ-গ্রন্থ রচিত হয়ে থাকবে।

রচনাকাল

সুনীতিকুমার তাঁর ODBL গ্রন্থে আদি-মধ্যযুগের বাংলা ভাষার একমাত্র নিদর্শন হিসাবে এ গ্রন্থের ভাষা নিয়ে বিশদ

আলোচনা করেছেন, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এ-গ্রন্থের ভাষার প্রাচীনতা বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করলেও (ব. সা. প, প, ১৩২৬ দ্র) সতীশচন্দ্র রায়, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, ড. শহীদুল্লাহ্ প্রভৃতি ভাষা-বিশেষজ্ঞগণ বিশদ বিশ্লেষণে প্রতিপন্ন করেছেন, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা আদি-মধ্যযুগের ভাষা। বসন্তরঞ্জন নিজেও ভাষাগত মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে গ্রন্থের ভূমিকায় আলোচনা করেছেন।

গ্রন্থের লিপিকাল নিয়ে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, ড. শহীদুল্লাহ্, বসন্তরঞ্জন প্রমুখ পণ্ডিতেরা আলোচনায় প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন, এ-লিপি চতুর্দশ শতকের থেকে ষোড়শ শতকের মধ্যেকার।

এ লিপিকাল

ড. সুকুমার সেন অবশ্য মনে করেন, পুথিটি খুবই অর্বাচীন কালে, এমনকি অষ্টাদশ শতকে লিখিত হওয়াও কিছু আশ্চর্য নয়। কিন্তু গ্রন্থ মধ্যে যে ক্ষুদ্র লিপিটি পাওয়া গেছে তার তারিখ সপ্তদশ শতকের। অন্তত: সেই তারিখের এদিকে লিপিকাল এগিয়ে আনা মুস্কিল। ড. সেন গ্রন্থের কাগজ রাসনায়িক পরীক্ষার যে প্রস্তাব করেছেন সেটি খুবই যুক্তপূর্ণ। তাতেই কাল বিষয়ক সন্দেহের অনেকটা নিরসন হতে পারে। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, পুথিতে তিন হাতের লেখা রয়েছে। একটি প্রাচীন, একটি প্রাচীন লিপির অনুকরণ,

---

১। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা সম্পর্কে সুনীতিকুমারের প্রসঙ্গিক মন্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে।—

The next great landmark in the study of Bengali, after the Caryas, is the 'Sri Krsna Kirttan' of Candidasa. This work, from point of view of language, is of unique character in MB literature......There is no Middle Bengali work dating from before 1500 which preserved in a contemporary MS, except one, and that is the SKK. The MS, from the style of script it employs, according to expert openion, belongs to the latter half of the 14 th century. It gives us the genuine West Bengali as used in literary composition in the middle of that century. The genuineness of the work is born out by the remarkably archaic character of the forms, which agree with such widely distant dialects as North Bengali and Assamese; and some of its expressions are found in Early Middle Bengali stage, and its importance in the study of Bengali, in the absence of other genuine texts is as great as that of the works of Layamon, Orm and Chaucer in English.

[Origin and Development of the Bengali Language, Pt 1. 1926, Pp. 127-129]

তৃতীয়টি অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের। গবেষকদের সুবিধার্থে গ্রন্থটির একটি ফটোমুদ্রণ সংস্করণের (Facsimilie edition) আশু প্রকাশ বাঞ্ছনীয়।

গ্রন্থের কাহিনী-বিন্যাসেও প্রাচীনতাব সাক্ষ্য রয়েছে। দশটি খণ্ডে সমগ্র কাহিনী বিন্যস্ত। জন্মখণ্ডে ভাগবত (দশম স্কন্দ) এবং বিষ্ণুপুরাণ অনুসরণে কৃষ্ণের জন্মকথা বর্ণিত হয়েছে। দেবতাবা কংসবধেব ষড়যন্ত্র কবেছেন। নারায়ণ

কাহিনী : জন্মখণ্ড

তাদের ধল কাল দুটি কেশ দিলেন। কংসেব কাবাগারে দৈবকীর অষ্টম গর্ভে কাল কেশে কৃষ্ণের জন্ম হল। পিতা বসুল গোপনে যমুনা পেবিয়ে গোকুলে যশোদার কাছে কৃষ্ণকে রেখে এলেন। বিনিময়ে যশোদাব সদ্যোজাত কন্যাকে এনে দৈবকীর কাছে রাখছেন। কংস তাকে হত্যা কবল, সেই কন্যা দৈববাণী কবে গেল, গোকুলে কংসেব হত্যাকারী বড় হচ্ছেন। এদিকে লক্ষ্মীদেবী রাধা রূপে সাগরের ঘবে পদুমাব গর্ভে জন্ম নিলেন। এ-অংশটি কবির নিজস্ব কল্পনা। নপুংসক আইহনের তিনি বধূ কৃষ্ণেব সঙ্গে তার প্রেমে দৌত্য কবেন বড়াই। আইহনেব মা বাধাব বক্ষণাবেক্ষণেব জন্য বুড়ী বড়াইকে পদুমার ঘব থেকেই চেযে নিয়েছেন। সুতবাং বড়াই হল রাধাব মায়ের পিসী। বাধা তাকে বড়াই (বড় মা) বলে ডাকে।

তাম্বুল খণ্ডে বড়াই কৃষ্ণেব পক্ষ হয়ে বাধাব কাছে পানফুল নিযে প্রেমের

তাম্বুলখণ্ড

দৌত্যে নেমেছেন। উপলক্ষটি কৌতুকপ্রদ। গোপীবা দুধ-দৈ নিয়ে গোকুল থেকে বৃন্দাবনের বনপথ পেরিয়ে মথুরার হাটে যাচ্ছিলেন,—সঙ্গে বড়াই। সে মাঝ পথে রাধাকে হাবিয়ে ফেলল। পথে গোপবালকদের কাছে বাধাব কথা জিজ্ঞেস কবল। গোপবালক কৃষ্ণ বড়াই-এব মুখে রাধার বর্ণনা শুনে বলছেন, 'তার হদিস বলে দিতে পাবি। বিনিময়ে তাকে বুঝিযে আমার কাছে নিয়ে আসতে হবে।' বেশ বোঝা গেল, রাধাকে কৃষ্ণ আগেই ভালভাবে জানেন এবং তার প্রতি আকৃষ্ট রয়েছেন। পানফুল দিয়ে কৃষ্ণ বড়াইকে রাধার কাছে বুঝিয়ে পাঠালেন। দৌত্যের প্রথম প্রতিক্রিয়া কি হ'ল, সে পদধৃত পৃষ্ঠা পুঁথিতে খণ্ডিত। কৃষ্ণের কাছে বড়াই ফিবে এলে কৃষ্ণ পুনর্বার পাঠালেন। রাধা কিঞ্চিৎ কুপিতা, তবে আশ্বাসও দিচ্ছেন,—

> জৈসানে রতি জানিবোঁ।
> তেসানে কাহ্ন আনিবোঁ।
> সুরতী সম্ভোগে সকল রাতী পোহাইবোঁ॥

দেখি তোহ্মাক আজলী।
পরকাজে তোঁ বিকলী।
তেসি না বুঝসি আহ্মে বালী ॥ [তাম্বুল, ১৪]

'যখন রতিরস বুঝতে শিখব তখন কানুকে এনে সুরতি-সম্ভোগে সকল রাত কাটাব। তুমি ন্যাকার মত অন্যের কাজে বিকল (বুদ্ধিহীনা) হয়েছ। তাই বুঝছনা, আমি বালিকা মাত্র।'

এতেও অবুঝ কৃষ্ণ তৃতীয়বার বড়াইকে রাধার কাছে পাঠালেন। বড়াই গিয়ে কৃষ্ণের স্বপ্নকথা (রাধা কৃষ্ণের শিয়রে বসে প্রেম-পরিহাস করছেন) রাধাকে বললেন। এবারে শুধু আর তিরস্কার বা বোঝানো নয়, রেগে রাধা বড়াইকে প্রহার করলেন।—

এহা গুআপান তোহ্মে আপনেই খাহা।
আপনাকে চিহ্নিআঁ কাহ্নের থান যাহা ॥
এহা বুলী বড়াইক চড় মাইল রোষে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ [ঐ, ১৮]

'কৃষ্ণ প্রদত্ত পান-সুপুরী তুমিই খাও এবং নিজেকে চিহ্নিত করে কানুর কাছে যাও।—এই বলে রেগে রাধা বড়াইকে চড় মারলেন। বাসলী-বন্দনাসহ চণ্ডীদাস গাইছেন।'

এবারে কানাই এবং তার দূতী বড়াই উভয়েই রাধার ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়ে পরামর্শ আটলেন, রাধাকে ভুলিয়ে মথুরার পথে এনে দানের ছলে তার ক্ষীর ননী সব নষ্ট করবেন, এবং

কাঞ্চুলী কবিয়োঁ চীর
হাথ দিবোঁ তাহার তনে।
তোর আনুমতী লআঁ
বলে রাধাক ধরিআঁ
লআঁ যাইবোঁ মাঝ বৃন্দাবনে ॥
পাছে ত মদন বাণে
হানিআঁ তাক পরাণে
রহিবোঁ ধরি মুনিবেশ। [ঐ, ২২

'কাঁচুলি ছিঁড়ে স্তনে হাত দেবেন, বড়াই-এর অনুমতি নিয়ে বলে রাধাকে মাঝ বৃন্দাবনে ধরে নিয়ে যাবেন। শেষে রাধার প্রাণে মদন বাণ হেনে, মুনিবেশ ধরে কৃষ্ণ দূরে সরে যাবেন।' এখানেই গ্রন্থের পরবর্তী কাহিনীর আভাস দেওয়া হয়েছে।

এর পরই চারটি পদে (২৩-২৬) কাহিনীর পারম্পর্য শিথিল। পদগুলি পরবর্তী প্রক্ষেপ বলেই সন্দেহ হয়।

দানখণ্ডের সূচনায় যমুনাঘাটে কানাই গোপীদের পথ রোধ করলেন। মাঝে

দানখণ্ড

তিনটি পৃষ্ঠা খণ্ডিত। পরের কাহিনী থেকে ধরা যায়, সবাইকে ছেড়ে কৃষ্ণ রাধাকে ঘাট-দানের দাবীর ছলে ধরে রেখেছেন। উভয়ের নানারূপ কথা কাটাকাটি, মাঝখানে বড়াইকে রেখে। রাধা বলছেন,—

আল বড়ায়ি।
এগার বৎসবের বালী।
যেহ্ন নলিনীদল কোঁঅলী ॥ ল ॥
আল বড়ায়ি।
তাক দেখি যার মন জাএ।
নিজ দোষে পরাণ হারাএ ॥ [দান, ৪]

'বড়াই, (আমি) এগার বৎসবের বালিকা, যেন পদ্মের কুঁড়ি। তাকে দেখে যার মন যায়, সে নিজ দোষে প্রাণ হারায়। বড়াই, কানু আমার আলিঙ্গন চায়। স্পর্শ করলে প্রাণত্যাগ করব। সব সখি চলে গেল, পথে আমাকেই আটকাল। পরিহাস ছলে কাঁচুলি ভাঙতে চায়। আমায় 'ধামালী' কথা বলে। তুমি মধুসূদনকে বারণ কর।'

কৃষ্ণ নিজেকে ভগবান বলে পরিচয় দেন, রাধা তাকে আইহন এবং কংসের ভয় দেখান। অনেক বিতর্কের পর রাধা বোধ হয় একটু নরম হলেন। বড়াইকে বলছেন, 'আমি ননীর পুতুলের ন্যায় রোদে গলে যাই। কানুর অনুরোধ কেমন করে পালন করব, প্রাণে ভয় লাগছে।' এর পর আবার উভয়ের বিতর্ক। কানাই রাধা উভয়েই পরদার-গমনের পক্ষে-বিপক্ষে শাস্ত্রবাণী উদ্ধার করছেন। কানাই-এর দু একটি রাধা-স্তুতির পদে কবিত্ব লক্ষণীয়,—

নীল জলদসম কুন্তল ভারা।
বেকত বিজুলি শোভে চম্পকমালা ॥

শিশত শোভএ তোর কামসিন্দুর।
প্রভাত সময়ে যেন উয়ি গেল সুর॥ [দান, ৩৮]

'নীল মেঘের মত তোমার কুন্তলভার। চম্পকমালা তার উপরে যেন বিদ্যুৎ-রেখা। কপোলদেশে কামসিন্দুর শোভিত, যেন প্রভাতী নবীন সূর্য।'

এই সময়ে রাধার বয়স কত? কৃষ্ণ বরাবর বলছেন, বারো। রাধা বলছিলেন, এগারো। কম করেই বলছিলেন। একটি পদে স্বীকার করে ফেলেছেন,—

এ বার বরিষ মোর তের নাহিঁ পূরে।
এহা দেখি রসত মন কর দূরে॥ [দান, ৪০]

'আমার বয়স বারো, তের পূর্ণ হয়নি। এ দেখে মন থেকে রস (আকাঙ্খা) দূর কর।' এই ভাবে কথা কাটাকাটিতে সকাল থেকে বিকাল হয়ে এল। দুধ-দৈ সব নষ্ট হল। মাঝে ৫১-৫২ পদ দুটি পারম্পর্যহীন। আবার ৫৩ পদ থেকে কাহিনী ধারা অব্যাহত। কৃষ্ণ এবারে রাধার ওপর বল প্রয়োগ করতে চান। বুদ্ধিমতী রাধা এবারে সতীত্ব বাঁচাতে সমুচিত দানরূপে অলঙ্কারাদি দিয়ে ছাড়া পেতে উৎসুকা; কৃষ্ণ কিন্তু রতিদান ছাড়া অন্যদানে সম্মত নন। গ্রাম্য কিশোরী চটে বলছেন,—

ষোলশত গোআলিনী জাই এ বিকে হাটে।
মাগুকিলেঁ কিলাআঁ মারিয়েঁা তোহ্মা বাটে॥ [দান, ৫৭]

'(দানের জন্য বল করলে) ষোলশত গোপী যারা হাটে যাই আমাদের 'মাগুকিলে' (মেয়েলী মুষ্টি প্রহারে) তোমায় পথে মেরে ফেলব।' কৃষ্ণও গ্রাম্য কিশোর। জবাব দিচ্ছেন,—

ছাওয়াল না দেখ মোরে মাথে ঘোড়া চুলে।
মুণ্ডেঁ মুণ্ডেঁ ডুসাআঁ মারিবোঁ তোহ্মা হেলে॥ [দান, ৫৭]

'আমায় ছেলে মানুষ ভেব না; মাথার লম্বা চুল দেখ। তোমাদের 'মুণ্ডে মুণ্ডে ঢুসিয়ে' (মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি করে) সহজেই মেরে ফেলব।' গ্রামীণ কবি এখানে গ্রাম-সমাজের নায়ক-নায়িকা রূপে রাধাকৃষ্ণকে উপস্থিত করেছেন।

ঘটনাগতি যেভাবে চলছিল ৬১ নং পদ থেকে (নিতি নিতি রাধা যাসি বিকে) আবার যেন একটু শিথিলগতি হয়ে পিছিয়ে এসেছে। তাছাড়া কৃষ্ণ এখানে দাদা বলভদ্রকে সাক্ষী মানছেন। হঠাৎ বলভদ্র কোথা থেকে এলেন? ৬১,৬২,৬৩

পদ তিনটি সঙ্গতিহীন। ৬৪,৬৫ পদে দেখা যায়, ইতিমধ্যেই কানাই রাধার উপর কিছু বলপ্রয়োগ করেছেন। তাই নিয়ে কথা কাটাকাটি। ৭০ পদে কৃষ্ণ রাধাকে অভিযোগ করছেন, 'রাধা, তুমিই কটাক্ষ করে আমার প্রাণ আকুল করেছ।' রাধা এ অভিযোগ অস্বীকার করছেন না। ৭২ পদে কৃষ্ণ আবার বলভদ্রকে সাক্ষী মানছেন। ৭৪ পদে রাধা কৃষ্ণকে পূর্ব শাস্তি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন,

তুমি ছুইআঁ হাথ পরসওঁ দুই কানে।
এভো তোহো কাহ্নাঞি তোত না ভৈল গেআনে॥ [দান, ৭৪]

'কানাই, তোমায় তুমি ছুঁয়ে দু কানে হাত স্পর্শ করতে হল তাতেও জ্ঞান হলনা?'—এ শাস্তির আখ্যায়িকা পাওয়া যায়নি। মনে হয় ৬১ থেকে বেশ কিছু সংখ্যক পদ প্রক্ষিপ্ত। একই দানের হিসাব পূর্বে একবার হয়ে গেছে, আবার ৭৫ পদে আসছে। উক্তি-প্রত্যুক্তিরও একঘেয়ে পুনরুক্তি। ৯৩ পদ থেকে (না জাই আল রাধা মথুরা নগর) কাহিনী পরিবর্তন। মনে হয় মাঝে কিছু অংশ নষ্ট হয়েছিল। কোনও দুর্বল কবি সে অংশ (৬১-৯২ পদ) পূরণের চেষ্টা করেছেন, তবে জোড় ঠিকমত লাগেনি। এর পর বড়াই-রাধার কথোপকথন। যে পথে কৃষ্ণ দানী সেজে বসে নেই সে পথে মথুরা যেতে রাধার আগ্রহ। তবে ইতিমধ্যেই রাধা যে কৃষ্ণ- প্রেমে কিছুটা মজেছেন বড়াই-এর উক্তিতে ধরা যায়,—

এথাঁ সুন্দরি রাধা কর কাঠদাপ।
তথা গেলেঁ হইব যেহ্ন বাদিআর সাপ॥ [দান, ৯৩]

'হে সুন্দরি রাধা, এখানে কাঠদাপ করছ (কঠোর দর্প দেখাচ্ছ), ওখানে গেলে যেন বেদের সাপ (মন্ত্রমুগ্ধ) হয়ে যাও।'

দ্বিতীয়বারে কানাই যখন রাধাকে পথে ধরলেন বড়াই রাধার মন বুঝেই কৃষ্ণের হাতে ধরা দিতে পরামর্শ দিচ্ছেন,—

আইস বোলোঁ গোআলিনী সুন মোর বোল।
জআঅ কাহ্নাঞি রাধা দিআঁ চুম কোল॥ [দান, ৯৫]

'আমি বলি, গোয়ালিনী এস, আমার কথা শোন। কানাইকে চুম্বন আলিঙ্গন দিয়ে, রাধা, তাকে বাঁচিয়ে তোল।'

এবারে বড়াইই কৌশলে রাধাকে কৃষ্ণের হাতে এনে দিয়েছেন বুঝে রাধা তাকে অনুযোগ করছেন। আর কানু তার বেশবাসের যে অবস্থা করেছেন তাতে কি

করে ঘরে ফিরবেন সেই ভয় করছেন। রাধা এবারে নরম হয়েছেন। ধরে নিয়েছেন, এই সঙ্কোৎকার দৈবঘটন, এড়াবার উপায় নাই। কৃষ্ণকে বলছেন,—

সুন্দর কাহ্নাঞি তবেঁ যাও তোর কোল।
কভোঁ না লঙ্ঘিবে যবেঁ আহ্মার বোল॥
মাথার মুকুট কাহ্নাঞিঁ ভাঁগি জুনি-জাএ।
যোড হাথ করি কাহ্নু বোলোঁ তোর পাএ॥
ছিণ্ডি জুণি-জাএ কাহ্নাঞিঁ সাতেসরী হারে।
আর নঠ না করিহ সব আলঙ্কারে॥
আতিশয় না চাপিহ আধর দাঁতে।
সখি সব দেখিআঁ বলিব দন্তঘাতে॥
নখঘাত না দিহ মোর পয়োভারে।
আইহন দেখিলেঁ মোর নাহিক নিস্তারে॥
কোঁঅলী পাতলী বালী আহ্মে চন্দ্রাবলী।
ভএ কম্পো যেহ্ন নব কদলীর বালী॥
আলিঙ্গন দেহ মোরে দয়া ধরি মনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ [দান, ১০৫]

'সুন্দর কানাই, তোমার কোলে যেতে পারি যদি আমার কথা লঙ্ঘন না কর। তোমার পায়ে জোড়-হাত করে বলি, মাথার মুকুট যেন ভেঙে না যায়, সাতেসরী হার যেন ছিঁড়ে না যায়। আর সব অলঙ্কার নষ্ট করোনা। দাঁতে অধর বেশী চেপোনা।—সখিরা দেখে বলবে, দন্তাঘাত। আমার পয়োভারে নখাঘাত দিওনা, আইহন দেখলে আমার নিস্তার থাকবেনা। আমি কোমল। ক্ষীণা বালিকা চন্দ্রাবলী, শিশু নবীনা কদলী বৃক্ষের মত ভয়ে কাঁপছি। মনে দয়া রেখে আমায় আলিঙ্গন দিও। বাসলী সেবক বড়ু চণ্ডীদাস গাইলেন।'

রাধার সম্মতি পেয়ে কিশলয় শয়নে কানাই রতি করলেন। রাধার সব নিষেধ কাযকালে ভুলে গেলেন। রতিশেষে রাধার ভয় জাগল। বড়াই এই অবস্থায় দেখে রাধাকে ঠাট্টা করলেন এর পর কানাই-এর ব্যবহার সম্পর্কে বড়াই-এর কাছে নালিশ করতে গিয়ে রাধা কেঁদে ফেললেন। তবে কৃষ্ণ রাধার ওপর যে যে

অত্যাচার করেছেন আইহনের ঘরে সব বলতে বলেও শেষ কথাটি শেখাচ্ছেন,—

অনেক প্রকারে কাকুতী করিল
না দিলোঁ সুরতীর আশে।

'এত অত্যাচার এবং অনেক প্রকার মিনতি করলেও তাকে রতি-আশ্বাস দিইনি। এই তত্ত্ব বড়াই, তুমি আইহনের ঘরে বুঝিয়ে দিও।'

এই প্রথম দিকের মিলন বর্ষার কিছু পূর্বে হয়েছিল মনে হয়। তখন কদম, মালতী, লঙ্গ ফুলের বাহার। কিশলয় শয়নে রতি সম্ভবপর। কোনও কোনও সমালোচক এই অংশের আলোচনায় কবির উপর অহেতুক কঠোর হয়েছেন। কবি সুকৌশলে রাধার পরপুরুষে রতি-আগ্রহ ধীরে ধীরে কৃষ্ণেরই যত্নে (এবং বড়াইয়ের সহায়তায়) কেমনভাবে তৈরী হচ্ছে দানখণ্ডে তারই বিশ্লেষণ দিয়েছেন।

রুচির প্রশ্ন

রাধা যে রতিব্যাপারে অনভিজ্ঞা ছিলেন না, কৃষ্ণকে যেভাবে সাবধানে মিলিত হতে বলছেন তা থেকেই ধরা যায়। তবে পরিণীতা নারীর পরপুরুষ-মিলনের সামাজিক ও নৈতিক ভয় প্রথম যথেষ্ট পরিমাণে ছিল তার পরিচয় রয়েছে। কিন্তু একথা কোনওক্রমেই বলা চলেনা যে কবি একটি অনিচ্ছুকা-বালিকার উপর গ্রাম্য গোঙার যুবকের অত্যাচারের অশ্লীল বর্ণনা দিয়েছেন। আর রুচির প্রশ্ন তুললে সমগ্র প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য নিয়েই সে প্রশ্ন ওঠে। জয়দেব, বিদ্যাপতি বা ভারতচন্দ্রে (এমনকি রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরেও) যদি রুচিদোষ না ঘটে,—বড়ু চণ্ডীদাস কিছু দোষ করেননি। বস্তুত উনবিংশ শতকের খৃষ্টান ও ব্রাহ্মরুচিবোধ আমাদের শ্লীলতা অশ্লীলতার দৃষ্টিভঙ্গি আমূল বদলে দিয়েছিল। সে কারণেই বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যপাঠে এ-যুগে আমরা এতটা অশ্লীলতা দেখতে পাই। আসলে, মধ্যযুগের কাব্যের রস ও রুচি বিচারে আমাদের সংস্কার-মুক্ত মন নিয়ে অগ্রসর হতে হবে।

নৌকাখণ্ড অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত। বর্ষা এসে গেছে। এদিকে রাধাকে অনেকদিন না পেয়ে কৃষ্ণ আকুল হয়েছেন। বড়াই-এর সঙ্গে পরামর্শ হল, রাধাকে ভুলিয়ে যমুনার ঘাটে নিয়ে যেতে হবে। নৌকায় যমুনা পেরিয়ে মথুরার হাটে যাবার পরিকল্পনা। কৃষ্ণ এবারে নড়বড়ে ছোট্ট একটি নৌকা তৈরী করলেন।

নৌকাখণ্ড

কোনওমতে দুটি লোক পার হতে পারে। আর একটি বড় নৌকাও তৈরী করলেন, অনেক লোক ধরবে তাতে। বড় নৌকাটি ঘাটে ডুবিয়ে রেখে ছোট নৌকাটি নিয়ে নিজেই নেয়ে সেজে ঘাটে এলেন।

এদিকে বড়াই রাধাকে অনেক বুঝিয়ে তার শাশুড়ীর অনুমতি নিয়ে গোপীগণ সহ এই নতুন খেয়া-পারাপারের পথে মথুরার হাটের উদ্দেশ্যে চললেন। ঘাটে পৌঁছে কৃষ্ণকেই নেয়ে রূপে দেখে রাধা ব্যাপার বুঝলেন। একে একে গোপীদের পার করিয়ে শেষে বড়াইকে সঙ্গে করে নায়ে উঠতে চাইলেন। কৃষ্ণের আপত্তি, তিনজনে নৌকা ডুবে যাবে। অগত্যা বড়াইও পার হলেন। রাধাকে অনেক বুঝিয়ে কৃষ্ণ নায়ে চড়ালেন। রাধা সব বুঝেও এবারে ধরা দিলেন। মাঝ দরিয়ায় নৌকা টলমল, রাধা ভয়ে কৃষ্ণকে জড়িয়ে ধরলেন। নৌকা ডুবল। কৃষ্ণ মাঝ দরিয়ায় রাধার আলিঙ্গন নিলেন। এবারে রাধার আপত্তি মৃদু। কৃষ্ণকে অনুনয় করছেন,—

বলে জলে কোলে কৈলে কাহ্ণাঞি ল
কৈলে বড়ই খাঁখার।
সব সখি দেখে মোর কাহ্ণাঞি ল
না তুলিহ জলের উপর॥

... ...

যে কর সে কর তুঞি কাহ্ণাঞি ল
মোরে জলের ভিতর।
হোর সব সখিজন কাহ্ণাঞি ল
দেখে তাক মোর ডর॥ [নৌকা, ২৬]

এবারে রতিমিলনে রাধা আর নিষ্ক্রিয় নন,—

দৃঢ় ভুজযুগে ধরি কৈল আলিঙ্গনে।
রাধার বদনে কাহ্ণাঞি কইল চুম্বনে॥

... ...

রাধার মনত তবেঁ জাগিল মদন।
উরস্থলে কৈল রাধা দৃঢ় আলিঙ্গন।
ধীরেঁ ধীরে পরসিআঁ রাধার জঘন।
সরূপে সফল কাহ্ণাঞি মানিল জীবন॥
রাধার নিতম্বে কাহ্ণাঞি দিল ঘন নখে।
চমকি করিল রাধা আতি রতিসুখে॥ [নৌকা, ২৭]

এবারে রাধা অনেক সেয়ানা হয়েছেন। ওপারে পৌঁছেও কানাই-এর দোষ থেকে বড়াই ও সখীদের কাছে তার গুণকীর্তনে মুখর হয়েছেন।

ডুবিআঁ মরিতোঁ যবেঁ না থাকিত কাহ্নে।
আহ্মা লআঁ সান্তরিআঁ রাখিল পরাণে॥
এবার কাহ্নাঞিঁ বড় কৈল উপকার।
জরমেঁ সুঝিতেঁ নারোঁ এ গুণ তাহার॥ [নৌকা, ২৯]

সখিরা তাদের পসরা থেকে রাধার পসরা নতুন করে সাজিয়ে দিলেন। মথুরার হাটে দুধ দৈ বেচে ফেরার পথে কৃষ্ণ এবারে বড় নৌকায় সবাইকে একবারেই পার করে দিলেন।

তাম্বুল, দান ও নৌকা তিনটি খণ্ডে লেখক রাধা চরিত্রের পর পর বিবর্তনটি বেশ নৈপুণ্যের সঙ্গেই ফুটিয়েছেন স্বীকার করতে হয়।

ভারখণ্ড

এরপর ভারখণ্ড। বর্ষা গিয়ে শরৎ এসে পড়ল। কৃষ্ণ বড়াইকে এবার নতুন পরামর্শ দিচ্ছেন, কিভাবে বৃন্দাবনের বনপথে রাধাকে ভুলিয়ে আনবেন।

উপস্থিত ভৈল বড়ায়ি শরত সমএ।
শুড়পথে এবেঁ লোক মথুরাক জাএ॥
এবেঁ তথাঁ কাহ্নাঞিঁর নাহি অধিকার।
হেন বুলী রাধা নেহ যমুনার পার॥

... ...

যমুনার পথে আহ্মে ভার সজাইআঁ।
থাকিব পথের মাঝে মজুরিআ হআঁ॥
রাধিকারে বুলিহ বিবিধ পরকার।
সে যেহ্ন আহ্মাক বহাএ দধিভার॥ [ভারখণ্ড, ১]

শরৎকাল এসে গেল। এখন লোক স্থলপথেই মথুরায় যায়। কৃষ্ণ বড়াইকে বললেন, তুমি রাধাকে বোঝাবে এই স্থলপথে কানাই-এর অধিকার নেই। এই বলে তাকে যমুনার ওপারে নেবে। পথে ভার সাজিয়ে কৃষ্ণ মজুর সেজে বসে থাকবেন। রাধা তাকে যেন ভারী নিয়োগ করেন এই ব্যবস্থা বড়াইকে করে দিতে হবে।

সে ব্যবস্থা হল। নদী পেরিয়ে শরতের খররৌদ্রে ক্লান্ত রাধা দুধ দৈ বয়ে মথুরার হাটে নেবার জন্য ভারীর খোঁজ করতেই কৃষ্ণ ভারীরূপে এসে হাজির। মাঝে এক পৃষ্ঠা খণ্ডিত। পরের কাহিনী থেকে বোঝা যায়, কৃষ্ণ রাধার সঙ্গ চান, ভার বহনে নারাজ। প্রধান কারণ লোকলজ্জা। রাধাও ভার না বহিয়ে ছাড়বেন না। শেষে ঠিক হল, কৃষ্ণ ভার বইবেন,—বিনিময়ে রাধার রতিমিলন চাই। রাধা সে আশ্বাস দিলেন। এর পর আবার একটি পৃষ্ঠা নেই। বোধহয় মথুরার কাছে পৌঁছে কৃষ্ণ আবার মিলন যাচ্ঞা করেছিলেন। রাধা আশ্বাস দেন, ফেরার পথে হবে। উপায়হীন হয়ে কৃষ্ণ ভার বইলেন।

ভারান্তর্গত ছত্রখণ্ড

এবারে ভারান্তর্গত ছত্রখণ্ড। ফেরার পথে রাধা বড়াইকে সখীদের মাধ্যমে আইহনের মাকে খবর পাঠাতে বললেন যে রোদ পড়লে তিনি ঘরে ফিরবেন। এবারে কৃষ্ণের সঙ্গে লীলা। রাধা ভারবহনের জন্য পয়সা দিতে চান, কৃষ্ণ রতিমিলন চান। রাধা সুযোগ বুঝে কৃষ্ণকে তার মাথায় ছত্র ধরতে বললেন, তবে রতি দেবেন। কৃষ্ণ বাধ্য হলেন ছত্র ধরতে। বোধ হয়, এরপর মিলন হয়েছিল। সে পত্র খণ্ডিত। রাধা এবারে অনেক সেয়ানা হয়েছেন। কৃষ্ণকে প্রেমের খেলায় এখন তিনিই চালিত করছেন।

বৃন্দাবন খণ্ড

এবপর বৃন্দাবন খণ্ড। বোধ হয় শরতের পর হেমন্ত শীত পেরিয়ে বসন্ত এসেছে। 'এবে মলয় পবন ধীরে বহেল। মনমথক জাগাএ ॥' কৃষ্ণ বড়াইকে রাধার কাছে দূতী পাঠাচ্ছেন। রাধাও যেতে ইচ্ছুক। আইহনের মাকে রাজি করানোর ভার বড়াই-এর। বড়াই রাধার শাশুড়ীকে রাজি করিয়ে রাধাকে কৃষ্ণাভিসারে যেতে বলছেন। এখানে কবি গীতগোবিন্দের 'রতিসুখসারে গতমভিসারে' (১১ নং গীত) গানটির অনুবাদ করে দিয়েছেন।—

> তোর রতি আশোয়াশেঁ গেলা অভিসারে।
> সকল শরীর বেশ করী মনোহরে ॥
> না কর বিলম্ব রাধা করহ গমনে।
> তোহ্মার সঙ্কেত বেণু বাজাএ যতনে ॥ [বৃন্দাবন, ৫]

বাসন্তী ফুলফলে যত্ন করে কানু বৃন্দাবন-কুঞ্জ সাজিয়েছেন। তবে ফুল ফলের নাম করতে গিয়ে কবি বিশেষ ঋতুর কথা আর মনে রাখেন নি। সুনীতিকুমার শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষাকে 'পশ্চিমবঙ্গের লিখিত ভাষার খাঁটি রূপ' বলেছেন।

কিন্তু ছোলঙ্গ, জাম্বীর, বাঙ্গী প্রভৃতি ফলের নাম বা মাগুকিল, ছাওয়াল প্রভৃতি শব্দ পূর্ববঙ্গেই সুপ্রচলিত নয়কি? রাধা কৃষ্ণের অনুরোধে সখীদলসহ বৃন্দাবনকুঞ্জে ঢুকে সুসজ্জিতা হলেন। কৃষ্ণকে কয়েকটি অনুভাব সাহায্যে প্রেমের ইঙ্গিত জানাচ্ছেন,—

খসাআঁ বান্ধিল পুণী কুন্তলভার।
সঘনে ছাড়িল রাধা হাঈ অপার॥
চুম্বন করিল রাধা সখির বদনে।
ভাল গীত গাএ বুলী পড়িল মদনে॥ [বৃন্দাবন, ৯]

চুল এলায়িত করে পুনর্বার বন্ধন, ঘন ঘন হাই তোলা, সখিবদনে চুম্বন, মদন-গীতি গাওয়া,—এগুলি কৃষ্ণমিলন কামনার অনুভাব-চিত্র।

সব গোপাকেই কৃষ্ণ রতি দিলেন, তাতে রাধার অভিমান। রাধার স্পষ্ট নামোল্লেখ ভাগবতে নেই। বিশেষ কোন রমণীর প্রতি বেশী অনুরাগে অপরা গোপীদের ঈর্ষার উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের আদর্শে বড় চণ্ডীদাস রাধা-চন্দ্রাবলীর পরিকল্পনা করেছেন। ভাগবতে শারদ রজনীর রাস বর্ণিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বসন্তে দিবারাসের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কৃষ্ণের এবারে রাধাস্তুতি। গীতগোবিন্দের 'বদসি যদি কিঞ্চিদপি' (১৯নং গীত) গানের অনুবাদ,—

যদি কিছু বোল বোলসি তবেঁ দশনরুচি তোহ্মাবে।
হরে ঢুরুবার ভয় আন্ধকার সুন্দরি রাধা আহ্মারে॥ [বৃন্দাবন ১৮]

পদ্মপত্রে জলের ন্যায় পুরুষের প্রেমে আর রাধার আস্থা নেই। কৃষ্ণ বোঝাচ্ছেন,—

নানা ফুলে বুলে ভ্রমরে।
আন হের সুন প্রাণ রাধা ল
তভোঁ কি মালতী পাসরে॥ ধ্রু॥ [বৃন্দাবন, ২৮]

'ভ্রমর নানা ফুলের মধু খেলেও মালতীকে ভুলবে কি করে?' এবারে মানভঙ্গ ও মিলন।

যমুনাখণ্ড

যমুনা খণ্ডে তিনভাগ: কালিয়দমন, যমুনা খণ্ড, হারখণ্ড। কাহিনীর পারম্পর্য ভাগবত থেকে একটু ভিন্নতর। ভাগবতে কালিয়দমন, বস্ত্রহরণ, রাস। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাস, কালিয়দমন, বস্ত্রহরণ।

যমুনায় তখন জল নেই, তাই কালিদহে (যমুনার মধ্যেই একটি দহ) জলকেলির ইচ্ছা জাগল কৃষ্ণের। তাই এই দহের কালিয় নাগকে দমন করলেন এবং সপরিবারে তাকে দক্ষিণ সাগরে পাঠিয়ে দিলেন। কৃষ্ণ জলে নামলে গোকুলের সকলেরই বিশেষ করে যশোদা, নন্দ, বলরাম ও গোপীদের দুর্ভাবনা। কালিয়নাগকে দমন করে উঠে আসাতে সকলের আনন্দ। সেখানে কবি রাধার ছবি আঁকছেন,—

কালিয়দমন

নেইঁতবেঁ আকুলী রাধিকা ততিখনে।
নিমেষ রহিত বঙ্ক সরস নয়নে॥
দেখিল কাহ্নের মুখ সুচির সমএ।
সকল লোকের মাঝে তেজি লাজ ভএ॥

[কালিযদমন, ৯]

'এতক্ষণে প্রেমাকুলা রাধিকা নিমেষহীন বাকা সরল নয়নে সব লোকের মাঝে লজ্জাভয় ত্যাগ করে, দীর্ঘ সময় ধরে কানুমুখ নিরীক্ষণ করলেন।'

যমুনাখণ্ডে গোপীদের দহে জল আনতে যাওয়া। রাধার প্রতি কৃষ্ণের অনুযোগ, যৌবন ছলা-কলায় উন্মনা করে এখন রতি দিতে পরান্মুখ কেন? রাধা কৃত্রিম কৈফিয়ৎ দিলেন। কৃষ্ণ ছলনা ভরে রাধাকে চুম্বন করে তার কৃত্রিম বোধ উৎপাদন করলেন। এরপর জলকেলি করতে করতে একসময় গোপীদের অলক্ষ্যে কৃষ্ণ পদ্মবনে আত্মগোপন করলেন। গোপীরা তাকে খুঁজে না পেয়ে বিষণ্ণমনে ঘরে ফিরলেন। পরদিন প্রভাতে কৃষ্ণ-সাক্ষাতের আশায় আবার তারা দহে এলেন। কিন্তু কাউকেই দেখলেন না। কোনও পুরুষ সেখানে নেই দেখে তীরে বস্ত্র রেখে গোপীরা স্নানে নামলেন। কৃষ্ণ বৃক্ষান্তরালে লুকিয়ে ছিলেন, অবসর বুঝে তাদের বস্ত্র ও সেইসঙ্গে রাধার হারও চুরি করলেন। এবারে কৃষ্ণের খেলা বুঝে গোপীদের লজ্জা ও অনুনয়। কৃষ্ণের নির্দেশে রাধাকে তীরে এসে বস্ত্র ভিক্ষা করতে হল, দুহাতে স্তনাবৃত করে বস্ত্র চাইলেন। কৃষ্ণ তাকে জোড় হাত করিয়ে তবে গোপীদের বস্ত্র ফিরিয়ে দিলেন। কিন্তু রাধা হারটি ফেরৎ পেলেন না। এ কাহিনীতে কিছু রঙ থাকতে পারে, তবে মূল আখ্যায়িকা ভাগবতের। এর জন্যে কবির রুচিবিকারের প্রশ্ন তোলা অসমীচীন।

যমুনাখণ্ড

যমুনান্তর্গত হারখণ্ডে, রাধা বড়াইকে নালিশ করলেন, কৃষ্ণ হার লুকিয়ে রেখেছেন। এরপর ছয় পৃষ্ঠা খণ্ডিত। ১৫২।১ পৃষ্ঠায় এসে দেখা গেল, কুপিতা রাধা সখীদল সহ যশোদার কাছে এসে কৃষ্ণের ব্যবহার সম্পর্কে নালিশ জানাচ্ছেন। কৃষ্ণ ঠিক কি করছেন লজ্জায় স্পষ্ট বলতে পারেন না। যশোদা কৃষ্ণকে তিরস্কার করলে, কৃষ্ণও পাল্টা মিথ্যা অভিযোগ করছেন। একটি ভাবমধ্যে বিশেষ গুরুতর,—

হারখণ্ড

যমুনার তীরে গোপীগণ লআঁ রঙ্গে।
কেলি কৈল রাধা পরপুরুষের সঙ্গে॥ [হার, ৪]

এই পরপুরুষ যে আসলে কানাই নিজে সে কথাটা উহ্য রাখলেন। রাধার সবচেয়ে বড় দুর্ভাবনা এই বিস্রস্ত বেশবাস নিয়ে কি করে ঘরে ফিরবেন। বড়াই রাধাকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে কৈফিয়ৎ দিলেন, বনে পাগলা বলদের আক্রমণে রাধার এই অবস্থা, বড়াই কোনওক্রমে তাকে প্রাণে বাঁচিয়ে এনেছেন। বোধহয় এবারে কৃষ্ণের আচরণে কিছুটা বাড়াবাড়ি ঘটেছিল বলেই রাধা যশোদার কাছে নালিশ করতে ছুটেছিলেন।

এর পর বাণখণ্ড। কৃষ্ণ এবারে খুবই অভিমানাহত হয়েছেন। যত বাড়াবাড়িই হোক, প্রেমকেলির ব্যাপারটা কৃষ্ণ-জননীর কানে তোলা উচিত হয়নি রাধার। তখন মারণ-উচাটন ক্রিয়া পদ্ধতির বেশ প্রচলন ছিল মনে হয়। বড়াই কৃষ্ণকে আরও উস্কে দিচ্ছেন,—

বিলম্ব না কর কাহ্নে মোর বোল শুন।
ঝাঁট করী ফুলের ধনুতে দেহ গুণ।
স্তম্ভন মোহন আর দহন শোষনে।
উচ্চাটিণ বাণে লঅ রাধার পরাণে॥ [বাণ, ২]

কানাই-এর কথামত বড়াই রাধাকে ভুলিয়ে আবার মথুরার পথে নিয়ে এলেন। বড়াই এবারে রাধাকে খবর দিলেন, তার ব্যবহারে কানাই রুষ্ট হয়েছেন। পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া ভাল। নইলে মদনবাণে কৃষ্ণ রাধাকে বধ করবেন। রাধা-কৃষ্ণে এ নিয়ে বিতর্ক হল। প্রথম লঘু ভাবে নিলেও পরে ভয় পেয়ে অনুনয় করলেন, কৃষ্ণ যেন মদনবাণে তাকে বধ না করেন। কৃষ্ণের মদনবাণে রাধা মূর্চ্ছিতা হলেন। এবারে বড়াইও কৃষ্ণের ওপর রুষ্ট হলেন। রাধাকে বাঁচিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত তিনি কৃষ্ণকে বন্দী রাখবেন। কৃষ্ণও স্ত্রীবধ আশঙ্কার ভীত হলেন।

শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণস্পর্শে রাধার চেতনা প্রাপ্তি এবং বৃন্দাবন-কুঞ্জে বিপরীত রতি মিলন। রাধা কিন্তু এতদিনে অনেকটা বড় হয়েছেন। নিজের বয়স চোদ্দ বছর বলছেন।

দশ চারি বরিষের হওঁ মো গোআলী।
হেন তিরী মারিতে অযোগ বনমালী॥ [বাণ, ১১]

বাণখণ্ডের কাল বলা নেই। তবে প্রাকৃতিক বর্ণনায় বসন্তঋতুর চিত্র।—

শীতল সমীর জন মনোহর কোকিল পঞ্চম গাএ।
সব তরুগণ বিকাশ কুসুম ভ্রমর কাঢ়এ রাএ॥ [বাণ, ৩]

একটি চতুর্দশী পূর্ণ যুবতীর পক্ষেই মদনের কুসুমবাণে চেতনা হারানো এবং পুনঃ চেতনা প্রাপ্তির পর বিপরীত রতিমিলন সম্ভবপর। রাধাচরিত্রের ক্রম-বিবর্তনের প্রতি কবি যথাযথ লক্ষ্য রেখেছেন।

বংশীখণ্ড

এবারে বংশী খণ্ড। বাঁশির অমোঘ প্রভাবের নানা চিত্র বৈষ্ণব-পদাবলী গীতিতে রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বংশীখণ্ড পালাগানের পূর্বে রাধার প্রতি কৃষ্ণের বাঁশির প্রভাব বর্ণিত হয়নি। এবারে দেখা যাচ্ছে, যমুনায় জল আনতে গিয়ে রাধা কৃষ্ণের বাঁশি শোনেন। বিরহিণী রাধিকাকে কৃষ্ণ বাঁশির সুরে উন্মনা করে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ান, ধরা দেননা, বিরহিণী রাধার সেই চিত্র-চরিত্র কবি অপূর্ব কবিত্বের সঙ্গে বর্ণনা করেছেন।—

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।
দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে।
তার পাএ বড়ায়ি মোঁ কৈলোঁ কোন দোষে॥
আঝর ঝরএ মোর নয়নের পানী।
বাঁশীর শবদেঁ বড়ায়ি হারায়িলোঁ পরাণী॥
আকুল করিতেঁ কিবা আহ্মার মন।
বাজাএ সুসর বাঁশী নান্দের নন্দন॥

পাখি নহোঁ তার ঠাই উড়ী পড়ি জাওঁ।
মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ ॥
বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জাণী।
পোড়ে মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী ॥
আন্তর সুখাএ মোর কাহ্ন অভিলাসে।
বাসলী শিরেবন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ [বংশী, ২]

অপূর্ব উপমা অলঙ্করণে, ভাষা ও ছন্দে, প্রেম বেদনার গভীর আন্তরিকতার সুরে পদটি কবির উচ্চ কবিত্ব প্রতিভার নিদর্শন।

একটি পদে রাধা বিরহের অভিব্যক্তি বলছেন,—

বাঁশীর শবদেঁ প্রাণ হরিআঁ কাহ্ন গেলা কোন দিশে।
তা বিনি সকল আন্তর দহে যেন বেআপিল বীষে ॥ [বংশী, ৩]

'বাঁশির সুরে প্রাণ হরণ করে কানু কোন্ দিকে গেল, তার অভাবে সমস্ত হৃদয় জ্বলছে, যেন বিষ ছড়িয়ে গেছে।' একটি পদে রাধা বড়াই-এর কাছে আক্ষেপ করছেন,—

কাল কোকিল রএ কাল বৃন্দাবনে।
এবে কাল হৈল মোকে নান্দের নন্দনে ॥ [বংশী, ৩]

'কাল' কথাটির ব্যঞ্জনা এ পদে লক্ষণীয়। সুমিষ্ট বাঁশির সুরে রাধার রান্নার কি হাল হল একটি পদে বলছেন,—

সুসর বাঁশার নাদ শুনিআঁ বড়ায়ি
রান্ধিলোঁ যে সুনহ কাহিনী।
আম্বল ব্যঞ্জনে মো বেশোআর দিলোঁ
সাকে দিলো কানাসোআঁ পানী ॥ [বংশী, ১৫]

অম্বল ব্যঞ্জনে বেশোয়ার (ঝাল বাটনা ?) এবং শাকে কানাসোআঁ (আকণ্ঠ ?) জল দিয়েছেন।

এই আকুল বিরহের তীব্রতা অপর একটি পদগীতিতে অপূর্ব ভাবে প্রকাশ পেয়েছে।—

কাখেত কলসী বড়ায়ি জাওঁ ধীরে ধীরে।
চতুর্দ্দিশ চাহোঁ বড়ায়ি যমুনার তীরে ॥
বাঁশীনাদ সুণী কাহ্ন দেখিতে না পাওঁ।

মেদনী বিদার দেউ পসিঞাঁ লুকাওঁ ॥
চাহা চাহা আল বড়ায়ি যমুনাক তীরে।
বাঁশীর শবদে প্রাণ কেহ্ন জনি করে ল ॥
শীতল মনোহর বাঁশী কেনা বাএ।
ডালত বসিঞাঁ যেহ্ন কুয়িলী কাঢে রাএ ॥
উল্লসিত হইলোঁ বড়ায়ি তার নাদ শুণী।
না পায়িঞাঁ কাহ্নাঞি বড়ায়ি তেজিবোঁ পরাণী ॥

[বংশী, ১৭]

'বড়াই, কলসী কাঁখে ধীরে ধীরে চলেছি, যমুনা তীরে চারদিকে চাইছি। বাঁশির সুর শুনি, কানুকে তো দেখতে পাই না! মেদিনী বিদীর্ণ হোক, প্রবেশ করে লুকাই আমি। যমুনার তীরে চাইতে চাইতে এলাম। বাঁশির সুরে প্রাণ কেমন করে। শীতল মনোহর বাঁশি কে বাজায়! যেন ভালবেসে কোকিল ডাকছে। বড়াই, সেই সুর শুনে উল্লসিত হলাম, কানুকে না পেলে এবারে প্রাণ ত্যাগ করব!'

এ সব পদে বড়ু চণ্ডীদাস যে উচ্চমানের কবিত্ব দেখিয়েছেন তাতে প্রথম শ্রেণীর পদাবলী কবিগোষ্ঠীর পাশেই আসন পেতে পারেন।

রাধার দুঃখে বড়াইও দুঃখিত। তিনি বুদ্ধি দিলেন, 'নিদ্রা উলি' মন্ত্রে যখন কৃষ্ণকে ঘুম পাড়িয়ে দেবেন রাধা যেন তখন বাঁশি চুরি করেন। রাধা সেই মত বাঁশি চুরি করলেন। এবারে কৃষ্ণের অনুনয়। রাধা কিছুতেই স্বীকার পান না। কৃষ্ণও বাঁশি না পেলে রাধাকে ছাড়বেন না। এবারে রাধা প্রতিশোধ নিচ্ছেন। বড়াইকে দিয়ে বলালেন, সব গোপীর কাছে হাত জোড় করে বাঁশী চাইতে হবে কৃষ্ণকে। রাধা কৃষ্ণকে বাঁশি দিতে গিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন, এমন বাঁশির সুরে তার হৃদয় চুরি করে কানাই আর পালাতে পারবেন না। তিনি আর যেন রাধাকে কষ্ট না দেন। রাধা এখন পরিণত যৌবনা। এখন কৃষ্ণ প্রেমে তিনিই আকুল, কৃষ্ণই দূরে পালিয়ে বেড়ান।

বংশীখণ্ডের ঘটনা বসন্ত ঋতুর।—

চারি দিগোঁ তরু পুষ্প মুকুলিল বহে বসন্তের বাএ।
আম্বডালে বসী কুয়িলী কুহলে লাগে বিষবাণ ঘাএ ॥ [বংশী, ৩]

তবে তখন রাধা যে যমুনা পারাপারে অসুবিধার উল্লেখ করে বলছেন,

যমুনা নদীতে মো কেমনে হৈবোঁ পার।

ঘড়িআল কুম্ভীর তাহাতে আপাব ।। [বংশী, ৪]

এটি অতিশয়োক্তি মনে হয়।

সমগ্র বংশী চুরি আখ্যায়িকাটিই পরবর্তী কোনও কবির সংযোজনা কিনা সে বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ আছে। কারণ এর পরবর্তী রাধা-বিরহ খণ্ডে কাব্যের পূর্ব কাহিনীগুলি পরম্পরাভাবে একাধিকক্ষেত্রে উল্লেখিত হয়েছে কিন্তু তার মধ্যে বংশী চুরির কথাটি নেই। কৃষ্ণ বা বড়াই বিরহখণ্ডে রাধাকৃত অপরাধের ফিরিস্তি দিয়েছেন, তার মধ্যে এত বড় অপরাধটির একবারও উল্লেখ করলেন না, এটি ভেবে দেখবার বিষয়। তবে যে কবিরই রচনা হোক বংশীখণ্ড কবিত্বের উৎকর্ষে অনুপম স্বীকার করতেই হবে।

রাধা-বিরহ

সবশেষ খণ্ড 'রাধাবিরহ'। চৈত্র মাস, শেষ বসন্ত। বড়াই এর কাছে রাধার অনুনয়, কৃষ্ণকে এনে দাও। কিন্তু বসন্তেই তো বংশী চুরির ঘটনা নিয়ে রাধা-কৃষ্ণের সন্ধি হল। কৃষ্ণ বংশী পেয়ে প্রসন্ন মনে রাধাকে ক্ষমা করলেন। তবে আবার কৃষ্ণের অদর্শনের চিত্র কেন? এখানেও বংশীখণ্ডের প্রক্ষিপ্ততা সম্পর্কে সন্দেহ জাগে। নইলে ধরতে হয়, এখানে আরও এক বৎসর পরের আর একটি বসন্তের কাহিনী এসেছে।

রাধা কৃষ্ণকে স্বপ্ন দেখে বড় আকুল হয়েছেন। বড়াইকে সেই স্বপ্নকথা বলছেন,—

দেখিলোঁ প্রথম নিশী সপন সুন তোঁ বসী
সব কথা কহি আরোঁ তোহ্মারে হে।
বসিআঁ কদমতলে সে কৃষ্ণ করিল কোলে
চুম্বিল বদন আহ্মারে হে।
এ মোর নিফল জীবন এ বড়ায়ি ল।
সে কৃষ্ণ আনিআঁ দেহ মোরে হে॥
লেপিআঁ সুগন্ধ চন্দনে বুলিআঁ সরস বচনে
আড় বাঁশী বাএ মধুরে।
চাহিল মোরে সুরতী না দিলোঁ মো আনুমতী
দেখিলোঁ মো ভুঅঙ্গ পহরে॥

তিঅজ পহর নিশী　　মোঞ কাহ্নাঞিঁর কোলে বসী
নেহালিলোঁ তাহার বদনে ॥
ঈষত বদন করী　　মন মোর নিল হরি
বেআকুলী ভৈলোঁ মদনে ॥
চউঠ পহরে কাহ্নে　　করিল আধর পান
মোর ভৈল রতিরস আশে।
দারুণ-কোকিল নাদে　　ভাঁগিল আহ্মার নিন্দে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥　　[বিরহ, ২]

পদটির ভাব, কবিত্ব এবং ছন্দোবন্ধ জ্ঞানদাস-ভণিতার 'মনের মরম কথা' [পৃ ১৫২-৫৩] স্বপ্নমিলনের বিখ্যাত পদটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

যমুনা সম্পর্কে এখানেও কবি লিখেছেন,

যমুনা বহে খরতর ধার।
কেমতেঁ তাহাতে হইবেঁ পার ॥　[বিরহ, ৭]

হয়তো তখন চৈত্রমাসেও যমুনায় বেশ জল থাকত, গতিবেগ তীব্র হত। আর একটি পদে রয়েছে, বড়াই রাধাকে বলছেন,—

বড় যতন করিআঁ　　চণ্ডীরে পূজা মানিআঁ
তবেঁ তার পাইবে দরশনে ॥　[বিরহ, ৯]

সে যুগের সমাজে চণ্ডীপূজার যে বেশ প্রাধান্য ছিল বোঝা যাচ্ছে। রাধা-বিরহে মাঝে মাঝে কয়েকটি পদে রাধার করুণ আর্তির চিত্র কবি বেশ নিপুণ হাতে এঁকেছেন। একটি উদাহরণ তুলি।—

মেঘ আন্ধারী অতি ভয়ঙ্কর নিশী।
একসরী ঝুরোঁ মো কদমতলে বসী ॥
চতুর্দিশ চাহোঁ কৃষ্ণ দেখিতেঁ না পাওঁ।
মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাও ॥
নারিব নারিব বড়ায়ি যৌবন রাখিতে।
সব খন মন ঝুরে কাহ্নাঞিঁ দেখিতে ॥　[বিরহ, ১৯]

রাধা পূর্বে কৃষ্ণের ডাকে সাড়া দেননি তার কৈফিয়ৎ দিয়ে বলছেন বড়াইকে,—

যবে কাহ্ন চাহিলে সুরতী।
মো তবেঁ আছিলোঁ শিশুমতী ॥

এবেঁ মোঞেঁ ভৈলোঁ। ভর যুবতী।
আহ্মাক ছাড়িআঁ কাহ্ন গেলা কতী।। [বিরহ, ২১]

কিন্তু কৃষ্ণ কিছুতেই ধরা দিচ্ছেন না। সেই যে তাম্বুল খণ্ডে তিনি রাধাকে শাস্তি দিতে মুনিবেশ ধরবেন সঙ্কল্প করেছিলেন এবারে সেই নিষ্কাম যোগীর ভেক নিয়েছেন। বড়াইকে বলছেন,—

আহোনিশি যোগ ধেআই।
মনপবন গগনে বহাই।।
মূল কমলে কয়িলে মধুপান।
এবেঁ পাইএঁ। আহ্মে ব্রহ্মগেআন।।
ইড়া পিঙ্গলা সুসমনা সন্ধী।
মন পবন তাতে কৈল বন্দী।। [বিরহ, ২৯]

এ-ছবি তো বৌদ্ধ তান্ত্রিক যোগসাধনার। যে যুগে বড়ু এ-কাব্য লিখেছেন তখন এ-সব আচার প্রচলিত ছিল ধরা যেতে পারে। রাধা রতিমিলন প্রার্থনা করে যত অনুনয় করছেন, কৃষ্ণ ততই এড়িয়ে যাচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত বড়াই-এর অনুরোধে কৃষ্ণ আলিঙ্গন দিলেন। বড়াই কৃষ্ণের কাছে বিরহিণী রাধার যে চিত্র দিয়েছেন, তাতে দুটি পদ গীতগোবিন্দ থেকে অনুবাদ।—

(১) তনের উপর হারে।
আল
মানএ যেহেন ভারে।
আতি হৃদয়ে খিনী রাধা চলিতে না পারে।।
সরস চন্দন পঙ্কে
আল
দেহে বিষম শঙ্কে।
দহন সমান মানে নিশি শশাঙ্কে।। [বিরহ, ৪৮]

এটি 'স্তনবিনিহিতমপি হারমুদারম্' (৪সর্গ, ৯গীত) গানের স্বচ্ছন্দ অনুবাদ। শুধু শেষ দু পংক্তি কবির নূতন সংযোজন।

(২) নিন্দয়ে চান্দ চন্দন রাধা সব খনে।
গরল সমান মানে মলয় পবনে।।
করে মনসিজশর কুসুম শয়নে।
ব্রত করে পারিতেঁ তোর আলিঙ্গনে।। [বিরহ, ৪৯]

এটি 'নিন্দতি চন্দন মিন্দু কিরণ মনু বিন্দতি' (৪সর্গ, ৮ গীত) এর অনুবাদ।

বড়াই-এর চেষ্টায় উভয়ের মিলন হল। রাধা মিনতি করলেন, আর যেন কৃষ্ণ তাকে ছেড়ে গিয়ে কষ্ট না দেন। কৃষ্ণের উরুদেশে মাথা রেখে ক্ষীণা ক্লান্ত রাধা ঘুমিয়ে পড়লেন। কৃষ্ণ বড়াইকে রাধার যত্ন নিতে বলে মথুরায় চলে গেলেন।

ঘুম থেকে জেগে রাধার আক্ষেপ। কিন্তু বড়াই রাধার অনুরোধে বৃন্দাবনে কেন কৃষ্ণের খোঁজ করছেন? তাকে বলেই তো কৃষ্ণ মথুরায় গেছেন। ৬০ নং পদটি প্রক্ষিপ্ত কি? অনেক বুঝিয়ে বড়াই রাধাকে ঘরে নিয়ে এলেন।

বর্ষা ঋতু এসে গেল। রাধার বিরহ অসহনীয়। কবির বর্ণনাও অনুপম।—

ফুটিল কদমফুল ভবে নোঁআইল ডাল।
এভো গোকুলক নাইল বলে গোপাল ॥
কতনা রাখিব কুচ নেতে ওহাডিআঁ।
নিদয় হৃদয় কাহ্ন না গেলা বোলাইআঁ।
শৈশবের নেহা বড়ায়ি কেনা বিহডাইল।
প্রাণনাথ কাহ্ন মোর এভোঁ ঘর নাইল ॥
মুছিআঁ পেলাইবোঁ বড়ায়ি শিষের সিন্দুর।
বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শঙ্খচুর ॥
কাহ্ন বিণী সব খন পোড়এ পরাণী।
বিষাইল কাণ্ডের ঘাএ যেহেন হরিণী ॥
... ...
জেঠ মাস গেল আষাঢ় পরবেশ।
সামল মেঘে ছাইল দক্ষিণ প্রদেশ ॥
এভোঁ নাইল নিঠুর সে নান্দের নন্দন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণ ॥ [বিরহ, ৬৩]

'কদমফুল ফুটে ডাল নুইয়ে পড়েছে, এখনো বালগোপাল গোকুলে এলনা। আর কত বুক ঢেকে রাখব, নিঠুর হৃদয় কানু বলে গেল না। বড়াই, আমাদের শৈশবের প্রেমকে বিগড়ে দিল! প্রাণনাথ কেন ঘরে এল না? বড়াই, আমি সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেলব, বাহুর বলয়, শঙ্খ ভেঙে ফেলব। কানু বিনে সর্বদা পরাণ পোড়ে, বিষাক্ত-ক্ষত হরিণীর মত।......জ্যৈষ্ঠ গিয়ে আষাঢ় এল, দক্ষিণদিক শ্যামল মেঘে ভরে উঠল। এখনো নিষ্ঠুর নন্দ-নন্দন এলো না। বাসলীগণকবি বড়ু চণ্ডীদাস এ-গান করছেন।'

রাধার দুঃখ সহ্য করতে না পেরে বড়াই মথুরা এসে কৃষ্ণকে বোঝাচ্ছে, 'কানাই তোমার চরিত বোঝা ভাব, রাধা প্রেমামৃত আপনা থেকে হাতে পেয়ে উপেক্ষা করছ কেন ?—

আসুখিনী চন্দ্রাবলী বিকলী বিরহে।
এবেঁ তাক তেজিতে উচিত তোর নহে ॥ [বিরহ, ৬৮]

'এখন না এলে পরে বিরহে কাতর হবে। তার কারণে ভাত খাওনি, এখন শাক খেতে এত যত্ন কেন ? সোনার ঘট ভাঙলে জোড়া যায়, উত্তম জনের প্রেমও তদ্রূপ। যে অধম তার প্রেম মাটির ঘটের মত, ভাঙলে আর জোড়া যায় না। রাধা তার ঘরে বসে রইল, তুমিও মথুরায় এসে বসে রইলে। যাতায়াত করে আমারই প্রাণ আকুল।' [বিরহ, ৬৮]

অভিমানী কৃষ্ণের সুর অনেকটা নরম। বলছেন, 'বড়াই, আমায় জোর কোরোনা। তার নাম শুনে আর যেতে ইচ্ছা হয়না। তুমি জান সে কত দুঃখ দিয়েছে। এখন মনে ইচ্ছা হয়, আর কখনো তাকে না দেখি। বড়াই তুমি ফিরে যাও, রাধার জন্যে আমায় আর জোর কোরোনা।

কাটিল ঘাঅত নেম্বুরস দেহ কত।
তোহ্মার বিদিত মোরে রাধা বুইল যত ॥
এ ধন বসতী সব তেজিবাক পারী।
দুসহ বচন তাপ না সহে মুরারী ॥
মথুরা আইলাহো তেজি গোকুলের বাস।
মন কৈলোঁ করিবোঁ মো কংসের বিনাস ॥ [বিরহ, ৬৯]

'কাটা ঘায়ে কত নেবু রস দেবে ? রাধা যে কত কি বলেছে তুমিতো জান। ধন, বসতি সব ত্যাগ করতে পারি, দুঃসহ বচন-তাপ সহ্য হয় না। গোকুলের বাস ত্যাগ করে মথুরায় এলাম। মনে ইচ্ছা, কংসের বিনাশ সাধন করি।'

—এখানেই পুথি খণ্ডিত। পরবর্তী অংশে কৃষ্ণ মথুরা থেকে আর গোকুলে ফিরলেন কিনা জানা গেল না। কৃষ্ণের কথায় রাধার প্রতি উদাসীনতার পরিবর্তে যেন অভিমান বেশী ফুটে উঠেছে।

কাহিনীর উপকরণ

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাহিনীটিতে ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ইত্যাদির সহায়তা নিলেও, মুখ্য আখ্যায়িকার ভিত্তি লোকগাথা। দান, নৌকা, যমুনা, ভার, ছত্র, হার, বাণ, বংশী খণ্ডের আখ্যায়িকা অপৌরাণিক। বোধ হয় রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা অবলম্বনে এ ধরণের লোক-

গীতি বাংলার পল্লী অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। বৃন্দাবন এবং রাধা-বিরহ আখ্যায়িকাতেও পুরাণ-বর্ণিত কাহিনীকে কবি যথেষ্ট পরিবর্তন করেছেন। কাহিনীতে রতি রসেরই (erotic) প্রাধান্য। শৃঙ্গার বা রতিরসের এ চিত্রকে

রুচিবোধ ও উত্তরাধিকার

এ যুগের সংস্কারে অশ্লীল মনে হলেও বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ পর্যন্ত এমন রুচি সংস্কার গড়ে ওঠেনি। কবিরা দেবলীলার কাহিনীতে এই রসের পরিবেশনে তখন পর্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করতেন না। কামশাস্ত্রের সংস্কৃত গ্রন্থগুলি হালকবি (গাঁথা সপ্তসতীর সংকলক), কালিদাস, ভবভূতি, বাণভট্ট প্রমুখ সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্যের বিখ্যাত কবিদের রচনাগুলি, মন্দির গাত্রের মধ্যযুগীয় চিত্রাবলী (বিশেষ করে কোনারক ও খাজুরাহো চিত্র স্মরণীয়) ভারতীয় সংস্কৃতি ও রুচিবোধে অন্যান্য রসবোধের সঙ্গে রতি-রসকেও নিঃসঙ্কোচে প্রাধান্য দান করেছিল। তারই সুস্পষ্ট প্রভাব দ্বাদশ শতকে জয়দেবের গীতগোবিন্দে, পঞ্চদশ শতকে বিদ্যাপতির রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক পদগীতিতে, এই যুগের বড়ু চণ্ডীদাস রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে বা অষ্টাদশ শতকের ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদ প্রমুখ কবিদের বিদ্যাসুন্দর কাব্যে লক্ষিত হয়। বাংলাদেশে ৭ম-৯ম শতকের শিল্প নিদর্শন পাহাড়পুরের মন্দির গাত্রে সর্বপ্রাচীন রাধা কৃষ্ণের (?) যে

পাহাড়পুরের রাধা-কৃষ্ণ যুগল মূর্তি

যুগল মূর্তি পাওয়া গেছে তাও রতিরসেরই চিত্র। এই পটভূমিতে বড়ু চণ্ডীদাসকে বিচার করলে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের একজন বিশিষ্ট কবি হিসাবে তাঁকে স্বীকার করতে কুণ্ঠা জাগেনা।

সমগ্র কাহিনীটি তিনবৎসর কালের মধ্যে সংঘটিত। জন্মখণ্ড গ্রন্থের ভূমিকা। কাহিনী আরম্ভ তাম্বূল খণ্ড থেকে। তখন রাধা বারো বছরের বিবাহিতা কিশোরী।

কাহিনীর কাল ও পারম্পর্য

অবশ্য, বয়স কমিয়ে এগার বলেছেন এবং ধরাও পড়েছেন। রতিরসের সম্যক জ্ঞান না হলেও একেবারে অনভিজ্ঞা নন। কথাবার্তায় সেটা ধরা পড়ে।—এটি এক বসন্তের অথবা গ্রীষ্মের কথা, কিশোর কৃষ্ণ-প্রেরিত দূতী বড়াইকে কিশোরী রাধা রতিমিলন-প্রস্তাবে রেগে প্রহার করলেন। মাঝে কিছুকাল কেটেছে, কারণ দানখণ্ডে রাধা নিজেই বলছেন, 'আমার বয়স বারো, তের এখনো পেরোয়নি'। দানখণ্ডের ঘটনা গ্রীষ্ম সূচনায়। নৌকাখণ্ড বর্ষার কাহিনী। বসন্ত গ্রীষ্মে মথুরারাজ বৃন্দাবন-মথুরা পারাপারের জন্য যমুনায় সেতু করে দিতেন। বর্ষায় সেতু নেই, খেয়া পারাপারের

ব্যবস্থা। ভার এবং ছত্রখণ্ড শরতের কাহিনী। শরতের খররৌদ্রে ক্লান্ত রাধা নদীর ওপারে গিয়ে দুধ দৈ বইবার জন্য ভারী নিলেন। কৃষ্ণকে মাথায় ছত্র ধরতে বললেন। রাধা কিন্তু এই ছয় মাসেই কৃষ্ণের সঙ্গলাভে অনেক সেয়ানা হয়ে উঠেছেন। তাম্বুল খণ্ডে তিনি 'পরপুরুষ নেহা' তে উষ্মা প্রকাশ করেছেন, দান খণ্ডে তিনি প্রেমের কথা-চালাচালির খেলায় আকর্ষণ বোধ করেছেন, তখনো সমাজ-সংস্কারের ভয় ও লজ্জা প্রবল। নৌকাখণ্ডে কৃষ্ণসঙ্গ লাভে উৎসুকা, লোকভয়ও অনেকটা কমেছে। এখন কৃষ্ণের দোষ ঢেকে কথা বলতে শিখেছেন। ভার ও ছত্র খণ্ডেতো রাধাই কৃষ্ণকে প্রেমের খেলায় চালিত করছেন, যেন স্বাধীন-ভর্তৃকা নায়িকা তিনি। বৃন্দাবনখণ্ড পরবর্তী বসন্তের কাহিনী। কৃষ্ণের আহ্বানে বাসন্তীরাসে গোপীদের নিয়ে বৃন্দাবনের কুঞ্জে এসেছেন। কাহিনী পুরাণ থেকে নিয়ে প্রয়োজনমত বদল করেছেন। এর পর যমুনাখণ্ড ; বৃন্দাবন আর যমুনা খণ্ডের মাঝেও বোধ হয় বৎসর কালের ব্যবধান। এ অংশের কালীয়দমন, বস্ত্রহরণ কাহিনী পৌরাণিক। বাণখণ্ড কবিকল্পিত। বাণখণ্ডের রাধা আরও পরিণত মনের নায়িকা। তার বয়সও বেড়েছে. নিজেই বলছেন, চোদ্দ। বংশীখণ্ড বোধ হয় এর পরবর্তী গ্রীষ্মের কাহিনী। এটি সম্পূর্ণ প্রক্ষিপ্ত হওয়াও অসম্ভব নয়, পূর্বেই আলোচনা করেছি। এরপর রাধাবিরহ, একে একে বর্ষা, শরৎ বর্ণনা করেছেন,—আরও কয়েকমাসের ছবি ছিল বোধ হয়। তাহলে, মোটামুটি তিন বৎসর কালের কাহিনীই পাওয়া যাচ্ছে। বারো বছরের কিশোরী উদ্ভিন্ন-যৌবনা রাধা এবারে চতুর্দশী, যৌবন-বিরহের পরিণত বেদনা বোধের নায়িকা। মাঝে মাঝে প্রক্ষিপ্ত পদ থাকলেও সমগ্র কাহিনী-পরিকল্পনায় এক হাতের ছাপ সুস্পষ্ট। যে সংকল্প কিশোর কৃষ্ণ তাম্বুলখণ্ডে প্রথম গ্রহণ করেছেন, কাহিনীর বিবর্তনের মধ্যে তারই সংঘটন দেখানো হয়েছে।

কাহিনীর ভৌগোলিক পরিবেশ বর্ণনাতেও সঙ্গতির বিশেষ অভাব ছিল বলা চলেনা। রাধা ও কৃষ্ণ দুটি কিশোর কিশোরী গোয়ালাদের একটি ছোট বর্ধিষ্ণু জনপদ মথুরানগরে থাকত। রাধার স্বামী আইহন ওই গাঁয়েরই সঙ্গতিপন্ন গোয়ালা, সম্পর্কে যশোদার বোধ হয় জ্ঞাতিভাই। তাই রাধা ও কৃষ্ণের মাতুলানী ও ভাগ্নে সম্পর্ক নিয়ে এত পারস্পরিক কটাক্ষ। এ-ধরণের প্রেম বা পরিণয়-সম্পর্ক সমাজ-নিষিদ্ধ ছিল নিশ্চয়ই। গোকুলে গোয়ালাদের বাস। সকালে দুধ দৈ এর পসরা মাথায় নিয়ে গোপীরা দলবদ্ধ

ভৌগলিক অবস্থান

হয়ে যমুনা পেরিয়ে ওপারে মথুরার হাটে বেচা-কেনা করতে যেত। গোকুল ছাড়িয়ে এসে বৃন্দাবনের মনুষ্যবসতিহীন নির্জন বন ছিল। সেখানেই লোকচক্ষুর আড়ালে কৃষ্ণ-রাধা ও গোপীদের মিলনকুঞ্জ কল্পিত হয়েছে। যমুনা যখন বর্ষায় ভরে উঠত মাঝিরা খেয়া পারাপার করত। তারই ভিত্তিতে নৌকালীলার পরিকল্পনা। অন্য ঋতুতে যমুনায় স্রোত তীব্র থাকলেও জল কমে যেত। মথুরারাজ নদী পারাপারের সাঁকো বেঁধে দিতেন। যাত্রীরা হাঁটাপথে সেই সাঁকো দিয়ে যাতায়াত করত। নদী পেরিয়ে ওপারেও অনেকটা নির্জন বনপথ পেরিয়ে মথুরার হাটে পৌঁছাতে হত। গোকুল—বৃন্দাবনের বন—মথুরা এই পথের দূরত্ব শরতের রোদে ক্লান্তি আনলেও গোপীরা সকালে মথুরার হাটে গিয়ে কেনা-বেচা সেরে দুপুরে আবার গোকুলে নিজেদের ঘরে ফিরে আসতেন। নদীর গতি এখন পরিবর্তিত হয়ে গোকুল—বৃন্দাবন—মথুরা যমুনার একই পাড়ে চলে এসেছে। নইলে দূরত্ব মোটামুটি একই আছে। তবে স্বীকার করতে হয়, এখন যানবাহন সহজলভ্য হবার ফলেই হাঁটা পথের দূরত্বটা যাত্রীদের কাছে বেশী কষ্টকর মনে হবে। সুতরাং ভৌগলিক যে পরিবেশে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাহিনী বিন্যস্ত হয়েছে তার মধ্যে মোটামুটি সঙ্গতি রক্ষিত হয়েছে বলা যেতে পারে।

কাহিনীর চরিত্র তিনটি কৃষ্ণ, রাধা[১] এবং বড়াই। যশোদা একবার মাত্র অল্পক্ষণের জন্য সামনে এসেছেন, বৃন্দাবন গোপীরা রাধার সঙ্গে থাকলেও তাদের কারও পৃথক চরিত্র-চিত্র অঙ্কিত হয়নি। কৃষ্ণ কবির চোখে ভগবানের অবতার হলেও গ্রাম্য একটি প্রাণবন্ত কিশোর রূপে অঙ্কিত করেছেন। তার সরলতা, উদ্ভিন্ন যৌবন কিশোর সুলভ রতি মিলনাকাঙ্খা, বাঁশির প্রতি অনুরাগ, প্রেমিকার প্রতি অভিমান,—সব মিলিয়ে অমার্জিত দুরন্ত একটি গ্রাম্য তরুণ যুবকের ছবিই ফুটে উঠেছে। তিন বৎসরের কাহিনীর মধ্যে কৃষ্ণচরিত্রের কিছুটা বিবর্তন ঘটেছে ঠিকই। প্রথম সে তীব্র আসক্তি নিয়ে সে রাধার কাছ থেকে রতি-মিলন দাবী

চরিত্র

কৃষ্ণ

১। পদাবলী গানে রাধা ও চন্দ্রাবলী কৃষ্ণলীলায় নায়িকা ও প্রতি নায়িকা—দুই ভিন্ন চরিত্র। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধাই চন্দ্রাবলী। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে রাধার নামান্তর চন্দ্রাবলী। সম্ভবতঃ এই পুরাণটি থেকেই বড়ু চণ্ডীদাস বেশী সাহায্য নিয়েছিলেন। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে কালীয় দমন, বস্ত্রহরণ, রাস প্রভৃতি লীলার বর্ণনা আছে। রাধার স্পষ্ট নামোল্লেখও রয়েছে। ভাগবতে রাধা নামের উল্লেখ নেই।

করেছে, কৌতূহল এবং প্রথম উচ্ছ্বাস চলে যাবার পর যেন সেই তীব্রতায় ভাটা প'ড়েছে। রাধার ব্যবহারে তার অভিমান এসেছে ঠিক, কিন্তু রাধা তো সব অভিমান ত্যাগ করে কৃষ্ণের কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েছিল,—তবু কৃষ্ণকে দূরে সরে যেতে হল কেন? নিছক অভিমান না প্রেমরতির ক্ষেত্রে পুরাতন উৎসাহের অভাব। তবে কৃষ্ণ চরিত্রের মানস পরিবর্তনের ছবিটি তত উজ্জ্বল হয়নি। যতটা রাধার ক্ষেত্রে হয়েছে। রাধাও গ্রাম্য অমার্জিত রুচির গোপ কিশোরী। 'মাণ্ডকিলে' কৃষ্ণকে শায়েস্তা করতে চান, আবার নৌকাখণ্ডে রতিমিলনে সহজ ভাবেই সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। তার কিশোরী মনের নীতিগত সংস্কার ও লোকলজ্জা পেরিয়ে পরপুরুষের সঙ্গে রতির মানস বিবর্তনটি কবি বেশ দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। মুখরা তর্ক-নিপুণা কিশোরী রতি বিষয়ে এবং পরকীয়া রতিতে সাংসারিক ও সামাজিক প্রতিক্রিয়া বিষয়ে প্রথম থেকেই যথেষ্ট অভিজ্ঞার মত ব্যবহার করেছেন, তবে কৃষ্ণের আহ্বানে সাড়া দেবার মতো মনের প্রস্তুতি ঘটতে কয়েকটি ঘটনাগত স্তর উত্তীর্ণ হবার প্রয়োজন ছিল। কবি বিশেষ নৈপুণ্যের সঙ্গে সেই স্তরগুলি দেখিয়ে-ছেন। বড়াই বুড়ী গ্রাম্য কুট্টনী জাতীয় একটি সুন্দর চরিত্র। সম্পর্কে সে রাধার দিদিমা হয়। কবি জন্মখণ্ডেই তার ছবি দিয়েছেন,—

রাধা

বড়াই

শেত চামর সম কেশে।
কপাল ভাঙ্গিল দুই পাশে॥
ভ্রূহি চুনরেখ যেহু দেখি।
কোটর বাটুল দুই আখি॥
সাহাপুট নাশা দন্তহীনে
উন্নত গণ্ড কপোল খীনে॥
বিকট দন্ত কপট বাণী।
ওঠ আধর উঠক জিনী॥
কাঠী সম বাহুযুগলে।
নাভিমূলে দুই কুচ লুলে।
কুটিল গমন ঘন কাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ [জন্ম, ২]

'কেশ শ্বেতচামরসম, কপালের দুপাশ ভেঙ্গে গেছে, ভ্রূ যেন চুনের রেখা, চোখদুটি গর্তের মধ্যে বলের মত। নাকে বিরাট ফুটো কিন্তু দন্তহীন, (বোধ হয় নাকের হাড়টি বসানো)। গাল তোবড়ানো, ছোট কপোল। বিকট দন্ত, কথা কপট। ওষ্ঠ অধরকে ছাড়িয়ে উঠেছে। বাহু দুইটি কাঠির মত সরু, স্তনদ্বয় নাভীমূল পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে। ঘন ঘন কাশতে কাশতে এলো-মেলো পায়ে হাটে। বড়ূচণ্ডীদাস গাইছেন।'

চেহারা এমন হলেও মন তার কুটিল নয়। অল্পেই চটে যায় যেমন, অল্পেই রাধা বা কৃষ্ণের দুঃখে গলে যায়। সরলা, সহানুভূতি সম্পন্না। দুটি কিশোর-কিশোরীর রতিমিলনে দৌত্য করতে সে যথার্থ আনন্দ পায়। তৎকালীন সমাজ জীবনের সে একটি জীবন্ত চরিত্র। কবি যথাসম্ভব নিপুণ হাতেই তাঁকে এঁকেছেন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের গীতি-নাট্য জাতীয় আঙ্গিকে রচিত হয়েছিল সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই। কবি যথাসম্ভব চরিত্রগুলির মুখে কথা দিয়েছেন। 'লগনী' অংশগুলি স্পষ্টতই উক্তি প্রত্যুক্তিমূলক নাট্যসংলাপ। তবে সবই গানের পদ। সুর সহযোগেই সংলাপগুলি এবং বর্ণনা অংশগুলি পরিবেশিত হত। গানের পদ হিসাবে কোড়া, বরাড়ী, গুর্জরী, পাহাড়ী, দেশাগ, ধানুষী, মালব, বেলাবলী, রামগিরি, কেদার, ভাটিয়ালী, বসন্ত, আহের, বিভাষ, ভৈরবী, ললিত, বঙ্গাল, মল্লার, কহ্নু, শ্রী প্রভৃতি রাগের উল্লেখ করা হয়েছে। এর কিছু কিছু রাগ এখনও প্রচলিত, অপ্রচলিত রাগগুলির বিষয়ে সঙ্গীত বিশেষজ্ঞেরা আলোকপাত করলে ভাল হয়। কয়েকটি রাগের নাম কেবলমাত্র রাধা-বিরহ খণ্ডেই মিলছে। পূর্ববর্তী খণ্ডগুলি থেকে এই খণ্ডের রচনা-কালের কোনও পার্থক্য এর থেকে সূচিত হয় কিনা ভেবে দেখবার বিষয়। পদ-গীতিগুলির তাল ও অন্যবিধ আঙ্গিক বিচারেও বোধ হয় ভিন্ন ভিন্ন নামের ব্যবহার হত। রূপক, লগনী, চিত্রক, ক্রীড়া, যতি, একতালী, আঠতালী, লঘুশেখর, কুড়ূক্, রূপকম্বা, যতির্বা প্রভৃতি নামের ব্যবহার হয়েছে।

আঙ্গিক

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষাকে আদিমধ্যযুগের (১৩০০—১৫০০ খৃ) ভাষা-নিদর্শন রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এর ধ্বনি উচ্চারণ বিষয়ক এবং রূপ-গঠন বিষয়ক মুখ্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা যেতে পারে।

লিপি নিদর্শন এবং বানান দেখে মনে হয়, লিপিকারেরা (হয়তো কবি স্বয়ংও) সে যুগের লিখিত কবিভাষার সঙ্গে উচ্চারিত ভাষারূপকেই অনেকটা মিলিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। সংস্কৃতানুগ বানানের প্রতিও যথেষ্ট শৈথিল্য ছিল।

ধ্বনিতত্ত্ব

(১) প্রাকৃত ও অপভ্রংশের উচ্চারণ-আদর্শে 'অ' ধ্বনির হ্রস্ব 'আ' এবং 'আ' ধ্বনির দীর্ঘ 'আ' উচ্চারণ তখনো বাংলা ভাষায় কিছুটা ছিল দেখা যায়। যেমন,

'আ' ধ্বনির ব্যবহার

দিআ **মাহাদান** (দান, ৫)

আনেক সমএ (দান, ৫)

আতি সে **আবুধি** (দান, ২২) ইত্যাদি

'অ' হ্রস্ব 'আ'-এর মতন উচ্চারিত হত বলেই এখানে বানানেও 'মাহা', আনেক আতি, আবুধি এসেছে। তেমনি আবার,—

বাপ বস্থল মোর (দান, ২০)

না কর আল রাধা (দান, ৮৭)

আসিআঁ বিবাহিল মথুরা গমনে (বৃন্দাবন ২১)

ইত্যাদি।

এসব দৃষ্টান্তে 'আ' দীর্ঘরূপে উচ্চারিত হয়েছে। ক্রমরূপত, এ, ও, প্রভৃতি সংস্কৃত ও প্রাকৃতের দীর্ঘস্বর শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে অনেক সময় দীর্ঘ উচ্চারণে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন,—

দীর্ঘস্বর

নীল জলদ সম কুন্তল ভারা (দান, ৩৮)

কে বোলে গদাধর **কে** বোলে কাহ্ন (দান, ৫০)

তোর বিরহে চিত্ত বেআকুল (দান, ৫২) ইত্যাদি।

(২) উদ্বৃত্তস্বর তখনো শব্দ শেষে অনেকটা রক্ষিত হত। যেমন,—

উদ্বৃত্তস্বর

আঁচলে না ধরে কহ্নে ভয়ে কাপে **গাঅ** (দান, ৯০)

কংস **রাঅ** তোকে মারিব সম্বন্ধ শুনী (দান, ২২)

আম্মে **জাইএ** দধি বিকে (দান, ৪০)

দ্বিতীয় উদাহরণটিতে 'য়'-এর উচ্চারণ যে 'অ' তে রূপান্তরিত হত তার দৃষ্টান্ত মিলছে।

(৩) প্রাকৃতে দুই ভিন্ন ব্যঞ্জনের যুক্তবর্ণ এক ব্যঞ্জনের দ্বিত্বে রূপ নিয়েছিল। বাংলায় ধীরে ধীরে সেই দ্বিত্ব অ-যুক্ত বর্ণের রূপ নেয়।

ব্যঞ্জনের সমদ্বিত্ব

এযুগে প্রাকৃত প্রভাবিত এক ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব রূপ সর্বনামে দৃষ্ট হয়। যেমন,

আহ্মে, আহ্মারে, তোহ্মে, তোহ্মারে; সম্মে, সহ্মারে ইত্যাদি। তাছাড়া এই সব উচ্চারণে, বা অন্য শব্দের উচ্চারণেও মহাপ্রাণ ধ্বনি-প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। আম্হে, তোমহে, কাহ্ন, কাহ্নাঞি, তেহ্ন, মাহ্লী, কেহ্নে ইত্যাদি শব্দ লক্ষণীয়।

(৪) পাশাপাশি দুই স্বরধ্বনির এক যুগ্মস্বরে (dipthong) সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ বাংলা বাক্‌রীতির প্রভাব সূচিত করে।

সংশ্লিষ্ট যুগ্মস্বর

যেমন,—

মাউলানীর যৌবনে কাহ্নের মন (দান, ২১)
কেন না চিহ্নসি আহ্মা **আইহনের** বাণী (দান, ৪২)
কাহ্নাইক বুইল বডায়ি মধুর বচন (বিরহ, ৫০)

গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে (বিরহ, ৪৯)

বাঁশীর শবদেঁ মো **আউলাইল** রান্ধন (বংশী, ২)

এখানে কয়েকটি পংক্তিতে একই সঙ্গে স্বরধ্বনির উচ্চারণ-সংশ্লিষ্টতা এবং উচ্চারণ-বিশ্লিষ্টতার (উপরে—চিহ্ন দ্বারা বোঝানো হল) দৃষ্টান্ত পাওয়া যাচ্ছে।

(৫) প্রাকৃত অপভ্রংশ-প্রভাবিত আনুনাসিক উচ্চারণ এবং বানানে চন্দ্রবিন্দু ব্যবহার শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে খুব বেশী হয়েছে। দু-একটি উদাহরণ দিই।—

আনুনাসিক উচ্চারণ

পাঁতরে (প্রান্তরে), হআঁ (হইয়া), কাহ্নাঞি (কানাই), এতেকেঁ (ইহাতে) জাওঁ (যাই), ভৈলোঁ (হইলাম), আমিআঁ (অমৃত), নাম্বাইতেঁ (নামাইতে), মাঝেঁ (মধ্যে), ভকতীএঁ (ভক্তি করে), তোঁ (তুই), রতীএঁ (রতিতে) ইত্যাদি।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, উত্তম পুরুষে ক্রিয়াপদে এবং অসমাপিকা ক্রিয়াতে চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার-প্রবণতা দেখা যায়। উত্তম পুরুষে: আছিলোঁ।

(ছিলাম), পাঠাইলোঁ (পাঠাইলাম), কৈলোঁ (করিলাম) ইত্যাদি। অসমাপিকা ক্রিয়ায় : খাআঁ (খাইয়া), হইআঁ, শুনিলেঁ, দেখিআঁ, মেলিআঁ (মিলিত হইয়া) ইত্যাদি।

(৬) বিপ্রকর্ষ, স্বরসঙ্গতি, যুক্তবর্ণের একটি লোপ ইত্যাদি আরও নানা ধ্বনিগত পরিবর্তন লক্ষিত হয়। কয়েকটি এখানে উদ্ধৃত করি।—

বিপ্রকর্ষ, স্বরসঙ্গতি ইত্যাদি

বিপ্রকর্ষ : মুগধী, আরতি (আর্তি), পরাণ, সনেহে (স্নেহে), আলপ (অল্প), আলগল (আল্‌গা করিল) ইত্যাদি। যুক্তবর্ণের একটি লোপ : বুধি (বুদ্ধি), আঠ (অষ্ট), আধ (অর্ধ), আখর (অক্ষর) ইত্যাদি স্বরসঙ্গতি : সোআদ (স্বাদ), সুঅরী (স্মরণ করে), লেখে (মনে করে), লখিমী (লক্ষ্মী) রসন (রসনা); রহিল। ইত্যাদি।

রূপতত্ত্ব

গঠনরূপের বিচারে (১) সে যুগের ভাষায় ঈ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গের রূপ যথেষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। যেমন,—

লিঙ্গ

বিশেষ্যপদে এগার বৎসরের বালী।

যেহ্ন নলিনীদল কোঁঅলী॥ (দান, ৪)

বিশেষণ পদে : কমল বদনী রাধা হরিণ নয়নী (দান, ২৬)

বিশেষ্য ও বিশেষণ পদে : কোঁঅলী পাতলী বালী আহ্মে চন্দ্রাবলী

[দান, ১০৫]

বিশেষণ পদে : রাধা নাগরী গোআলী [বংশী, ২৭]

ক্রিয়াপদে : বুঢী মেলিল আসিআঁ [হার, ৫]

রাধা লআঁ গেলী ঘর [হার, ৫]

তরাসে পড়িলী রাধা [ঐ]

রাধা বিরহে বিকলী [ঐ]

এখানে ব্রজবুলি পদের সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

(২) সংস্কৃতে দ্বিবচন আছে। প্রাকৃত অপভ্রংশ বা বাংলায় দ্বিবচন লুপ্ত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে অনেক সময় একবচন বহুবচনেও একই রূপ (বিশেষ করে সর্বনামে,) লক্ষিত হয়।—যেমন,

বচন

এক বচনে (কর্তা) ত্রিভুবননাথ তোহ্মে হরী (কালিয়দমন, ৭)

বহুবচনে (কর্তা) : সা কাল চল **তোহ্মে** দক্ষিণ সাগরে (ঐ, ৮)

একবচনে (**সম্বন্ধে**) : **তোহ্মার** তনয় আহ্মে নান্দের নন্দন (হার, ৪)

বহুবচনে (সম্বন্ধে) : **তোহ্মার** বসন হের আহ্মার হাতে (যমুনা, ২০)

এছাড়া বহু বচনে রা, রে, সবে, সব জন, সঅল, সহ্মে প্রভৃতি বিভক্তি-অনুসর্গের ব্যবহার লক্ষিত হয়।

তোহ্মারা কেহ্নে তরাসিল মনে (কালিয়, ১)

আহ্মারে দিলে আতএ (বৃন্দাবন, ৩)

আহ্মে সখি **সব** (যমুনা, ৯)

সখি **জন** লআ (হার, ১)

স**খিগণ** আনাইল (যমুনা, ১৯)

সঅল ফুল লআঁ (বৃন্দাবন, ২) ইত্যাদি।

বিভক্তি অনুসর্গ

বিভক্তিরূপের বিশদ আলোচনা সম্ভব নয়। কিছু উদাহরণ দিচ্ছি।—

কর্তায় 'এ'— **তোহ্মে** জল, **তোহ্মে** থল, **তোহ্মে** বন গিরী (কালিয়, ৭)

অবশ্য, কর্তায় বিভক্তি শূন্য রূপই বেশী ব্যবহৃত হয়েছে।

কর্মে 'ক'—প্রথমত কংশে **পুতনাক** নিয়োজিল (জন্ম, ৬)

সে কেহ্নে **আহ্মাকে** বহাএ দাধ ভাবে (ভাব, ১)

এখানে আহ্মাক 'আমাদ্বারা' এই অর্থে ধরলে করণ কারকের উদাহরণ হবে এটি।

অপাদানে 'হতেঁ' তে, ত :

এবে **হতেঁ** দৈবকীর যত গর্ভ হএ (জন্ম, ৪)

জলতে উঠিলী বাহী আধ কর্রি তলে (যমুনা, ২১)

মাঅ **বাপত** বড গুরু জন নাহী (হার ৩)

সম্বন্ধে ত, র, এর : কণ্ঠদেশ দেখিআঁ **শঙ্খত** ভৈল লাজে (তাম্বুল, ৪)

পদুমিনী **আহ্মার** নাতিনী রাধা নামা (ঐ, ৪)

গোচরিল রাধা মোর **মাএর** চরণে (বাণ, ১)

সপ্তমীতে ক, ত, এ, তে :

এ **থানক** আইলা বড়ায়ি আহ্মার ভাগে (তাম্বুল, ৫)

আহ্মার **হাথত** দেহ কিছু ফুল পানে (ঐ, ৬)

তোহ্মাতে মজিল চিত ধরিতেঁ না পারী (দান, ২৬)

ক্রিয়ারূপ কাল

ক্রিয়ারূপের দু-একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।—

বর্তমান : আতী বুঢ়ী না **দেখোঁ** (দেখি : উত্তমপুরুষ) নয়নে (দান, ১১০)

(সাধারণ) **উপসন্ন হৈল** হের বরিষা সমএ (নৌকা, ১), যৌগিক ক্রিয়া।

(পুরাঘটিত) হারমোর **ছিণ্ডি নিলেঁ** বাহের কঙ্কন (দান, ৭৮), যৌগিক ক্রিয়া। আনেক ফুল **তুলিলেঁ** (বৃন্দাবন, ২২)

ভবিষ্যৎ : নাঅ বাহ্মিতেঁ গিয়া **করিউ** (করিব, উত্তমপুরুষ) যতনে (নৌকা ১)

(সাধারণ) তবে না **পড়িব** রাধা কাহ্নাঞিঁর হাথে (নৌকা, ১)

এবার তোহ্মাক লআঁ **যাইব** আন পথে (নৌকা, ১)

(অনুজ্ঞা): না **তুলিহ** জলের উপরে (নৌকা, ২৬)

অহিত না **বোলোঁ** মোএঁ রাধা ল (নৌকা, ৩)

অতীত : আয়াসেঁ কাহ্নের উরে **শুতিলোঁ** (শুয়েছিলাম) দিঞাঁ শিয়রে (রাধাবিরহ, ৬১)

(সাধারণ, ঘটমান **আছিলা** বাল গোপাল (ঐ, ৫৫)

পুরাঘটিত) তার সনে নেহ **বাঢ়ায়িলোঁ** (ঐ, ১৩)

যবে কাহ্ন **চাহিলে** (চেয়েছিল) সুরতী।

মো তবেঁ **আছিলোঁ** (ছিলাম) শিশুমতী॥

নিত্যবৃত্ত এবেঁ মোঞঁ **ভৈলোঁ** (হলাম) ভর যুবতী। (ঐ, ২১)

(ঘটমান) যা দেখিআ। কাহ্নাঞিঁ **করন্তি** যতন (দান, ৬০)

যৌগিক ক্রিয়া, নামধাতু প্রভৃতির যথেষ্টই ব্যবহার লক্ষিত হয়। যেমন :

যৌগিক ক্রিয়া

যৌগিক ক্রিয়া : আনিআঁ দিবোঁ, লঞঁ গেল, দরশন ভৈল, তুলিঞাঁ দেখ ইত্যাদি। নামধাতু : চুম্বিলা, মুকুলিল, চিহ্নিল, মুণ্ডিয়া (মুণ্ডন করিয়া), কিলাআঁ বান্ধিঞাঁ রাখ ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে তদ্ভব ও তৎসম শব্দই বেশী। অনার্য দ্রাবিড় শব্দ (কাল, নীর, পূজা, মলয়, মীন, মুকুট ইত্যাদি) এবং অষ্ট্রিক শব্দ (কদলী, গঙ্গা, ডমরু, তাম্বুল, নারিকেল, পণ : (সংখ্যাবাচক), বাণ, মুকুট, ময়ূর ইত্যাদি বেশ কিছু রয়েছে।

শব্দ-উচ্চারণ

কামান, মজুর, মজুরিআ, খরমুজা, রাঙ্ক ইত্যাদি আরবী পারশী শব্দেও কিছু কিছু প্রবেশ করেছে। বানান অনেকটা উচ্চারণানুগ বলেই আদি-মধ্যযুগের তদ্ভব ও অর্ধতৎসম শব্দের বহু দৃষ্টান্ত লক্ষিত হয়।

অলঙ্কার প্রসঙ্গ

শব্দালঙ্কার

জয়দেব বিদ্যাপতি বা বৈষ্ণবপদের অপর কবিদের মত বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও অলঙ্কারের ঐশ্বর্য চোখে পড়ে। উপমা রূপক, দৃষ্টান্ত, ব্যতিরেক, অপ্রস্তুত প্রশংসা ইত্যাদি বহুবিধ অলঙ্কারের সু-প্রয়োগ রাধা-কৃষ্ণের উক্তি-প্রত্যুক্তিগুলিকে বিদ্যুৎ ঝলকে যেন উদ্ভাসিত করে তুলেছে। শব্দালঙ্কার নিয়ে পদাবলীর কবিরা অনেক সময় কিছুটা বাড়াবাড়ি করেছেন,—এখানে শব্দালঙ্কারের সেই স্থূলতা কবি যেন সযত্নে পরিহার করেছেন। মাঝে মাঝে চমৎকারী দু-একটি পংক্তি এসে পড়েছে, কিন্তু সে আপনা থেকেই এসেছে, কৃত্রিম প্রয়াসের ছাপ সেখানে নেই। যেমন—,

কাল কাহ্নাঞিঁ তোহ্মে আহ্মা না উপেখ।
কামে আন্ধল হুআঁ বাট নাহি দেখ॥
কাল শরীর কাহ্নাঞিঁ কাল তোর মন।
দান ছলেঁ বাট পাড় সবক্ষণ॥ [দান, ৬৫]

এখানে অ, আ, ক, হ্ন, এবং নাসিক্যধ্বনির সূক্ষ্ম অনুপ্রাস লক্ষণীয়।

কোঅঁলী পাতলী বালী আহ্মে চন্দ্রাবলী।
ভএ কাম্পো যেহ্ন নব কদলীর বালী॥ [দান, ১০৫]

এখানেও অলী/আলী, অ/আ, হ্ন/ন ধ্বনিগুলির সূক্ষ্ম অনুরণন লক্ষণীয়।

অর্থালঙ্কার

অর্থালঙ্কারেরও বিশদ ফিরিস্তি না দিয়ে অলঙ্কৃত দু-একটি পদ-নিদর্শন উদ্ধৃত করাই শ্রেয় মনে করি।—

তিরীর যৌবন বাতির সপন যেহ্ন নদীকের বাণে।
আপন পুনে উত্তম জনে হাথে তুলিআঁ দেহ দানে॥
নানা তরুবর যে ফল ফলে আপণে তাক না ভখে।
সংসার আসার পর উপকার করিলেঁ কিরীত থাকে॥
গোআল জাতী তোঁ ভর যুবতী নিতি বিকে যাসি হাটে।
তোর রূপ দেখি সবজন মোহে মঞ্জরে সুখান কাঠে॥
আহ্মে দামোদর বিরহে কাতর তোর সুরতির আশে।
বাসলী চরণ শিরে বন্দিআঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ [দান, ৭৯]

এখানে উপমা, দৃষ্টান্ত, অতিশয়োক্তি—নানা ধরণের অলঙ্কারের স্পর্শে রাধা-প্রেমাকাঙ্খী কৃষ্ণের বক্তব্যটি কবি সঞ্জীবিত করে তুলেছেন।

আর একটি পদে রাধা কৃষ্ণকে রতিকামনা থেকে নিবৃত্ত করতে গিয়ে বলেছেন,—

উচিত কমলে ভোগ করএ ভ্রমরে।
আহ্মার মুকুলে না পায় মধুভরে॥
ইচলা খাআঁ কাহ্ন বার পাড়িবে।
আঘোর পাপেঁ তোএ গায় বেআপিবেঁ
পরদার স্থরতী করিতেঁ না জুআএ।
ভাতের ভোখ কাহ্নাঞিঁ ফলেঁ না পালাএ॥
একবার রতীএঁ মদন বাঢ়ে চিতে।
প্রজ্বল আনল কাহাঞিঁ না নিবাএ ঘৃতে॥ [দান, ১০১]

'কমল ফুটলেই (উচিত কমলে) ভ্রমর ভোগ করে। আমার এই (অপ্রস্ফুটিত) মুকুলে এক ফোটা মধু পাবে না। ইচলা (ছোট মাছ) খেয়ে কানু ব্রত ভাঙবে কেন? ঘোর পাপ তোর গায়ে লাগবে। পরদার-স্থরতি তোর যোগ্য নয়। কানাই, ভাতের ক্ষুধা কি ফলে যায়? একবার রতিতে চিত্তের মদন (কাম আকাঙ্খা) বৃদ্ধি পায়। কানাই, প্রজ্জ্বলিত অনল ঘৃতে নিভানো যায় না।'

এর মধ্যে বিম্ব-প্রতিবিম্ব, না বস্তু-প্রতিবস্তু ভাব রয়েছে তা'নিয়ে চুলচেরা বিতর্ক অবাস্তব। অলঙ্কৃত চমৎকারী উপমার দ্বারা বুদ্ধিমতী রাধা যে ভাবে কামলোলুপ কৃষ্ণকে নিবৃত্ত করতে চাইলেন সেই কবিত্বময় বচন-চাতুর্য লক্ষণীয়। রাধাবিরহের আর একটি পদ উদ্ধৃত করি।—

দিনের স্থরুজ পোড়াআঁ মারে রতিহো এ দুখ চান্দে।
কেমনে সহিব পরাণে বড়ায়ি চখুত নাইসে নিন্দে॥
শীতল চন্দন আঙ্গে বুলাও তভোঁ বিরহ না টুটে।
মদনী বিদার দেউ গো বড়ায়ি লুকাও তাহার পেটে॥
আল। দহে পৈস্থ কাল দূতী।
উথার্আ পাথার্আ আহ্মা আনিল নিফলে পোহাইল রাতী॥
... ...
একে দহদহ ঘসির আগুণ আরে কেনা জালে ফুকে॥
ভিড়ি আলিঙ্গন দিতেঁ না পাইলোঁ এ শাল থাকিল বুকে॥
[বিরহ, ১৮]

'দিনে সুখ পুড়িয়ে মারে, রাতে চাঁদ দুঃখ দেয়। বড়াই, প্রাণে কি করে সহ্য করি, চোখে নিদ আসে না। শীতল চন্দন অঙ্গে বুলাই (স্নিগ্ধতার আশায়) তবুও বিরহ টুটে না। বড়াই, মেদিনী বিদীর্ণ হোক, তার পেটে লুকাই। ওগো দূতী. কাল দহে প্রবেশ করলাম। উথাল পাথাল (ঢেউ) আমায় ফিরিয়ে আনল, নিস্ফল রাত কাটাই। ঘসিব আগুন একে দগদগ করে, তাতে আবার কে যেন জ্বাল ও ফুক দিচ্ছে। কাছে গিয়েও আলিঙ্গন দিতে পারলাম না,—এই শাল বুকে রইল।' এখানে তুলনামূলক উপমাধর্মী একাধিক অলঙ্কারের সমাবেশ রাধার প্রেম-বিরহের ছবিটিকে বেদনার তীব্রতা দিয়েছে।

বড়ু চণ্ডীদাস এমন অসংখ্য অপূর্ব সৌন্দর্যময় অলঙ্কারের ব্যবহারে তার কাব্যকে সমৃদ্ধ চিত্রময় করে তুলেছেন। অধিকাংশ অলঙ্কারই পূর্বসূরী সংস্কৃত-প্রাকৃতের কবিদের কাছ থেকে নিয়েছেন, তবে মাঝে মাঝে নূতন চমৎকার উপমাও এসেছে। উপরে 'দহদহ ঘসিব আগুনের উপমা, বা হাংপুরে উদ্ধৃত 'পোড়ে মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পনী' (বংশী, ৪)-এর উপমা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

ছন্দ পরিচয়

বাংলা ছন্দের ইতিহাসে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের ছন্দের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এর পূর্বেকার একমাত্র বাংলা পদ্য-নিদর্শন যে চর্যাপদগুলি পাওয়া গেছে সেখানে মাত্রাবৃত্তের প্রাচীন রূপটি মিলছে। বিদ্যাপতির মৈথিল প্রভাবিত ব্রজবুলি পদগুলিও মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেই প্রথম বাংলা অক্ষরবৃত্তের নিদর্শন পাওয়া গেল।

অক্ষরবৃত্তের বৈশিষ্ট্য

অক্ষরবৃত্তের আধুনিক রূপের আদর্শটি সপ্তম অধ্যায়ে ছন্দ-আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি। এ ছন্দও মাত্রাবৃত্তের ন্যায় কাল বা কলা-মাত্রিক (moric)। রুদ্ধদল (closed syllable) শব্দ প্রান্তে দ্বিকলা, অন্যত্র সাধারণত এককলা। যতি সাধারণত জোড় মাত্রায়, আট দশ বা ছয় মাত্রার পর আসে। শব্দ বিন্যাসে বিজোড় মাত্রিক শব্দের পর বিজোড় মাত্রিক, জোড় মাত্রিক শব্দের পর জোড় মাত্রিক শব্দ বসে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রাথমিক অক্ষরবৃত্ত

এই ছন্দ-রীতির প্রাথমিক নির্মীয়মান স্তরটির নিদর্শন মিলছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে। উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি কম বেশী সবই সেখানে ফুটে উঠেছে। তবে উচ্চারণগত শৈথিল্যও যথেষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। এর কারণ, পদাবলীর ক্ষেত্রে যা বলা হয়েছে. এখানেও তাই। পালাভাগে গ্রথিত পদগুলি সে যুগে গায়ক কর্তৃক সুর সহযোগে গীত হত।

সুতরাং অনেক ক্ষেত্রেই পাঠ্য কবিতার আদর্শে যে সব ছন্দ-দুর্বলতা লক্ষিত হয়, সেগুলি সুরের মাধ্যমে পরিপূরণ তখন সম্ভব ছিল। অক্ষরবৃত্তের আধুনিক উচ্চারণ আদর্শে বিচার করলে দেখা যাবে কোথাও কোথাও শব্দ সূচনায় বা মধ্যে রুদ্ধদল দ্বিকলার মর্যাদা পেয়েছে, যেটি স্বাভাবিক উচ্চারণে এককলা রূপে গণ্য হওয়া উচিত। কোথাও বা, সংস্কৃত-প্রাকৃত উচ্চারণরীতির প্রভাবে গুরু মুক্তদলেরও (আ, ঈ, ঊ, এ, ও) দ্বিকলা উচ্চারণ রয়ে গেছে, বাংলা উচ্চারণে যেগুলি লঘুরূপেই গণ্য হওয়া উচিত। এগুলি অক্ষরবৃত্তের সংশ্লিষ্ট পঠনভঙ্গির আদর্শ বিরোধী বিশ্লিষ্ট উচ্চারণের নিদর্শন। অন্যদিকে অতি সংশ্লিষ্টতারও নিদর্শন মেলে। শব্দপ্রান্তিক রুদ্ধদল অক্ষরবৃত্তে দ্বিকলা উচ্চারণের মর্যাদা পায়, কবি অনেক সময় এ গুলিকেও ঠেশে, অতি সংশ্লিষ্ট ভাবে এক কলার উচ্চারণ দিয়েছেন। তবে এ সব ব্যতিক্রম দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও অক্ষরবৃত্তের মূল উচ্চারণ রীতি ও কাঠামো শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে স্পষ্ট ভাবেই ফুটে উঠেছে সন্দেহ নেই, কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বক্তব্য স্পষ্ট করা যাক।

শুধুমাত্র অক্ষরবৃত্তের স্বাভাবিক উচ্চারণ বিরোধী ব্যতিক্রম দৃষ্টান্ত বোঝাতে বিশেষ দ্বিকলা দলের (syllable) উপরে ‖ চিহ্ন এবং রুদ্ধ অতি-সংশ্লিষ্ট দলের উপরে । চিহ্ন দেওয়া হল। শব্দের পাশে । দণ্ডচিহ্ন পদযতি-সূচক।

দৃষ্টান্ত

নানা মাপের দ্বিপদাবন্ধ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ব্যবহৃত হয়েছে দেখতে পাই। যেমন,—

দ্বিপদী : ৮।৬ মাত্রার পয়ারবন্ধ

তোর ভাঁগে দিল রাধা | রতি আনুমতী।
হরিষ করিআঁ তার | মাথে ধর ছাতী ॥
‖
আলপ কাম কৈলেঁ | হৈব বড় কাজ।
।
এ হাত না করিহ কাহ্ন | মনে কিছু লাজ ॥
… … …
ঝাঁট করী রাধার মা | থাত ধর ছাতী।
। ‖
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস | বাসলী গতী ॥ [ছত্র, ৩৫]

এ-অংশে প্রাচীন অক্ষরবৃত্তের প্রায় সমস্ত বৈশিষ্ট্যই প্রতিফলিত হয়েছে। প্রথম দুটি পংক্তিতো বিশুদ্ধ আধুনিক অক্ষরবৃত্তেও খাপ খাওয়ানো যেতে পারে।—দুটি রুদ্ধদল শব্দ (তোর, তার), দুটিই একদল (mono-syllabic) শব্দ, দ্বিকলা উচ্চারণ। তৃতীয় পংক্তির 'আলপ' শব্দে 'আ' শব্দ সূচনায় গুরু দ্বিকলা হয়েছে, স্বাভাবিক ভাবে লঘু এককলা হওয়া উচিত। অনুরূপ ষষ্ঠ পংক্তির 'বাসলী' শব্দে 'বা' গুরু দ্বিকলা। চতুর্থ পংক্তির 'এহাত' এখানে দুকলা হলেও আধুনিক অক্ষরবৃত্তে তিনকলা, কারণ 'হাত' শব্দ প্রান্তিক রুদ্ধদল, কিন্তু উচ্চারণের অতি-সংকোচনে এটি এককলা হয়েছে। পঞ্চম পংক্তির 'মাথাত' শব্দের 'মা' দলের পর মধ্যখণ্ডন যতি এসেছে। সংস্কৃত বা প্রাকৃতের আদর্শে প্রাচীন বাংলায় মধ্যখণ্ডন যথেষ্ট হত, ক্রমান্বয়ে ছন্দযতি এবং ভাবযতির এই বিরোধ কমে এসেছে। মাঝে মাঝে সুখকর ব্যতিক্রম (happy variation) দৃষ্টান্ত হিসেবে পাওয়া যায়। অবশ্য মধুসূদন তার অমিত্রাক্ষরে মধ্যখণ্ডন চালিয়েছেন সম্পূর্ণ ভিন্নতর উদ্দেশ্য নিয়ে। ষষ্ঠ পংক্তির 'গাইল' শব্দে অ-যুক্তবর্ণে গোটা 'গাই' রুদ্ধদল শব্দের সূচনায় ব্যবহৃত হয়েছে। আধুনিক কবিরা এমন রুদ্ধ দলকে এক কলা বা দ্বিকলা দুভাবেই ইচ্ছামত ব্যবহার করেন। এখানে কবি সংশ্লিষ্ট এককলা ধরেছেন। এ অংশে যতি সুনির্দিষ্ট আট ছয় মাত্রাভাগেই এসেছে। শব্দগ্রন্থি দিতে গিয়েও কবি বিজোড়ের পর বিজোড়, জোড়ের পর জোড়—এই উচ্চারণ নীতি মেনে চলেছেন। সে যুগে অক্ষরবৃত্তের এই গঠনভঙ্গিটি সুস্পষ্ট ভাবে গড়ে উঠলেও উচ্চারণে এই ধরণের কিছু কিছু শৈথিল্য থেকে গিয়েছিল।

দ্বিপদী : ৮ | ৪) ৮

এখানে মূল পংক্তির অন্তরক্ত গানের ধুয়া অংশটি শব্দের পাশে) চিহ্ন দ্বারা বোঝানো হল।

দধি দুধ নষ্ট কৈলেঁ | কাহ্নাইল) মোর ডুবাইলেঁ পসার।
বলে জলে কোলে কৈলেঁ | কাহ্নাইল) কৈলে বড়ই খাখার॥
যতছিল মনে তোর | কাহ্নাইল) চিরকাল মনোরথ।
তাহার কারণে কৈলে | কাহ্নাইল) মোর মরণের পথ॥

[নৌকা, ২৬]

এই ষোল মাত্রা পংক্তিই প্রাকৃত পাদাকুলক থেকে বাংলায় এসেছে। ধীরে ধীরে প্রান্তিক এক, দুই মাত্রা কমে শেষ পর্যন্ত চোদ্দ মাত্রার পয়ারের রূপ নিয়েছে।

দ্বিপদী: ১০ | ৮

গাআল জবম আহ্মে শুন | দধি দুধে উতপতী।
এবেঁ তাক উপেখহ কেহ্নে | তোর ভৈল কি কুমতী ॥
আনাহ সকল সখিজন | মেলী করিউ যুগতী।
||
হবে মথুরাক জাইএ | সঙ্গে হআঁ একমতী ॥ [নৌকা, ৩]

সম্ভবতঃ আর্যা জাতীয় ছন্দ থেকেই এর উদ্ভব হয়েছে। পরবর্তী কালে যে মহাপয়ার (৮। ১০)-বন্ধ অক্ষরবৃত্তে দেখা দিয়েছিল এখানে তারই একটি রূপ পাওয়া যাচ্ছে।

দ্বিপদী ১২ | ১।৮, ১)

এবে মলয় পবন ধীরে বহে | ল
মনমথক জাগাএ ॥ ল
সুগন্ধি কুসুমগণ বিকসএ | ল
ফুটি বিরহি হৃদয়ে ॥ ল

... ...

এবে সত্বর গমন করি বাধা। ল
পুর কাহ্নাঞির আশে ॥
||
বাসলী চরণ শিরে বন্দিআ | ল
|
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ [বৃন্দাবন, ২]

অন্ত্যযতি-প্রান্তে বা পংক্তি শেষে 'ল' ধুয়া এসেছে গানের খাতিরে। এটি দীর্ঘ ১২ | ৮ মাত্রাভাগের দ্বিপদী। বারো মাত্রার দীর্ঘ ভাগে আবার ২+১০ বা ৮+৪ লঘুযতি এসেছে।

অন্যান্য ছন্দোবন্ধের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ৬।৬।৮ এবং ৮।৮।১০ ভাগের ত্রিপদী, ১১ বা ১২ মাত্রার একাবলী, বা একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদীর মিশ্র স্তবকবন্ধ।

একটি মিশ্র পংক্তিবন্ধের উদাহরণ দিয়ে এবারে আলোচনা শেষ করা যেতে পারে।—

পয়ার+দশপদী : কি মোর ঝগড় পাত যমুনার ঘাটে।
জাইবোঁ ঝাঁটি মথুরার হাটে॥
মতি খাআঁ মোরে তোএঁ করসি ধামালী।
বাপেঁ মাএঁ দিবোঁ তোরে গালী॥ [নৌকা, ১৬]

মিল বিন্যাস

মিলবিন্যাসে জয়দেব, বিদ্যাপতি বা বিদ্যাপতি-শিষ্য বৈষ্ণব কবিরা যে ঐশ্বর্য দেখিয়েছেন বড়ু কবিকে সে তুলনায় নিষ্প্রভ মনে হবে। তাছাড়া তোম্মে/আম্মে, তোম্মারে/মোরে, সমএঁ/পাঁএ ইত্যাদি শিথিল মিল-বিন্যাসের দৃষ্টান্তও যথেষ্ট দেখা যায়। ত্রিপদী, চৌপদী বা পঞ্চপদীতে কবি সাধারণত প্রথম, দ্বিতীয় পদান্তে যে মিল দিয়েছেন পংক্তিশেষে ও একই মিল এনেছেন। কদাচিৎ পদান্তমিল পৃথক রেখে দুই পংক্তিশেষে পৃথক মিল এনেছেন।

ফটোমুদ্রণ সংস্করণ প্রকাশ বাঞ্ছনীয়

বৈষ্ণব পদাবলীর আলোচনাক্ষেত্রে বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পাঠাভিনয় কাব্যটির গুরুত্ব বিবেচনা করে পরিশিষ্টে পৃথক আলোচনা সন্নিবেশিত করা গেল। বিষয়বস্তু, কবিত্ব, রচনার আঙ্গিক, ভাষা, ছন্দ, চিত্রকল্প ও অলঙ্কার—সব দিক থেকেই বইটি মূল্যবান। পুঁথিটির পূর্ণাঙ্গ ফটোমুদ্রণ সহ (Facsimilie) একটি প্রামাণ্য সংস্করণ প্রকাশের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ এ-কাজে সত্বর অগ্রণী হলে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের একটি অভাব মিটতে পারে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে গ্রন্থটির সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে শেষ করা গেল।

পরিশিষ্ট (খ)

চৈতন্য-জীবনী কাব্য-প্রসঙ্গ

ইতিপূর্বে গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে চৈতন্যের জীবনী বর্ণিত হয়েছে। সেই জীবনের উপকরণ যে সব গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে এখানে সেই চৈতন্য-জীবনী গ্রন্থগুলির একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা দেওয়া গেল।

আধুনিক কালে জীবনী সাহিত্য বলতে তথ্যনির্ভর যে রচনাদর্শকে গ্রহণ করা হয় প্রাচীন বা মধ্যযুগের ভারতে সেরূপ কোনও জীবনী লেখা হয় নি। বাণভট্টের হর্ষচরিত, হেমচন্দ্রের কুমারপাল চরিত, কহ্লনের রাজতরঙ্গিনী বা সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত'-এ রাজাদের গুণকীর্তন করা হয়েছে। সেই গুণ-কীর্তনে অতিশয়োক্তি রয়েছে। সন্ধ্যাকর তো দ্ব্যর্থবোধক আলঙ্কারিকতার মাধ্যমে একাধারে অযোধ্যার রাজা রাম এবং তৎকালীন গৌড়াধিপতি রামপালের প্রশস্তিসূচক কাব্য লিখেছিলেন। মধ্যযুগের সংস্কৃত বা পালিভাষায় লিখিত রাজসভার কবিদের এসব কাব্য বিশুদ্ধ জীবনী কাব্য না হলেও তৎকালীন রাজপরিবারের এবং রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের বহু উপকরণ এখানে পাওয়া যায়। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে সংস্কৃত ও বাংলায় লিখিত চৈতন্যজীবনী-গুলিকেও অনেকটা এই আদর্শের জীবনীকাব্যরূপে গ্রহণ করা যায়। এখানে রাজস্তুতি নয়, বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের ভক্ত কবিগণ ধর্মীয় নেতার জীবনালেখ্য অবলম্বনে গুণকীর্তন বা লীলা মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন।

চৈতন্য-জীবনীগুলির মধ্যে সংস্কৃতে লিখিত দুখানি এবং বাংলায় লিখিত পাঁচখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃতে মুরারি গুপ্ত লিখিত "শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতামৃতম্" গ্রন্থটি সম্ভবতঃ কবির জীবিতকালেই বা তিরো-

মুরারি গুপ্তের কড়চা

ধানের অব্যবহিত পরেই লিখেছিলেন। মুরারি কৈশোরে চৈতন্যদেবের সহপাঠী ছিলেন এবং বালকসুলভ চাপল্যে গৌরাঙ্গ তাঁকে কেমন অপদস্থ করতেন বৃন্দাবনদাস তার ছবি এঁকেছেন। পরবর্তী জীবনে মুরারি চৈতন্যের পরম ভক্ত হন। ভক্তিতত্ত্বে কিছুটা আতিশয্য দেখিয়ে গৌরাঙ্গকে কৃষ্ণের ওপরে স্থান দিয়ে 'গৌরপারম্যবাদ' প্রচার করেন, মুরারি গুপ্তের গ্রন্থটি 'কড়চা' নামে বেশী পরিচিত, এটি চৈতন্য-জীবনীগুলির মধ্যে প্রাচীনতম এবং

মুরারির সঙ্গে চৈতন্যের বাল্যাবধি ঘনিষ্ঠতা নিবন্ধন সবচেয়ে প্রামাণিক। অবশ্য সমগ্র কাব্যটি মুরারির একহাতের রচনা নয় বলেই সন্দেহ হয়। কবিরাজ গোস্বামী সশ্রদ্ধভাবে মুরারির এবং স্বরূপ দামোদরের ঋণ স্বীকার করে বলেছেন,

আদি লীলা মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত।
সূত্ররূপে মুরারি গুপ্ত করিলা গ্রথিত।।
প্রভুর যে শেষ লীলা স্বরূপ দামোদর।
সূত্র করি গাঁথিলেন গ্রন্থের ভিতর।।
এই দুই জনের সূত্র দেখিয়া শুনিয়া।
বর্ণনা করেন বৈষ্ণব ক্রম যে করিয়া।।

[চৈ. চ. আদিখণ্ড : ১৩ অধ্যায়]

জয়ানন্দ তাঁর চৈতন্যমঙ্গলেও উল্লেখ করেছেন যে মুরারি চৈতন্যের জন্ম থেকে বাল্যকাল পর্যন্ত জীবনী রচনা করেছেন। অপরদিকে স্বরূপ দামোদরের বহু উল্লেখিত 'কড়চ' গ্রন্থটির সন্ধান মেলেনি। তিনিই বৈষ্ণব সমাজে 'পঞ্চতত্ত্ব' প্রতিষ্ঠিত করেন, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের বনিয়াদ স্বরূপ চৈতন্যচরিতামৃতে একাধিকবার উদ্ধৃত চৈতন্য আবির্ভাবতত্ত্ব বিষয়ক শ্লোক দুটি রচনা করেন বলে একাধিক ভক্তকবি ও দার্শনিক উল্লেখ করেছেন। মুরারির কড়চায় বাল্যলীলার পরবর্তী সূত্রাকারে সংক্ষেপে বর্ণিত অংশটি কি তাহলে স্বরূপ দামোদরের রচনা? গবেষকেরা এ সম্পর্কিত তথ্য-প্রমাণাদি আলয়ে দেখতে পারেন। মুরারি চৈতন্যের নবদ্বীপ লীলার প্রত্যক্ষ সঙ্গী ছিলেন, সেই কারণেই তাঁর বর্ণনাকে প্রামাণিক ধরে পরবর্তী সমস্ত জীবনী-লেখকই চৈতন্যের বাল্যলীলার চিত্র এঁকেছেন এবং সশ্রদ্ধে তাঁর ঋণ স্বীকার করেছেন।

চৈতন্যের অন্যতম প্রধান ভক্ত শিবানন্দের পুত্র কবিকর্ণপুর পরমানন্দ সেন জীবনী-নাটক, কাব্য ও অলঙ্কারের অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করে বৈষ্ণব সমাজে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। শিবানন্দও মুরারির ন্যায় 'গৌরপারম্যবাদে'র প্রচারক ছিলেন। কবিকর্ণপুরর-চিত 'চৈতন্যচরিতামৃত' কাব্যজীবনী এবং 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকে এই গৌরাঙ্গকে কৃষ্ণের উপরে প্রাধান্য দানের পরিচয় পাওয়া যায়। 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'তে তিনি কৃষ্ণাবতারের সঙ্গে চৈতন্যাবতার লীলার ব্যাখ্যা করেছেন। কৃষ্ণ-সখাসখীদের ন্যায় গৌরাঙ্গ-

কবিকর্ণপুর : চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যচন্দ্রোদয় এবং গৌরগণোদ্দেশদীপিকা

পরিকরদেরও অবতারত্ব দেখিয়েছেন। বলাবাহুল্য, বৃন্দাবন-গোস্বামীরা কৃষ্ণের সমপর্যায়ে চৈতন্যের এতটা ভাগবতী লীলার সমর্থক ছিলেন না। গ্রন্থ দুটির রচনাকাল বিষয়ে গবেষকদের মধ্যে মতবিরোধ আছে, তবে আভ্যন্তরীণ তথ্যাদি থেকে অনুমিত হয় প্রথমে কাব্যটি, পরে নাটকটি রচিত হয়েছিল। সম্ভবতঃ চৈতন্যচরিতামৃত ১৫৪১-৪২-এ, চৈতন্য চন্দ্রোদয় ১৫৭২-এ এবং গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা ১৭৭৬-এ রচিত হয়।

মুরারি ও পরমানন্দ ব্যতীত কাশীবাসী প্রবোধানন্দ সরস্বতী সংস্কৃতে 'চৈতন্য-চন্দ্রামৃত' নামে ১৪৩টি শ্লোকে একটি স্তোত্রমূলক কাব্য রচনা করেন। তিনিও গৌরাঙ্গকে কৃষ্ণের উপরে স্থান দিয়েছিলেন। তার কাব্যটি মুরারি বা পরমানন্দের কাব্যের ন্যায় অতটা জনপ্রিয়তা অর্জন করেনি।

বাংলা চৈতন্য জীবনী কাব্য :— বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য-ভাগবত :

বাংলা চরিত গ্রন্থগুলির মধ্যে বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থটিই প্রাচীনতম এবং সাধারণ বৈষ্ণব সমাজে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় বলা যেতে পারে। লোচন এবং কবিরাজ গোস্বামী তাঁদের গ্রন্থে সশ্রদ্ধভাবে বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতের উল্লেখ করেছেন, বৃন্দাবনদাস চৈতন্যভাগবত গ্রন্থে আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন,

সর্বশেষ ভৃত্য তান বৃন্দাবনদাস,
অবশেষ নারায়ণী গর্ভে পরকাশ ॥
অদ্যাপিও বৈষ্ণব মণ্ডলে যাঁর ধ্বনি।
চৈতন্যের অবশেষ পাত্র নারায়ণী ॥ [৩য় খণ্ড : ৬ অধ্যায়]

বৃন্দাবনদাস সম্ভবতঃ শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রীর পুত্র ছিলেন। পিতৃ পরিচয় না দিয়ে তিনি মাতৃ-পরিচয় দিয়েছেন। কথিত আছে, মাতা নারায়ণীর বৈধব্য জীবনে চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ কৃপাপাত্রী অবস্থায় বৃন্দাবনের জন্ম হয়। ড. বিমানবিহারী মজুমদার চৈতন্যভাগবতের আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য বিচারে ১৫১৮ খৃঃ এর কাছাকাছি কোনও সময়ে বৃন্দাবনের জন্মকাল স্থির করেছেন। তিনি চৈতন্যদেবকে যে সাক্ষাৎ দর্শন করেননি একাধিকবার সে সম্পর্কে আক্ষেপ করেছেন।—

গঙ্গাতীরে শিষ্যসঙ্গে মণ্ডলী করিয়া।
বৈকুণ্ঠের চূড়ামণি আছেন বসিয়া ॥

চতুর্দিগে দেখে সব ভাগ্যবন্ত লোক।
সর্ব নবদ্বীপ প্রভু-প্রভাবে অশোক ॥
... ...
সে আনন্দ দেখিলেক যে সুকৃতী জন,
তাহা দেখিলেও খণ্ডে সংসার বন্ধন ॥
হইল পাপিষ্ঠ জন্ম নহিল তখনে।
হইলাঙ বঞ্চিত সে সুখ দরশনে ॥ [আদিখণ্ড : ১অধ্যায়]

সম্ভবতঃ কবির জন্মের পর চৈতন্য আর বাংলা দেশে আসেননি এবং কবির নীলাচলে মহাপ্রভুকে দর্শনের জন্য ভ্রমণের উপযুক্ত বয়স হবার আগেই তাঁর তিরোধান ঘটেছে ;—সেজন্যই এই আক্ষেপ।

বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থটির পূর্বনাম, 'চৈতন্যমঙ্গল'। নিত্যানন্দদাস 'প্রেমবিলাসে' সংবাদ দিয়েছেন,

চৈতন্য ভাগবতের নাম চৈতন্যমঙ্গল ছিল।
বৃন্দাবনের মহান্তেরা ভাগবত খ্যাতি দিল ॥

তাহলে, বৃন্দাবনের গোস্বামীদের কাছে বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য জীবনীটি বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছিল মনে হয়। কবিরাজ গোস্বামী কর্তৃক বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থকে অবশ্য চৈতন্যমঙ্গল নামেই অভিহিত করেছেন।

রচনাকাল

কবিকর্ণপুর ১৫৭৬ এ রচিত 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকায়' বৃন্দাবনদাসকে ব্যাস-অবতার বলে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন, কিন্তু ১৫৪২-এ রচিত 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে বৃন্দাবনদাসের আদৌ উল্লেখ করেননি। এর থেকে ডঃ মজুমদার অনুমান করেছেন গ্রন্থটি ১৫৪২-এর পরে রচিত হয়।

কবি নিজে বলেছেন,

নিত্যানন্দ স্বরূপের আজ্ঞা করি শিরে
সূত্রমাত্র লিখি আমি কৃপা অনুসারে ॥
[চৈ. ভা. আদি ১০, অ.]

নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর তিরোধানের পর আরও কিছুকাল জীবিত ছিলেন। 'বৈষ্ণব দিগ্‌দর্শনী' মতে ১৫৪২-এ তাঁর তিরোধান ঘটে। সুতরাং অনুমান করা চলে শেষ জীবনে নিত্যানন্দ হয়তো বৃন্দাবনকে চৈতন্যজীবনী লিখতে নির্দেশ

দেন। বৃন্দাবন তখন গ্রন্থ রচনা শুরু করলেও শেষ করেছেন আরও কিছুকাল পরে। ডঃ মজুমদার অনুমান করেন ১৫৪৬ থেকে ১৫৫০ এর মধ্যে কোনও সময়ে গ্রন্থটি রচিত হয়ে থাকবে ; কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয়, বৃন্দাবনদাস তাঁর গ্রন্থের অন্ত্যখণ্ডে· তৃতীয় অধ্যায়ে কবিকর্ণপুরের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটক থেকে দুটি শ্লোক উদ্ধার করেছেন। যে গ্রন্থ ১৫৭২-এ রচিত বলে ডঃ মজুমদারের অনুমান, তার থেকে শ্লোক ১৫৪৬-এ রচিত গ্রন্থে প্রক্ষিপ্তভাবে ছাড়া অন্তর্ভুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু· শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত মনে করার পক্ষে অন্য কোনও যুক্তিই মেলে না, বরং মনে হয় গ্রন্থ শেষ হয়ে এলে অন্ত্যখণ্ডে বৃন্দাবন কবিকর্ণপুরের শ্লোক উদ্ধার করাতে কবি-কর্ণপুর খুশী হয়ে পরবর্তী গ্রন্থ গৌরগণোদ্দেশদীপিকাতে বৃন্দাবনকে ব্যাস অবতার বলেছেন। তাহলে অনুমিত হয় গ্রন্থটি ১৫৭২-৭৬ এর মধ্যে কোনও সময়ে সমাপ্ত হয়ে থাকবে,—নাহলে চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক রচনার তারিখ আরও এগিয়ে ১৫৪৬-এর পূর্বে আনতে হয়। ডঃ সুকুমার সেন বলেন,...."মুটামুটিভাবে বলা যায় যে চৈতন্যভাগবতের রচনাকাল ১৫৪০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি। কবিকর্ণপুরের রচনায় কোনও উল্লেখ এতে নেই।" [দ্র. সা. এ. প্রকাশিত চৈতন্য চরিতামৃতের ভূমিকা ; পৃঃ ১১]

গ্রন্থ-পরিচয়

চৈতন্য-ভাগবতে তিনটি খণ্ডে একান্ন অধ্যায়ে রচিত আদিখণ্ডের বারোটি অধ্যায়ে চৈতন্যের জন্ম থেকে আরম্ভ করে গয়ায় পিতৃপিণ্ড প্রদানান্তে নবদ্বীপে প্রত্যাগমন পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। এই খণ্ডের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি হল : গৌরাঙ্গের জন্মলীলা, শৈশবের খেলাধুলা, উপনয়ন, পাঠাভ্যাসাদি, নিত্যানন্দের জন্ম ও বাল্য কৈশোরের কাহিনী, ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে গৌরাঙ্গের মিলন, গৌরাঙ্গের কাছে দিগবিজয়ীর পরাভব কাহিনী, লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে পরিণয়, নিমাইএর-বঙ্গদেশ পর্যটন, লক্ষ্মী দেবীর মৃত্যু, বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে বিবাহ, হরিদাস ঠাকুরের কাহিনী, নিমাইয়ের গয়াগমন, ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার, নবদ্বীপ প্রত্যাবর্তন।

মধ্যখণ্ড দীর্ঘতর, ছাব্বিশ অধ্যায়ে গয়া প্রত্যাগমন থেকে সন্ন্যাসগ্রহণ পর্যন্ত কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এই অংশের মুখ্য ঘটনাগুলি হল : ভক্তি ব্যাখ্যান্তে টোল বন্ধ করে নগর সংকীর্তন আরম্ভ, নিত্যানন্দর সঙ্গে মিলন, ব্যাসপূজা, অদ্বৈত-মিলন, জগাই-মাধাই উদ্ধার বর্ণন, মুরারি গুপ্তের কাহিনী বর্ণন, কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামকরণ। এই অংশে নবদ্বীপে নিমাইএর

বহু অলৌকিক ভাগবতী লীলার বর্ণনা আছে তাছাড়া নিত্যানন্দের বিশদ পরিচয় দিতে লেখক তিনটি অধ্যায় ব্যয় করেছেন।

অন্ত্যখণ্ড অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত : এগারোটি অধ্যায়ে সন্ন্যাস গ্রহণান্তর নীলাচল আগমন কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। মুখ্য ঘটনাক্রম হল : শান্তিপুরে অদ্বৈতগৃহে সকলের মিলন, নীলাচল গমনের পথের বর্ণনা, পুরীতে জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ ও মূর্চ্ছা, সার্বভৌমের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও তাঁর গৃহে চৈতন্যকে আনয়ন। নীলাচলের নানা বিলাস বর্ণনা, মথুরা গমনোদ্দেশে বঙ্গদেশে গঙ্গাতীরে নবদ্বীপের নিকটবর্তী রামকেলিতে আগমন। অদ্বৈত ও অচ্যুতের সাক্ষাৎকার। চৈতন্যের শান্তিপুরে অদ্বৈতগৃহে মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। মথুরা না গিয়ে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন, শেষদিকে কয়েকটি অধ্যায়ে নিত্যানন্দলীলা এবং কয়েকটি অধ্যায়ে অদ্বৈতলীলা বর্ণিত হয়েছে। চৈতন্যের নীলাচল লীলার, দাক্ষিণাত্য ও বৃন্দাবন ভ্রমণের কাহিনী বৃন্দাবন দাস আদৌ লেখেননি এ গ্রন্থে।

বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ সহজ হৃদয়গ্রাহী কাহিনী-বিন্যাসের কৌশল, তিনি সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন সন্দেহ নেই, মুরারি গুপ্তের কড়চা বা কবিকর্ণপুরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। পদ্মপুরাণ, বরাহপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, স্কন্দপুরাণ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, জৈমিনি ভারত ও মনুসংহিতা থেকে শ্লোক উদ্ধার করেছেন, আরও বহু সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে প্রয়োজনমত উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও গ্রন্থটি নীরস দার্শনিক তত্ত্বভারাক্রান্ত হয়নি। একথা সত্য, ভক্তহিসাবে ভগবানের লীলাবর্ণনা করতে গিয়ে বৃন্দাবন চৈতন্যলীলার মধ্যে অলৌকিকত্ব এনেছেন। কিন্তু সেই অলৌকিকত্বের ভিতরেও বাৎসল্যলীলার আলেখ্যে চৈতন্যের বাল্যলীলার নবদ্বীপের গঙ্গাঘাটের স্নানের যে তথ্যপূর্ণ হৃদয়গ্রাহী ছবি এঁকেছেন এ যুগের অপর কোনও লেখকই তেমন জীবন্ত চিত্র দিতে পারেননি। লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে বিবাহ-পূর্ব পরিচয়, কিশোর নিমাইএর মায়ের কাছে বিবাহের আগ্রহ প্রকাশ, পূর্ববঙ্গ পর্যটনান্তে গৃহে ফিরে আঞ্চলিক ভাষা নিয়ে কৌতুক, গয়া প্রত্যাগমনান্তর নিমাইএর বৈরাগ্যভাব, নগরকীর্তন, কাজিদমন, শান্তিপুরে নীলাচল গমনের প্রাক্কালে সকলের সঙ্গে মিলন, পুরীতে প্রথম জগন্নাথ দর্শনের ভাবাবেশ ও সার্বভৌমের সঙ্গে পরিচয়, এ-সকল চিত্র বৃন্দাবন দাস সুস্পষ্টতার সঙ্গে সরল ভক্তির আখরে অঙ্কিত করেছেন। তত্ত্বান্বেষী কবিরাজ গোস্বামীর ছবি সে তুলনায় অনেক জটিল, সাধারণের প্রবেশদ্বার সেখানে রুদ্ধ।

বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দের বলরামলীলার ছবিটিও খুবই উজ্জ্বল রঙে এঁকেছেন। অলৌকিকতায় সে যুগের মানুষের প্রবল আগ্রহ ছিল। ভক্ত ভগবানের অবতার-লীলা বর্ণনায় এই অলৌকিকত্ব দেখাবেন তাতে দোষের কিছু নেই।

বৃন্দাবনদাস চৈতন্য-তিরোভাবের পর যখন গ্রন্থটি লিখেছেন এবং এ-গ্রন্থ রচনার সময় আদর্শ হিসাবে যখন মুরারি এবং কবিকর্ণপুরের জীবনীকে পেয়েছিলেন তখন চৈতন্যের নীলাচল লীলার বিশদ বর্ণনা কেন দিলেন না, বিশেষকরে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ কাহিনী একেবারেই কেন বাদ দিলেন সেইটি প্রশ্নের বিষয়। বস্তুত এই কারণেই গ্রন্থটি অসমাপ্ত রয়েছে। কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্যচরিতামৃত রচনার উদ্দেশ্য বর্ণনায় আর উল্লেখ করেননি। এর একটি কারণ হতে পারে, কবির তথ্য আহরণের অক্ষমতা — কিন্তু সেটি বিশ্বাস্য নয়। দ্বিতীয় কারণ হতে পারে, চৈতন্যের যে জীবনাংশ অবলম্বনে বৃন্দাবন গোস্বামীরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন গড়ে তুলেছেন সেই তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার প্রতি অনীহা। গৌড়-লীলার দিকটাকে, যে চৈতন্যের সাথে অদ্বৈত নিত্যানন্দের হরিচন্দনের লৌকিক যে চৈতন্যকে বৃন্দাবনদাস হৃদয়ে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। সেই কারণেই তাঁর আধ্যাত্মিক হিসাবে গ্রন্থটির অসম্পূর্ণতা সকলেরই চোখে পড়ে।

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল : জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল একটি বৈষ্ণবসমাজে অপরিচিত ছিল। নগেন্দ্রনাথ বসু ১৩০৫ বঙ্গাব্দে সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় প্রথম এই গ্রন্থের আলোচনা করেন। ১৩[illegible] বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ থেকে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির সঠিক রচনাকাল বলা কঠিন। জয়ানন্দ জানিয়েছেন তার গ্রন্থরচনার পূর্বে সার্বভৌম 'চৈতন্য সহস্রনাম,' বৃন্দাবনদাস 'চৈতন্যভাগবত' গোপাল বসু 'চৈতন্যমঙ্গল' এবং পরমানন্দ গুপ্ত 'গৌরাঙ্গ জয় গীত' লিখেছিলেন।

গ্রন্থটি তথ্য নির্ভর নহে

এর মধ্যে 'চৈতন্যভাগবত' আমরা পেয়েছি সার্বভৌম এবং পরমানন্দের পরিচয় মিলছে, গ্রন্থ মিলছেনা। ডঃ মজুমদারের মতে বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত রচনার ১০।১২ বছর পরে (১৫৫৮-৬০ ?) এ-গ্রন্থ রচিত হয়েছে। জয়ানন্দের গ্রন্থটি তথ্যের দিক থেকে আদৌ নির্ভরযোগ্য নয়। তিনি বহু ঘটনাই ভুলভাবে বর্ণনা করেছেন, এবং ঘটনার পারম্পর্য রক্ষা করেননি। যেমন, নিমাই-এর গয়া থেকে ফেরার পর লক্ষ্মীর সঙ্গে বিবাহ, পূর্ববঙ্গ গমন ইত্যাদি বর্ণনা করেছেন। আবার গয়া-গমনের পূর্বেই তাঁকে কৃষ্ণভক্তরূপে দেখিয়ে হরিদাস ও বক্রেশ্বরকে তাঁর

সঙ্গীরূপে বর্ণনা করেছেন। মুবারি, কবিকর্ণপুর বা বৃন্দাবনের বর্ণিত ঘটনাধারা থেকে এখানে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। এমন আরও বহু ঘটনাগত অমিল রয়েছে। জয়ানন্দই প্রথম আমাদের চৈতন্যের পূর্বপুরুষদের নিবাস সম্পর্কে একটি নতুন তথ্য জানিয়েছেন যে,—

চৈতন্য গোসাঞির পূর্বপুরুষ
আছিলা যাজপুরে।
শ্রীহট্ট দেশেরে পালাঞা গেল
রাজ ভ্রমরের ডরে ॥

ডঃ মজুমদার নানাদিক বিচার-বিশ্লেষণের পর এই তথ্য ভ্রান্ত বলে গণ্য করেছেন। মুরারিগুপ্ত জানিয়েছেন, শ্রীচৈতন্য পাশ্চাত্য বৈদিক কুলে বাৎস্যগোত্রে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সেদিক থেকেও বলা যায়, চৈতন্যের পূর্বপুরুষ বাঙালী ছিলেন—ওড়িয়া নহে। জয়ানন্দের গ্রন্থে চৈতন্যের নবদ্বীপ থেকে গয়া, কাটোয়া থেকে শান্তিপুর, শান্তিপুর থেকে পুরী এবং পুরী থেকে বারানসী যাত্রা-পথের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। এই বর্ণনা অন্যান্য চরিতকারদের প্রদত্ত বর্ণনার সঙ্গে মেলে না। তবে সে যুগে যাতায়াতের এই পথগুলিও চালু ছিল অনুমান করা চলে। জয়ানন্দ অঙ্কিত চৈতন্য-চরিত মূলতঃ মুরারি, কবিকর্ণপূর বা বৃন্দাবন দাস অঙ্কিত চরিত্র থেকে ভিন্নতর। সম্ভবতঃ এই কারণেই বৈষ্ণব সমাজে তাঁর গ্রন্থটি সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়ে পড়েছিল। তবে এসব সত্ত্বেও মনে রাখতে হবে একমাত্র জয়ানন্দই চৈতন্য তিরোভাবের বাস্তবানুগ একটি বিবরণ দিয়েছেন। মুরারি, কবিকর্ণপূর, বৃন্দাবনদাস, লোচন বা কৃষ্ণদাস কবিরাজ কেউই চৈতন্য তিরোভাবের ঐতিহাসিক কোনও তথ্য-বিবরণ দেননি। কিছুটা অলৌকিকতার রহস্যে সে কাহিনী আচ্ছন্ন রেখেছেন। জয়ানন্দই স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন —

চৈতন্য তিরোভাবের নূতন সংবাদ

নীলাচলে নিশাএ চৈতন্য টোটাগ্রামে।
বৈকুণ্ঠ যাইতে নিবেদিল ক্রমে ক্রমে ॥
আষাঢ় সপ্তমী তিথি শুক্লা অঙ্গীকার করি।
রথ পাঠাইহ যাব বৈকুণ্ঠপুরী ॥
... ...
আষাঢ় বঞ্চিতে রথ বিজয়া নাচিতে।
ইটাল বাজিলে বাম পাএ আচম্বিতে ॥
... ...

চরণ বেদনা বড় ষষ্ঠীর দিবসে।
সেই লক্ষ্যে টোটায় শয়ন অবশেষে ॥
পণ্ডিত গোসাঞিকে কহিল সর্বকথা।
কালি দশ দণ্ড বাতে চলিব সর্ব্বথা ॥

এদিক থেকে জয়ানন্দ চৈতন্যজীবন-ইতিহাসের একটি মূল্যবান সূত্র আমাদের দিয়েছেন স্বীকার করতে হয়।

লোচনের চৈতন্যমঙ্গল

বাংলার বৈষ্ণব-ধর্ম-আন্দোলনেব ইতিহাসের দিক থেকে লোচনদাসের চৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থটির গুরুত্ব রয়েছে। গৌরাঙ্গকেই পরমতত্ত্বরূপে গ্রহণ করে মুরারি গুপ্ত, কবিকর্ণপূব, বৃন্দাবনদাস, জয়ানন্দ প্রভৃতি নবদ্বীপ সম্প্রদায়েব বিশিষ্ট লেখকেবা 'গৌবপাবম্যবাদ' প্রচাব কবেছিলেন। এই তত্ত্বকে আশ্রয় কবেই তাঁরা চৈতন্যকে ব্রজমঙ্গলরূপ নবদ্বীপেব কৃষ্ণনাগব এবং নিজেদের গোপী বা নাগরীরূপে কল্পনা কবেন। নাগব-ভাবেব ভজনাপদ্ধতি প্রচলিত হয়, লোচনদাস পূর্বসূরীদের চৈতন্যজীবনীগুলিতে এই নাগব-ভাবেব অভাব লক্ষ্য করেই নতুন জীবনী রচনার প্রয়োজন বোধ করেন।

গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য

লোচন তাঁব গ্রন্থশেষে আত্মপবিচয়ে বলেছেন:

চাবিখণ্ড কথা সায় কবিল প্রকাশ,
বৈদ্যকুলে জন্ম মোর কো'গ্রাম নিবাস ॥

কবি পরিচয়

মাতাব নাম সদানন্দী, পিতার নাম কমলাকব দাস, মাতৃ ও পিতৃ উভয় কুলেব লোকেবা কোগ্রামবাসী ছিলেন। মাতামহ পুরুষোত্তম গুপ্ত বিশেষ ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। উভয় কুলে তিনিই একমাত্র পুত্র ছিলেন। শ্রীখণ্ডেব নরহরি ঠাকুব তাঁর গুরু ছিলেন।

লোচনের চৈতন্যমঙ্গল ঠিক কোন্ সময়ে রচিত হয়েছিল বলা কঠিন। আভ্যন্তরীণ প্রমাণাদিতে ডঃ মজুমদার মনে কবেন গ্রন্থটি ১৫৭৬-এব পূর্বে অর্থাৎ কবিকর্ণপূবের 'গৌবগনোদ্দেশদীপিকা' প্রকাশেব পূর্বে রচিত হয়েছিল। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনও মন্তব্য করেছেন, 'কথিত আছে যে তিনি ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহাব গুরু নরহরি সরকারের আদেশে এই গ্রন্থ রচনা করেন।' সুতরাং ডঃ মজুমদার যে শেষ পর্যন্ত মন্তব্য করেছেন '১৫৬০ হইতে ১৫৬৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময়ে শ্রীচৈতন্যমঙ্গল রচিত হইয়াছিল

রচনাকাল

বলিয়া আমি বিবেচনা করি।' এই মতবাদের পক্ষে তেমন যুক্তি মিলছে না। গ্রন্থটি ১৫৭৫-এ রচিত হয়েছিল ধরে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত। লোচনের গ্রন্থ বৃন্দাবন দাসকে দেখতে দিয়েছিলেন এবং এ গ্রন্থপাঠে বৃন্দাবন দাস চমৎকৃত হয়ে নিজের গ্রন্থের নাম পরিবর্তিত করে 'চৈতন্য ভাগবত' রাখেন, এ-কাহিনীটি অমূলক বলে সন্দেহ হয়।

লোচনের গ্রন্থ সূত্রখণ্ড, আদিখণ্ড, মধ্যখণ্ড এবং শেষখণ্ড—এই চার খণ্ডে বিভক্ত। তিনি মুরারি গুপ্তের কড়চা অবলম্বনে তাঁর গ্রন্থ রচনা করেছেন একথা বারবার স্বীকার করলেও অনেক ক্ষেত্রেই উভয় গ্রন্থে পার্থক্য লক্ষিত হয়। মুরারি লিখেছেন, কলিযুগের মানুষকে উদ্ধারের জন্য নারদের অনুরোধে বৈকুণ্ঠের হরি বাৎস্য-জগন্নাথ সুতরূপে মর্তে অবতীর্ণ হন। চৈতন্য অবতারত্বের প্রমাণ রূপে ভাগবত ও মহাভারতের শ্লোক পাশাপাশি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন ভবিষ্য পুরাণ, জৈমিনি ভারত এবং ব্রহ্মপুরাণ থেকে শ্লোক উদ্ধার করেছেন, লোচন লিখেছেন, কৃষ্ণ রুক্মিণীকে বললেন, 'কলিকালে অবতীর্ণ হয়ে 'ভুঞ্জিব প্রেমার সুখ ভুঞ্জাইব লোকে' এবং

কহিতে কহিতে প্রভু গৌরতনু-হৈলা।
নিজ প্রেমা বিলাসির প্রতিজ্ঞা করিলা॥ [সূত্রখণ্ড]

লোচনের চৈতন্যমঙ্গলে আদিখণ্ডে বিশ্বম্ভরের জন্ম থেকে আরম্ভ করে গয়া প্রত্যাগমন কাহিনী পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। মধ্যখণ্ডে গয়া প্রত্যাগমনের পর থেকে পুরীগমন ও সার্বভৌমকে স্বমতে আনয়ন পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। শেষখণ্ডে মুখ্যত মুরারি গুপ্তের কড়চাকেই অবলম্বন করেছেন। চৈতন্যের দিব্যোন্মাদ ভাবের চিত্র তিনি অঙ্কিত করেননি। লোচন চৈতন্যের তিরোভাবের বিষয়ে সংবাদ দিয়েছেন, তিনি আষাঢ় মাসে তিথি সপ্তমী দিবসে গুঞ্জা বাড়ীর মধ্যে লীন হয়েছিলেন,—

চৈতন্য-তিরোভাব সংবাদ

তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে।
জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে॥ [শেষ খণ্ড]

তিরোভাবের বিস্তৃত তথ্য না জানালেও যে তিথি ও তারিখ দিয়েছেন তার সঙ্গে জয়ানন্দ বর্ণিত-তিথি তারিখের মিল রয়েছে।

পদাবলীর লোচন আর চৈতন্যজীবনী-লেখক লোচন একই ব্যক্তি কিনা বলা কঠিন। তবে স্বরবৃত্ত ছন্দে লিখিত ধামালী গানের পদে গৌরাঙ্গের 'নাগর

ভাবের' প্রাধান্য দেখে মনে হয় উভয়ে একই ব্যক্তি ছিলেন। জীবনী কাব্যটি অবশ্য অক্ষরবৃত্ত রীতির পয়ার-ত্রিপদী বন্ধে রচিত। লোচনের কাব্যপাঠে জানা যায়, সংস্কৃত কাব্যধারার সঙ্গে, বিশেষ করে গীতা, ভাগবত, মুরারির কড়চা এবং অনেকগুলি পুরাণের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তবে এই পাণ্ডিত্য কাব্যকে ভারাক্রান্ত করেনি। কাব্যটি যথাসম্ভব সরল রেখেছেন। এটি লঘু সুর সহযোগে পাঁচালী গান রূপে গাইবার জন্যই রচিত হয়েছিল।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত

সংস্কৃত ও বাংলায় লিখিত চৈতন্য-জীবনী কাব্যগুলির মধ্যে নিঃসংশয়ে কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্যচরিতামৃতের স্থান সবোচ্চে। দার্শনিক তত্ত্ব ও কবিত্বের মিলন কতটা উৎকর্ষ লাভ করতে পারে এ-গ্রন্থটি তার অপূর্ব নিদর্শন।

কবি পরিচয়

কৃষ্ণদাস আত্মপরিচয় খুব কম দিয়েছেন। যেটুকু জানা যায় সে হল, নৈহাটির নিকটবর্তী ঝামটপুর গ্রামে তাঁদের নিবাস ছিল। পিতার নাম ভগীরথ, মায়ের নাম সুনন্দা। তিনি বৈদ্যবংশজ। ছোটবেলায় পিতৃমাতৃহান হয়েছিলেন। আদিলীলার পঞ্চম পরিচ্ছেদে তিনি লিখেছেন, একদা কীর্তনীয়া রামদাস তাঁদের গৃহে এসেছিলেন। তিনি জানতে পারেন কৃষ্ণদাসের অনুজ নিত্যানন্দকে বলরাম অবতার বলে মানেন না। তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে বংশী ভেঙে দিয়ে গানের আসর ত্যাগ করে চলে যান। এতে কৃষ্ণদাস-অনুজের বিশেষ সবনাশ হয়। কৃষ্ণদাসও ভাইকে ভর্ৎসনা করেন। সেই রাত্রে নিত্যানন্দের স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হন,—

> ভাইকে ভৎসিনু মুই—লৈয়া এই গুণ।
> সেই রাত্রে প্রভু মোরে দিলা দরশন॥
> নৈহাটি নিকটে ঝামটপুর নামে গ্রাম।
> তাঁহা স্বপ্নে দেখা দিলা নিত্যানন্দ-রাম॥ [আদি, ৫ পরি]

আনন্দ-বিহ্বল মূৰ্চ্ছিতপ্রায় কবিকে নিত্যানন্দ অভয় দিলেন,—

> অয়ে অয়ে কৃষ্ণদাস, না কর তুমি ভয়।
> বৃন্দাবনে যাহ তাহা সর্ব লভ্য হয়॥ [ঐ]

কবি বৃন্দাবনে এলেন, রূপ সনাতনের আশ্রয় পেলেন, রঘুনাথ মহাশয়কে পেলেন, 'শ্রীস্বরূপ-আশ্রয়' পেলেন ; এবং—

> সনাতন-কৃপায় পাইনু ভক্তির সিদ্ধান্ত।
> শ্রীরূপ কৃপায় পাইনু ভক্তিরস-প্রান্ত॥ [ঐ]

এই ভক্তির সিদ্ধান্ত জেনে, ভক্তিরস-প্রান্তে পৌঁছে চৈতন্য নিত্যানন্দের অবতার-লীলা উপলব্ধি করলেন। চৈতন্যচরিতামৃতের প্রায় প্রতি অধ্যায় শেষে তিনি রূপ এবং রঘুনাথের উল্লেখ করেছেন। প্রেমবিলাস থেকে জানা যায়, রঘুনাথই কৃষ্ণদাসকে সন্ন্যাসজীবনে প্রবুদ্ধ করেন। চৈতন্যচরিতামৃত রচনার পূর্বেই কবিরাজ গোস্বামী সংস্কৃতে দুটি গ্রন্থ লিখেছিলেন, 'গোবিন্দ-লীলামৃত' এবং 'সারঙ্গ-রঙ্গদা' : লীলাশুকের শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের টিকা। ২৩ অধ্যায়ে রচিত 'গোবিন্দলীলামৃত' রূপগোস্বামীর অনুরোধে কৃষ্ণের অষ্টকালীয় নিত্যলীলা-কীর্তনের উদ্দেশে কবিরাজ গোস্বামী রচনা করেন। রঘুনাথের মুক্তাচরিতে কৃষ্ণদাসকে 'কবি ভূপতি' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সুতরাং মুক্তাচরিতের পূর্বেই কৃষ্ণদাস বোধ হয় 'গোবিন্দলীলামৃত' রচনা করে থাকবেন। রূপগোস্বামীর উজ্জ্বলনীলমণি থেকে উদ্ধৃতি আছে। সুতরাং সেটি আরও পরবর্তী রচনা।

কবির অন্যান্য রচনা

ভক্তির সিদ্ধান্ত ও রসোপলব্ধি নিয়ে বৃন্দাবন গোস্বামীদের[1] সংবাদ বাংলা দেশ ও নীলাচলের বৈষ্ণব ভক্তগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচারের উদ্দেশ্যেই পরিণত বয়সে ষট্‌গোস্বামীর অনুরোধে কৃষ্ণদাস বাংলায় চৈতন্য জীবনী লিখতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন মনে হয়। বৃন্দাবন গোস্বামীরা 'গৌরপারম্যবাদ' বা 'নাগরভাব'-এর দ্বারা বাংলার বৈষ্ণব ভক্তমণ্ডলীকে বিকৃত রুচির আবাহনগামী পথ থেকে ফিরিয়ে চৈতন্য আবির্ভাবের দার্শনিক তত্ত্বশ্রয়ী দৃঢ়মূল একটি আদর্শের সন্ধান দিতে চেয়েছিলেন। সেই তত্ত্বগুলি জীব গোস্বামীর ষট্‌সন্দর্ভ এবং রূপ গোস্বামীর উজ্জ্বলনীলমণি ও ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এবারে সেই তত্ত্বের আলোকে বাংলায় একটি চৈতন্য জীবনী রচনার প্রয়োজনীয়তা তাঁরা উপলব্ধি করলেন এবং স্বীকার করতেই হবে, এ কাজে যোগ্যতম ব্যক্তিকে তাঁরা নির্বাচন করলেন।

গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য

১। বৃন্দাবনের ষট্‌ গোস্বামী : রূপ, সনাতন, জীব, রঘুনাথ দাস, রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট। ড. সুশীলকুমার দে তাঁর Vaisnava Faith and Movement গ্রন্থে ছয় গোস্বামীর পরিচয় দিয়েছেন।

'এই প্রথম একজন চৈতন্য-জীবনীকার স্বরূপ গোস্বামী-কথিত বলে চৈতন্য-আবির্ভাবের একটি তত্ত্ব ব্যাখ্যা দিলেন,

চৈতন্য-আবির্ভাব তত্ত্ব প্রচার

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশোবানয়ৈবা—
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা—
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥
[চৈঃ, চঃ আদি ১ পরি]

যে প্রেমে রাধা আমার অপূর্ব মধুরিমা আস্বাদন করে তার প্রণয়মহিমা কি রকম, আর রাধা-প্রেমের দ্বারা আস্বাদ্য যে আমার অদ্ভুত মধুরিমা তাই বা কি রকম, আমাকে অনুভব করে রাধা যে সুখ পায় তাই বা কিরকম,—এরই লোভে রাধাভাবযুক্ত হয়ে শচীগর্ভসিন্ধুতে হরি (গৌরাঙ্গ) রূপ ইন্দু (চন্দ্র) জন্ম নিয়েছিলেন।'

ঠিক এই ভাষায় স্বরূপ গোস্বামী চৈতন্য আবির্ভাব তত্ত্বের এ-ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন কিনা সন্দেহ থাকলেও এ তত্ত্বই যে কৃষ্ণদাস ষট্‌গোস্বামীর কাছে শিখেছিলেন এবং অপূর্ব প্রাঞ্জল ভাষায় দীর্ঘ চার শতাব্দীকাল গৌরভক্ত গৌড়বাসীকে শুনিয়ে এসেছেন চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থটিই তার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

গ্রন্থ রচনাকাল

কৃষ্ণদাসের সঠিক জন্মকাল জানা যায়নি। গ্রন্থের আভ্যন্তরীণ প্রমাণ থেকে ড. মজুমদার অনুমান করেন ১৫২৭ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি কোনও সময় তাঁর জন্ম হয়েছিল। কৃষ্ণদাস গ্রন্থটি কবে রচনা করেছিলেন তাও সঠিকভাবে বলা কঠিন। গ্রন্থের উপসংহারে একটি শ্লোক রয়েছে,—

শাকে সিন্ধগ্নিবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্যাহেঽসিত পঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ[১] ॥
[চৈ, চ. উপসংহার ৪ শ্লোক]

১। ডঃ মজুমদার মনে করেন 'সিন্ধু' অর্থে সাত না ধরে চার ধরা চলে এবং গ্রন্থ সমাপ্তি সম্ভবতঃ ১৫৩৪ শক বা ১৬১১ খৃষ্টাব্দ। প্রেমবিলাসে উপরোধৃত শ্লোকটির প্রথমাংশের পাঠ 'শাকেঽগ্নিবিন্দু বাণেন্দু'—তাতে রচনাকাল ১৫০৩ শক বা ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে ধরতে হয়। এই তারিখের অসম্ভাব্যতা প্রায় সকলেই স্বীকার করেছেন।

অর্থাৎ ১৫৩৭ শকে) ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে), কৃষ্ণা পঞ্চমীতে গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয়। ড. সুশীলকুমার দে এই তারিখ সঠিক বলে অনুমান করেন। গ্রন্থশেষে কবি নিরভিমান ভাবে নিজ পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন,—

আমি লিখি এহো মিথ্যা করি অভিমান।
আমার শরীর কাষ্ঠ পুতলী সমান ॥
বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির।
হস্ত হালে, মন বুদ্ধি নহে মোর স্থির ॥
নানা রোগগ্রস্ত চলিতে না পারি।
পঞ্চরোগ পীড়ায় ব্যাকুল রাত্রিদিনে মরি ॥ [চৈ. চ. অন্ত্য ২০ পরি]

সুতরাং এ-গ্রন্থ কবি প্রবীণ বয়সে লিখেছিলেন। গ্রন্থ শেষ করতে তাঁর নাকি সাত বছর (মতান্তরে নয় বছর) সময় লেগেছিল। বারবার কবি জরা ও বার্ধক্য নিবন্ধন সংকল্পিত কাজ শেষ করে যেতে পারবেন কিনা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। সেই আশঙ্কাতেই মধ্যখণ্ডে সূত্রাকারে অন্ত্যলীলার মুখ্য ঘটনাগুলি বর্ণনা করেছেন।[২]

২। শেষ লীলার সূত্রগণ কৈল কিছু বিবরণ
ইহা বিস্তারিতে চিত্ত হয়।
থাকে যদি আয়ু শেষ, বিস্তারিব লীলাশেষ
যদি মহাপ্রভুর কৃপা হয় ॥
আমি বৃদ্ধ জরাতুর, লিখিতে কাঁপয়ে কর,
মনে কিছু স্মরণ না হয়।
না দেখিয়ে নয়নে, না শুনয়ে শ্রবণে
তবু লিখি এ বড় বিস্ময় ॥
এই অন্ত্যলীলার সার সূত্রমধ্যে বিস্তার
করি কিছু করিল বর্ণন।
ইহা মধ্যে মরি যবে বর্ণিতে না পারি তবে
এই লীলা ভক্তগণ ধন ॥
সংক্ষেপে এই সূত্র কৈল যেই ইঁহা না লিখিল
আগে তাহা করিব বিচার।
যদি ততদিনে জীয়ে মহাপ্রভুর কৃপা হয়ে,
ইচ্ছা ভরি করিব বিচার ॥ [চৈ. চ. মধ্য ৩ প]

চৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলায় সতেরটি পরিচ্ছেদ। নিমাই-এর জন্ম থেকে সন্ন্যাস গ্রহণের সংকল্প পর্যন্ত এই খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম বারো পরিচ্ছেদে মঙ্গলাচরণ, চৈতন্য তত্ত্ব নিরূপণ, জন্মের সামান্য ও মুখ্য কারণ, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত তত্ত্ব, পঞ্চতত্ত্ব আখ্যান, চৈতন্য লীলা বর্ণন, ভক্তি কল্পবৃক্ষের মালীরূপে চৈতন্য বর্ণন, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত শাখা বর্ণন রয়েছে। অর্থাৎ গ্রন্থের মুখবন্ধই বারো পরিচ্ছেদ, তারপর তিনটি পরিচ্ছেদে নিমাই-এর জন্ম, বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর ও যৌবন লীলার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। কারণ,—

গ্রন্থ পরিচয়

আদিলীলা

বৃন্দাবন দাস ইহা চৈতন্য মঙ্গলে।
বিস্তারি বর্ণিলা নিত্যানন্দ আজ্ঞাবলে॥ [আদি, ১৭ পরি]

প্রথম চারিটি পরিচ্ছেদে লেখক বিশেষ নৈপুণ্য সহকারে সংক্ষিপ্তভাবে বৃন্দাবন-গোস্বামীগণ প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্বের সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করিয়েছেন। সপ্তদশ পরিচ্ছেদে কবিরাজ গোস্বামী যে কাজীদলন-কাহিনী দিয়েছেন বৃন্দাবন দাসের তুলনায় সেখানে আরও কিছুটা বৈষ্ণব-প্রাধান্যের রঙ ফলানো হয়েছে। বৃন্দাবন দাস দেখিয়েছেন নিমাই ক্রুদ্ধ হয়ে কাজীকে বলপ্রয়োগে শাস্তি দিতে উদ্যত হয়েছিলেন। কৃষ্ণদাস প্রথম থেকেই নিমাইকে নির্ভীক, বিনয়নম্র রূপে অঙ্কিত করেছেন। কাজীকে তিনি গোবধের দোষ বুঝিয়েছেন, হরি সংকীর্তনের উপযোগিতা বুঝিয়েছেন, নৃসিংহাবতারে কাজীকে সন্ত্রস্ত করেছেন। কাজীর কাছে 'পাষণ্ডী'রা অর্থাৎ নবদ্বীপের অবৈষ্ণব (মঙ্গলচণ্ডী ও বিষহরির পূজক) সম্প্রদায় এসে নিমাই-এর হরি-সংকীর্তন বন্ধ করতে অনুরোধ করেছিল, কৃষ্ণদাস তারও উল্লেখ করেছেন।

মধ্যলীলার পঁচিশটি পরিচ্ছেদে সন্ন্যাস গ্রহণ থেকে আরম্ভ করে বৃন্দাবন-মথুরা-কাশী ভ্রমণান্তে চৈতন্যের নীলাচলে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত আখ্যায়িকা অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি হল, সন্ন্যাস গ্রহণ ও নীলাচল গমনের প্রাককালে শান্তিপুরে অদ্বৈতগৃহে সকলের সঙ্গে মিলন, নীলাচল গমন,—সেখানে বাসুদেব সার্বভৌমকে অদ্বৈতবাদী পথ থেকে দ্বৈতবাদী গৌড়ীয় বৈষ্ণবাদর্শের পথে আনায়ন, দাক্ষিণাত্যে তীর্থযাত্রা, রামানন্দ সংবাদ (ভক্তির স্বরূপ ও স্তর-পর্যায় বিষয়ে আলোচনা), গৌড়পথে বৃন্দাবন যাত্রা এবং অর্ধপথেই নাটশালা থেকে পুনর্বার

মধ্যলীলা

নীলাচলে প্রত্যাবর্তন, বৃন্দাবন-মথুরা-কাশী পরিভ্রমণান্তে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন। এই খণ্ডেই বাসুদেব এবং রামানন্দের সঙ্গে চৈতন্যের আলোচনাসূত্রে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তিদর্শন বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। রাগানুগা ভক্তিরহস্য, বেদান্তের ভক্তিব্যাখ্যা, বৈষ্ণব রসপর্যায় বিশ্লেষণ, মধুর রসের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন, ঈশ্বর জীব কৃষ্ণরাধা-তত্ত্ব প্রভৃতি বৃন্দাবন গোস্বামীদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি এই খণ্ডেই বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। এই দিক থেকে ষষ্ঠ, অষ্টম, বিংশ এবং চতুর্বিংশ অধ্যায়গুলি গুরুত্বপূর্ণ।

অন্ত্যলীলা

অন্ত্যলীলায় বিশটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। এই অংশও লেখক বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন। তবু লেখকের তৃপ্তি হয়নি। তাঁর মনে হয়েছে সংক্ষেপেই এই লীলা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু প্রভুর লীলা-বৈচিত্র্যে গ্রন্থ-কলেবর বেড়ে উঠেছে।—

বৃন্দাবন দাস প্রথম যে লীলা বর্ণিল।
সেই সব লীলার আমি সূত্রমাত্র কৈল॥
তাঁর ত্যক্ত-অবশেষ সংক্ষেপে কহিল।
লীলার বাহুল্যে গ্রন্থ তথাপি বাঢ়িল॥
অতএব সব লীলা নারি বর্ণিবারে।
সমাপ্তি করিল লীলা কার নমস্কারে॥ [অন্ত্য, ২০ পরি]

অন্ত্যলীলার প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি হল রূপের সঙ্গে নীলাচলে দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎকার এবং রূপের ললিতমাধব ও বিদগ্ধমাধব নাটকের বিষয়-শ্রবণ, ছোট হরিদাসের প্রতি শাস্তি বিধান, হরিদাসের কাহিনী ও নির্বাণ প্রসঙ্গ, সনাতনের সঙ্গে দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার এবং তাকে দেহত্যাগ সংকল্প থেকে নিবৃত্তকরণ, প্রদ্যুম্নমিশ্র কর্তৃক রায় রামানন্দের জিতেন্দ্রিয় স্বভাব প্রত্যক্ষীকরণ ও তার কাছে কৃষ্ণকথা শ্রবণ, রঘুনাথের কাহিনী: চিড়া মহোৎসব, জগদানন্দের প্রভুর প্রতি অভিমান প্রসঙ্গ, নবদ্বীপ থেকে নিত্যানন্দ, শিবানন্দ প্রভৃতি ভক্তদের নীলাচলে আগমন ও প্রভু-মিলন প্রসঙ্গ, মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ অবস্থা: মন্দিরের সিংহদ্বারে ভাবাবেশ, চটকগিরি দর্শনে উন্মাদনা, গাভীমধ্যে পতন ও কূর্মাকৃতি লাভ, সমুদ্রপতন, গম্ভীরার দেওয়ালে মুখ সংঘর্ষণ, নিজকৃত শিক্ষাষ্টক পঠন ও ভক্তদের শিক্ষণ। মুখ্যতঃ চৈতন্যের দিব্যোন্মাদ অবস্থার চিত্রাঙ্কনে লেখক অন্ত্যলীলাকে এত বিস্তৃত করেছেন। সাধারণ্যে চৈতন্যের কৃষ্ণপ্রেম-গভীরতা প্রকাশের উদ্দেশ্যেই কৃষ্ণদাস অন্ত্যলীলার এত চমৎকারী বর্ণনা দিয়েছেন।

কৃষ্ণদাসের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত একাধারে তত্ত্ব ও প্রেমাকুলতার সার্থক চিত্রণ। যে উচ্চাঙ্গের কবিপ্রতিভা তত্ত্বকেও ভাবাকুলতার সংযোগে কাব্যরসে ফুটিয়ে তুলতে পারে আলোচ্য গ্রন্থে সেই কবি প্রতিভার স্ফুরণ ঘটেছে। ডঃ সুশীলকুমার দে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভাষাশৈলীকে **quaint and laboured diction** বলেছেন। ড. সুকুমার সেনও কবিরাজ গোস্বামীর ভাষার মধ্যে ব্রজবুলির মিশ্রণ লক্ষ্য করেছেন। একথা সত্য, বৃন্দাবনদাস বা লোচনদাসের তুলনায় কৃষ্ণদাসের রচনাশৈলী কিছুটা কঠিন। এই কাঠিন্য কিন্তু তাঁরই কথায় বলতে গেলে, ইক্ষুচর্বণের ন্যায়। একটু আয়াস সহকারে পাঠক ভিতরে প্রবেশ করলে তার মাধুর্যের সন্ধান পান। এবং এই মাধুর্যের আস্বাদন গভীর সঞ্চারী আনন্দানুভূতি জাগিয়ে তোলে। কবিরাজ গোস্বামীকে এ-গ্রন্থে বহু সংস্কৃত শ্লোকের

পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের সমন্বয়

বঙ্গানুবাদ করতে হয়েছে, তার ফলে কবিত্ব মাঝে মাঝে ক্ষুণ্ণ হয়েছে; তাছাড়া তত্ত্বব্যাখ্যাতেও অনেক সময় কবিত্বের মাধুর্য রক্ষা সম্ভবপর হয়নি। তবু সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে গ্রন্থটিকে পাণ্ডিত্য, গভীর বৈষ্ণবতত্ত্বজ্ঞান ও কবিত্বের আশ্চর্য সংমিশ্রণের সার্থক উদাহরণরূপে গণ্য করতে হয়। বৃন্দাবন গোস্বামীরা ইচ্ছাসত্ত্বেও গৌড়বাসীকে গৌড়ীয় তত্ত্বদর্শন ঠিকমত বোঝাতে সক্ষম হননি, দেবভাষা সংস্কৃতে তাঁদের গ্রন্থগুলি লিখিত হয়েছিল বলে। তাঁদেরই ইচ্ছানুযায়ী কৃষ্ণদাস তাঁদের ব্যাখ্যাত গৌড়ীয় বৈষ্ণব প্রেমতত্ত্ব চৈতন্য-জীবনী অবলম্বনে বাংলায় প্রচার করলেন, সে প্রচারে যেমন গৌর নিতাই বা অদ্বৈতকে যথাযোগ্য গুরুত্ব দিয়েছেন, —তেমনি বৃন্দাবনের কৃষ্ণরাধা প্রেমলীলার মূল রহস্যও চমৎকার বুঝিয়েছেন। গৌর আবির্ভাবের গৌণ ও মুখ্য কারণরূপ তত্ত্বব্যাখ্যাও কৃষ্ণদাস ষট-গোস্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণে করেছেন, পদ্যাবলীতে-ধৃত চৈতন্যের নামে প্রচলিত শিক্ষাষ্টক-গুলিও চমৎকার অনুবাদ করে (অন্ত্যঃ ২০ পৃ) দিয়েছেন। এ-গ্রন্থ দ্বারা সম্ভবতঃ বৃন্দাবনের ষট্‌গোস্বামী বাংলাদেশে গৌরপারম্যবাদের আতিশয্য কমাতে চেয়েছিলেন। কৃষ্ণদাস সে কাজে সফল হয়েছেন বলা-যেতে পারে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বংলাদেশে প্রচারের পর অল্পদিনের মধ্যেই বৈষ্ণব সমাজে অন্য গ্রন্থগুলির প্রাধান্য কমে গিয়ে এই গ্রন্থটিই সমাদৃত হতে থাকে। গ্রন্থটি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মণীষা, কবিত্ব এবং সহজ তত্ত্বব্যাখ্যার সুষ্ঠ-সমন্বয়ের একটি আশ্চর্য নিদর্শন বলা যেতে পারে।

গোবিন্দদাসের কড়চা

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে জয়গোপাল গোস্বামী কর্তৃক 'গোবিন্দদাসের কড়চা' প্রকাশের পর থেকেই গবেষক মহলে এই গ্রন্থের প্রামাণিকতা বিষয়ে বিতর্কের সূত্রপাত হয়। জয়গোপাল শান্তিপুর নিবাসী কালিদাস নাথের কাছে 'গোবিন্দদাসের কড়চা' এবং 'অদ্বৈত বিলাস' পুঁথির সন্ধান পেয়ে পুঁথি দুটি স্বহস্তে নকল করে নেন, এবং কড়চার প্রথমাংশ (১সং ৫১ পৃঃ পর্যন্ত) শিশিরকুমার ঘোষকে (অমৃতবাজার পত্রিকা) দেখতে দেন। শিশির-কুমার এই অংশটি আবার শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে (**Rais and Ryot** পত্রিকার সম্পাদক) দেখতে দিলে এই অংশটি হারিয়ে যায়। জয়গোপাল বহু চেষ্টাতেও মূল পুঁথিটি আর সংগ্রহ করতে পারেন নি। পরে শান্তিপুর নিবাসী হরিনাথ গোস্বামীর কাছে প্রাপ্ত খণ্ডিত আর একটি পুঁথির সাহায্যে প্রথমাংশটি উদ্ধার করে গ্রন্থটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। গ্রন্থ প্রকাশের দু'বছর আগে শিশিরকুমার এক প্রবন্ধে এই মূল পুঁথির সম্বন্ধে লেখেন "শ্রীগোবিন্দের কড়চা বলিয়া একখানি অতি সুন্দর গ্রন্থ আছে। গ্রন্থকার শ্রীগোবিন্দের সমকালীন লোক, কায়স্থ, বেশ পয়ার লিখতে পারেন, বর্ণনাশক্তিও সুন্দর আছে, সংস্কৃত ভাষায়ও উত্তম অভিজ্ঞতা ছিল স্পষ্টই বোধ হয়।" কড়চা প্রকাশের পরই শিশিরকুমারের অনুজ মতিলাল এক প্রবন্ধে লিখলেন, "হাঁটু ধরি রাম রায় করেন ক্রন্দন" অংশ পর্যন্ত প্রক্ষিপ্ত "ইহার পরে গ্রন্থে যাহা আছে তাহা সমস্তই সত্য" অর্থাৎ যে অংশটি হারিয়ে গিয়েছিল (১ম সং-এ ৫১ পর্যন্ত, ২য় সং ২২ পৃষ্ঠার ১-ম পয়ার পর্যন্ত) সেটুকুর প্রামাণিকতায় সন্দেহ প্রকাশ করলেন, এই সন্দেহ ১৯০০ খৃঃ পর্যন্ত দীনেশচন্দ্র সেনও পোষণ করে এসেছেন। কিন্তু এর পর দীনেশচন্দ্রের ভূমিকাসহ এবং জয়গোপালের পুত্র বনোয়ারী লালের সম্পাদনায় গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়। সেখানে সমগ্র গ্রন্থটিকে প্রামাণিক প্রতিপন্ন করতে একপক্ষ যেমন আগ্রহ দেখাতে থাকেন, সমগ্র গ্রন্থটিই জাল প্রমাণের জন্য দ্বিতীয় পক্ষ তেমনি বদ্ধপরিকর হন। গ্রন্থের প্রামাণিকতার পক্ষে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও দীনেশচন্দ্র সেনের নাম, গ্রন্থের অপ্রামাণিকতার পক্ষে মৃণালকান্তি ঘোষ ও বিপিনবিহারী দাশগুপ্তের নাম উল্লেখযোগ্য। ড. মজুমদার উভয়পক্ষের যুক্তি নিরপেক্ষভাবে আলোচনান্তে সিদ্ধান্ত করেছেন,—

গ্রন্থ প্রাপ্তির সূত্র

প্রামাণিকতার প্রশ্ন

"প্রকাশিত গ্রন্থের কোন উক্তিই আপাততঃ শ্রীচৈতন্যচরিতের ঐতিহাসিক উপাদানরূপে গ্রহণ করা যায় না। কিন্তু তাই বলিয়া কড়চার আগাগোড়া সমস্তটাই যে জয়গোপাল গোস্বামীর কল্পনাপ্রসূত, তাহার কোন প্রকার প্রাচীন ভিত্তি নাই, একথা বলাও সঙ্গত মনে হয় না। কোন প্রকার নির্ভর-যোগ্য প্রমাণ না পাইলেও আমার বিশ্বাস যে গোস্বামী মহাশয় হয়ত কোন কীট-দষ্ট প্রাচীন পুঁথিতে সংক্ষিপ্তভাবে যাহা পাইয়াছিলেন, তাহাই পল্লবিত করিয়া নিজের ভাষায় লিখিয়া 'গোবিন্দদাসের কড়চা' নাম দিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন।[১]

এই সিদ্ধান্তের পটভূমিকায় উক্ত গ্রন্থটি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা অনাবশ্যক মনে হয়। গ্রন্থটিতে চৈতন্যের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ পথের যে বর্ণনা আছে, বিভিন্ন লীলার যে বর্ণনা আছে, অপেক্ষাকৃত প্রামাণিক জীবনীগুলিতে প্রদত্ত বর্ণনার সঙ্গে তার যথেষ্ট অমিল লক্ষিত হয়। গোবিন্দদাস বলে চৈতন্যের কোনও একজন ভৃত্য ছিলেন। সুতরাং চৈতন্যের সঙ্গে তার দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ নিছক কল্পনাও হতে পারে। তিনি যদি সম্যক শিক্ষাপ্রাপ্ত না হয়ে থাকেন ভৌগোলিক বিবরণ

১। সম্প্রতি ডঃ মজুমদারকে এ বিষয়ে পুনর্বার প্রশ্ন করাতে তিনি যে মতামত দিয়েছেন তার প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

ড. বিমানবিহারীর সাম্প্রতিক মত

গোবিন্দদাসের লেখা কোন বই যে ছিল তাহার একটি নূতন প্রমাণ (অর্থাৎ যাহা এ পর্যন্ত কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই) জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল হইতে উপস্থিত করিতেছি। তিনি মহাপ্রভুর ক্ষেত্রবাস লীলার বিবরণ দিতে যাইয়া বলিতেছেন যে চৈতন্য—

দণ্ডবৎ হৈঞা সিংহদ্বারে প্রবেশিল।
একশত দণ্ডবৎ গোবিন্দ লেখিল॥ [পৃঃ ৯৯]

এই গোবিন্দ বাসুঘোষের অগ্রজ গোবিন্দ ঘোষ বা শ্রীবাস আচার্যের শিষ্য সুপ্রসিদ্ধ পদকর্তা গোবিন্দদাস হইতে পারেন না। কেননা প্রথমোক্ত ব্যক্তি তখন পুরীতে আসেন নাই এবং শেষোক্ত ব্যক্তি জন্মেন নাই। প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে যে গোবিন্দ থাকিতেন তিনিই কোথাও এইরূপ লিখিয়াছেন। জয়ানন্দ তাহার গ্রন্থের সূচনায় (পৃঃ ৩) পরমানন্দ পুরীর গোবিন্দ বিজয়, পরমানন্দ গুপ্তের গৌরাঙ্গ বিজয় গীত এবং গোপাল বসুর চৈতন্যমঙ্গলের কথা লিখিয়াছেন। সেগুলি যেমন এ-পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই, গোবিন্দদাসের লেখা বইও তেমনি ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে অজ্ঞাত ছিল। ঐ সালে অদ্বৈত বংশীয় গোস্বামী সন্তান জয়গোপাল গোস্বামী (১৮৩০-১৯১৬) গোবিন্দদাসের কড়চা প্রকাশ করেন। তাঁহার বয়স তখন ৬৫ বৎসর। এই বয়সে সাধারণতঃ লোকে জালজুয়াচুরি করিতে প্রবৃত্ত হয় না। তারপর

রাখতে গিয়ে ভুলভ্রান্তিও অস্বাভাবিক নয়। তবে সেখানে ইংরেজ আমলে (খৃ ১৮৩৬) স্থাপিত Russell Konda-কে রসালকুণ্ড নামে পরিচিত করা এবং অনুরূপ আরও কিছু তথ্যগত, বা গ্রন্থের ভাষাগত অর্বাচীনতা জয়গোপাল গোস্বামীর হাতেই ঘটেছে অনুমান করতে কষ্ট হয় না। প্রাচীন পুঁথির এমন সংশোধন সে যুগে ততটা দোষাবহ বলে গণ্য হত না। স্বয়ং দীনেশচন্দ্র পূর্ববঙ্গ গীতিকায় ভাষা ও ছন্দের বহু পরিমার্জনা করেছেন। প্রামাণিকতার দিক থেকে 'গোবিন্দদাসের কড়চা'র এই ত্রুটির কথা মনে রেখেও সমগ্র গ্রন্থটিকে বনোয়ারী-লালের জাল রচনা হিসাবে গণ্য করা ঠিক হবে না মনে হয়। ডঃ সুশীলকুমার দে, ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার প্রমুখ প্রবীণ গবেষকেরাও গ্রন্থটিকে সম্পূর্ণই কাল্পনিক রচনা বলে উড়িয়ে দেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করেন নি। বস্তুতঃ আর একখানি 'কড়চা' পুঁথি হাতে পেলেই বনোয়ারীলাল মূল পাঠ থেকে কতটা পরিবর্তন করেছেন সে বিষয়ে বহু বিতর্কিত সমস্যার অনেকটা সমাধান সম্ভবপর হতে পারে।

আবার তিনি এমন এক পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন যাহার দ্বারা বাংলা দেশ ও তাহার বাহিরে শ্রীচৈতন্য-ধর্মের ঐতিহ্য সংরক্ষিত ও প্রচারিত হইয়াছে। কোন ঘটনার প্রচার হইলে শ্রীচৈতন্যের ভক্তদের মনে আঘাত লাগিতে পারে তাহা তাহাপেক্ষা বেশী কম লোকেই জানিতেন।...এমন লোককে জালিয়াৎ বলা অত্যন্ত গর্হিত স্পর্ধার কাজ। তবে কোন প্রাচীন পুঁথিকে ভিত্তি করিয়া নিজের ভাষায় বর্তমান কালের উপযোগী বই লিখিতে যাইয়া তিনি ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত রাসেল কোণ্ডা ও পূর্ণা নদীর তীরে মন্দিরবিহীন পূজার কথা সংযোজন করিয়াছিলেন বলা যায়।

[গোবিন্দদাসের কড়চা কি একেবারে কাল্পনিক, শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার সম্মেলনী বর্ষ ১, সংখ্যা ১০, মাঘ ১৩৭৩ ; পৃ ৯-১২]

উৎস নির্দেশ

উৎস নির্দেশ

(ক) পরিভাষা

১। তারকা চিহ্নিত পৃষ্ঠাঙ্ক পাদটিকা জ্ঞাপক। নামের উভয়দিকে কমাচিহ্ন গ্রন্থনাম-জ্ঞাপক।